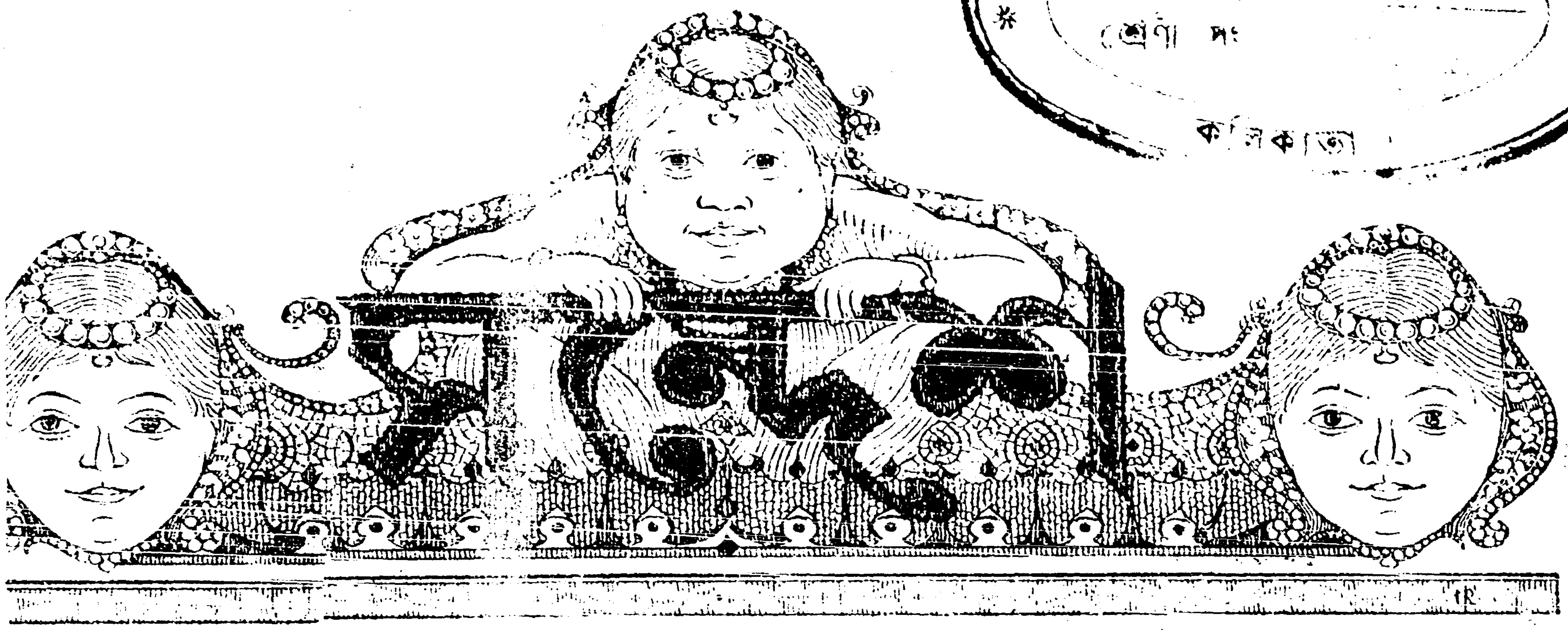

ীয় বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২১ | প্রথম সংখ্যা

ফুলের ভাষা।

(সকল) ভুবন উজল করি ফুটেছি আমরা সবে,
তাঁহার অমৃত ধারা আনন্দে বিতরি ভবে,
যাঁহার করুণা লভি সুনীল গগন তল,
যাঁহার করুণা গাহি নাচিয়া চলেছে জল,
যাঁহার করুণা লভি নিশীথে ফুটিছে তারা,
যাঁহার করুণা লভি স্নিগ্ধ শ্যামল ধরা,
তাঁহারি করুণা লভি ফুটেছি আমরা সবে,
আনন্দ অমৃতধারা বিতরি তাঁহারি ভবে।

(গোলাপ) আমরা গোলাপ ফুল,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি লয়ে
ফুটেছি কাঁটার মাঝে
সৌরভে অতুল।

(শতদল) মেলিয়া শতেক দল
ফুটিয়াছি শতদল
নির্ম্মল সরসী জলে,

বিলাইয়া পরিমল,
আকুলি ভ্রমর কুলে।

(চম্পক) সোণার বরণ কায়,
সোণালী বসন গায়,
চম্পক এসেছি দ্বারে।

(শেফালি) প্রভাত পবন ভরে
শ্যামল তৃণের পরে
শেফালি পড়েছি ঝরে।

(যূথিকা) নিশীথ গগন তলে
আঁধার ধরণী কোলে
যূথিকা উঠেছি ফুটি,
শুভ্র বেশ শুভ্র হাসি,
বিমল সৌরভ রাশি,
কাননে যেতেছে লুটি।

(অপরাজিতা) আমরা অপরাজিতা,
আকাশ বরণ দিব্য বসনে
কুসুম কুঞ্জ ঘিরি,
আমরা অনিন্দিতা।

(সকলে) ভুবন উজল করি ফুটিছে কুসুমচয়
তাঁহার আশীষ বহি, গাহিয়া তাঁহারি জয়।
শুনগো ফুলের কথা, বিচিত্র বরণে বাসে,
কহে সে জগতজনে, নীরব মধুর ভাষে।

(অপরাজিতা) সবারে বাসেন ভাল, নিখিল ভুবন পিতা
যতনে পালেন সবে, কহিছে অপরাজিতা;
নীল জলধি জল, নীলিমা গগন দেহে,
মোরেও সুনীল বেশে সাজায়ে দিলেন স্নেহে।

(যূথিকা) যূথিকা কহিছে শুন, শুভ্র বদনে হাসি—
গোপনে আঁধার রাতে বিজন কাননে বসি,

বিমল বসন বাসে, সৃজিলেন মোরে যিনি
পবিত্র সুন্দর করি, পরম পবিত্র তিনি।
(শেফালি) শেফালি পড়িল ঝরি,—যেন রে অশ্রুরাশি
প্রকৃতি নয়ন হতে ধরায় পড়িল খসি,
কহিল মানবে ডাকি, দুঃখী জনের তরে
যেন গো পরাণ কাঁদে, নয়নে অশ্রু ঝরে।
(চম্পক) চম্পক কহিছে, হের দীপ্ত অরুণ ভাতি
কুসুম কোমল অঙ্গে দিলেন জগতপতি ;
কোমল মানব প্রাণে জ্ঞানের আলোকধারা,
স্বর্ণ চম্পক সম, শোভায় উজলে ধরা।
(শতদল) দুলিয়া মলয় বায়ে কহে শুন শতদল,
প্রভাত অরুণালোকে মেলিয়া অমল দল,
হৃদয় কমল তব পুণ্য আলোকে তাঁর
পুলকে উঠুক ফুটি, ঘুচুক মনের ভার।
(গোলাপ) গোলাপ কাঁটার মাঝে গরবে ফুটিয়া রয়,
জগতবাসীর প্রাণে আনন্দ বারতা গায় ;
মধুর মধুর ভব, তাঁহারি অসীম স্নেহে,
আনন্দ জাগিয়া রহে মধুর মানব গেহে।

শ্রীসুখলতা রাও।

নূতন বৎসর।

ভগবানের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমরা নূতন বৎসরের কাজ আরম্ভ করিতেছি। আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের মঙ্গল হউক; এবারে আমরা যেন আরো ভাল করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে পারি।

একটা বৎসর চলিয়া যাওয়া ত সহজ কথা নহে। পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া আমরা এই সময়ের মধ্যে না জানি কোথা হইতে কোথায় চলিয়া আসিয়াছি। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, গত বৈশাখ মাসে আমরা আকাশের যে স্থানে ছিলাম, সূর্য্যের চারি দিক ঘুরিয়া আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিয়াছি; এই ঘটনাটি ঘটিতে যে সময় লাগিয়াছে তাহাই একটি বৎসর। সূর্য্য এখান হইতে প্রায় ৯২৭৯৬৯৫০ মাইল দূরে, তাহার চারি দিক ঘুরিয়া আসিতে গেলে প্রায় ৫৮৪০০০০০০ মাইল পথ চলিবার দরকার হয়। এই কাজটি আমরা ৩৬৫¼ দিনে শেষ করিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮½ মাইল হিসাবে চলিতে হইয়াছে।

সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল! কি ভয়ঙ্কর কথা। রেলগাড়ী যদি এত তাড়াতাড়ি চলিতে পারিত, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইতে এক মিনিটও লাগিত না। ২২ মিনিটের মধ্যে সমস্তটা পৃথিবী ঘুরিয়া আসা যাইত (অবশ্য, পৃথিবীর চারিদিক বেড়িয়া রেল থাকিলে)।

আসলে কিন্তু পৃথিবীকে ইহার চেয়েও তাড়াতাড়ি চলিতে হইতেছে। সূর্য্য যদি আকাশের এক জায়গায় স্থির থাকিত, তবে তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবীর ঐ পরিমাণ পথই চলিতে হইত, এ কথা ঠিক। কিন্তু পণ্ডিতেরা অনেক পরীক্ষা আর হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্য আকাশের এক স্থানে বসিয়া নাই, সে বৎসরে চল্লিশ পঞ্চাশ কোটী মাইল হিসাবে এক দিক পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই হিসাবে পৃথিবীকেও সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইতেছে, নচেৎ সূর্য্য তাহাকে পিছনে অন্ধকারের মধ্যে ফেলিয়া নিজের আলোক লইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে।

ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর কাজ কত কঠিন। বেচারীকে চলিতে চলিতে ক্রমাগত পাক খাইতে হইতেছে, নহিলে আমাদের দিন রাত হয় না। পাক খাইতে খাইতে আবার তাহাকে সূর্য্যের চারিধারে চক্কর দিয়া আসিতে হইতেছে, নহিলে আমাদের বৎসর হয় না। এই সব কাজ করিতে করিতে আবার শুধু সূর্য্যের সঙ্গে থাকিবার জন্য তাহাকে বৎসরে চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি মাইল করিয়া ছুটিতে হইতেছে, নহিলে আমরা অন্ধকারে পড়িয়া মারা যাই।

সুতরাং, পৃথিবী যে বৎসরের শেষে আবার আকাশের একটা জায়গায় ফিরিয়া আসে, এ কথা আসলে ঠিক নহে। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে আমরা যেখানে ছিলাম, এখন তাহা হইতে ঢের দূরে আছি। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এমন ভাবে এত দিন ছুটিয়াও পৃথিবী আকাশটাকে পাড়ি দিতে পারে নাই; সে জিনিসটা না জানি তবে কত বড়!

যাহা হউক, এত কথায় আমাদের কাজ নাই; আমরা বৎসরের কথাই বলিতে যাইতেছি। আকাশের যেখানেই থাকি, বৎসরে সূর্য্যের চারিদিক একবার দেখিয়া আসিতেছি একথা ঠিক। আর, তাহার দরুণ যাহা ঘটিবার কথা, তাহা নিয়মিতরূপেই ঘটিতেছে, সুতরাং আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, এ সকল ঋতুর পরিবর্ত্তন কেন হয়? না, পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাই। আর এক দিন তাহার কথা ভাল করিয়া বলিব। আজ শুধু এইটুকু মনে করিয়া দিতেছি যে, এই সকল ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৎসরের হিসাবও আমরা পাইতেছি। শীতকালের দিন কেমন ছোট, আর রাত কত লম্বা; গ্রীষ্মকালের দিন কত লম্বা, আর রাত কত ছোট। এ সকল কথা হয় ত তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ। মোটামুটি ২১এ ডিসেম্বর সকলের চেয়ে লম্বা রাত আর ছোট দিন হয়। তার পর ক্রমে রাত ছোট আর দিন বড় হইয়া ২০এ মার্চ্চ দিন আর রাত্রি সমান হয়। তার পর ক্রমে দিন বাড়িয়া আর রাত ছোট হইয়া ২১এ জুন সকলের চেয়ে লম্বা দিন আসে। তার পর আবার দিন ছোট আর রাত বড় হইয়া ২২এ সেপ্টেম্বর দিন রাত সমান হয়। তার পর ২১এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ক্রমে রাত লম্বা আর দিন ছোট হইতে থাকে।

এই সকল ঘটনা হইতে বৎসরের হিসাব সহজেই পাওয়া যায়। চৈত্র মাসের শেষ দিনকে "বিষুব সংক্রান্তি" বলে; সেই দিন দিবা রাত্রি সমান হইবার কথা। ইহার পরের দিন (অর্থাৎ ১লা বৈশাখ) হইতে দিন রাত্রির চেয়ে বড় হইতে থাকে, সেই দিন হইতে গ্রীষ্মকাল এবং বৎসরের আরম্ভ ধরা হয়।

দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে ৩০এ চৈত্র বিষুব সংক্রান্তি হইত বটে, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। পৃথিবীর চাল চলনের মধ্যে এমন একটু ঘোর প্যাঁচ আছে, যাহার দরুণ বিষুব সংক্রান্তি ক্রমেই ঠিক বৎসর শেষ হওয়ার একটু আগে পড়িয়া যায়। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই ঘটনার কথা জানিতেন, কিন্তু এখনকার পঞ্জিকায় আর তাহার

কোন হিসাব রাখা হয় না। বিষুব সংক্রান্তি আসলে ২০এ মার্চ্চ হইয়া গিয়াছে; সেই দিন দিন রাত সমান ছিল। সে দিনকার বাংলা তারিখ ছিল ৬ই চৈত্র। তাহার পরের দিন হইতে ১লা বৈশাখ ধরিতে পারিলেই বৎসরের হিসাব ঠিক হইত।

যাহা হউক, সে হিসাব যখন হইবার নয়, তখন আর দুঃখ করিয়া লাভ কি? চলিত হিসাবেই তোমাদের শত বৎসর পরম সুখে কাটিয়া যাউক!

শব্দবেধী।

জন্তুকে না দেখিয়া, কেবল মাত্র তাহার শব্দ শুনিয়াই যে তাহাকে তীর দিয়া বিঁধিতে পারে, তাহাকে বলে 'শব্দবেধী'।

রাজা দশরথ এইরূপ 'শব্দবেধী' ছিলেন। যুবা বয়সে অনেক সময় তিনি রাত্রিতে বনে গিয়া এইরূপে কত হাতী মহিষ হরিণ শীকার করিতেন। বর্ষার রাত্রে তীর ধনুক লইয়া চুপি চুপি সরযূর ধারে বসিয়া থাকিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। নদীর ঘাটে নানারূপ জন্তু জল খাইতে আসিত; সেই জলপানের শব্দ একটিবার দশরথের কাণে গেলে আর সে জন্তুকে ঘরে ফিরিতে হইত না।

একবার এইরূপ বর্ষার রাত্রিতে দশরথ সরযূর ধারে তীর ধনুক লইয়া বসিয়া আছেন। মনে আর কোন চিন্তা নাই, খালি কাণ পাতিয়া রহিয়াছেন, কখন কোন জানোয়ারের শব্দ শোনা যাইবে। প্রায় সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে, ভোর হইতে আর বেশী বাকি নাই, এমন সময় নদীর ঘাট হইতে "গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্" করিয়া একটা আওয়াজ আসিল।

দশরথ চমকিয়া ভাবিলেন, "ঐ হাতী!" আর সেই মুহূর্ত্তেই সেই শব্দের দিকে একটি ভয়ঙ্কর বাণ শন্ শন্ শব্দে ছুটিয়া চলিল।

দশরথ জানেন না যে সে বাণে কি সর্ব্বনাশ হইবে। সে শব্দ ত হাতীর শব্দ নয়, ঋষির পুত্র ভোরের বেলায় কলসী হাতে ঘাট হইতে জল নিতে আসিয়াছেন, সেই কলসীতে জল পোরার ঐ শব্দ। অন্ধ পিতা মাতা বিছানায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন; তাঁহারা একে যার পর নাই বুড়া, তাহাতে আবার নিতান্ত দুর্ব্বল, চলিবার শক্তি নাই। পিপাসায় তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাই ছেলেটি ছুটিয়া জল নিতে আসিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে এই নিদারুণ বাণ আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিল। রক্তে দেহ ভাসিয়া

গেল, কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল। ঋষিপুত্র ধূলায় পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে বলিলেন, "আহা! আমি ত কাহারও কোন অনিষ্ট করি না। বনে থাকি, ফল মূল খাই আর বৃদ্ধ অন্ধ পিতা মাতার সেবা করি। ওগো! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে এমন নিষ্ঠুর সাজা আমাকে দিলে? হায় হায়! আমার পিতা মাতাকে দেখিবার যে আর কেহই নাই। আমি মরিলে যে আর তাঁহারা কিছুতেই বাঁচিবেন না!"

ঋষিপুত্রের কথা শুনিয়া দশরথের হাত হইতে ধনুর্ব্বাণ পড়িয়া গেল। তিনি দুঃখে অস্থির হইয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! তখন ঋষিপুত্র অতি কষ্টে তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! আমার কি অপরাধ ছিল? এই এক বাণে আমারও প্রাণ গেল, আমার পিতা মাতারও প্রাণ গেল। আহা! মা আর বাবা পিপাসায় কাতর হইয়া পথ চাহিয়া আছেন, আমি গেলে জল খাইতে পাইবেন।"

দুঃখে দশরথের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাঁহার কথা বলিবার শক্তি নাই। তাহা দেখিয়া সেই যাতনার মধ্যেও ঋষিপুত্রের দয়া হইল; তিনি বলিলেন, 'মহারাজ! আর এখানে বিলম্ব করিবেন না। এই সরু পথে আমাদের কুটীরে যাওয়া যায়। শীঘ্র গিয়া আমার পিতাকে এই সংবাদ দিন, আর তাঁহার রাগ দূর করুন্, নইলে তিনি আপনাকে ভয়ঙ্কর শাপ দিবেন। আর আপনার এই বাণ যে আমার বুকে বিঁধিয়া রহিয়াছে, ইহার যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না; শীঘ্র এটাকে তুলিয়া দিন।"

দশরথ ভাবিলেন, "হায়! এখন কি করি? বাণ না তুলিলে ইহার যন্ত্রণা যাইবে না, কিন্তু বাণ তুলিলেই ইঁহার মৃত্যু হইবে!" তখন ঋষিপুত্র বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই। বাণ খুলিবার সময় যদি আমি মরিয়া যাই, তাহাতে আপনার ব্রাহ্মণবধের পাপ হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ নহি; আমার পিতা বৈশ্য, মা শূদ্রের মেয়ে।"

একথায় দশরথ ঋষিপুত্রের বুক হইতে বাণ টানিয়া বাহির করিলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটির প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন সেই কলসী ভরিয়া জল লইয়া দশরথ নিতান্ত দুঃখিত মনে ধীরে ধীরে কুটীরের দিকে চলিলেন। সেখানে অন্ধ মুনি আর তাঁহার অন্ধ পত্নী পিপাসায় কাতর হইয়া পুত্রের আশায় বসিয়া আছেন। দশরথের পায়ের শব্দ শুনিয়া মুনি বলিলেন, "বাবা, এত বিলম্ব কেন হইল? তোমার জন্য তোমার মা বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, শীঘ্র ঘরে আইস। তুমি কি রাগ করিয়াছ বাবা? আমাদের যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা তোমার মনে করা উচিত নয়। তুমি কথা কহিতেছনা কেন?"

দশরথের চোখ জলে ভরিয়া গেল। তিনি অনেক কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভগবন্, আমি আপনার পুত্র নহি। আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম দশরথ। আজ এই অভাগার বাণে আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আমি জন্তু মারিবার জন্য সরযূর ধারে বসিয়া ছিলাম। আপনার পুত্রের কলসীতে জল ভরার শব্দ শুনিয়া মনে করিলাম বুঝি হাতীর শব্দ। অন্ধকারের ভিতরে সেই শব্দে দিকে বাণ ছুঁড়িলাম, তাহাতেই সর্ব্বনাশ হইল। এখন এই পাপীর প্রতি আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।"

এই বলিয়া দশরথ ছল ছল চোখে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুনি তাঁহার মুখে সেই দারুণ সংবাদ শুনিয়াও সাধারণ লোকের মত ব্যস্ত হইলেন না, রাজাকে কোন কঠিন শাপও দিলেন না। তিনি কেবল একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তুমি না জানিয়া এ কাজ করিয়াছ, তাই রক্ষা পাইলে, নহিলে আজ তোমার বংশ শুদ্ধ নষ্ট হইত। এখন এক কাজ কর; আমরা আমাদের পুত্রের নিকট যাইতে চাহি, একটিবার আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল।

রাজা তখনই তাঁহাদের দুজনকে সরযূর ধারে লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের চক্ষু নাই, সুতরাং জন্মের মত একটিবার পুত্রের মুখ দেখিয়া লইবার উপায় নাই। তাঁহারা কেবল তাঁহার দেহের উপর পড়িয়া বার বার তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তার পর চিতা প্রস্তুত করিয়া সেই দেহ পোড়ান হইল। তখন অন্ধ মুনি নিতান্ত দুঃখের সহিত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! পুত্রের শোকে আমি এখন যে দুঃখ পাইতেছি এইরূপ পুত্রশোক তোমাকেও পাইতে হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা দুজনে সেই চিতায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, আর দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের শরীর ভস্ম হইয়া গেল।

ইহার অনেক বৎসর পরে বুড়া বয়সে, কৈকেয়ীর ছলনায় দশরথ রামকে বনে দেন, আর সেই রামের শোকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন অন্ধ মুনির সেই কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িয়াছিল,—

"পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মমসাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি॥"

অদ্ভুত চিত্রবিদ্যা।

আমি আগে ভাব্‌তাম যে ছবি আঁকা বড় কঠিন কাজ। এখন দেখ্‌ছি তা নয়, ছবি ইচ্ছা কর্‌লেই আঁকা যায়। এই দেখ আমাদের একটি আড়াই বছরের খুকী কেমন পাখী এঁকেছে।

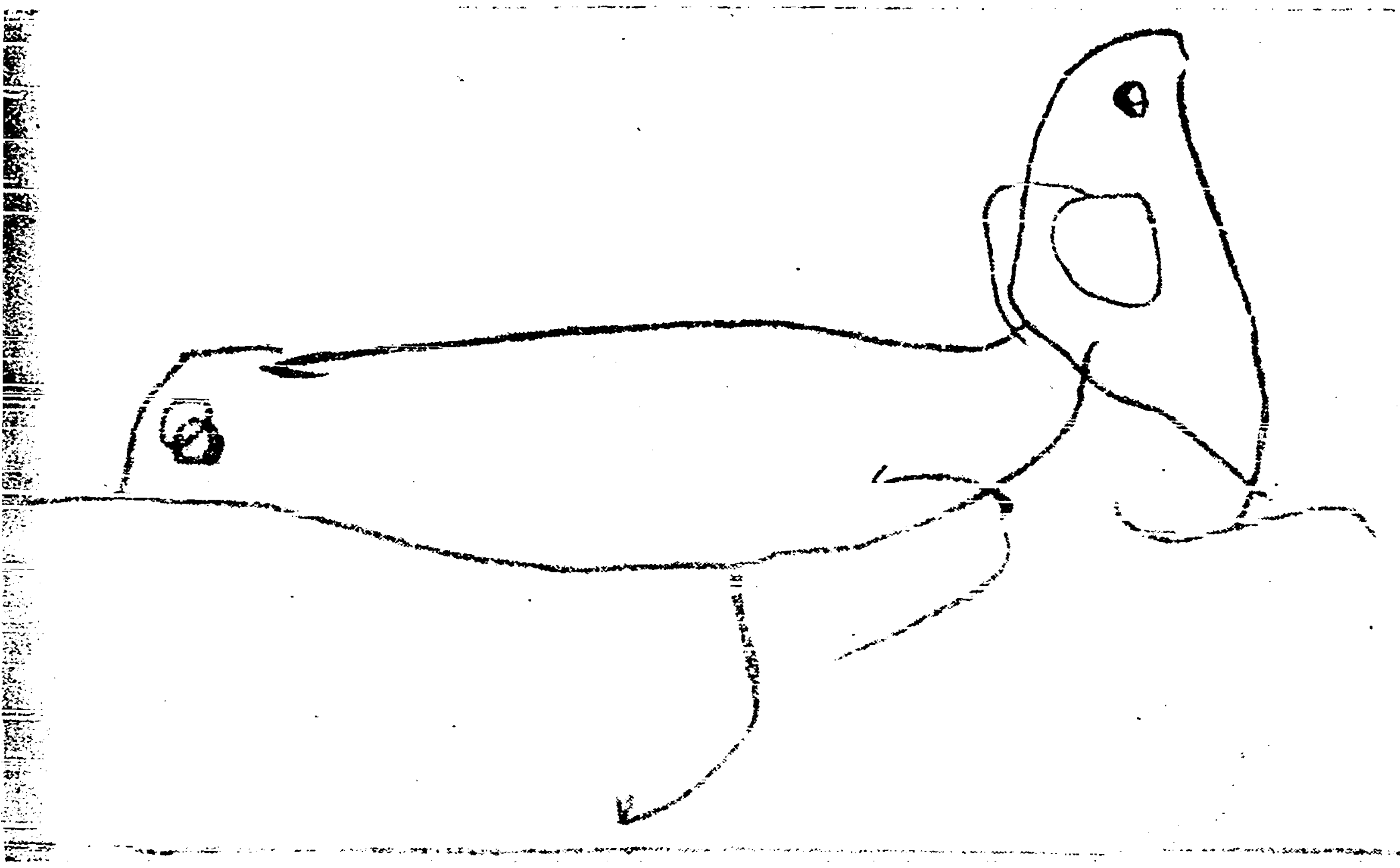

এর চেয়েও একটু ছোট একটি খুকী দুধের বোতল এঁকেছিল, তার দুই মুখে দুটি রবারের বাঁটও ছিল।

ছেলে বেলায় যখন দ'কে টিয়া বানাতে শিখেছিলাম, তখন আমার বয়স কত ছিল জানি না; কিন্তু একথা বেশ মনে আছে যে সে কাজটাতে বেশ মজা লাগ্‌ত। খালি দ'কে টিয়া বানিয়েই যে ছাড়তাম, এমন মনে ক'রো না। পাখী, ঘোড়া, রাজা আর সিপাইও আঁক্‌তে পার্‌তাম।

তোমাদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে, যে কখনো পাখী আঁক নাই? যদি থাক, তবে এই বেলা শীগ্‌গির একটা পাখী এঁকে ফেল, নইলে আমাদের খুকী হাস্‌বে।

ছোট ছোট ছেলেরা পাখী আঁক্‌তেই বেশী পছন্দ করে। তার চোখাল ঠোঁট থাকে, ড্যাবড়েবে চোখ থাকে, গুটান পাখা আর কুলোপানা লেজ থাকে; সবই চমৎকার, খালি হাঁটু দুটো থাকে উল্টো।

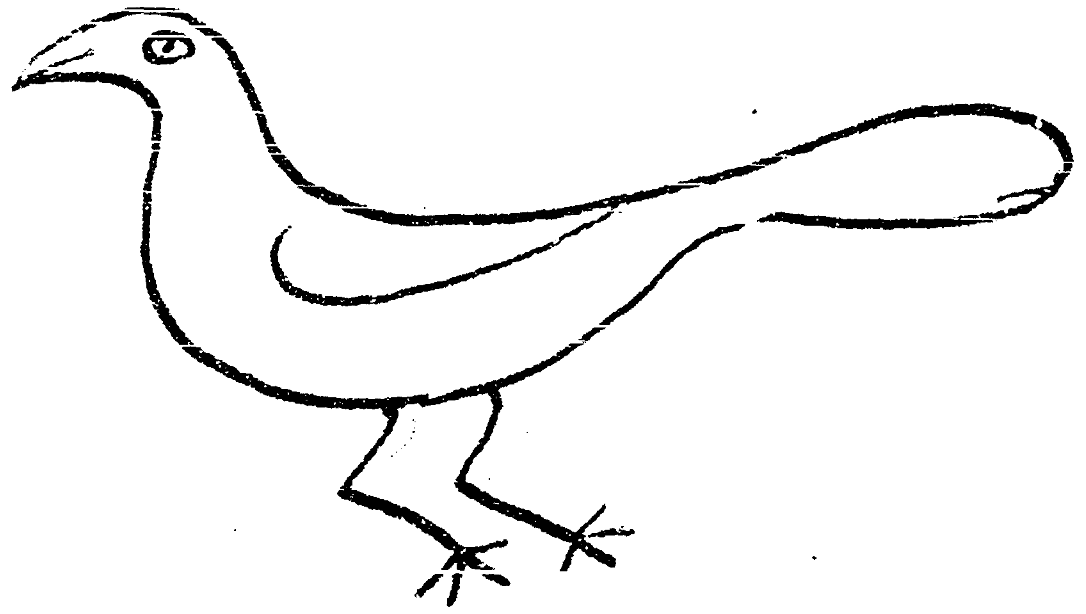

তারা ভাবে, ঐ দুটো তার হাঁটু, তাই হাঁটুর মতন করে আঁকে। আসলে কিন্তু ও জায়গাটা হাঁটু নয়, গোড়ালী।

এর চেয়ে যাদের হাত পাকা, তারা আঁকে ময়ূর। ঠিক ময়ূরের মত তার চক্র

দেওয়া লেজ, লম্বা গলা, ঝুঁটিওয়ালা মাথা. আর মুখে অবশ্যি একটা সাপ, সে বেটা আবার ফোঁস্ কর্‌তে চায় !

আমি এত কথা বল্লাম, এখন বোধ করি তোমাদের সকলেরই ছবি আঁকার ভরসা হবে। এতেও যদি না হয়, তবে সে দিন আমি কতগুলো ছবি দেখেছিলাম, তার কথা বল্‌ছি শুন। একখানি মেজ ঢাকা কাপড়, তাতে কোন্ দেশের মেয়েরা লাল, নীল, হল্‌দে সূতো দিয়ে সব ছবি এঁকেছে। সে ছবি যেমন সহজ, তেমনি সুন্দর। তোমরা তা আঁক্‌তে গেলেই অমনি তা হয়ে যাবে। চল, আঁক্‌তে আরম্ভ করি।

একেকটা কাজ থাকে, সেটা করা খুবই সহজ, কিন্তু তার হিসাব দেওয়া বড়ই মুস্কিল। এই ছবিগুলিও কিন্তু কতকটা সেই রকমের। শুনেছি সেকালের গ্রীস্‌দেশের পটোরাও নাকি অনেক সময় এমনি ছবি আঁক্‌ত; তার নীচে লিখে দিতে হত 'এটা ঘোড়া', 'এটা গাছ', নইলে লোক গাছকে ঘোড়া ভেবে নিত।

যা হোক, এই দেখ কেমন সুন্দর ছবি। ১ নং ছবিটা কি জান? এটা মিসর দেশের পীরামিড! এর যদি পা থাক্‌ত, তাহলে ২নং ছবির মত ঘর হয়ে যেত,—এটা হল চৌচালা; দোচালা হলে ৩নং ছবির মতন দেখাবে।

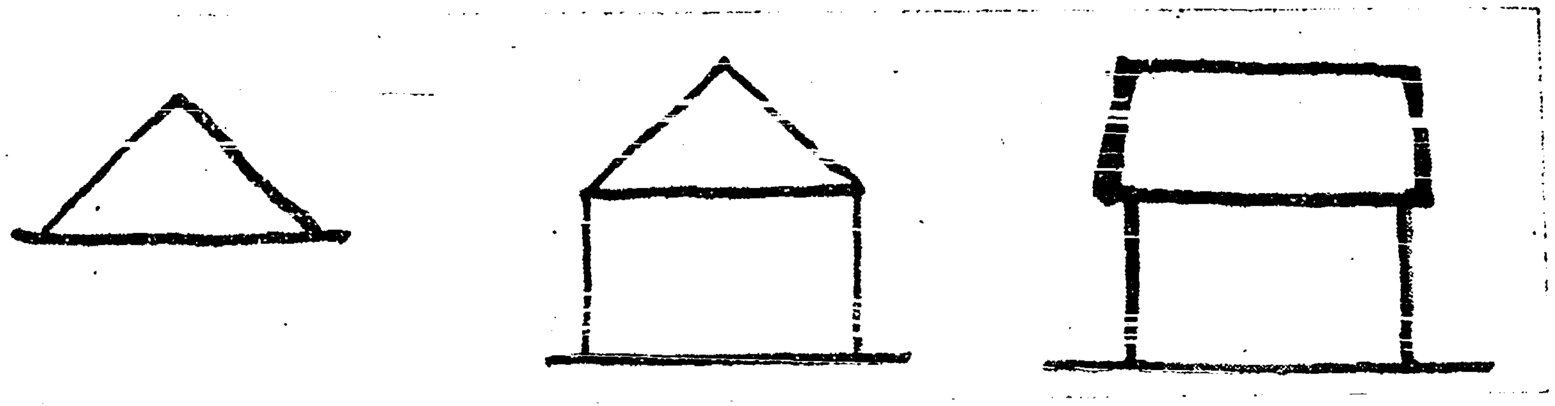

১নং ২নং ৩নং

চৌচালার গলা আর লেজ দিলে সে উট হয়ে যায়, আর দোচালার লেজ আর গলা আঁকলে সে হয় ঘোড়া।

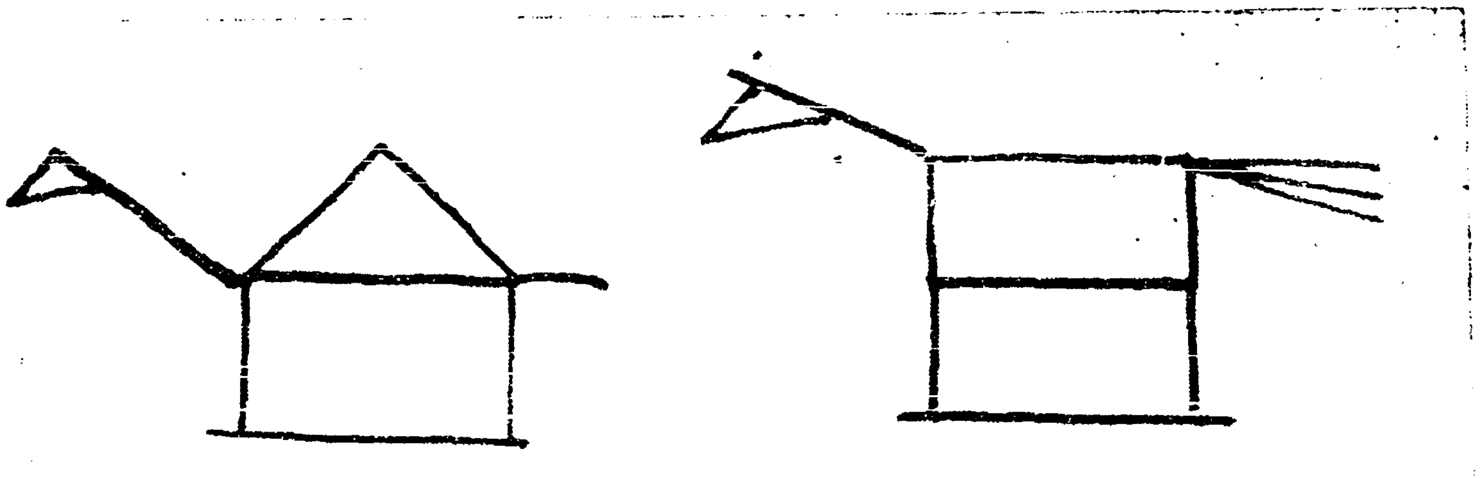

যদি বল ওটা ঘোড়া কেন হবে, আর শেয়াল কেন হবে না, তবে আমি একটু গোলে পড়্‌ব। আমি ত আগেই বলেছি, এ কাজ করা সহজ, কিন্তু এর হিসাব দেওয়া মুস্কিল। মোষ, গরু কি ভেড়া আঁক্‌লে বোধ হয় এর চেয়ে একটু সহজে চেনা যাবে।

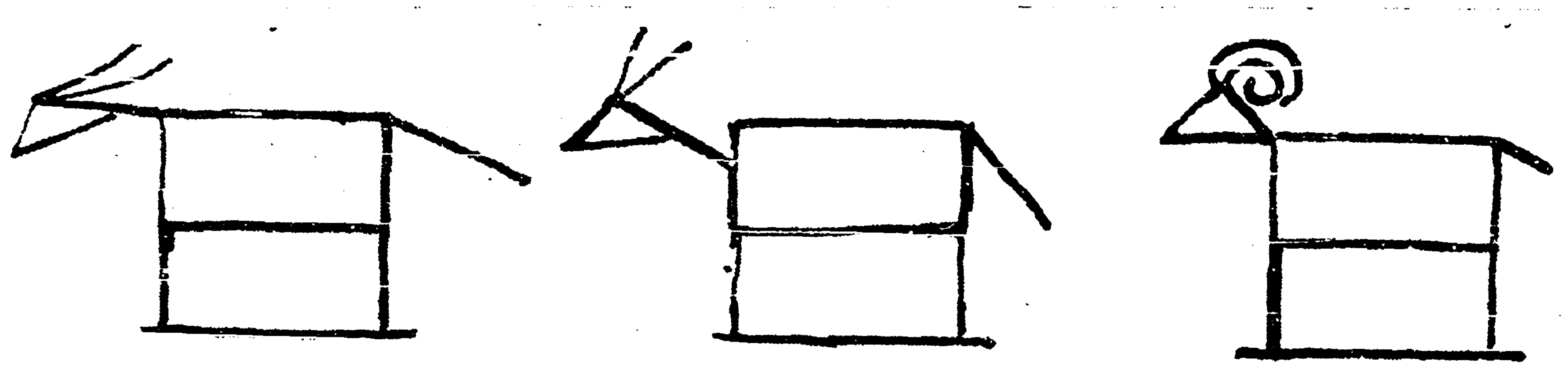

মোষ গরু ভেড়া

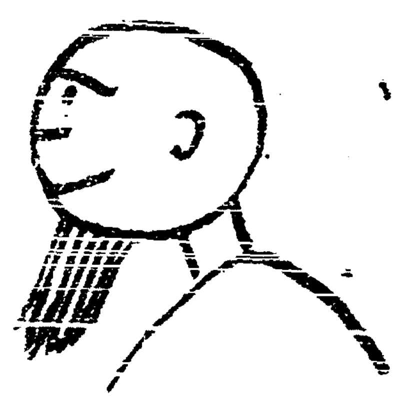

আর আমাদের সেই পাখী আঁক্‌নেওয়ালী খুকীর দাদামশায়কে আঁকলে আর চিন্‌তে কোন মুস্কিলই হবে না। এ ছবি দেখলেই সে বল্‌বে 'দাদা মশায়!' লম্বা দাড়িওয়ালা লোক দেখলেই সে ঐ কথা বলে। এক দিন এক বাবুদের দাড়িওয়ালা দরোয়ানকে দেখে বলেছিল, "একটা দাদা মশায়!"

বোকা ছেলে।

তোমরা মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের নাম শুনিয়াছ কি? তিনি আমাদের দেশের একজন খুব বড়লোক ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল পুনায়। ছেলেবেলায় তাঁহাকে সকলেই খুব বোকা মনে করিত; আর করিবার কারণও ছিল। একবার তিনি গরুর গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন, সঙ্গের লোকেরা তাহা টের পায় নাই। তিনি নিজেও সে কথা কাহাকেও না বলিয়া পথেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, গাড়ী তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভাগিস্ তাঁহার কাকা একটু পরেই সেই পথে আসিয়াছিলেন, নহিলে তিনি সেইখানেই হয় ত বসিয়া থাকিতেন। অনেক বড় হইয়াও তিনি সকল কথা ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; 'কাকা'কে বলিতেন 'টাটা'। এই ছেলেটিই বড় হইয়া শেষে দেশের সকলের মান্য হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে গঙ্গাধর বলিয়া এক জন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকেও ছেলেবেলায় লোকে ভারী বোকা মনে করিত। গঙ্গাধরের পিতা মাতা ছিলেন না। তাঁহার খুড়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতেই তিনি থাকিতেন। বোকা বলিয়া খুড়িমার

নিকট তাঁহাকে বড়ই গঞ্জনা পাইতে হইত, এমন কি, শেষে সে বাড়ীতে থাকাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এক দিন তিনি সেখান হইতে কোথায় যে চলিয়া গেলেন, আর অনেক বৎসর দেশে ফিরিলেন না। তার পর যখন ফিরিলেন, তখন আর তিনি বোকা নহেন, বিদেশ হইতে লেখা পড়া শিখিয়া অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন।

তাঁহার খুড়ার বাড়ীতে কিন্তু কেহ সে কথা জানে না। আহারের সময় তাঁহার খুড়ীমা খুড়ামহাশয়ের পাতে ভাল ভাল মাছ দিয়া গঙ্গাধরের পাতে খান কতক কাঁটা মাত্র দিয়াছেন। গঙ্গাধর তাহাতে হাসিয়া বলিলেন, "খুড়ীমা, আমি ত 'গঙ্গা' নই, আমি 'গঙ্গাধর'।" অর্থাৎ গঙ্গায়ই লোকে আবর্জ্জনা ফেলিয়া থাকে কিন্তু আমি ত তাহা নই আমি যে গঙ্গাধর,—আপনার স্নেহের পাত্র—আমাকে কাঁটা দেওয়া ঠিক হয় নাই।

এ কথায় খুড়া মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছিস ? গরু !" তাহাতে গঙ্গাধর বলিলেন,—

"কিং গবি গোত্বমুতাগবি গোত্বং ?
গবি চেদ্ গোত্বমনর্থকমুক্তম্।
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টং,
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্॥"

অর্থাৎ "কেবল গরুই গরু হয়, না, যে গরু নয় সেও গরু হইতে পারে ? কেবল গরুই যদি গরু হয়, তবে আপনার কথা মিথ্যা। আর, গরু যে নয়, সেও গরু হইতে পারে, ইহাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে ত আপনিও গরু হইতেছেন!"

তখন দুজনে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল, আর তাহাতে হার হইল খুড়া মহাশয়েরই।

কালিদাসের মত কবি কমই জন্মিয়াছে। সেই কালিদাসও নাকি ছেলেবেলায় বড়ই বোকা ছিলেন। 'উষ্ট্র' কথাটি তাঁহার মুখে আসিল না, একবার বলিলেন 'উষ্ট', আর একবার বলিলেন 'উট্র'! গঙ্গাধর যেমন খুড়ীমার জ্বালায় লেখা পড়া শিখিতে বাহির হইয়াছিলেন, কালিদাসও নাকি তেমনি স্ত্রীর তাড়ায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। লোকে এমনি বলিয়া থাকে, সত্য কি মিথ্যা আমি চক্ষে দেখি নাই।

নিউটনের মত অসাধারণ পণ্ডিত, তিনিও নাকি ছেলেবেলায় বোকা ছিলেন। ক্লাসে তিনি সকলের নীচে পড়িয়া থাকিতেন। আর একটি ছেলে ছিল তাঁহার চেয়ে একটু কম বোকা, সেই ছেলেটি তাঁহার একটু উপরে থাকিত। একদিন এই ছেলেটি নিউটনকে এক লাথি মারিল, তাহাতে নিউটন তাহাকে ধরিয়া খুব করিয়া ঠেঙ্গাইয়া

দিলেন। তখন তাঁহার এই কথা মনে হইল যে, "আচ্ছা, গায়ের জোরে যেমন ইহাকে আমি হারাইলাম, তেমনি লেখা পড়ায়ও হারাইতে পারি না ?"

সেই হইতে নিউটন খুব মন দিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিলেন, আর তাহাতে কি হইল, সকলেই জান।

এমনি আরো অনেকের কথা বলা যাইত, কিন্তু ভয় হয়, পাছে কেহ মনে করিয়া বসেন যে, বোকা হইলে খুব লেখা পড়া শিখা যায়। যে যথার্থ বোকা, সে বেচারা লেখা পড়া শিখিতে পারে না। কিন্তু লোকে বোকা বলিলেই কেহ বোকা হইয়া যায় না ; কিম্বা এক বিষয়ে বুদ্ধি না থাকিলেই যে সে অবোধ, এমনও কিছু কথা নহে। সুতরাং লেখা পড়া শিখিতে গিয়া প্রথমে একটু মুস্কিল ঠেকিলেও হাল ছাড়িয়া দিতে হয় না ; যদি কেহ দেয়, সে বড়ই বোকা।

লপাস্‌।

(হিন্দী গল্প অবলম্বনে)

পশ্চিম অঞ্চলে এক পাড়া গাঁয়ে এক ধোপা বাস করত। একদিন তার মা তাকে ডেকে বল্‌লেন, "বাবা অনেকদিন শ্বশুরবাড়ী যাওনি—একবার গিয়ে সেখানকার খবর টবর নিয়ে এসো। কিন্তু দেখো তিন দিনের বেশী সেখানে থেকো না—তা'হলে মান থাক্‌বে না"।

সব ঠিক্‌ঠাক্‌ করে তার পরদিন সকালে উঠে ধোপা শ্বশুর বাড়ী যাত্রা কর্‌ল। তা'দের গ্রাম থেকে তার শ্বশুর বাড়ী অনেকখানি দূরে—কত বড় বড় মাঠ ও ছোট ছোট গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক বেলায় ধোপা শ্বশুর বাড়ী পৌঁছিল।

অনেকদিন পরে জামাইকে পেয়ে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা খুব আহ্লাদ কর্‌তে লাগ্‌ল। তিন দিনের দিন তার মায়ের কথা মনে পড়্‌ল। তখন শ্বাশুড়ীকে বল্‌ল—"আজই আমি বাড়ী যাব।"—অনেক আপত্তির পর শ্বাশুড়ী রাজি হলেন ও ভাল রকম আহারের বন্দোবস্ত কর্‌তে লাগ্‌লেন।

ধোপা খেতে বসে আহারের আয়োজন দেখেই চম্‌কে গেল। কোন্‌টি আগে খাবে তাই ঠিক কর্‌তে না পেরে শেষে আন্দাজে একধার থেকে খেতে সুরু কর্‌ল। পায়েসের মতন একটা কি জিনিষ ছিল সেটা তার এতই ভাল লাগ্‌ল যে সেইটা দিয়েই

সে একেবারে পেট ভরিয়ে ফেল্‌ল আর মনে মনে ভাব্‌ল, এমন জিনিসটা যদি মাকে রাঁধ্‌তে শেখাতে পারি তবে ইচ্ছে মত খেতে পাই। এই ভেবে সে একেবারে তার শাশুড়ীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ'টার নামই বা কি? আর কি রকমেই বা তৈরি কর্ত্তে হয়? শাশুড়ী বলে দিলেন কি করে রাঁধ্‌তে হয়, আর বল্লেন পায়সের নাম্‌টী—"লপাস্‌"।

ধোপা পাছে ভুলে যায় এই ভয়ে মন্ত্র পড়্‌বার মত লপাস্‌ নামটী মনে মনে জপ কর্‌তে কর্‌তে শ্বশুর বাড়ী থেকে সকাল সকাল যাত্রা কর্‌ল। এমন কি শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদের প্রণাম কর্‌তে পর্য্যন্ত ভুলে গেল। একমনে "লপাস" "লপাস" কর্‌তে কর্‌তে চলেছে, এমন সময় একটা ডোবার ধারে এসে তার ভারী জল তেষ্টা পেল আর ভারী ক্লান্তি বোধ হতে লাগ্‌ল। তখন সে আস্তে আস্তে জলে নেমে বেশ করে হাত পা ধুয়ে মনের সাধে খেল। তাতে তার এমনি আরাম বোধ হল যে সে ঐ ডোবার ধারে একটা গাছ তলায় ঘাসের ওপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়্‌লো। বেশ একটু ঘুম পেয়ে আস্‌ছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হ'লো—"সেই মিষ্টি পায়েসের নামটা না কি"? সে দেখ্‌ল নামটা আর কিছু মনে নেই—সে একেবারে ভুলে গিয়েছে। তাই ত নামটা কোথায় গেল?

বুদ্ধিমান তখন স্থির কর্‌ল যে পুকুরে হাত, মুখ ধোবার সময়ই নিশ্চয়ই নামটী হারিয়ে গেছে। কাজে কাজেই সে ব্যস্ত হয়ে জলে পড়্‌ল ও দুহাত দিয়ে পাগলের মত খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। সেখান দিয়ে দুটো পুলিশ যাচ্ছিল। তা'রা ধোপাকে ও রকম ভাবে জলে হাৎড়াতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌ল। ধোপা কাঁদ' কাঁদ' হ'য়ে বল্ল—"আমার একটা ভারী মূল্যবান জিনিস হারিয়ে গেছে—।" তখন পুলিশ দুটো মূল্যবান জিনিসের ভাগ পাবার আশায় কোর্ত্তা, পাগড়ী ইত্যাদি খুলে রেখে জলে নেমে পড়্‌ল। ক্রমে আর একটা লোক এসেও তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

একে ছোট ডোবা, তার উপর চারজনে মিলে মহা উৎসাহে পাঁকের মধ্যে হাতড়াচ্ছে, কাজেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলটা কাদার মত হয়ে উঠ্‌ল। তাই দেখে একজন পুলিশ বলে উঠ্‌ল—"পানিতো একদম লপাস্‌কা মাফিক্‌ হো গিয়া" (অর্থাৎ জল তো একেবারে লপাসের মতন হয়ে গেছে)। যাই পুলিশ এই কথা বলেছে, অম্‌নি ধোপার "লপাস" নামটী মনে পড়ে গেল—আর সে "মিল গিয়া—'মিল গিয়া" (পেয়েছি, পেয়েছি) শব্দে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে দৌড় দিল।

পুলিশেরা দেখ্‌ল এত পরিশ্রম বুঝি বৃথায় যায়—মূল্যবান জিনিসটার ভাগ না দিয়েই ধোপা পালায়। তখন তারাও উঠে তার পেছন পেছন তাড়া ক'রে তাকে ধ'রে ফেল্ল, আর মূল্যবান জিনিসটা দেখাতে বল্‌লে। ধোপা তখন লপাসের কথা আগা গোড়া বল্‌ল। শুনে পুলিশ ছুটো, এত পরিশ্রম মাটি দেখে, বেজায় চ'টে গেল ও তাকে পাগল ঠিক্ করে গাল দিতে দিতে ডোবার ধারে ফিরে এল। এসে দেখে চতুর্থ লোকটার সঙ্গে তাদের জামা পাগড়ী প্রভৃতিও কোথায় যেন সরে পড়েছে।

শ্রীতারকদাস মজুমদার।

হাসির গল্প।

এক চাষার বুদ্ধি একটু কম ছিল। চাষা মাঠে যাবে কাজ কর্‌তে, সারাদিন সেখানে থাক্‌তে হবে, তাই তার স্ত্রী বিকালে জল খাবার জন্য তার কাপড়ে দশখানা চাপাটি বেঁধে দিল।

চাষা ভারী পেটুক ছিল, সে মাঠে যেতে না যেতেই ভাব্‌ল, "উঃ! আমার দেখ্‌ছি এক্ষুনি বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, চাপাটি খাব নাকি! নাঃ, খাব না, তা হলে বিকালে খাব কি?"

খানিক বাদে সে ভাব্‌ল, "উঃ! বড্ড যে ক্ষিদে পেয়েছে, একখানা চাপাটি খাই, বাকি বিকালে খাব।"

এই বলেই সে একখানা চাপাটি খেয়েছে, অমনি তার ক্ষিদে যেন আরো বেড়ে গিয়েছে; তখন সে ভাব্‌ল, "আরেকখানা খাই।" যত খায়, ততই তার ক্ষিদে যেন বেড়ে যায়। একখানা দুখানা করে সে আটখানা খেয়ে ফেল্ল, তবু তার পেট ভর্‌ল না। শেষে বাকি দুখানাও বার করে খেতে হল, আর তাতে তার পেটও ভরে গেল।

তখন চাষা ভাব্‌ল, 'আটটা খেলাম, তাতে কিছু হলনা, আর এ দুটো খেতে না খেতেই পেট ভরে গেল! আহা! এ দুখানা কেন আগে খেলুম না, তা হলে ত গোড়াতেই পেট ভরত, আর আমার কোঁচড়ে আটখানা চাপাটি থেকে যেত। তাই ত, আমি কি বোকা!"

একজন লোক আখ্‌রোট্ গাছের তলায় বসে বল্‌ছে, "দেখ ঈশ্বরের কেমন বিচার! আখরোটের ফল এমনি ছোট করেছেন যে তার শাঁসটুকু মুখে দিতে না দিতেই ফুরিয়ে যায়। কেন? এটাকে আরেকটু বড় কর্‌লে কি হত?"

এমন সময় গাছের উপর থেকে একটি আখরোট টকাস করে তার টাকে পড়েছে। অমনি সে উহুহু ! বলে লাফিয়ে উঠে টাকে হাত বুলাতে বুলাতে বল্ল, "ভাগ্যিস আখরোট এমনি ছোট হয় ! বড় হলে ত আজ মাথা ফেটেই যেত !"

এক গুলিখোর গয়লার বাড়ী থেকে এক বাটি দুধ কিনে নিয়ে চলেছে। চল্‌তে চল্‌তে কখন তার মাথার মলমলের টুপীটি হাওয়ায় উড়ে এসে দুধের বাটিতে পড়েছে, তা সে টের পায় নি। খানিক বাদে সেটার উপর চোখ পড়্‌তে সে বল্ল, "গোয়ালা বেটা ঠকেছে ! দুধ ভি দিয়েছে, সর ভি দিয়েছে !"

তখন সে ভারী খুসী হয়ে বাড়ী এল। এসেই সেই সরখানাকে তুলে সে মুখে দিয়েছে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক চিবিয়েও তার কিছু কর্‌তে পার্‌ছে না। তখন সে নাক মুখ সিট্‌কিয়ে বল্ল, "বেটা আমাকে ঠকিয়েছে ! সর দিয়েছে, লেকেন্ সো ভারী সক্ত !"

এক বড়লোকের বাড়ীতে ভোজ হচ্ছে, এক দল গুলিখোর তাই শুনে সেখানে নিমন্ত্রণ খেতে চল্ল। যেতে যেতে তাদের একজন বল্ল," আরে, তোরা যে যাবি, ওদের ফটক শুনেছি বড্ড নীচু—ঢুক্‌বি কি করে ?"

তা শুনে আরেকজন বল্ল, "কেন ? এমনি করে ঢুক্‌ব !" বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। তা দেখে আর সব কটাও তেমনি করে হামা দিতে লাগ্‌ল।

এই ভাবে ত তারা গিয়ে সেই ভোজের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, আর অমনি যমদূতের মত চারটে দরোয়ান এসে তাদের ঘাড়ে চেপে ধরেছে ! তখন সেই প্রথম গুলিখোরটা ভারী গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় বল্ল, "এখন দেখদেখিন্ ? আমি বলেই ছিলাম যে ফটক নীচু, আট্‌কাবে !"

আরেক গুলিখোর তার মাসীকে বলেছে, "মাসী, আমি মিঠাই খাবো; আমাকে

মিঠাই করে দাও।" এই কথা বলেই সে বেরিয়ে গিয়েছে, আর বাড়ী ফিরেছে ঢের রাত্রে; ততক্ষণে তার মাসী খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গুলিখোর ঠিক মনে ভেবে এসেছে, তার মাসী মিঠাই করে রাখ্‌বে। মাসী যদিও জেগে নেই, কিন্তু সে নিশ্চয় মিঠাই করে শিকের উপরে হাঁড়ির ভিতরে রেখে দিয়েছে। এই ভেবে সে হাঁড়ির ভিতরে হাত দিল। হাঁড়িতে মিঠাই ছিল না, ছিল খালি গোটা কতক গুলি সূতো; গুলিখোর তাকেই মিঠাই মনে করে যারপর নাই খুসী হয়ে মুখে পূরে দিয়েছে। সেগুলিকে কি চিবিয়ে খাওয়া যায়, না গিলতে গেলে তল হতে চায়। কিন্তু গুলিখোরও ছাড়বার লোক নয়; অনেক কষ্টে খানিকটে গিল্‌ল, আর খানিকটে করে সূতো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে রইল। মুখ ধোবার সময় সেই সূতোয় হাত দিয়েই চম্‌কে বল্ল, "এটা আবার কিরে?" তখন সে গেল সেটাকে টেনে বার কর্‌তে। একেক গুলিতে দু'শ গজ করে সূতো, তাকে টেনে পেটের ভিতর থেকে বার করা, সে কি সহজ ব্যাপার? হাত পোনের ষোল বার করেই বেচারা মাথায় হাত দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। সেই কান্নায় তার মাসী জেগে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে বল্ল, "কি হল রে হারু? কাঁদ্‌ছিস্ কেন?"

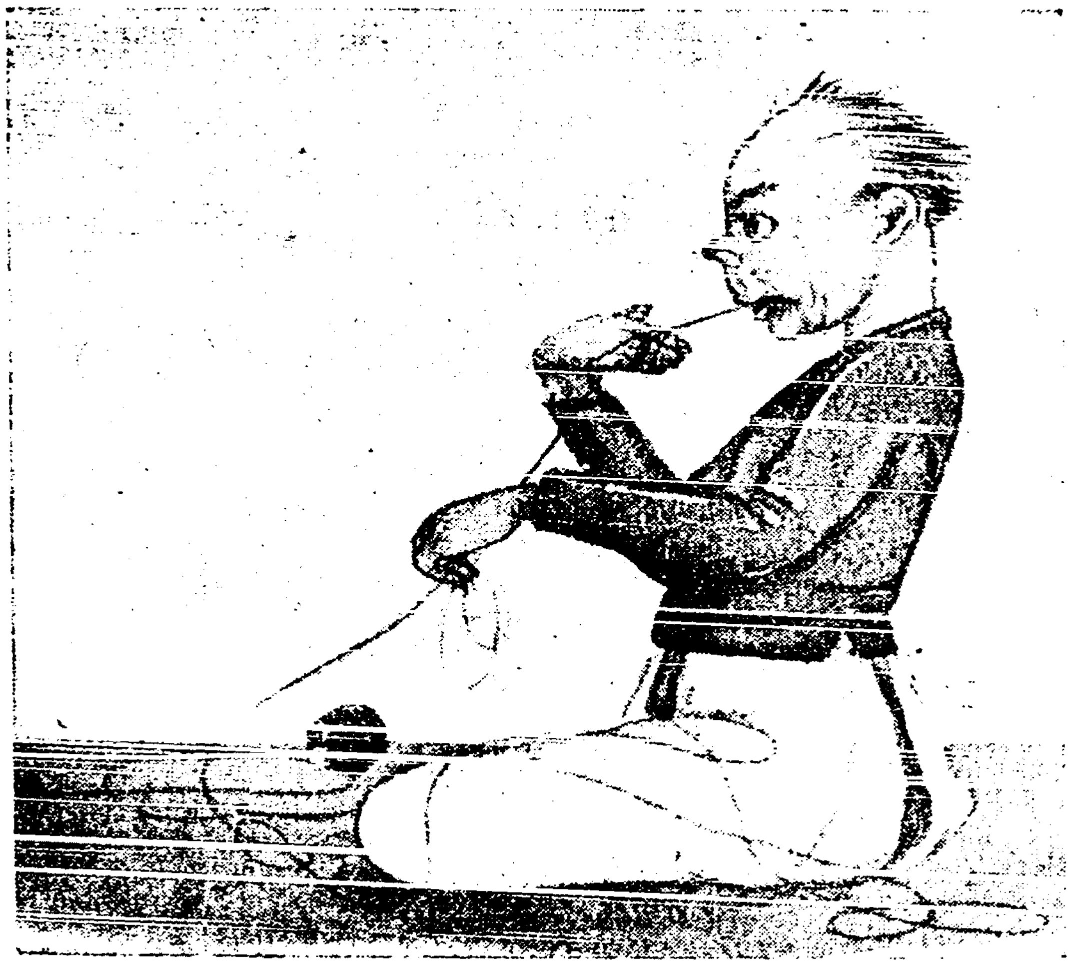

তা শুনে গুলিখোর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্ল, "ও মাসী! তোমার হারু আর বাঁচ্‌বে না; আমার নাড়ী ভুঁড়ি সব এলিয়ে গেছে!"

একজন লোক আরেক জনকে বল্ল, "আরে ভাই, টাকায় টাকা আনে।" সেইখানা দিয়ে এক বোকা চাষা হাটে যাচ্ছিল, সে সেকথা শুনে ভাব্‌ল, "আমার সঙ্গে ত একটা টাকা আছে। আচ্ছা, দেখি এটাতে আর টাকা আন্‌তে পারে কি না।" এই কথা ভেবেই সে অমনি এক পোদ্দারের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হল! পোদ্দার অনেক টাকা আর পয়সা ঢিপি করে দোকানে রেখে দিয়েছে, চাষাও গিয়ে সেই দোকানের জানালার উপরে তার টাকাটি রেখে দিয়ে দেখ্‌ছে, তাতে পোদ্দারের টাকার কয়েকটা টেনে আন্‌তে

পারে কি না'। এমন সময় তার টাকাটি হাওয়ায় গড়িয়ে দোকানের ভিতরে পড়ে পোদ্দারের টাকার সঙ্গে মিশে গেল। তখন চাষা বেচারা আর কি করবে,'সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলেছে। খানিক দূর গিয়ে তার সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হল, যে বলেছিল যে 'টাকায় টাকা আনে।' চাষা তাকে বল্ল, "তোমার কথায় আর বিশ্বাস করব না, তুমি বড্ড মিথ্যা কথা বল !" সে লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "কেন ভাই, আমি কি মিথ্যা কথা বল্লুম ?"

এ কথায় চাষা তাকে সব কথা খুলে বল্ল। তা শুনে সেই লোকটি বল্ল, "আমি ত ঠিকই বলেছিলাম। সেই পোদ্দারের টাকা তোমার টাকাকে টেনে নিয়ে গেছে। ওব কিনা বেশী টাকা কাজেই তার জোর বেশী !"

এক চাষা তার জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। খালি হাতে যাওয়া ত ভাল দেখায় না, জমিদার মশায়ের জন্য একটা কিছু নিয়ে যাওয়া চাই। তাই সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে পরামর্শ করছে।

চাষার স্ত্রী বল্ল, "আমাদের গাছের বেল খুব ভাল, একটা বেল নিয়ে যাও !"

চাষা বল্ল, "তুমি মেয়ে মানুষ, কিছু বোঝ না ! বেলের চেয়ে পিঁয়াজ নিয়ে যাব।"

এই বলে, সের কয়েক পিঁয়াজ কাপড়ে বেঁধে সে জমিদারের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল, আর তাঁকে সেলাম করে পিঁয়াজগুলো তাঁর সাম্‌নে রেখে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল, "কর্ত্তা আপনার জন্য এই পিঁয়াজ এনেছি, আপনি তরকারী খাবেন।" জমিদার মশাই পরম বৈষ্ণব, পিঁয়াজের নাম শুন্‌লে বমি করেন। সেই জিনিস তাঁর সাম্‌নে রাখ্‌তেই ত তিনি বেজায় চটে গিয়েছেন, আর চাকরকে বলেছেন, "মার্ এগুলো বেটার মুখে ছুঁড়ে।"

চাকরও সে কথায় চাষার মুখে এমনি পেঁয়াজ ছুঁড়ে মেরেছে যে সে বেচারা আর চেঁচিয়ে পালাবার পথ পায় না !

যা হোক, সে ত কোন মতে প্রাণপণে ছুটে বাড়ী ফিরে এল। এসেই তার স্ত্রীকে বল্ল, "আমি বলেই ছিলাম,—তুমি মেয়ে মানুষ, কিছু বোঝ না। আজ যদি তোমার কথায় বেল নিয়ে যেতাম তবে আমার কি হাল হত? বাবা! সেই চাকর বেটা সয়তানের মতন ছুঁড়তে পারে!"

সাহসের কাজ।

১৯১০ সালের আগষ্ট মাসে, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইল, ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া ও ভাসিয়া গিয়াছিল। বড় বড় লোহার কড়ি ও পাথরের থাম পর্য্যন্ত জলের স্রোতে উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছিল। রাইপুর ষ্টেসন হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে একটি নদীর উপর দিয়া রেলপথ ও টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে। ঝড়ে সেই টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উপড়াইয়া পড়িয়া ছিল ও তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তার জুড়িয়া না দিলে সংবাদ পাঠাইবার ও রেলগাড়ী চলাচলের উপায় ছিল না। হাজার হাজার লোকের অসুবিধা হইত এবং রেলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে বহুলোকের প্রাণনাশ হইতেও পারিত।

এই সংবাদ পাইয়া সেখানকার তার বিভাগের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী সেখানে উপস্থিত হইলেন। যে নদীর উপর দিয়া টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে তাহা বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ। তীর ভাঙ্গিয়া, গাছ উপ্‌ড়াইয়া স্রোতের জল মহাবেগে চলিতেছে। নদী পার হইবার উপায় নাই, অথচ তার জুড়িয়া না দিলেও নয়। তখন যতীন্দ্রনাথ আপনার কোট ও টুপি খুলিয়া সঙ্গের লোকের হাতে দিলেন, এবং নিজে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু স্রোত এত বেশী ছিল যে তিনি কিছুতেই অপর পারে পৌঁছিতে পারিলেন না। কিছু দূর যাইবার পর তাঁহার শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িল। একটা বড় গাছ ভাসিয়া আসিতে ছিল, সেইটার আঘাত পাইয়াই হউক বা স্রোতের বলেই হউক তিনি ডুবিয়া গেলেন, আর উঠিলেন না।

এই যতীন্দ্রনাথ কে ছিলেন তোমাদিগকে বলিতেছি। বারাকপুরের নিকট মণিরামপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কটকে পুলিস ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করিতেন। শিশুকালেই যতীন্দ্রনাথের পিতার ও তাহা

পারে কি না। এমন সময় তার টাকাটি হাওয়ায় গড়িয়ে দোকানের ভিতরে পড়ে পোদ্দারের টাকার সঙ্গে মিশে গেল। তখন চাষা বেচারা আর কি কর্‌বে, সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী চলেছে। খানিক দূর গিয়ে তার সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হল, যে বলেছিল যে 'টাকায় টাকা আনে।' চাষা তাকে বল্ল, "তোমার কথায় আর বিশ্বাস কর্‌ব না, তুমি বড্ড মিথ্যা কথা বল!" সে লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "কেন ভাই, আমি কি মিথ্যা কথা বল্লুম ?"

এ কথায় চাষা তাকে সব কথা খুলে বল্ল। তা শুনে সেই লোকটি বল্ল, "আমি ত ঠিকই বলেছিলাম। সেই পোদ্দারের টাকা তোমার টাকাকে টেনে নিয়ে গেছে। ওর কিনা বেশী টাকা কাজেই ওর জোর বেশী!"

এক চাষা তার জমিদারের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে। খালি হাতে যাওয়া ত ভাল দেখায় না, জমিদার মশায়ের জন্য একটা কিছু নিয়ে যাওয়া চাই। তাই সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে পরামর্শ কর্‌ছে।

চাষার স্ত্রী বল্ল, "আমাদের গাছের বেল খুব ভাল, একটা বেল নিয়ে যাও।"

চাষা বল্ল, "তুমি মেয়ে মানুষ, কিছু বোঝ না! বেলের চেয়ে পিঁয়াজ নিয়ে যাব।"

এই বলে, সের কয়েক পিঁয়াজ কাপড়ে বেঁধে সে জমিদারের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল, আর তাঁকে সেলাম করে পিঁয়াজগুলো তাঁর সাম্‌নে রেখে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল, "কর্ত্তা আপনার জন্য এই পিঁয়াজ এনেছি, আপনি তরকারী খাবেন।" জমিদার মশাই পরম বৈষ্ণব, পিঁয়াজের নাম শুন্‌লে বমি করেন। সেই জিনিস তাঁর সাম্‌নে রাখ্‌তেই ত তিনি বেজায় চটে গিয়েছেন, আর চাকরকে বলেছেন, "মার্ এগুলো বেটার মুখে ছুঁড়ে।"

চাকরও সে কথায় চাষার মুখে এমনি পেঁয়াজ ছুঁড়ে মেরেছে যে সে বেচারা আর চেঁচিয়ে পালাবার পথ পায় না!

যা হোক, সে ত কোন মতে প্রাণপণে ছুটে বাড়ী ফিরে এল। এসেই তার স্ত্রীকে বল্ল, “আমি বলেই ছিলাম,—তুমি মেয়ে মানুষ, কিছু বোঝ না। আজ যদি তোমার কথায় বেল নিয়ে যেতাম তবে আমার কি হাল হত? বাবা! সেই চাকর বেটা সয়তানের মতন ছুঁড়তে পারে!”

সাহসের কাজ।

১৯১০ সালের আগষ্ট মাসে, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইল, ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া ও ভাসিয়া গিয়াছিল। বড় বড় লোহার কড়ি ও পাথরের থাম পর্য্যন্ত জলের স্রোতে উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছিল। রাইপুর ষ্টেসন হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে একটি নদীর উপর দিয়া রেলপথ ও টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে। ঝড়ে সেই টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উপড়াইয়া পড়িয়া ছিল ও তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তার জুড়িয়া না দিলে সংবাদ পাঠাইবার ও রেলগাড়ী চলাচলের উপায় ছিল না। হাজার হাজার লোকের অসুবিধা হইত এবং রেলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে বহুলোকের প্রাণনাশ হইতেও পারিত।

এই সংবাদ পাইয়া সেখানকার তার বিভাগের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী সেখানে উপস্থিত হইলেন। যে নদীর উপর দিয়া টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে তাহা বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ। তীর ভাঙ্গিয়া, গাছ উপ্‌ড়াইয়া স্রোতের জল মহাবেগে চলিতেছে। নদী পার হইবার উপায় নাই, অথচ তার জুড়িয়া না দিলেও নয়। তখন যতীন্দ্রনাথ আপনার কোট ও টুপি খুলিয়া সঙ্গের লোকের হাতে দিলেন, এবং নিজে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু স্রোত এত বেশী ছিল যে তিনি কিছুতেই অপর পারে পৌঁছিতে পারিলেন না। কিছু দূর যাইবার পর তাঁহার শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িল। একটা বড় গাছ ভাসিয়া আসিতে ছিল, সেইটার আঘাত পাইয়াই হউক বা স্রোতের বলেই হউক তিনি ডুবিয়া গেলেন, আর উঠিলেন না।

এই যতীন্দ্রনাথ কে ছিলেন তোমাদিগকে বলিতেছি। বারাকপুরের নিকট মণিরামপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কটকে পুলিস ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করিতেন। শিশুকালেই যতীন্দ্রনাথের পিতার ও তাহার

পর তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। অতি কষ্টে তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল অনেক দিন তিনি এক মুঠা মুড়ি বা খই মাত্র খাইয়া থাকিতেন। থাকিবার জায়গা ছিল না, পথে রাত্রি কাটাইতে হইত। সেই অবস্থায় এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া যতীন্দ্রনাথ পনের টাকার বৃত্তি পান। তাহা দ্বারা নিজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ও খরচ চালাইতে হইত। কলিকাতায় লেখা পড়ার অসুবিধা হওয়ায় ইনি কটকে গিয়া তাঁহার পিতার কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় যতীন্দ্র-নাথের বিবাহ হয় এবং তাঁহার শ্বশুর মহাশয় যথাশক্তি তাঁহার লেখা পড়ার সাহায্য করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গণিত ও রসায়ণ এই দুই বিষয়ে অনার অর্থাৎ গৌরবের সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর রূড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি তার বিভাগের এসিষ্টাণ্ট সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি রূড়কি কলেজে ৪০ টাকার বৃত্তি ও দুইটী পদক পান। তাঁহার শরীর যেরূপ সবল, বুদ্ধি যেরূপ প্রখর, চরিত্রও তেমনি নির্ম্মল ছিল। সন্তরণে কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে তিনি প্রথম ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

গুরুর শিক্ষায় পদ্য লেখা।

পদ্য লেখা বড্ড সোজা, মন দিয়ে ঠিক্ শেখ ;
এই ধর না, পাখীর বিষয় নিয়েই কিছু লেখ।
মিল জোটান আরো সোজা, ভাবছ কথা নূতন ?
অমিত্রাক্ষর লিখ্‌লেন কেন স্বয়ং মধুসূদন ?
ইহার জবাব পরে দেব, এখন দেখ স্পষ্ট,
মিলিয়ে নিতে কথায় কথা হয় না কোন কষ্ট।
"খৈ" আর "দৈ" মেলে, "পাত"এর পরেই "ভাত"
আরো দুটা মিল দিচ্ছি—"হাত" আর "দাঁত",
"ঘণ্ট" "কণ্ঠ" খাসা মেলে,—"শোল" আর "ঝোল" ;
'গলা'য় 'কলা,' এবং দেখ 'ওল'এ হচ্ছে 'গোল'।

সাঁতরাগাছির হ'লে পরে ? ভাব্‌ছ তুমি খাদ্য ?
তুমিও মিল দিতে পার ? দেখি কেমন সাধ্য ?
লাউ আর চিংড়ি মেলে ? এঃ তুমি পেটুক !
কেমন করে কবি হবে না বুঝ্‌লে এটুক ?
পাখীর বিষয় নিয়ে তুমি লিখ্‌বে পদ্য আজ্‌ই !
আচ্ছা তুমি লিখে শোনাও, শুন্‌তে আছি রাজি।

শিষ্যের পদ্য—পাখী।

ক'এর কোটায় কাঠ্‌ঠোকরা কুঁক্‌ড়ো কাল কাক ;
কাদায় করে কোলাহল কাদাখোঁচা কাঁক।
কাকাতুয়া কথা কয়, কোকিল করে 'কু-কু',
খঞ্জনকে খাঁচা খুলে খুদ খাওয়ায় খুকু।
গাঙ্গে গিয়ে গয়াল গুলো গান গায়—'গুঁ গুঁ'
ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে ঘাস ঘাঁটে ঘুঘু।
অহঙ্কারে বিহঙ্গমের অঙ্গে চড়ে' শুধু
'ঙ' মশায় শঙ্খ বাজান্ ; একার কাজে ঢুঁ-ঢুঁ।
চ-এ চাতক, চকোর, চিল, চন্দনা ও চড়াই ;
চকা-চকী চমৎকার চরে নদীর চড়ায়।
ছাতারেদের ছটা ছানা ছাতিম ছায়ে ছোটে ;
জটায়ূর নেই জন্ম যদি, জ—এ কিবা জোটে ?
ঝড়ঝাপটে ঝাড়ের পাখী ঝেঁটিয়ে গেছে মারা ;
নেজ ঝুলিয়ে নাড়ে ঝুটি অন্য পাখী তারা।
অ-ঞ্চ অ-ঞ্ছ অ ঞ্জ অ-ঞ্ঝে করেন আনাগোনা,
চ-বর্গের চাকর 'ঞ' আজন্ম খোনা।
টুনটুনিকে ঠোক্‌রে টিয়ে, ডাহুক ডানা ঢাকে ;
গণ্ডগোলে কণ্ঠে দণ্ড ; ণ-এর আওয়াজ নাকে।
তুড়ির তালে তুষ্ট তোতা, তিতির তোলে তান্ ;
থম্‌কে থেমে দয়েল দুটো ধূলোয় ধোঁড়ে ধান।

ন'এর নামে নেইক বনে নূতন পাখীর ডাক্ ;
প'এর পিক, ক'এর কোকিল ; ব'এর বায়স কাক।
পাপিয়াটির পিউ-পিউ, পায়রা পাখীর বকম ;
পালায় পেলেই স্পষ্ট আলো, এইত পেঁচার রকম ;
ফড়িং, ফুঁকে, ফিচেল, ফিঙ্গে ফেউ হয়ে ফেরে—
ব্যস্ত বাজ ও বায়স বটে ; বটের বড়ই বেড়ে !
বক বেড়ান বিলে, বাবুই বাঁধে ভাল বাসা ;
বুলবুলি ও বউ-কথা-কও বাড়ায় ভালবাসা।
ভোরে উড়ে ভঙ্গীভরে ভারুই ভাল ভাষে ;
ভেলার মত ভাসেরা সব ভাস্‌তে ভালবাসে।
ম-এর মাঝে মাছরাঙ্গারা মরে মাছ মারি ;
মুখটি মিষ্ট ময়নাটির, ময়ূর মনোহারী।
য-র-ল-ব'র কলরবে পাখী ওড়ে বনে,
শুক-শারীর বাঙ্গলা শালিক সুস্বরেতে স্বনে।
শাখায় শকুন কত শত সংখ্যা দিতে নারি,
সাত ভেয়েরা ছাতারে ও চম্পা নামে জারি।
হাড়্গিলা ও হাঁড়িচাঁচার হিংসা হাঁসের ডাকে ;
হিরেমন্টি হয়ে হাজির "হরি হরি" হাঁকে !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অদ্ভুত বাড়ী তৈয়ারী। কিছুদিন হইল আমেরিকার এক বড় সহরে এক অদ্ভুত বাড়ী তৈয়ারি হইয়াছে। দুইটা উনিশতলা বাড়ীর মাঝখানে একটা মাত্র সাততলা উঁচু বা[ড়ী] ছিল। যাঁহার বাড়ী তাঁহার ইচ্ছা হইল মাঝের বাড়ীটাও ঐ রকম উঁচু করে—কিন্তু ইঞ্জিনিয়[ার] আসিয়া বলিলেন "এখানের জমী ভাল না—অত উঁচু বাড়ী ইহার উপর চাপাইবেন না।" এ[খন] উপায় ? অনেক ভাবিয়া শেষে এই উপায় ঠিক হইল—প্রথমে পাশের দুই বাড়ীর মাথায় বড় [বড়] লোহার কড়ি চড়াইয়া একটা পুলের মত করা হইল। তার পর, সেই সাততলা বাড়ীর উপর অ[ার] কিছু না গাঁথিয়া, ঐ লোহার পুল হইতে বারোতলা দালান নীচের দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল !

অদ্ভুত শিকার।

চৈত্রমাসের "সন্দেশে" শিকারী গাছের কথা বলা হইয়াছিল, এবারে কয়েকটা অদ্ভুত শিকারী জন্তুর কথা বলা হইবে। "অদ্ভুত" বলিতেছি এই জন্য যে ইহাদের শিকার করিবার কায়দাগুলি বেশ একটু নূতন রকমের। যে সকল জানোয়ার শিকারকে তাড়া করিয়া ধরে, বা শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া ঘাড় মট্‌কাইয়া খায়—এখানে তাহাদের কথা বলিতেছি না।

এই দেখ, একটা বহুরূপীর ছবি। বহুরূপী নিজের গায়ের রং চট্‌পট্ বদ্‌লাইতে পারে, একথা অনেকেই জানে কিন্তু তার ওই আশ্চর্য্য জিবটির কাজ সকলে দেখে নাই—

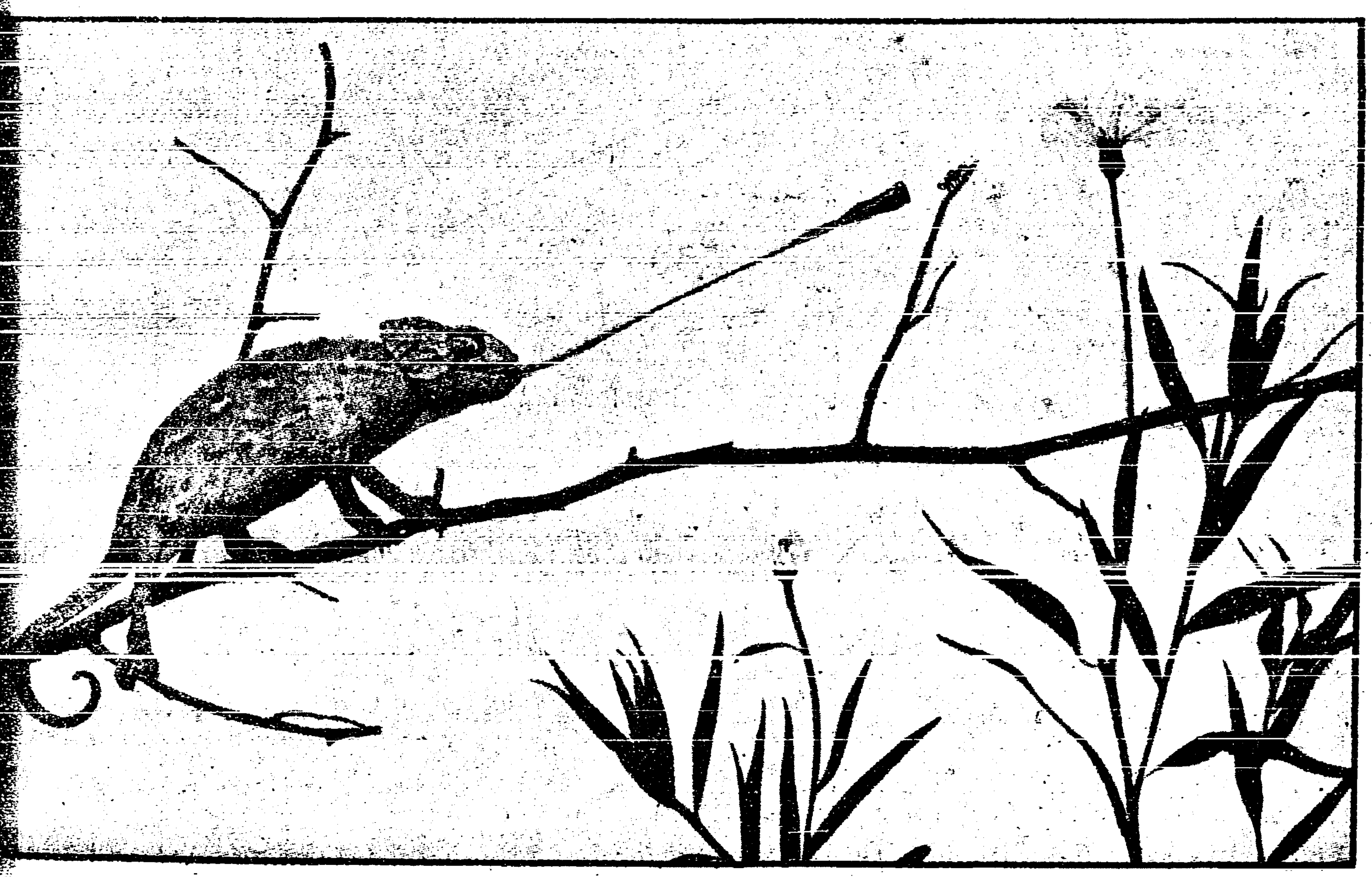

ঐ জিব তাহার পোকা ধরিবার অস্ত্র। পোকাটা তাহার সাম্‌নে গাছের ডালে বসিয়াছিল—বহুরূপীটা তাহাকে বেশ খানিকক্ষণ দেখিয়া লইল। তাহার পরেই দেখ, ঐ জিবটা লম্বা হইয়া কেমন তীরের মত ছুটিয়া পোকার দিকে চলিয়াছে। পোকার গায়ে ঠেকিবা মাত্র বহুরূপী পোকা শুদ্ধ তাহার জিব গুটাইয়া লইবে। চক্ষের পলকে অস্ত্র ছোঁড়া, শিকার ধরা, খাওয়া—তিন কাজ শেষ। জিব দিয়া শিকার ধরা শুধু যে বহুরূপীই জানে তাহা নয়, কিন্তু আর কোন জানোয়ারের জিব এত আশ্চর্য্য রকম খেলে না—এবং তাদের জিবের দৌড় ও এত বেশী নয়।

এই একটা মাছের ছবি দেখ। ইনি পিচকারী দিয়া শিকার ধরেন। আমরা

যেমন ঢিল মারিয়া গাছের উপর হইতে ফল পাড়ি—এই মাছ সেইরূপ কেবল থুথুর জোরে ডাঙ্গার শিকার জলে পাড়িয়া আনেন। ইনি খুব ভাল তীরন্দাজ—পোকাকে লক্ষ্য করিয়া যে অস্ত্র ছাড়েন, সে অস্ত্র প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। সুতরাং ইঁহাকে 'অর্জ্জুন' মাছ বলা যাইতে পারে।

পরপৃষ্ঠায় দেখ আর একটা ভয়ঙ্কর বিদ্ঘুটে শিকারী। ইহার নাম 'অক্টোপাস্,' অর্থাৎ 'অষ্ট পদ'। আটপেয়ে বলা হয় বটে, কিন্তু ঐ আটটা শুঁড়ের মত জিনিষকে পা না বলিয়া হাত বলাই উচিত, কারণ ঐগুলি দিয়াই সে তাহার শিকার ধরে। প্রত্যেকটি হাতের তলার দিকে সারি সারি চাক্‌তি বসান আছে, সেইগুলি একবার শিকারের গায়ে বসাইতে পারিলে আর সহজে ছাড়ান যায় না—একেবারে জোঁকের মত চুষিয়া ধরে। এই জানোয়ার নিজের শরীর হইতে এক রকম কালী বাহির করিতে পারে। সেই কালীতে চারিদিকের জল ঘোলা করিয়া সেই নোংরা জলের মধ্যে সে লুকাইয়া থাকে—একবার শিকার কাছে আসিলেই হয়। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ইহারা বেশী বাছ বিচার করে না—হাতের কাছে যাহা জোটে কোনটাতেই আপত্তি নাই। ছোট মাছ কাঁকড়া চিংড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া আস্ত মানুষটা পর্য্যন্ত, কিছুই সে শিকার করিতে বাকী রাখে না। একটা বড় অক্টোপাসের শুঁড় প্রায় ৪ হাত লম্বা হয়। সে একবার জলের নীচে সুবিধা মত ধরিতে পারিলে, কোন মানুষের সাধ্য নাই তাহার হাত ছাড়াইয়া আসে। একবার একটা

ছোট খাটো অক্টোপস্ সামান্য একহাঁটু জলে এক সাহেবকে ধরিয়াছিল। সাহেব হাত দিয়া কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলেন না; শেষে একটা ছুরি দিয়া তাহার হাতগুলি একটা একটা করিয়া কাটিয়া তিনি অনেক কষ্টে ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিলেন।

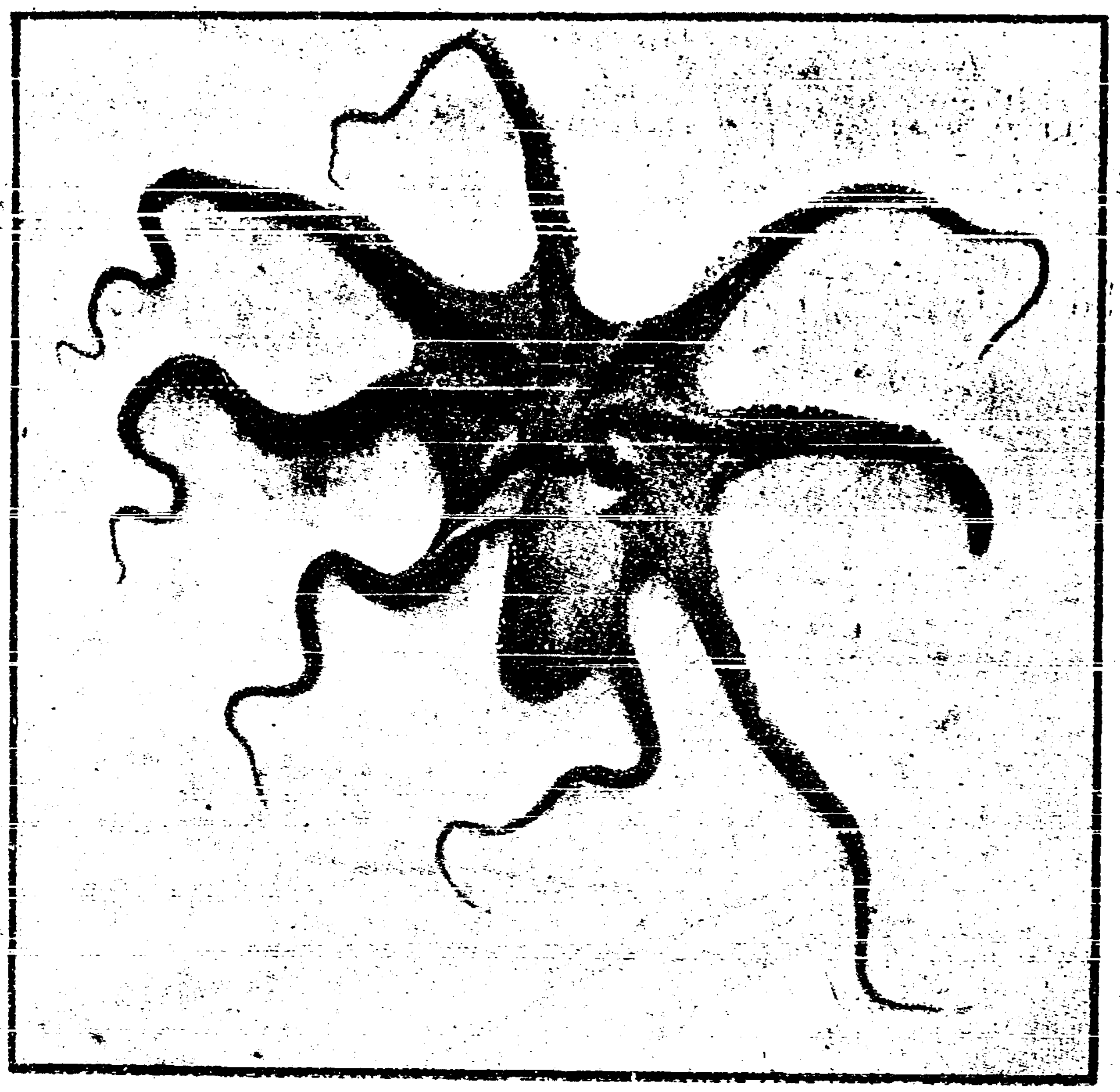

বড় জানোয়ার ছোটকে শিকার করে—যাহার গায়ে জোর বেশী সে নিরীহ দুর্ব্বলকে মারিয়া সর্ব্বনাশ করে, ইহাই শিকারের নিয়ম। কিন্তু এখানে দেখ, সামান্য পিঁপ্ড়ায় শুধু দলের জোরে কেমন করিয়া সাপ মারিতেছে! এই পিঁপড়ার বাড়ী আফ্রিকায় ইহারা সর্ব্বদাই প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া থাকে এবং সেই দল যখন ওস্তাদ্ সৈন্যদলের মত সুন্দর সার বাঁধিয়া ২।৩ মাইল পথ জুড়িয়া গোঁ ভরে চলিতে থাকে তখন মানুষ গরু হাতী কাহাকেও গ্রাহ্য করে না এবং বুদ্ধিমান জানোয়ার মাত্রই বিনা আপত্তিতে তাহা

পথ ছাড়িয়া দেয়। এই সাপটা সবে খোলস ছাড়িয়াছে. এমন সময় পিঁপ্‌ড়ার দল সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সাপ বেচারার হয়ত সরিয়া যাইতে একটু দেরী হইয়াছিল তাই তাহার এই দুর্দ্দশা। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত শরীরে দুই ইঞ্চি পুরু পিঁপ্‌ড়া জমিয়া গেল এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে তাহাকে সাবাড় করিয়া মাংস ভাগাভাগি আরম্ভ হইয়া গেল। তাহার পর পিঁপ্‌ড়ার দল যেমন চলিতেছিল তেমনি সোজা পথে চলিতে লাগিল।

ভাই বোন।

(মাওরী দেশের গল্প)

সেই যে দেশের চার ধারে নীল সাগরের জল তড়াক্‌ তড়াক্‌ করে নাচে, আর সকাল বেলায় সোনার সূর্য্য তার পিছনে উঁকি মারে, সেই দেশে রূপী আর হীনার বাড়ী ছিল। তারা দুটি ভাই বোনে মিলে সাগরের ধারে খেলা কর্‌ত, আর ঢেউগুলিকে কল কল করে ছুটে এসে বালীর উপর লুটিয়ে পড়্‌তে দেখে খল্‌ খল করে হাস্‌ত। দুজনায় একটু ছাড়াছাড়ি হলে তাদের চোখে জল আর ধর্‌ত না।

হায়! সেই ছাড়াছাড়ি এক দিন ভাল করেই হল। একদিন খেলার সময় রূপী হীনাকে ডাক্‌তে গিয়ে দেখ্‌ল, হীনা নাই। ঘরে নাই, মাঠে নাই, বনের নাই, সাগরের ধারে নাই,—কোথাও নাই। সকলে পাগল হয়ে খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল, কোথাও তাকে দেখ্‌তে পেল না।

তখন সবাই বল্ল, "হায় হায়, মরে গেছে।" কিন্তু রূপীর মন বল্ল, "তা কখনই হতে পারে না! আমার হীনা বোন্‌ যেখানেই থাকুক, তাকে খুঁজে আন্‌ব।"

রূপী ঘর ছেড়ে গ্রামের পথে ঘাঠে মাঠে খুঁজ্‌ল, গ্রাম ছেড়ে দেশে বিদেশে পাহাড় পর্ব্বত খুঁজে বেড়াল, কোথাও হীনার দেখা পেল না। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খুঁজে, শেষে সে বল্ল, "এখানেত তার দেখা পেলাম না; স্বর্গে গিয়ে তাকে খুঁজ্‌ব। সেখানে সকল দেবতার রাজা রেহুয়া থাকেন, তিনি বলে দিবেন আমার হীনা বোন কোথায় আছে।"

তখন সে মন্ত্র পড়ে একটি পায়রা হয়ে আকাশে উড়ে চল্ল। নয়টি স্বর্গ ডিঙ্গিয়ে গেলে, তার পরেরটিতে রেহুয়াকে পাওয়া যায়। সে জায়গা চন্দ্র সূর্য্য তারা সকলের উপরে, সেইখানে বসে দেবতার রাজা জগৎ সংসার চেয়ে দেখেন।

চন্দ্র সূর্য্য তারা সকল ডিঙ্গিয়ে রূপী উড়ে উড়ে সেই রেহুয়ার কাছে গিয়ে, তাঁর পায় পড়ে বল্ল্ "ওগো দেবতার রাজা, আপনি ত সব জানেন ; আমার হীনা কোথায় আছে, আমাকে বলে দিন।"

রেহুয়া বল্লেন, "তুই কাঁদিসনে বাছা, তোর বোনের সন্ধান আমি বলে দিচ্ছি। ঐ যে সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপটুকু দেখ্‌ছিস্, সেই খানে বসে হীনা তোর নাম ধরে কাঁদ্‌ছে।" এ কথা শুনে রূপী রেহুয়ার পায়ের ধূলা নিয়ে তখনি সেই দ্বীপে উড়ে এল।

সেই দ্বীপের রাজার বাড়ীতে হীনা ছিল। যে দিন সকলে তাকে পথে মাঠে খুঁজেছিল,—তারা জান্‌ত না যে সে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছে। হীনার কোমরে একটি কোমর-বন্ধ ছিল, তার এমনি গুণ যে, তাকে যে পরে, সে কিছুতেই মর্‌তে পারে না। তাই, জলে

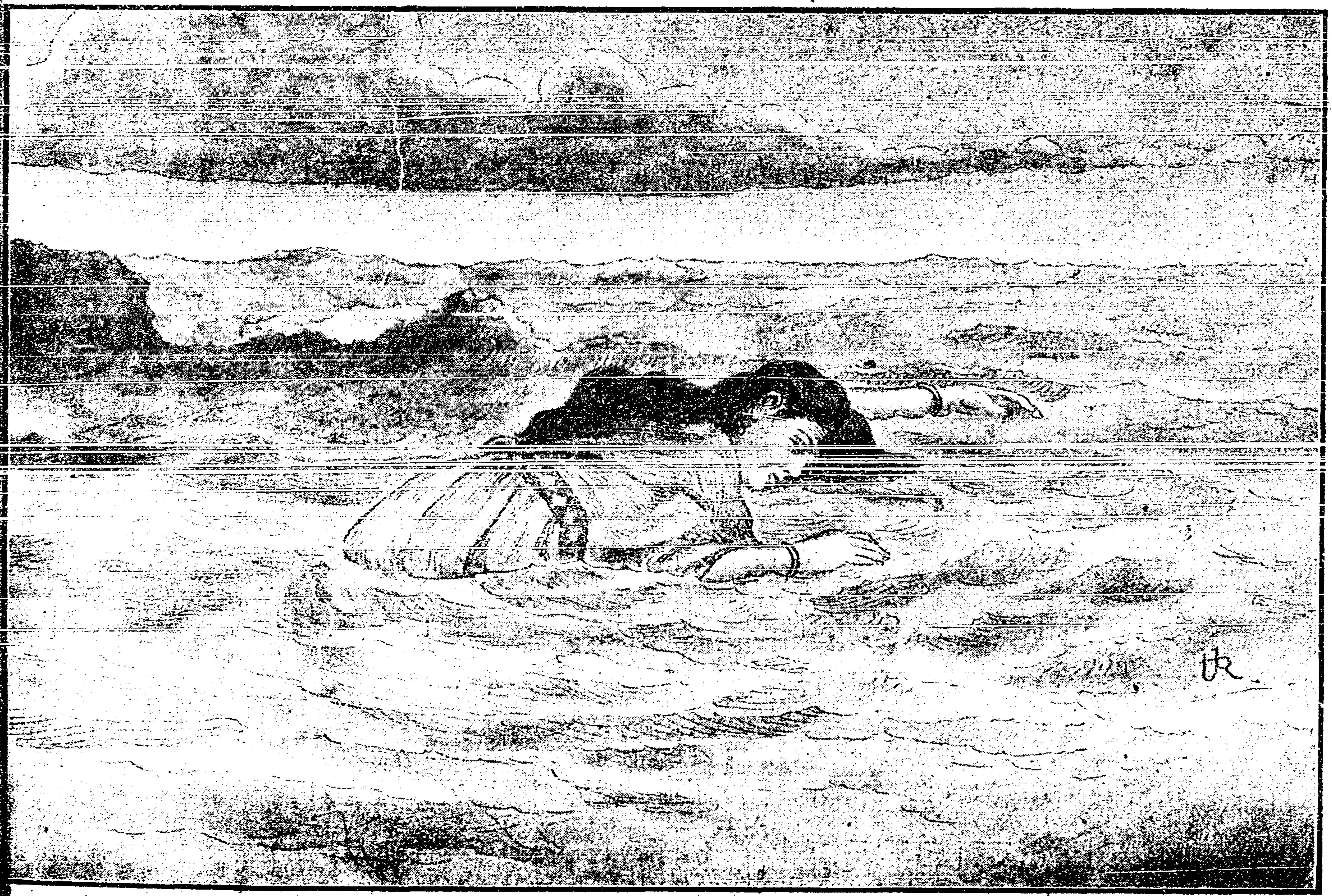

পড়েও হীনা সোলার মত ভাস্‌তে লাগ্‌ল। ঢেউগুলি তাকে পেয়েই নাচ্‌তে নাচ্‌তে তাকে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে চল্ল। সে অনেক চেষ্টা করেও কূলে ফির্‌তে পার্‌ল না, সকলের নাম ধরে অনেক ডেকেও কারুর সাড়া পেল না। ক্রমে তার হাত পা অবস হয়ে গেল,

চোক দুটি বুঁজে এল; কিন্তু কোমরবন্ধের গুণে তার প্রাণ গেল না, সে শুধু ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

অনেক দিন ধরে সাগরের ঢেউগুলি হীনাকে এমনি করে বয়ে নিয়ে শেষে একটি ছোট দ্বীপের কূলে তাকে রেখে দিল। হীনা তখনও ঘূমে, এ সকলের কিছু সে জানে না; এত দিনে তার গায় কত স্যাওলা কত গুগ্‌লি জমেছে তারও কিছু সে টের পায়নি। সেই দ্বীপের লোকেরা তাকে দেখ্‌তে পেয়ে কোলে করে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। তার পর তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার গায়ের গুগলি আর শ্যাওলা ঝেড়ে, তাকে স্নান করিয়ে সুন্দর কাপড় পরিয়ে এমনি আদর করে তাকে রাখ্‌ল, যেন সে তাদের নিজের মেয়ে।

তার পর একদিন সেই দেশের রাজা তাকে দেখ্‌তে পেয়ে, যার পর নাই যত্নে তাঁর নিজের বাটীতে নিয়ে তাকে রেখে দিলেন।

সেই রাজার বড়ীতে রূপী উড়ে এসে হীনার ঘরের জানালায় বস্‌ল। চাকরেরা তাকে দেখেই বাঁশ নিয়ে দড়ি নিয়ে ছুটে এল, তাকে ধর্‌তে। কিন্তু তাকে কি যে সে ধর্‌তে পারে? উল্টে তাদের বাঁশই ভেঙ্গে গেল, দড়ি ছিঁড়ে গেল। তারা বড্ড ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে হীনাকে বল্ল, "দেখ এসে একটা পায়রা এসেছে, সে যাদু জানে। আমরা তাকে কিছুতেই ধর্‌তে পার্‌লাম না।"

হীনা এসে সেই পাখীর দিকে তাকিয়েই কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল; বল্ল "আরে, এই যে আমার দাদা।" বল্‌তে বল্‌তেই রূপী আবার মানুষ হয়ে এসে তার বোনকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌ল। তার পর অনেকক্ষণ দুজনের চোখে খালি জল পড়্‌ল; শেষে, রূপীও বল্ল, "কি করে এখানে এলে?" হীনা ও বল্ল "কি করে এখানে এলে?"

তখন দুজনে বসে কত কথাই বল্ল। সেই হীনার হারাবার দিন থেকে যা কিছু হয়েছিল, দুজনে যা কিছু করেছে, দেখেছে, শুনেছে,—কিছু তারা বল্‌তে বাকি রাখ্‌ল না। শেষে রূপা বল্ল, "এখানে আর থেকে কি হবে বোন? চল রেহুয়ার কাছে যাই। এখানে ছাড়াছাড়ি হয়, হারিয়ে যেতে হয়, দুঃখ পেতে হয়; সেখানে এর কিছুই হয় না। সেখানে সবই সুন্দর, সবই ভালো। তেমন আলো কেউ দেখেনি, তেমন গান কেউ শোনে নি। আর রেহুয়া কত ভালো। চল, আমরা তাঁর কাছে থাক্‌ব।"

তখন দুজনে দুটি পায়রা হয়ে, মনের সুখে উড়ে সেই সকল দেবতার রাজার কাছে আলো আর গানের দেশে চলে গেল।

বনের খবর।

হাতীর ভয়।

হাতী যে কেমন বেখাপ্পা জানোয়ার, এবারে তার কথা কিছু বল্‌ব।

আমরা পাকোয়া নদীর ধারে এসেছি। নদীটি ৭০।৮০ হাত চওড়া হবে, তাতে এক মর জল। নদীর ধারে হাতীর পায়ের তাজা দাগ; একটির পিছনে আর একটি, তার পিছনে র একটি, এমনি করে এক দল হাতী গিয়েছে। পায়ের দাগ দেখে আমি বল্লাম ৫।৭টা হাতী ; লুশাই বুড়ো খানিক বেশ ভাল করে দেখে বল্ল, ৪০।৪৫টার কম নয়। ঠিক দাগে দাগে ফেলে গিয়েছে, তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

সারাদিন জলে জলে চলে আমার কাপড় চোপড় সব ভিজে গিয়েছিল। আমি নদীর ধারে, াড়ের গায় ঠেসান দিয়ে বসে জুতা মোজা খুল্‌তে লাগলাম, লুশাইটিকে বল্লাম, "পারে গিয়ে র জায়গা দেখ!" লুশাই ওপারে চলে গেল, শ্যামলাল খালাসীও বন্দুকটি নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে া; আমি বসে বসে 'হুঁ—উঁ—উঁ——!' করে চেঁচিয়ে পিছনের লোকদের ডাকতে লাগলাম। ারওয়ালা খালাসী তাদের সঙ্গে; আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

বার দুই 'হুঁ-উঁ-উঁ' করে চেঁচিয়েছি, অমনি ঠিক আমার মাথার উপরের পাহাড় থেকে একটা তী "হুঁ-উঁ-উঁ—" করে উঠ্‌লো, আর আমার কাছ থেকে ৫০।৬০ হাত দূরে আরো অনেকগুলো তী গুড়্ গুড়্ শব্দ করে তার জবাব দিতে লাগ্‌ল! আমি আবার চ্যাঁচালাম, হাতীগুলোও আবার তেমনি করতে লাগ্‌ল! আবার চ্যাঁচালাম, আবারও তাই। একটা পাহাড়ের উপর থেকে -উঁ-উঁ" করে উঠে, আরগুলো নালার কাছ থেকে গুড়্ গুড়্ করে আর নাকে ফোঁস্ াস্ করে।

এমন সময় আমার মাথার উপর থেকে মড়্ মড়্ করে বাঁশ ভাঙ্গার আওয়াজ হতে লাগল, র ওপরে থেকে শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাকতে লাগল, "চলে এস! চলে !" ৩।৪টা হাতী আমার আওয়াজ শুনে দেখতে আসছে, এটা কি রকম জানোয়ারের ডাক। ার মাথার ১০০।১২৫ গজ উপরে অবধি এসেছে।

আমি তাড়াতাড়ি নদীর এপারে এসে শ্যামলালের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে, গুলি ভরে, নদীর নারায় গিয়ে দাঁড়ালাম; শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো খুব চ্যাঁচামেচি করতে লাগল; তা শুনে তীগুলো দৌড়ে গিয়ে আবার পাহাড়ে উঠ্‌ল। তারপর অনেকক্ষণ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু র হাতী দেখতে পেলাম না। হাতীর আওয়াজ কিন্তু ক্রমাগতই শোনা যাচ্ছিল, আর নদীর জল কবারে ঘোলা হয়ে গিয়েছিল।

চারটা সাড়ে চারটার সময় সব লোকজন এল; নদীর ওপারে বন কেটে তাঁবু খাটান গেল; বড় বড় ধূনী আর পাহারারও বন্দোবস্ত হল। আমার সঙ্গে দুটা হাতী ছিল। মাহুতেরা রোজ দের চরে খাবার জন্য বনে ছেড়ে দেয়, আজ আমাদের কাছেই বেঁধে রাখল। ছেড়ে দিলে বুনো

হাতীতে তাদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবে, না হয় মেরে ফেলবে। লুশাইরা শুকনো শুকনো বাঁশের মশাল বানিয়ে লম্বা লম্বা কাঁচা বাশের আগায় বেঁধে নিল। রাত্রে হাতী এলে ঐ মশাল জ্বালিয়ে সেই লম্বা বাঁশের বাঁট ধরে সামনে ঘুরিয়ে তাকে তাড়াবে—এমনি করে লুশাই দেশে ক্ষেত্ত থেকে হাতী তাড়ায়।

সে রাত্রে আর হাতীর জ্বালায় ঘুম হয়নি, অন্ধকার হতেই তারা আমাদের কাছে এল, আর বোধ হয় ধূনীর আলোতে আমাদের হাতী দুটোকে দেখতে পেয়ে তাদের মনে ভারী খটকা লাগল যে, এ দুটো আবার ওখানে কি করছে! ৫।৭টা হাতী মিলে এ পারে আসবার জন্য এক একবার এসে নদীতে নামে। তারা নদীর মাঝামাঝি আসতে না আসতেই আমাদের হাতী দুটো ছট্‌ফট্ করতে আর চ্যাচাতে থাকে। অমনি আমাদের লোকেরা প্রাণপণে মশাল ঘুরিয়ে সকলে মিলে বিকট চীৎকার করতে করতে ছুটে যায়, আর হাতীগুলো ছুটে গিয়ে আবার বনে ঢোকে। সারাটা রাত এই ভাবে কাটল। ভোরের বেলায় কতগুলো হাতী পূবের পাহাড়ে, আর কতগুলো পশ্চিমের পাহাড়ে উঠে গেল।

সকালে উঠে, চা খেয়ে, জিনিস পত্র বেঁধে আমরা ও পথ ধরলাম। সেই পূবের পাহাড়ে আমাদেরও যেতে হবে। যেমন রোজ যাই, তেমনি চলেছি,—লুশাই বুড়ো আগে আগে, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে শ্যামলাল, খাবারওয়ালা, আর আমার চাকর গঙ্গারাম।

খানিক দূরে এসে একটা ঝিল পেলাম; তাতে জল নাই, কিন্তু কাদা খুবই। আমরা বলাবলি করছি, কেমন করে কোন দিক দিয়ে পার হব, আর অমনি সেই ঝিলের মাঝে শরবনের আড়াল থেকে একটা হাতী উঠে বাঁশবন ভেঙ্গে সে যা হুড়্‌মুড়্ করে ছুট! পাহাড় পর্ব্বত যেন সব একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

যা হোক, এতে আমাদের এই উপকার হল যে, কোনখান দিয়ে ঝিল পার হতে হবে, সেটুকু আর বুঝতে বাকি রইল না। সেই হাতীর পায় পায় আমরা ঝিলের ওপারে চলে গেলাম। তখন লুশাই জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ দিকে যাব?" আমি বল্লাম, "যেদিকে হাতীটা গিয়েছে, সেই দিকে।" সেই দিকেই হাতীর পায়ের দাগ আর বাঁশ ভাঙ্গা দেখে চল্‌তে লাগলাম; তার পর খানিকটা পাহাড় উঠে বন্দুকটা শ্যামলালের হাতে দিলাম।

লুশাই বুড়ো আগে গিয়ে পাহাড়ের উপরে পৌঁছাল; পৌঁছিয়েই সে ডেকে বল্ল, "মস্ত দোয়াল (হাতীর রাস্তা)! কোন্ দিকে যাব?" আমি বল্লাম, "পূবদিকে যাও, উপরের দিকে।" সেই ভাবে সে হাত ৫০।৬০ গিয়েছে, আমিও ততক্ষণে এসে দোয়ালে পৌঁছিয়েছি, শ্যামলাল আমার হাত ৪।৫ পিছনে, গঙ্গারাম আর অন্য খালাসীটি আর একটু পিছনে।

দোয়াল ধরে উপরের দিকে সবে হাত ৮।১০ গিয়েছি, এমন সময় সামনে ভয়ঙ্কর একটা গোলমাল, বাঁশ ভাঙ্গার হুড়মুড় অরে জানোয়ারের গর্জ্জন, আর লুশাইর চীৎকার। আমি বল্লাম, "ক্যা হ্যায় রে?" শ্যামলাল পিছন থেকে বল্ল, "গণ্ডা (গণ্ডার) হোগা হুজুর।" সামনের দিকে চেয়ে দেখি, লুশাই বুড়ো ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে নামছে, আর তার পিছনে প্রকাণ্ড হাতী শুঁড় তুলে কামানের গোলার মত আসছে।

তা দেখে আমি "বন্দুক লাও!" বলে হাত বাড়িয়েছি, কিন্তু বন্দুক আর আসে না; চেয়ে খ শ্যামলাল লম্বা দিবার ফিকির করছে। তুই লাফে তাকে গিয়ে ধরে, তুই থাপ্পড় দিয়ে বল্লাম, গতা কাঁহা?" তারপর তার কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে উপরের দিকে ছুটলাম। বন্দুক ত নিয়েই মনে হল তার একনালে ছিটা, একনালে মাত্র গুলি। দৌড়াচ্ছি আর টোটা বদ্‌লাচ্ছি। ান কি যায়? তাড়াতাড়িতে এক সেকেণ্ডের কাজ ৫ মিনিটেও হতে চায় না।

যা হোক, কোন মতে ছিটা বদলে গুলি ত ভরা হল। দৌড়াচ্ছি তখনো, তাতে আবার উপরে ত হচ্ছে—মাটির দিকে চেয়ে, নইলে পড়ে মরবার ভয়। গুলি ভরে সামনের দিকে চাইলাম। নাশ! লুশাই বুড়ো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হাতে দা ছিল, হাতীর সামনে তাতে কোন কাজ দেবে বলে সেটা ফেলে দিয়েছে, দিয়ে রাস্তার মাঝখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতী তার কাছ ক ৯।১০ হাত মাত্র দূরে—এই ধরলে!

সেখানের রাস্তায় তুটো মোড় ছিল, আমার চোখের সামনে হাতীর কপালটা। আর কথা নাই; তুলেই দে সেই কপালে গুড়ুম করে ছেড়ে। হাতী কিন্তু থামেনি, এক পা আরো চলে এসেছে। এবারে তার পাঁজর আমার সামনে। বন্দুক আমার তোলাই ছিল গুড়ুম করে দিলাম সেই

পাঁজরে আর এক নালা ছেড়ে। এবারে ওষুদে ধরল। আওয়াজও করা, আর যা চীৎকার হাতীর পাহাড় বন সব থর থর করে কাঁপতে লাগল। তার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা সেখান থেকে ঘুরে কয়ে পা ছুটে গিয়েই কুড়ূঙ্গের ভিতর হুড়মুড় করে পড়ল—আর যা চীৎকার!

আমি দুই গুলি মেরেই পথ ছেড়ে তাড়াতাড়ি আর দুটো গুলি ভরে নিয়েছি, আর হাতীর পিছ আর একটা মেরেছিও। কিন্তু সেটা বাঁশে আটকে গিয়ে আর হাতীর গায় লাগতে পারে নি।

বিপদ ত কেটে গেল, এখন চারদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। লুশাই বেচারা সেইখানেই ক হয়ে দাঁড়িয়ে। আমার কাছ থেকে সে ৬ ধাপ মাত্র দূরে, আর যেখানে হাতীটাকে গুলি মেরেছিল সে যায়গাটা লুশাইর কাছ থেকে মোটে ৩ ধাপ। হাতীর শুঁড়টা আমার মনে হচ্ছিল যেন ঠি লুশাইর মাথার উপরেই ছিল। পিছনে চেয়ে দেখি ২০।২৫ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গঙ্গারাম, শ্যামলা আর অন্য খালাসীটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, আর খালি বলছে, "বাবারে বাবা!" "ওরে বাবারে "ওরে বাবারে!" তারা এগোয়ও না, পালায়ও না। গঙ্গারামের বড়ই দুর্দ্দশা! বেচারার মু যেন আর কথা বেরুচ্ছে না—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মাঝে মাঝে বলছে, "বাবারে বাবা! এত্তা বড়া কপাল হাতীর ঐ কপালটাই খালি তার চ'খে পড়েছে।

আমি লুশাইটির কাছে গেলাম। বেচারা প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। আমি কাছে যেতে আমার পা জড়িয়ে ধরল,—মুখে তার কথা নাই।

তখনো হাতীটার চীৎকারে বন জঙ্গল কাঁপছে; আর যেদিক দিয়ে সে গিয়েছিল, তাতে খা রক্ত আর রক্ত।

ক্রমশঃ

ধাঁধা।

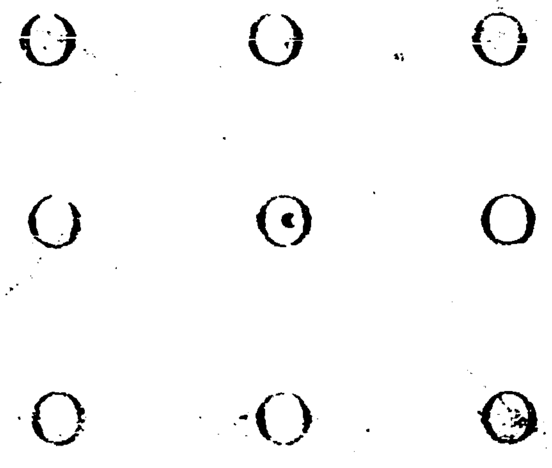

এই নয়টি শূন্যের কোন একটি হইতে আরম্ভ করিয়া এমন চারটি সো লাইন টান যে চারটি লাইনই এই নয়টি শূন্যের কোনটা না কোনটার উপ দিয়া যাইবে, অর্থাৎ নয়টি শূন্যই কাটা হইবে। কাগজ হইতে পেন্সিল উঠাইয়া লাইন কাটিতে হইবে এবং একটি লাইন যেখানে শেষ হই সেখানেই আরেকটি লাইন আরম্ভ করিতে হইবে।

উপহৃত তাং
সং
ব, সা, প, গ্র,

উপহৃত তাং
সং
ব, সা, প, গ্র,

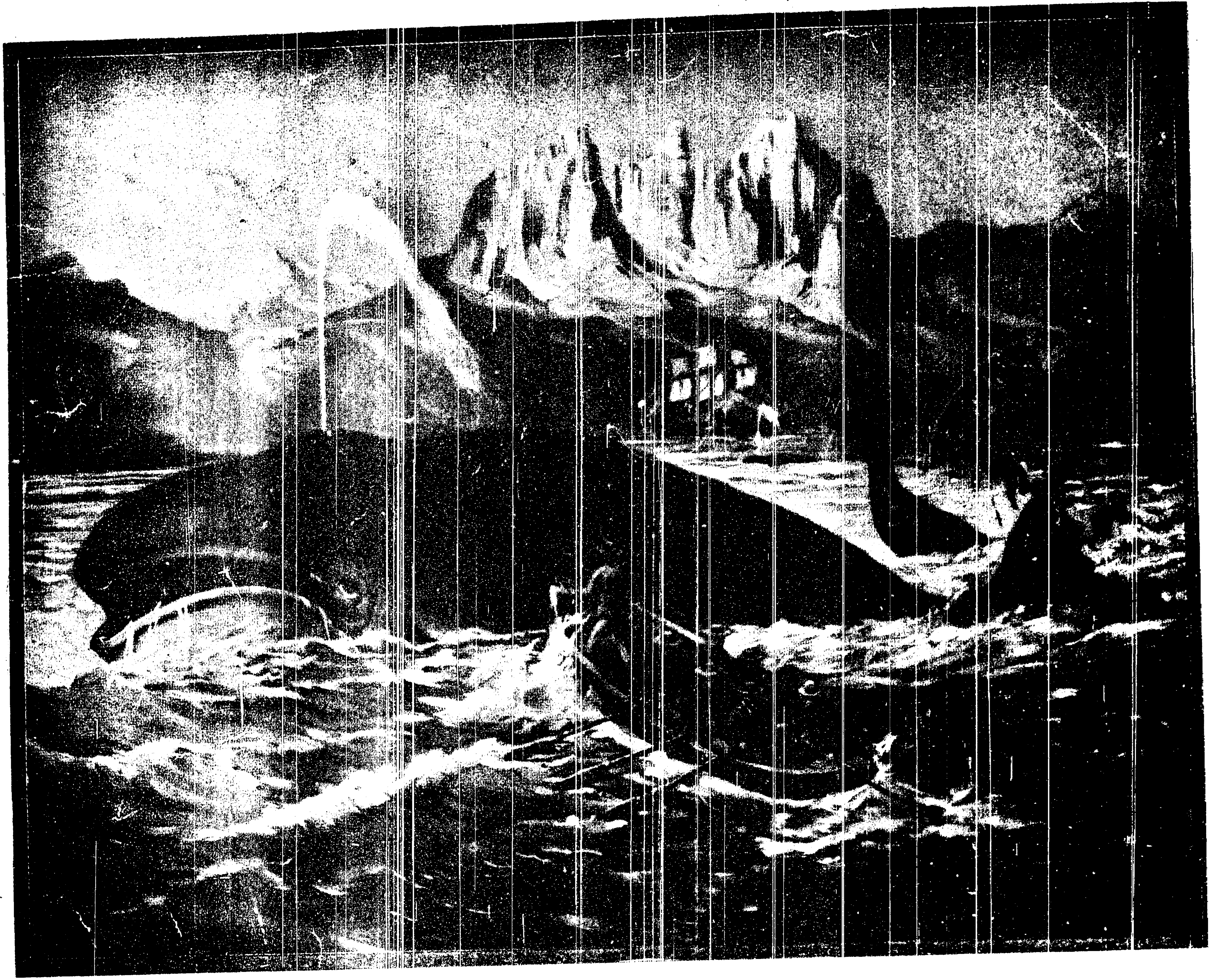

তিমি শিকার।

তীয় বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ দ্বিতীয় সংখ্যা

মহত্ত্ব।

"তুমি এ ধরার প্রাণ," সূর্য্যে বলে নর,
"তুমি আছ ব'লে ধরা এত মনোহর।
মানব জীবন তুমি মানবের গতি,
হে সবিতা! তব পদে সহস্র প্রণতি।"
সূর্য্য বলে,—"কেন নর আমারে বাড়াও,
আমি যাঁর দাস তুমি তাঁরি পানে চাও।"

শ্রীমতী বিজনবালা দাসী।

রাবণ।

রাবণের কথা তোমরা সকলেই জান। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মায়ের নাম কৈকসী। বিশ্রবা পরম ধার্ম্মিক মুনি ছিলেন। রাবণ আর তাহার ভাই বোনেরা জন্মিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাদের সকলে ছোটটি খুব ধার্ম্মিক হইবে, আর সকলেই ভয়ঙ্কর দুষ্ট রাক্ষস হইবে।

মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর তাহাদের বোন শূর্পণখা,ইহাদের এক একটা এমনি বিকট আর দুষ্ট রাক্ষস হইল, যে কি বলিব! ইহাদের ছোট ভাই বিভীষণও রাক্ষস ছিল বটে, কিন্তু সে যার পর নাই ভাল লোক ছিল।

রাবণের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত ছিল। দাঁতগুলো ছিল থামের মত বড় বড়, চুলগুলি আগুনের শিখার মত লাল, আর শরীরটা কালো পর্ব্বতের মত বিশাল। তাহার জন্মের সময় পৃথিবী কাঁপিয়াছিল, সূর্য্য ময়লা হইয়া গিয়াছিল, আর সমুদ্রের জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "দশগ্রীব"। উহাই উহার আসল নাম, 'রাবণ' নাম পরে হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় রাবণ ভাইদিগকে লইয়া দশ হাজার বৎসর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিল। এই দশ হাজার বৎসর সে আহার করে নাই। এক এক হাজার বৎসর যাইত, আর নিজের এক একটি মাথা কাটিয়া সে আগুনে আহুতি দিত। নয় হাজার বৎসরে নয়টি মাথা সে এইরূপ করিয়া আগুনে দিল। তার পর দশ হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, যেই সে তাহার বাকি একটি মাথাও কাটিতে যাইবে, অমনি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, "দশগ্রীব! আমি খুসী হইয়াছি, এখন তুমি বর লও।"

দশগ্রীব বলিল, "আমাকে অমর করিয়া দিন।" ব্রহ্মা বলিলেন, "সেটি হইবে না, অন্য বর লও।" দশগ্রীব বলিল, "তবে এই বর দিন যে, দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পক্ষী, ইহাদের কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না।" ব্রহ্মা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। তাহা ছাড়া তোমার যে মাথাগুলি কাটিয়া দিয়াছ, তাহাও ফিরিয়া পাইবে; ইহার উপর আবার যখন যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনি চেহারা করিতে পারিবে।"

কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণও এই দশ হাজার বৎসর ধরিয়া খুব তপস্যা করিয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মা তাহাদিগকেও বর দিতে গেলেন। বিভীষণ বলিল, "আমাকে দয়া করিয়া এই বর দিন, যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে।" এ কথায় ব্রহ্মা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে সে বর ত দিলেনই, তাহা ছাড়া তাহাকে অমর করিয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণকে বর দিবার সময় দেবতারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, "প্রভু, এমন কাজ করিবেন ; এ বেটা বর পাইলে আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। এর মধ্যেই কত জনকে রিয়া খাইয়াছে !"

তাই ত ! এখন তবে কি করা যায় ? তপস্যা করিয়াছে, কাজেই বর দিতেই হইবে ; বার বর দিলেও বিপদের কথা। তখন ব্রহ্মা বুদ্ধি করিয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের মুখের তরে ঢুকাইয়া দিলেন। সরস্বতী ঢুকিতেই তাহার মাথায় কি যে গোল লাগিয়া গেল, র বেচারা ঠিক করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ব্রহ্মা বলিলেন, "কুম্ভকর্ণ ! কি চাহ ?" ম্ভকর্ণ বলিল, "আমি খালি ঘুমাইতে চাই ! ছয় মাস ঘুমাইয়া এক দিন উঠিয়া খাইব !" হ্মা বলিলেন, "বেশ কথা ! তাই হো'ক !" এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে লইয়া চলিয়া লেন, আর কুম্ভকর্ণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিল, "তাই ত ! এটা কি বলিলাম ? বতা বেটারা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল নাকি ?"

যা হোক, আমরা দশগ্রীবের কথা বলিতেছি। সে ত বর পাইয়া নিতান্তই ভয়ঙ্কর ইয়া উঠিল ; এখন আর কেহ তাহার কোন কথায় 'না' বলিতে ভরসা পায় না। দশ-ীবের এক দাদা ছিলেন, তাঁহার নাম কুবের। তিনিও বিশ্রবা মুনির পুত্র, তাঁহার মাতা রদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনী। কুবের লঙ্কায় বাস করিতেন। দশগ্রীব তাঁহাকে লিয়া পাঠাইল, 'দাদা ! লঙ্কাপুরীখানি আমাকে ছাড়িয়া দাও !"

কাজেই তখন কুবের আর কি করেন ? ভালয় ভালয় না দিলে জোর করিয়া াড়িয়া নিবে। তাহার চেয়ে তিনি কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবও খন পরম আনন্দে রাক্ষসের দল সমেত লঙ্কায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিল !

ইহার কিছুদিন পরেই দশগ্রীব বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত সূর্পণখার বিবাহ দল। তাহাদের তিন ভাইয়ের বিবাহ হইতেও আর বেশী বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, ভকার্য্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঘোর নিদ্রা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরিয়া াসিল ! তাহার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢুলিয়া পড়িল, সে বিকট মুখে ভীষণ হাই ুলিয়া বলিল, "দাদা ! বড়ই ঘুম পাইয়াছে, আমার শয়নের জন্য ঘর করিয়া দাও !" খনই রাবণের হুকুমে চমৎকার ঘর প্রস্তুত হইল। তাহার ভিতরে গিয়া সেই যে কুম্ভকর্ণ ুইল, হাজার হাজার বৎসরেও আর উঠিল না।

এদিকে দশগ্রীবের জ্বালায় ত্রিভুবন অস্থির সে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মুনি ঋষি কাহাকেও ানে না, এক ধার হইতে সকলকে মারিয়া তাহাদের বাড়ী, ঘর, বাগান সব চুরমার করিতে

আরম্ভ করিয়াছে। কুবের ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, তাহাকে বারণ করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। সে দূতের কথা দশগ্রীব ত শুনিলই না; লাভের মধ্যে বেচারাকে কাটিয়া রাক্ষসদিগকে খাইতে দিল। তার পর রথে চড়িয়া এই বলিয়া সে বাহির হইল যে, "আমি ত্রিভুবন জয় করিব!"

বাহির হইয়াই সে সকলের আগে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল;—তাঁহার উপরেই রাগটা বেশী। কুবেরের যক্ষেরা অনেক যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দশগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসেরা গিয়াছিল; তাহারা যক্ষদের এমনি দুর্গতি করিল যে তাহা আর বলিবার নহে। যক্ষেরা সোজাসুজি সরল ভাবে যুদ্ধ করে, আর রাক্ষসেরা নানা রকম ফাঁকি দেয়; কাজেই যক্ষেরা হারিয়া গেল। কুবের নিজে আসিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। দশগ্রীব তাঁহাকে অস্ত্রের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া, তাঁহার 'পুষ্পক' নামক রথখানি লইয়া চলিয়া গেল। সে রথ বড়ই আশ্চর্য্য ছিল। তাহাতে সঙ্গে দানা, পানি, সইস কোচমান কিছুরই দরকার হইত না; যেখানে যাইবার হুকুম পাইত, অমনি সে উড়িয়া গিয়া সেখানে হাজির হইত।

সেই পুষ্পক রথে চড়িয়া দশগ্রীব স্বর্গের বিশাল শরবনে গিয়া উপস্থিত হইল। পর্ব্বতের উপরে সে অতি পবিত্র বন, কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থান, তাহার উপর দিয়া কোন রথেরই যাইবার হুকুম নাই; বিশেষতঃ শিব আর পার্ব্বতী তখন সেখানে ছিলেন। কাজে কাজেই পুষ্পক রথ সেখানে গিয়া আটকাইয়া গেল। ইহাতে দশগ্রীব যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় শিবের দূত নন্দী আসিয়া তাহাকে বলিল যে, "দশগ্রীব! মহাদেব এখানে আছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।"

নন্দীর চেহারা বড়ই অদ্ভুত ছিল। ছোট্ট খাট্টো পিঙ্গলবর্ণ লোকটি, হাত দুখানি এতটুকু, মাথাটি নেড়া, মুখ খানি বানরের মত। দশগ্রীব তাহার কথা শুনিবে কি, সে হাসিয়াই অস্থির। কিন্তু নন্দী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই ষণ্ডা, তাহাতে আবার হাতে ভয়ঙ্কর শূল। দশগ্রীব রাগের ভরে রথ হইতে নামিয়া সবে বলিয়াছিল, "কে রে তোর মহাদেব?" অমনি নন্দী তাহাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিল। তখন সে ভারী চটিয়া বলিল, "বটে? আমাকে যাইতে দিবি না? আচ্ছা, দাঁড়া! তোদের পাহাড় আমি তুলিয়া নিব!"

এই বলিয়া সত্য সত্যই সে কুড়িহাত সেই পর্ব্বতের তলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সেকি যেমন তেমন টান? টানের চোটে পর্ব্বত নড়িয়া উঠিল, শিবের ভূতগুলি

ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, পার্ব্বতী যার-পর নাই ব্যস্ত হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। মহাদেব কিন্তু কিছু মাত্র ব্যস্ত হইলেন না। তিনি কেবল পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়া পর্ব্বত খানিকে একটু চাপিয়া ধরিলেন তাহাতেই সে তাহার জায়গায় বসিয়া গেল, আর অমনি, দরজার কামড়ে দুষ্টু খোকার আঙ্গুল আটকাইবার মতন, দশগ্রীব মহাশয়ের হাত কখানিও পর্ব্বতের চাপনে আটকাইয়া গেল।

তখন ত দশগ্রীব দশমুখে ভ্যা ভ্যা শব্দে চাঁচাইয়া অস্থির! চীৎকারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল, সাগর উছলিয়া উঠিল, দেবতারা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন।

হাজার বৎসর ধরিয়া দশগ্রীব ঐরূপ চ্যাঁচাইয়া ছিল, আর মহাদেবকে ক্রমাগত মিনতি করিয়াছিল। মহাদেবের দয়ার কথা সকলেই জানে, বেচারার এই কষ্ট দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া ত দিলেনই, তাহার উপর আবার ভারী ভারী কয়েকটা অস্ত্রও তাহাকে দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, দশগ্রীব, তুমি এৎকার চ্যাঁচাইয়া ছিলে তোমার চীৎকারে সকলেই ভয় পাইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তোমার নাম 'রাবণ' (যে চীৎকারে লোকের ভয় লাগাইয়া দেয়) হইল।" দশগ্রীব দেখিল, পাহাড় চাপা পড়িয়া মোটের উপর তাহার লাভই হইয়াছে, কাজেই সে খুব খুসী হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

গরমের কাজ।

গরম আসিল, মুস্কিল হইল। আমরা তাহাকে চাহি না, তবুও সে আসে, আর সে আসিলে আমাদের চলেও না।

এই গ্রীষ্মে কে দেশে থাকিবে? কে পাহাড়ে উঠিবে? পাহাড়ের উপরে এখানকার চেয়ে ঠাণ্ডা। পাহাড় বলিয়া যে ঠাণ্ডা, তাহা নহে, উঁচু বলিয়া ঠাণ্ডা। পাহাড় যদি না থাকিত, বেলুনে করিয়া উঁচুতে উঠিতে, তবুও ঠাণ্ডা লাগিত।

হাজার, দু হাজার ফুট উঁচুতে তত ঠাণ্ডা বোধ না হইতে পারে, কিন্তু চার হাজার ফুটের উপরে উঠিলে, এই গ্রীষ্মের দিনেও আমাদের শীতকালের মত বোধ হইবে। আট দশ হাজার ফুট উপরে আমাদের ভয়ঙ্কর শীতের চেয়েও ঠাণ্ডা; আর, কুড়ি হাজার ফুটের উপরে এত ঠাণ্ডা যে, সেখানে বারো মাসই জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতের মাথা এই জন্যই চিরকাল বরফে ঢাকা।

এই জন্যই লোকে গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে যায়। যাহাদের যাইবার সুবিধা হয় না, তাহারা পাখা নাড়িয়া, বরফ সরবৎ খাইয়া, দরজা আঁটিয়া, খস্‌খস্ টাঙ্গাইয়া ঠাণ্ডা থাকিতে চেষ্টা করে, আর গরমকে গালি দেয়। গরম সে কথায় কাণও দেয় না, সে তাহার কাজ করিয়া যায়।

গরম না আসিলে আম কাঁঠাল খাইতে পাইতে না। ফল শস্য পাকাইয়া সে আমাদের বন্ধুর কাজ করে। গরম না থাকিলে বৃষ্টিও হইত না, সুতরাং গাছ পালা শুখাইয়া মরিত।

বরফে গরম লাগিলে তাহা গলিয়া জল হয়, জলে গরম লাগিলে তাহা হাওয়ার মত হইয়া উড়িয়া যায়। সেই হাওয়ার মত জলকে বলে বাষ্প। উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া থাকে। একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই (অর্থাৎ গরম কমিয়া গেলেই) আবার সে নিতান্ত ছোট ছোট জলের কণা হইয়া বাহির হইয়া পড়ে; তখন আমরা তাহাকে দেখিতে পাই। সেই জলের কণাই রাত্রে গাছের পাতায় আর ঘাসের আগায় লাগিয়া থাকে, তাহাকে আমরা বলি শিশির। অনেক সময় তাহা ধোঁয়ার মত হইয়া হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায়। সে জিনিস জমির উপরে থাকিলে তাহাকে বলে কুয়াসা, আর আকাশের উপরে থাকিলে বলে মেঘ।

এ সবই গরমের কাজ। গরম যাহাতে লাগে, সেই জিনিসটাকেই সে বড় করে। যে জিনিসটা এক হাত লম্বা, তাহাকে তাতাইয়া আবার মাপিয়া দেখ, এক চুল বেশী লম্বা পাইবে। রেলের পথ যাহারা তয়ের করে, তাহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হয়। পর পর দুখানা রেল বসাইবার সময় তাহারা মাঝখানে একটু ফাঁক রাখে। যদি তাহা না করিত, তবে গরমের সময় রেলগুলি লম্বা হইবার জন্য ঠেলাঠেলি জুড়িয়া দিত, আর, বাড়িবার জায়গা না পাইয়া শেষে বাঁকিয়া উঠিত, তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিতে গেলে হয় ত পড়িয়া যাইত।

হাওয়া তাতিলে তাহাও বাড়িয়া যায় (বেশী জায়গা দখল করে), তাহার দরুণ কাজেই সে পাতলা, সুতরাং হালকাও, হইয়া যায়। তখন আর সে নীচে পড়িয়া থাকিতে চায় না; সে উপরে ভাসিয়া উঠে, আর চারিদিক হইতে হাওয়া আসিয়া তাহার খালি জায়গাটুকু দখল করে। এই জন্যই কোন জায়গায় খুব বেশী রকম আগুন জ্বলিলে, দেখা যায় যে ধোঁয়াগুলি ক্রমাগত ছুটিয়া উপরে উঠিতেছে, আর চারিদিক হইতে হাওয়া ছুটিয়া আগুনের কাছে আসিতেছে।

এমনি করিয়া হাওয়ার স্রোত জন্মায়। এক জায়গায় জমি যদি বেশী গরম থাকে, বে সেখানকার হাওয়া তাহাতে তাতিয়া উপরে উঠিবে, আর চারিদিকের হাওয়া আসিয়া হার স্থান পূরণ করিবে। এ কাজটি একটু বেশী তাড়াতাড়ি হইলে তোমরা তাহাকে লিবে ঝড়। এর পর যখন ঝড় আসিবে, তখন মনে রাখিও যে উহা গরমের কাজ। গ্রীষ্মের দিনে সন্ধ্যার পর যখন সুমিষ্ট দক্ষিণে হাওয়াটি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখনও নে রাখিও, উহা গরমের কাজ। বর্ষায় যখন আকাশের চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ড়িবে, তখনও মনে রাখিও, উহা গরমের কাজ; শীতকালে যখন উত্তুরে হাওয়া হু হু রিয়া বহিতে থাকিবে, তখনও মনে করিও, উহা গরমের কাজ।

গাছের আবদার।

বনের ভিতরে সব গাছেরই সবুজ পাতা ছিল, খালি একটি ছোট্ট গাছ ছিল, কাঁটার য়ে কেউ সে গাছটির কাছে যেত না।

গাছটি বল্ল, "হায়, ঈশ্বরের কি অন্যায়। সকলকে দিয়েছেন সুন্দর পাতা, শুধু আমাকে দিয়েছেন কাঁটা। আমাকে কেন তিনি সোণার পাতা দিয়ে সাজিয়ে লেন না?"

পরদিন সকালবেলায় সেই গাছটি ঘুম থেকে উঠে দেখে, কি মজা! তার গা ময় সব সোণার পাতা ঝক্ ঝক্ করছে। তখন সে আর সকল গাছের পানে তাকিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল, "শুধু পাতা থাক্‌লে কি হয়? আমার মতন এমন সোণার পাতা আর কার আছে?"

সেইখান দিয়ে এক বুড়ো যাচ্ছিল, সে ভয়ানক কিপ্‌টে। সে সেই গাছটির সোণার পাতা দেখেই একটি একটি করে তার সবগুলো কুঁড়ি শুদ্ধ ছিঁড়ে চাদরে বেঁধে নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল। গাছটি কত কাঁদ্‌ল, কত বারণ কর্‌ল, দুষ্টু বুড়ো তার কিছুতেই কান দিল না।

বুড়ো চলে গেলে গাছটি বল্ল, "হায়, কেন আমি সোণার পাতা চেয়েছিলাম? কাচের পাতা হলে ত দেখ্‌তে ও সুন্দর হত, কেউ চুরী করে নিয়ে ও যেত না।"

তারপর দিন সে ঘুম থেকে উঠে দেখে, তার চমৎকার সব কাঁচের পাতা হয়েছে। খন সে খুব খুসী হয়ে বল্ল, "এই হয়েছে ঠিক! এমন ঝক ঝকে পাতা আর কারুর

নেই।" বল্‌তে বল্‌তেই আকাশে কালো কালো মেঘ দেখা দিল, বনবাদাড় তোলপাড়

কিপ্‌টে বুড়ো সোণার পাতা ছিঁড়্‌ছে।

করে পাগলা হাওয়া শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে এল, তিলেকের মধ্যে আতুরে গাছের কাঁচের পাতা গুঁড়ো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

তখন সে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্ল, "তাইত, আমার অত জমকালো জিনিস চাওয়াটা হয় ত ভাল হয় নি। আর সব গাছের মত আমারও সবুজ পাতা হলেই চলতে পারে।"

তাই হল। পরদিন ঘুম থেকে উঠে গা ময় কচি কচি সবুজ পাতা দেখে গাছটি বল্ল, "এবার আর ভয় নাই। আর, সবুজ পাতা দেখতে এমন মন্দই বা দেখায় কি?"

এমন সময় সেইখানে এক ছাগল এসেছে, তার তিনটে বাচ্চা নিয়ে। এসেই ত কচি পাতাগুলো দেখে তাদের জিব দিয়ে জল পড়্‌তে লেগেছে। অমনি তারা চারজনায় মিলে খাবল খাবল করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই পাতা সব খেয়ে ফেল্ল, একটিও বাকি রাখল না।

পাতা খেয়ে পেট ভরে ছাগলগুলো নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল। তখন গাছটি মাথা হেঁট করে বল্ল, "আমি যেমন দুষ্টু, আমার তেমনি সাজা হয়েছে। কাঁটাই ত দেখ্‌ছি আমার ভাল ছিল। আহা! যদি সে কাঁটা আবার ফিরে আস্‌ত।"

মনের দুঃখে তার রাত কেটে গেল। সকালে উঠে সে দেখ্‌ল যে, তার সেই কাঁটা আবার ফিরে এসেছে। এবারে সে কাঁটাকে তার বিশ্রী মনে হল না! সে যোড়-হাতে ভগবানকে নমস্কার করে বল্ল, "হে ভগবান, তুমি যা দাও, তাই ভাল।"

অন্ধের ক্রিকেট খেলা।

গত বারে 'শব্দবেধীর' কথা শুনেছ, এবারে আরেক রকমের শব্দবেধীর কথা শোন। অন্ধেরা চোখে দেখ্‌তে পায় না, কাজেই, তারা যে ক্রিকেট খেল্‌তে পারে একথা শুনেই অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু এই পৃথিবীতে আজ কাল এমন অনেক ব্যাপারই আমাদের চোখের সাম্‌নে ঘট্‌ছে, যাকে আগে লোকে অসম্ভব মনে কর্‌ত।

সেদিন খবরের কাগজে একটি স্কুলের কথা পড়ছিলাম, সেখানে অন্ধ ছেলেরা পড়ে। সেই ছেলেরা ক্রিকেট খেলে।

তোমরা হয়ত বল্‌বে, "তারা বল্‌ দেখে কেমন করে? আর সে বল এসে নাকে পড়্‌লে তারা কি করে?"

তাদের বল্‌ দেখবার দরকার হয় না, তারা বল্‌ 'শোনে'।

বলটি একটি খুব ছোট্ট বেতের ঝুড়ি; তার ভিতরে ঘুঙুর পোরা আছে। বলটা যখন আসে, তখন সে রুণু ঝুণু করে বাজ্‌তে বাজ্‌তে আসে; সেই আওয়াজের আন্দাজে তাকে ঠিক করে ব্যাট দিয়ে মার্‌তে হয়। কাজেই এটাকেও এক রকম শব্দবেধী বলা যেতে পারে।

বেতের জিনিসটি খুবই হাল্কা, কাজেই সে এসে দৈবাৎ নাকে পড়লেও তেমন বিপদের কথা হয় না। আর, যারা খেলে, তারা চায়ই যে, একবার বলটা এসে গায় পড়ুক, কেননা, তাহলেই তাকে খপ্‌ করে ধরে ফেলা যাবে। সেই অন্ধ ছেলেদের হাত এমনি চটপটে যে একবার কোন জিনিস এসে গায় পড়লে আর সে হাতের কাছ থেকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

'বোলার' বল্‌ দিবার আগে বলে "প্লে" (play); অমনি ব্যাটস্‌ম্যান বলে

'রাইট ও' (right o)। বল্‌তে বল্‌তেই বল্ রুণু ঝুণু করে এসে হাজির হয়; আর অমনি,—বুঝ্‌তেই পার।

ব্যাটস্ ম্যান্ যেখানে দাঁড়ায়, সেখানে মাতুর পাতা থাকে। 'রাণ' করবার সময় ব্যাট খানিকে এগিয়ে ধরে সেই মাতুরের খোঁজ নিতে হয়। ব্যাট মাতুরে ঠেকলেই বোঝা গেল যে, একবারের রাণ শেষ হয়েছে।

তিমি শীকার।

মেরুর নিকটে যে সকল সাগর আছে, তাহাতে বিস্তর তিমি থাকে। তিমির তেলে বাতী প্রস্তুত হয়, কাজেই সেটা ভারী দরকারী জিনিস। এই তেলের ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় এক কোটী টাকা লাভ হয়, সেই টাকার লোভে ঢের লোক জাহাজে করিয়া তিমি শীকার করিতে যায়।

এ কাজে বিপদ অনেক। একেত সেই সকল সমুদ্রই খুব ভয়ানক স্থান। এই সেই দিন তুখানি খুব ভাল জাহাজ তিমি শীকারে গিয়াছিল, সেই তুখানিই খোয়া গিয়াছে। এক খানি জাহাজ বরফের পাহাড়ের চাপনে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার কয়েকটি মাত্র লোক অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে; আর একটি জাহাজের যে কি হইয়াছে, তাহার কোন ঠিকানাই নাই।

এ সকল বিপদ ত আছেই; যতটা সম্ভব তাহার হাত এড়াইবার জন্য লোকে গ্রীষ্মকাল দেখিয়া এই কাজে বাহির হয়, কেন না গ্রীষ্মকালে বরফের ভয় কম থাকে। কিন্তু তিমির মত এমন বিশাল একটা জন্তুকে মারিতে যাওয়ারই যে ভয়ঙ্কর বিপদ, বরফের বিপদ তাহার চেয়ে বেশী নহে।

তিমিকে শীতের ভিতরে বাস করিতে হয়, কাজেই তাহার গায় গরম একটা কিছু না থাকিলে চলে না। উহার চামড়াই হইতেছে সেই গরম জিনিস। সে চামড়ার অধিকাংশই চর্ব্বি, তাহার ভিতর দিয়া শীত প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। সমুদ্রের মাংসখেকো মাছেরা সেই চামড়া খাইতে যারপর নাই ভালবাসে; তিমি পাইলেই তাহারা দল শুদ্ধ আসিয়া মহানন্দে তাহাকে খাইতে থাকে। তখন ডুব দিয়া একেবারে সমুদ্রের তলায় চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর বেচারার উপায় থাকে না। ছোট ছোট মাছের নিতান্ত গভীর জলে যাইবার সাধ্য নাই, কাজেই সেইখানে গিয়া তিমি একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

কিন্তু সেই গভীর জলে আবার চিরকাল বসিয়া থাকিবার যো নাই, কেন না তাহার [খো]রাক যে ছোট ছোট মাছ, তাহারা থাকে উপরে। ইহা ছাড়া, যদিও অনেকে তিমিকে

মাছ বলে, তথাপি সে আসলে হাতী ঘোড়ার মত জানোয়ার। মাছের রক্তের মত উহার রক্ত ঠাণ্ডা নহে, কিন্তু হাতী ঘোড়ার রক্তের মত গরম। শিশুকালে সে হাতী ঘোড়ার বাচ্ছার মত মায়ের দুধ খায়, আর—সেইটাই আসল কথা—হাতী ঘোড়ার মত তাহারও নিশ্বাস ফেলা চাই। কাজেই আর কোন কারণে না হউক শুধু নিশ্বাস ফেলিবার জন্যই শুশুর মত তাহাকে বার বার উপরে আসিতে হয়।

তিমির নিশ্বাস ফেলা এক চমৎকার ব্যাপার। আমরা যেমন নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলি, তিমি তাহা করে না; উহার শ্বাস প্রশ্বাসের ছিদ্রটি ঠিক মাথার উপরে, একটি ছোট ঢিপির আগায়। শ্বাস ফেলিবার সময় জল আর হাওয়া মিলিয়া সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে প্রকাণ্ড ফোয়ারা বাহির [হ]য়, আর অমনি মাস্তুলের উপর হইতে শীকারীদের পাহারাওয়ালা "ঐ জল ফুকিতেছে!" [ব]লিয়া চ্যাঁচায়। তখন যে খুব একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়, তাহা বুঝিতেছ।

নৌকা প্রস্তুতই থাকে, আর থাকে হাজার হাজার হাত রশি বাঁধা বড় বড় দোহাতি

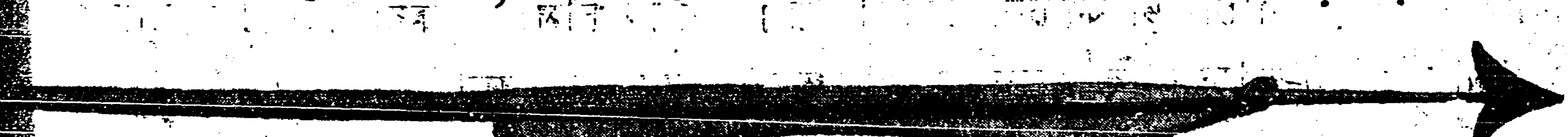

[বল্ল]ম। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই সব নৌকা নিঃশব্দে তীরের মত ছুটিয়া বাহির হয়। শীকারী বল্লম

হাতে নৌকার আগায় খাড়া থাকে আর সকলে প্রাণ পণে দাঁড় টানে। তিমি এত বিপদের কথা কিছুই জানে না, ইহার মধ্যে বল্লমের বিষম খোঁচা লাগিয়া তাহার প্রাণ চমকাইয়া দেয়। অমনি সে সাগর তোলপাড় করিয়া সেই বল্লম শুদ্ধ ভয়ঙ্কর বেগে তলার দিক পানে ছোটে। বল্লমের দড়ি হুস হুস শব্দে খুলিতে থাকে। তখন যদি ক্রমাগত তাহাতে জল না ঢালা হয় তবে তাহা ভয়ানক তাতিয়া নৌকায় আগুন ধরিয়া যাইতে পারে। যদি

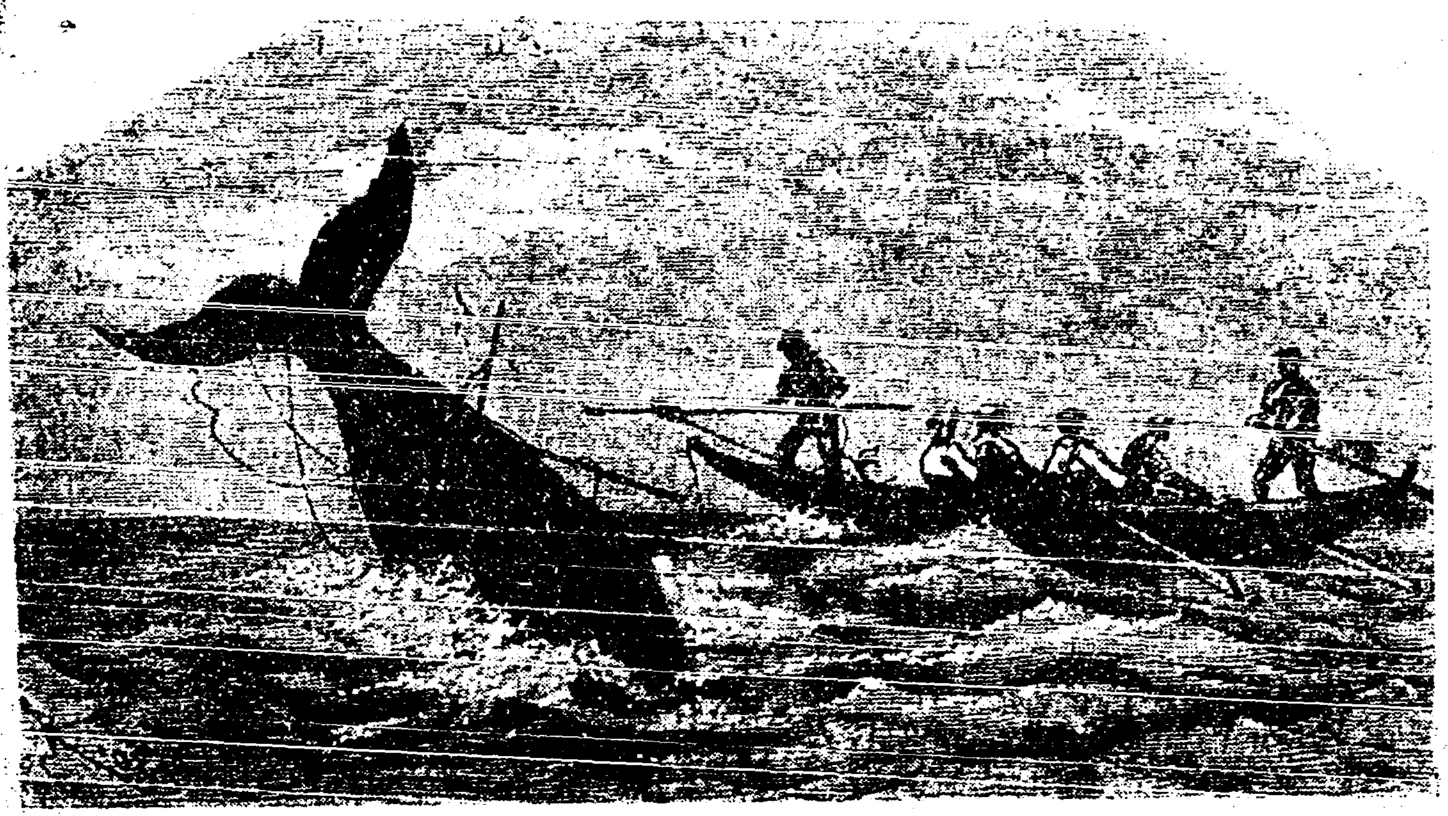

কাহারও পা উহাতে জড়াইয়া যায়, তবে তখনি পাখানি কাটিয়া যাইবে, না হয় দড়ির টানে লোকটি চিরদিনের মত জলের নীচে যাইবে। যদি নৌকায় দড়ি আটকাইয়া যায় তবে নৌকারও সেই দশা হইতে পারে। আর তিমি ডুব দিবার সময় যদি তাহার লেজের বাড়ি নৌকায় লাগে, তবেত তাহার চুরমার হইয়া যাওয়া ধরা কথা।

দেখিতে দেখিতে তিমি একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়া উপস্থিত হয়, আর এতই বেগে গিয়া উপস্থিত হয় যে তলায় ঠেকিয়া মাঝে মাঝে তাহার মাথা কাটিয়াও যায়। কিন্তু সেখানে গিয়াও আর বেশীক্ষণ থাকিবার যো নাই, আবার নিশ্বাস ফেলিবার জন্য উপরে আসিতেই হয়। নিষ্ঠুর শীকারীরাও বল্লম লইয়া প্রস্তুত থাকে, তিমি ভাসিয়া উঠামাত্রই আর একটি বল্লম তাহার গায় বিঁধাইয়া দেয়, কাজেই আবার বেচারা প্রাণের ভয়ে পাগল হইয়া তলার দিকে ছোটে।

এইরূপে একবার ভাসা, একবার ডোবা, আর ক্রমাগত বল্লমের খোঁচা খাওয়া, এমনি করিয়া বেচারা ক্রমেই কাহিল হইতে থাকে। ইহার পর তাহার মৃত্যু হইতেও আর বেশী দেরী হয় না। তখন তাহাকে টানিয়া জাহাজের কাছে আনিয়া ছুরী আর কোদাল দিয়া তাহার চামড়া কাটিয়া তোলা হয়। সেই চামড়া টুকরা করিয়া পীপায় পোরা হইলে আর একটি কাজ বাকি থাকে, তাহার কথা এখন কিছু বলা দরকার।

তিমি এত বড় জন্তু, কিন্তু তাহার গলার ছিদ্র নিতান্তই ছোট। পুঁটি বাটার চেয়ে বড় মাছ সে গিলিতে পারে না। সে হাঁ করিয়া মাছের ঝাঁক শুদ্ধ জল মুখের ভিতরে

নিয়া নেয়, তারপর জলটুকু ছাড়িয়া দেয়, মাছ মুখের ভিতরে আটকা পড়ে। যে তিমি লোকে শীকার করিতে যায় তাহার দাঁত নাই, তাহার জায়গায় চিরুণীর মত

একটি জিনিস থাকে। সে চিরুণীর ফাঁক দিয়া মাছ গলে না, কিন্তু জল বাহির হইয়া যায়। এই চিরুণী যে জিনিসের তৈরী, তাহাই 'কাচকড়া'। ইহা অনেক কাজে লাগে, কাজেই ইহাতেও ঢের লাভ হয়। তিমির চামড়া তুলিয়া লওয়া শেষ হইলে, এই কাচকড়ার চিরুণীটি কাটিয়া বাহির করারও নিতান্ত দরকার। সে কাজ হইয়া গেলে আর তিমির শরীরটা দিয়া শীকারী-দের কান প্রয়োজন থাকে না; কাজেই তাহারা তখন সেটাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া অন্য শীকার খোঁজে। তারপর সেখানকার যত পাখী, যত মাছ, যত শেয়াল, যত ভাল্লুক সকলে আসিয়া মহানন্দে সেই দেহ ভোজন করে।

এই তিমি গ্রীণলণ্ড দেশের নিকটে থাকে, তাই ইহার নাম "গ্রীণলণ্ড তিমি।" ররকাল (Rorqual) বলিয়া ইহাদের চেয়ে বড় আর এক রকমের তিমি আছে, কিন্তু তাহার তত চর্ব্বি নাই, কাচ কড়া ও খুব কম। তাহাতে আবার উহার স্বভাবটাও হিংস্র—নৌকা দেখিলে কামড়াইয়া ধরিতে চায়। কাজেই ইহাকে শীকার করিতে লোকের তত উৎসাহ নাই।

ছুঁচ কুমার।

এক যে ছিল রাজকন্যা;—দেখ্‌তে এমনি সুন্দর আর এতই ভাল ছিল, যে তাকে যে দেখ্‌ত সেই তাকে ভালবাস্‌ত।

রাজার ঐ একটি মেয়ে ছাড়া আর ছেলে পিলে কিছু ছিল না, তাই রাজা আর রাণী তাকে যারপর নাই আদর করতেন। সে যখন যা চাইত, অমনি তা পেত।

এমনি করে দিন যায়, এর মধ্যে একদিন রাণীর বড় অসুখ হ'ল আর তিনি মরে গেলেন। তার কিছুদিন বাদে রাজা মশায় নতুন এক রাণী ঘরে আন্‌লেন।

নতুন রাণী এসেই রাজকন্যাকে ভয়ানক হিংসা কর্‌তে লাগলেন। সে কেন তাঁর চেয়ে দেখ্‌তে সুন্দর হবে? লোকে কেন তাকে এত ভাল বল্‌বে আর আদর কর্‌বে? রাজা কেন তাকে যা চায় তাই দিবেন? এসব কথা রাণী যত ভাবেন, ততই মেয়েটির উপরে তাঁর রাগ বেড়ে যায়।

রোজ তিনি মেয়েটির নামে মিছামিছি কত কথা রাজার কাছে লাগান, তাই শুনে রাজা রোজই তাকে সাজা দেন, তাতেও তাঁর মন উঠে না। শেষে তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি হতভাগীটাকে নিয়ে যুক্তি কর্‌লেন, "মেয়েটাকে বিষ খাইয়ে মারতে হবে।"

সেই ঘরে একটা টিয়া পাখী ছিল, সে রাজকন্যাকে বড় ভালবাস্‌ত। রাজকন্যা রোজই নিজ হাতে এনে তাকে খাবার দিত। সে দিন যখন সে খাবার নিয়ে এসেছে, তখন পাখীটা তাকে বল্ল, "তোমাকে বিষ খাইয়ে মার্‌বে; এখনি পালিয়ে যাও।"

রাজকন্যা আর কি করবে? সে তখনি একটি পুঁটুলীতে করে খান কতক কাপড় আর গহনা আর একটি ঝি সঙ্গে নিয়ে খিড়কীর দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দুজনে বোঁ

করে ছুটছে, আর বার বার পিছনে তাকিয়ে দেখ্‌ছে, পাছে, রাজবাড়ীর লোক এসে দের ধরে ফেলে। সারা দিন এই ভাবে চলে সন্ধ্যা বেলায় একটা বনের ভিতরে এসে রা উপস্থিত হল। তখন আর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিক থেকে খালি বাঘ লুকের ডাক শোনা যাচ্ছে, কখন জানি তার কোনটা হাঁই মাঁই করে এসে উপস্থিত হয়! হায় এখন কি হবে? কোথায় যাবে? রাজ কন্যা আর কিছু ভাব্‌তে না পেরে কটা গাছকে বল্ল, "গাছ রে! তুই দু'ভাগ হ, আমরা তোর ভিতরে গিয়ে লুকাই।"

বল্‌তে বল্‌তেই গাছটা ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেল, আর রাজকন্যা ঝিকে নিয়ে তার তরে ঢুকতেই আবার তার ফাটা বুঁজে গেল। তখন আর তাদের বাঘ ভাল্লুকের ভয় ছু রইল না। সকাল বেলায় আবার গাছ ফাঁক হয়ে তাদের বেরুবার পথ করে দিল।

তারপর আবার তারা দুজনে চল্‌তে লেগেছে। কোথায় যাবে তার কোন ঠিকানা নাই, লি দুজনে পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে তারা একটা খুব বড় আর খুব সুন্দর ড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। সেটা যে কোন রাজার বাড়ী হবে, তাতে আর ভুল ই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লোকজন কাউকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘর, বারান্দা, ত, আঙ্গিনা সব খালি পড়ে আছে।

তারা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল। কোথাও কেউ নাই, খালি এক ঘরে একখানা নার খাটে একটি রাজপুত্র শুয়ে আছে। রাজপুত্রটি এমন সুন্দর যে, তেমন আর উ কখনো দেখেনি। কিন্তু হায়, সে অজ্ঞান; ডাক্‌লে সাড়া দেয় না, নাড়া দিলে টের য় না। তখন তারা দেখ্‌তে পেল যে, ছেলেটির গা ময় খালি হাজার হাজার ছুঁচ ধান, চোখ মুখ নাক কান সব ছুঁচ দিয়ে সেলাই করা।

তখনি রাজকন্যা ব্যস্ত হয়ে রাজপুত্রের গা থেকে ছুঁচ ফেল্‌তে লাগ্‌ল। যতই ছুঁচ ছে, ততই যেন রাজপুত্রের মুখ খানি হাসি হাসি হয়ে আস্‌ছে। ক্রমে সব ছুঁচই খোলা গেল, খালি দুটি চোখের ছুঁচ খুল্‌তে বাকি। তা দেখে রাজ কন্যা ঝিকে বল্ল, "ঝি, এখানে বসে থাক্; আমি স্নান করে পরিস্কার হয়ে এসে তবে ঐ কটি ছুঁচ খুল্‌ব।" বল্ল "আচ্ছা।"

ঝিটা এতক্ষণ জানালার কাছে বসে তামাসা দেখ্‌ছিল। রাজ কন্যা স্নান করতে চলে লে, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌ল যে সে ঐ পুকুরের ঘাটে গিয়ে নেমেছে, স্নান র্‌তে তার দেরী হবে। অমনি হতভাগী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ছে কি যে, 'বেশ হল. ন আমি হব রাজার মেয়ে, ওকে কর্‌ব ঝি!'

বলেই সে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজপুত্রের চোখের ছুঁচ গুলো খুলে দিয়েছে। দিতেই রাজপুত্র চোখ মেলে চেয়ে হেসে বল্ল, "আহা! আমায় বাঁচালে! তুমি কে?" হতভাগী বল্ল, "আমি অমুক দেশের রাজার মেয়ে।" রাজপুত্র তাতে যারপরনাই আশ্চর্য্য আর খুসী হয়ে বল্ল, "বটে? আমি শুনেছি সেই রাজকন্যাই আমাকে বাঁচাবে, আর আমার রাণী হবে। কিন্তু কৈ? আমার লোকজন ত আস্ছে না? আমি শুনেছিলাম যে সেই রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই আমার লোক জন সব ফিরে আস্বে। এক মুনি আমাকে শাপ দিয়ে এমনি করে রেখেছিল।"

এমন সময় রাজকন্যা স্নান করে ফিরে এল। তাকে দেখে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করল "ও কে?" ঝি বল্ল, "ও আমার ঝি!" রাজপুত্র মনে মনে ভাব্‌ল, "তাইত, ওকে দেখে ত ঝি বলে মনে হচ্ছে না? দেখ্‌লে মনে হয় যেন ওই রাজকন্যা, আর এটি ঝি।" কিন্তু রাজপুত্র কিনা জানে যে ঝিটাই তাকে বাঁচিয়েছে, সে আর কিছু বল্ল না।

ঝিটা কিন্তু তার আগেই রাজকন্যাকে ধমকিয়ে বলেছে যে, "এখানে কি দেখ্‌ছিস? ঝাঁটা খুঁজে নিয়ে ঘর ঝাঁট দেগে' যা।" রাজকন্যা তখন কপালে হাত দিয়ে, 'হায় ভগবান!' বলে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

যাহোক, এর মধ্যে আর একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হয়েছে। রাজকন্যার সঙ্গে রাজ পুত্রের দেখা হতে মাত্রই কোত্থেকে মেলাই লোক জন ঝি চাকর ছেলে মেয়ে এসে বাড়ী ভরে গেল। তা দেখে রাজপুত্র ভাব্‌ল, "বড় ত মুস্কিল দেখ্‌ছি। এদের মধ্যে কোনটি রাজকন্যা? একজন ত আমাকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হবার সময় লোক জন আসেনি। আর এক জনের সঙ্গে দেখা হতে না হতেই লোকজন এল, কিন্তু সে ত আমাকে বাঁচায় নি। আমি ভাল করে না দেখে কাউকে রাণী করব না।"

খাবার সময় ঝিটা পা ছড়িয়ে বসে, মুঠো ভরে ভরে খালি ভাত ঠেসে মুখে দিচ্ছে। রাজকন্যা ভাত খেতেই চাচ্ছেনা, সে খালি কাঁদ্‌ছে। ঝির খাওয়া দেখে সকলে ভাব্‌ল "ওমা! এটা আবার কি রকম রাজকন্যা!"

এমনি করে দুদিন গেল। তার পর দিন রাজকন্যাকে খুঁজ্‌তে তার দেশ থেকে লোক এসে উপস্থিত। রাজা যখন শুনেছেন যে রাজকন্যা পালিয়ে গেছে সেই থেকে আর তিনি খানওনি, বিছানা থেকেও উঠেনওনি। বাড়ীর সকল লোক রাজকন্যার জন্য কেঁদে অস্থির হয়েছে আর দেশ বিদেশে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

তখন ত আর কারুর কিছু জানতে বাকি রইল না। রাজপুত্র ও বুঝতে পারলেন,

রাবণ কৈলাস পর্ব্বত তুলিতেছে ।

U. RAY & SONS

রাজকন্যা আর কে ঝি, আর কেই বা তাঁকে বাঁচিয়েছে। তখনি সেই হতভাগী ...র মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, তাকে দেশের বার করে দেওয়া হল।

তার পর রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হল। সেই বিয়েতে তার বাপ এলেন, ...ীয় স্বজন সকলেই এলেন, নূতন রাণীও লাজে আধ মরা হয়ে, মাথা হেট করে এলেন। ...র যে আনন্দ হল! আর ঘটা, আর গান বাজনা, আর ভোজ। সে ভোজ যদি ...নো শেষ না হয়ে থাকে, আর তোমরা খুব ছুটে যেতে পার, তবে হয় ত তোমাদের ও ...ছু খেতে দিবে। খুব ছুটতে হবে কিন্তু!

কুমীরের গল্প।

খবরের কাগজে একটা নূতন রকমের কুমীরের গল্প পড়েছি। চারটি সাহেব যুটে ...জন পথ দেখাবার লোক সঙ্গে নিয়ে নৌকায় চড়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। মাছ ...বার আগেই একটা কুমীরের ছানা এসে একজন সাহেবের বঁড়সী গিলে বসল। সাহেব ...ত ব্যস্ত হয়ে সেটাকে নিয়ে ভারী টানাটানি কর্‌ছেন, এমন সময় তার মাটা হাঁ করে ...ট তাঁকে ধর্‌তে এল। তখন হুড়োহুড়িতে ছোট্ট নৌকাখানা গেল উল্টে, আর সাহেব ...য়ে পড়্‌লেন সেই কুমীরের ঘাড়ে,—ঠিক যেন ঘোড়ায় চড়েছেন, এমনি ভাবে। পথ ...খাবার লোকটিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়ে গেল্ল। ভাগ্যিস আর একজন সাহেব তাড়া-...ড়ি নৌকার বৈঠাখানা নিয়ে প্রাণপণে কুমীরের নাকে ঠুকে সেটার ভ্যাবাচাকা লাগিয়ে ...লেন, আর সেই ফাঁকে ডুবসাঁতার দিয়ে ওঁরা দুজন গিয়ে তাড়াতাড়ি ডাঙ্গায় উঠলেন, ...লে সে দিন আর উপায়ই ছিল না। এই ঘটনাটি সে দিন আমেরিকায় ঘটেছিল।

সুন্দর বনের কাছে দুটি ভাই জাল নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছেন, এমন সময় একটা ...ীর এসে হাঁ করে বড় ভাইটির পায় ধরে ফেল্ল। তখন ছোট ভাইটি ভারী বুদ্ধি করে ...ড়াতাড়ি জালটাকে পুঁটুলী পাকিয়ে কুমীরের হাঁর ভিতরে এমনি করে ঠেসে দিল যে, ...র সে বেটা মুখ বন্ধ কর্‌তে পারে না। সেই ফাঁকে বড় ভাইও তার পা বার করে ...য়েছে। তার পর দু ভাই দুই কাঠ নিয়ে, কুমীর মশাইয়ের মাথায় ঘটাঘট, দমাদম, ... পারে মার্‌তে লাগ্‌ল। কুমীরের মুখ ভরা জালের পুঁটুলী; তিনি হাঁস্‌তেও পার্‌ছেন ... কাঁদতেও পারছেন না, শুধু হাঁ করে আছেন। দুই ষণ্ডার ঠ্যাঙ্গানির চোটে সেই হাঁর ...তর দিয়ে তাঁর প্রাণটি বেরিয়ে গেল!

একটা পুস্তকে এক মজার রকমের কুমীর শীকারের কথা পড়েছি। এটা আমেরিকা দেশের গল্প, কিন্তু সত্য কি না বল্‌তে পারি না। দশ বারো জন লো

মিলে খুব লম্বা আর মোটা একটা বাঁশ নিয়ে কুমীর মার্‌তে যায়, তা ছাড়া লাঠি মুগু এসবও তাদের সঙ্গে যথেষ্ট থাকে। কুমীর দেখ্‌তে পেলে তারা নানামতে তাকে চটা চেষ্টা করে। তারা চায় যে সে বেটা চটে হাঁ করে তাদের গিল্‌তে আসুক। সে অব কুমীরের মেজাজ বুঝে; কোনটা হাঁ করে আসেও, কোনটা আবার ছুটেও পালায় হাঁ করে এলেই কিন্তু শীকারের মজাটা বেশ জমাট রকমের হয়। তখন তারা সবাই মি সেই লম্বা বাঁশটাকে নিয়ে "হেইয়োঁ হো !!" বলে একেবারে কুমীরের গলায় ঢুকি দেয়। কুমীরের হাঁ কি বিষম হাঁ, তা ত দেখেইছ। সেই হাঁকে গুটিয়ে আনতে আন বাঁশ ততক্ষণে একেবারে পেটের ভিতরে ঢুকে যায়। তখন আর কুমীরের বাছার নড়বা চড়বার যো থাকে না, আর তাঁকে ঠেঙ্গিয়ে শেষ করতেও মুস্কিল লাগে না।

বোকা তাঁতি।

এক ছিল তাঁতি। সে যেম্নি বোকা তেম্নি কুঁড়ে, তাই তার স্ত্রী রোজ নিজে বাজার ক'রে ত। এক দিন স্ত্রীর বড় অসুখ হ'ল তাই সে তাঁতিকে বল্‌ল, "আজ তুমি বাজার ক'রে ন।" তখন তাঁতি ছাতা মাথায় দিয়ে বাজার কর্‌তে চল্‌ল। যাবার সময় তার স্ত্রী ছাতার ায় পয়সা বেঁধে দিল, আর ব'লে দিল, "খানিক দূরে গেলেই দেখ্‌বে এক জায়গায় খুব লমাল হ'চ্ছে, সেইটেই বাজার।" তাঁতি ত একটু খানি গিয়েই দেখে একটা গাছের ল মেলা পাখী ব'সেছে আর খুব কিচির মিচির কর্‌ছে। দেখেই সে বল্‌ল "এইত খুব ল মাল হ'চ্ছে—নিশ্চয়ই এইটে বাজার। এখন তবে পয়সা বার করি।" ঐযা! পয়সা ত তার আগায় বাঁধা রয়েছে! মাথার উপর ছাতা, তার উপরে পয়সা—পয়সা পাড়বে কেমন রে? হাত উঁচু কর্‌তে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটাও উঁচু হয়। তখন সে লাফ দিয়ে সাটা ধর্‌তে গেল; কিন্তু, একি! ছাতাটাও সঙ্গে সঙ্গে লাফায় কেন? তাঁতি মাথায় হাত য় ভাবতে বস্‌লো। এমন সময় সে হঠাৎ দেখ্‌তে পেল সাম্‌নে মই রয়েছে। অম্‌নি সে ড়াতাড়ি মইয়ের উপর চড়তে গেল। কিন্তু সে যতই উঁচুতে ওঠে ছাতাটাও সঙ্গে সঙ্গে ্‌তে থাকে! তখন তার স্ত্রীর উপর ভারি রাগ হ'ল, কেন সে এত উঁচুতে পয়সা বেঁধে যে মই দিয়েও পাড়া যায় না?

তখন সে বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীকে বল্‌ল, "বাজারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কি রকম ? এত উঁচুতে পয়সা বেঁধে দিয়েছ যে, মই লাগিয়েও পাড়া গেল না।" তখন তার মাথা থেকে ছাতা নামিয়ে পয়সা গুলো তার হাতে দিল—আর তাকে খুব করে বকে । তাঁতি পয়সা নিয়ে আবার সেই গাছের তলায় বাজার কর্‌তে গেল।

গাছের উপরে বাজার বসেছে কিনা, কাজেই সে গাছে চড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে উপরে পৌঁছাতেই পাখী গুলো সব ভয়ে উড়ে পালাল। তখন সে ভাবল, "ঐযা বাজার ভেঙ্গে ল।" উঠতে উঠতে বেচারার বড় পরিশ্রম হয়েছে তাই সে ভাবতে লাগ্‌ল এখন কি রি? নাম্‌তে গেলে অনেক সময় লাগে তাছাড়া হাঙ্গাম আর পরিশ্রমও খুব। লাফিয়ে ড়লে কতকটা সহজ, কিন্তু—মাটি যে অনেক নীচে।" বেচারা আর কিছু ঠিক করতে না রে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে রইল আর ভাবতে লাগলে "তাইত, কি করি?" ন সময় কতগুলো লোক রাজবাড়ীর হাতীতে চ'ড়ে তলা দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁতি তাদের খে বল্‌ল, "ভাই, আমাকে নামিয়ে দাও না।" তাই শুনে একজন লোক তাঁতির পা ধরে তে গেল। কিন্তু তাঁতি গাছের ডাল শক্ত করে ধরে আছে কিছুতেই ছাড়ে না—কাজেই

লাভের মধ্যে হ'ল এই, হাতীটা চলে গেল আর সেই লোকটা তাঁতির ঠ্যাং ধরে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। এমনি ক'রে সকাল কেটে গেল, দুপুরে রোদে তাদের মাথা গরম হয়ে উঠ্‌ল। তাঁতি জিজ্ঞাসা কর্‌ল "ভাই তুমি কি কাজ কর?" সেই লোকটা বল্‌ল, "আমি রাজবাড়ীতে গান করি।" তাঁতি বল্‌ল, "একটা গান কর না।" অমনি রাজবাড়ীর গাইয়ে 'তানানা তাইরে তানা' করে সুর ধর্‌ল। তাঁতি তাতে মহা উৎসাহে যেই ধাঁই করে হাঁটুর উপর তাল ঠুক্‌তে গিয়েছে অমনি হাত ছাড়া মাত্র দুজনে গাছের থেকে পড়ে মাথায় আর মাটিতে এম্‌নি তাল ঠুকে গেল যে তাইরে নারে ছেড়ে তারা বাপরে মারে কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী ফিরে গেল।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য।

সূর্য্যের সাজা।

সূর্য্যটা ভারী দুষ্টু! গরম এনে দেখ আমাদের কি কষ্ট দেয়। ওকে জব্দ করার কোন রকম ক্ষমতা যদি আমার থাকত, তবে আমি কখনো ওকে ছাড়তাম না! কেউ কখনো ওকে জব্দ করেছে, এমন কথা শুনলে আমার বেশ লাগে। এমন কয়েক জন লোকের খবর আমি পেয়েছি, তাদের কথা শুনলে হয়ত তোমরা ও খুসী হবে।

জব্দ করার মত জব্দ করেছিল দুজন লোক। তার একজন হচ্ছে হনূমান, আরেক জন মাউই। হনূমান গিয়েছিল গন্ধমাদন পর্ব্বত থেকে লক্ষ্মণের জন্যে ওষুদ আনতে। রাবণ শক্তিশেল মেরে লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করে ফেলেছে, রাত্রের মধ্যে ওষুদ নিয়ে ফেরা চাই, সূর্য্য উঠলেই লক্ষ্মণ মরে যাবেন। হনূমান তাই প্রাণপণে ওষুদ খুঁজছে, আর ভাবছে, ভোর হওয়ার ঢের আগেই ওষুদ নিয়ে পৌঁছে যাবে।

এ দিকে রাবণ ভাবছে কিছুতে রাত্রের ভিতরে হনূকে ওষুদ নিয়ে ফিরতে দিবে না। তখন রাত দুপুর হবে। সে সূর্য্যকে ডেকে হুকুম দিল, এখনি গিয়ে আকাশে উদয় হও। সূর্য্য মহাশয় রাবণের ভয়ে বড়ই জড় সড় থাকতেন। সে একবার এই বড় গদা নিয়ে তাকে ঠেঙ্গাতে গিয়েছিল, তখন আগে ভাগেই হার মেনে তার রাগ থামিয়ে ছিলেন, সে কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। কাজেই হুকুম পাওয়া মাত্র, প্রাণের ভয়ে ব্যস্ত হয়ে সেই দুপুর রাত্রেই তিনি আকাশে উদয় হতে গেলেন।

হনূ ওষুদ খুঁজছিল, এমন সময় দেখ্‌ল যে সূর্য্য ঠাকুরের গোল মুখখানি পাহাড়ের

াড়াল থেকে উঁকি মারছে। হনূ তাতে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "সে কি ঠাকুর? ত রাত্রে আপনি আজ কোথায় চলেছেন?" সূর্য্য বল্লেন, "আমি উদয় হতে যাচ্ছি!" নূ যোড় হাতে তাঁকে মিনতি করে বল্ল, "ঠাকুর গো! আপনার পায় পড়ি। এখনো র রাত আছে; আপনি এখনি উদয় হবেন না, তা হ'লে লক্ষ্মণ মরে যাবেন।" সূর্য্য াতে চটে বল্লেন, "সে হবে না বাপু! আমি এখনি উদয় হব!"

যেই এ কথা বলা, অমনি হনূ তাঁকে ধরে বগলে পূর্‌ল। তারপর ওষুদ নিয়ে লঙ্কায় ফিরে এসে সেই ওষুদে লক্ষ্মণকে ভাল হয়ে উঠে বসতে দেখে, তবে বগল থেকে াকে বার করল। ততক্ষণে ঢের বেলা হয়ে গিয়েছিল।

এখন মাউইর কথা বলি। মাউই ছিল একজন মাওরী (Maori)। এই জাতী নিউ-িলণ্ড দ্বীপে থাকে।

মাউই ভয়ঙ্কর যাতু জানত, আর তার যে দিদিমা ছিল, সে জান্‌ত আরো বেশী। ্সই বুড়ীর একেক খানা হাড়ের এমনি গুণ ছিল যে, তা দিয়ে যা খুসী তাই করা যেত। াই মাউই একদিন তাকে বল্ল, "দিদিমা, আমাকে একখানা হাড় দাও না!" অমনি বুড়ী িজের চোয়ালের একখানা হাড় খুলে মাউইকে দিয়ে দিল! মাউই সে হাড় পেয়ে কি ্খীই হল! সে জানত যে তা দিয়ে ঠুকলে পাহাড় ও গুঁড়ো হয়ে যাবে।

সেটা গ্রীষ্মকাল, আর তখনকার সূর্য্যটী ছিল বেজ্রায় গরম, আর ভারী চঞ্চল। সে ূর্ব্বদিকের এক কোণে উঁকি মেরেই অমনি বোঁ করে ছুটে আকাশ পার হয়ে যেত, আর ্টুকুর মধ্যেই সকলে গরমে পাগল হয়ে উঠত। এত গরমে কাজই বা কি করে করবে, াতে আবার দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে যায়, কাজ শেষই বা কেমন করে হবে?

মাউই বল্ল, "সূর্য্যটাকে একটু পোষ না মানাতে পারলে আর চলছে না।"

সকলে সে কথা শুনে হাসল, কিন্তু মাউই তাতে ভয় পেল না। সে তার ভাইদের িয়ে দিন রাত বসে খালি দড়ি পাকাতে লাগল। এমনি মোটা আর এমনি লম্বা দড়ি যে তমন আর কেউ কখনো দেখেনি; আর সেই দড়িতে মাউই এমনি মন্ত্র পড়ে দিল যে ূর্য্যের আগুনে আর তার কিছু হবে না।

তার পর সেই দড়ি নিয়ে তারা ক'ভাই মিলে পৃথিবীর কিনারার দিকে রওয়ানা হল। কল দেশ আর সকল সাগরের শেষে পৃথিবীর সেই কিনারা। সেই খানে রোজ ভোরের েলায় এসে সূর্য্য উঁকি মারে।

মাউই আর তার ভাইয়েরা দিনের বেলায় বনের ভিতরে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে

মাউই আর তার ভাইরা সূর্য্যকে বাঁধছে।

াকে। রাত্রে যখন সূর্য্য থাকে না, তখন তারা চলে। কাজেই সূর্য্য তাদের দেখতে ও পেল না, কিছু টেরও পেল না।

এমনি করে ত একদিন সূর্য্য উঠবার একটু আগে এসে তারা পৃথিবীর কিনারায় পৌঁছেছে। পৌঁছিয়েই মাউই তার ভাইদের বল্ল, "এইখান দিয়ে এসে সূর্য্য উঁকি ারবে, আর অমনি তোরা এই দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বেটাকে বাঁধবি। দেখিস, ছাড়িস া যেন!"

বলতে বলতেই সূর্য্য হাসতে হাসতে এসে সেইখান দিয়ে উঁকি মেরেছে। বেচারা কছু জানে না, সে খালি ভাবছে, এইবার বোঁ করে একটা ছুট দিবে। এমন সময়, সেই র্বনেশে দড়ি এসে হুড় মুড় করে তার মাথায় পড়ল আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাউইর ভাই-য়েরা ছুটে এসে তাকে এমনি বাঁধন বাঁধল যে কি বলব। তখন সূর্য্য ভয়ানক ছটফটিয়েছল, আর দাঁত খিঁচিয়ে ছিল আর চেঁচিয়েছিল বই কি! কিন্তু চ্যাচালে কি হবে? সেই ড়ি ও সে ছিঁড়তে পারল না, সেই গেরো ও সে খুলতে পারল না। ততক্ষণে মাউই এসে ার দিদিমার সেই চোয়াল দিয়ে তাকে মেরে একেবারে থেৎলো করে দিল। তার তেজ-ুলো ধোনা তুলোর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শেষে বেচারা কোঁকাতে কোঁকাতে বল্ল, "আর মারিসনে দাদা, ছেড়ে দে।"

মাউই কিন্তু তাকে ছাড়ল না। সে তার দড়ির মাথা সেইখানে পৃথিবীর কিনারার সঙ্গে ুব মজবুত করে বেঁধে রেখে দিল। এখনো সেই দড়িতে সূর্য্য বাঁধা আছে। মেঘলা দিনে কখন কখন সে দড়ি দেখতে পাওয়া যায়। লোকে বলে সে সব সূর্য্যের কিরণ, কিন্তু মাউই জানে, আসলে সেগুলো কি।

জমদগ্নি মুনি ও সূর্য্যকে একবার বেশ জব্দ করে ছিলেন। মুনি তীর ছুঁড়ছেন, তাঁর ব্রাহ্মণী রেণুকা সেই তীর কুড়িয়ে এনে দিচ্ছেন। এর মধ্যে সূর্য্যের তেজে রেণুকা কাহিল হয়ে পড়লেন, আর চলতে পারেন না। তা দেখে মুনি ভয়ানক রাগের ভরে ধনুক তুলে আর একটু হলেই সূর্য্যকে কাণা করে দিচ্ছিলেন আর কি। সূর্য্য প্রাণের ভয়ে বিষম ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি একটি ছাতা আর এক যোড়া জুতা নিয়ে এসে মুনিকে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষা। ার আগে আর কেউ ছাতা বা জুতা দেখেনি; মুনি সেগুলি দেখে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর সূর্য্য তাঁকে যখন বুঝিয়ে দিলেন যে ছাতা মাথায় দিলে আর জুতা পায় দিলে রোদের ভয় থাকে না, তখন তাঁর সকল রাগ থেমে গিয়ে মুখ হাসিতে ভরে গেল।

ফলের কবিতা।

কাঁচা ডাঁশা পাকা ফল না রেঁধে যা খাই,
এবং যাহা জন্মে দেশে, গণে নিও তাই।
অ-ফলন্ত অ অক্ষরে অতি অনশন,
অন্য অরণ্যেতে করি ফল অন্বেষণ।
আ-কারে আহারে আছে আনন্দ প্রচুর,
আসে কাশ্মীর হতে আখরোট্, আঙ্গুর;
আঁস্‌ফল, আমড়া ও আতা, আনারস,
আর আছে আম, যার নাম কি সরস!
ই থেকে ঔকার স্বরে নাহি কোন আশা,
পেতে ফল কাঁচা, পাকা কিংবা হোক্ ডাঁশা।
কাঁঠাল, কমলা, কলা এবং কাঁকুড়,
করম্‌চা, কামরাঙ্গা, কত্‌বেল, কুল;
কিস্‌মিস্ বলে লোকে, দ্রাক্ষা তার নাম;
কাজু নামে হয় খ্যাত হিজ্‌লি বাদাম:
খোবানি, খেজুর আর খরমুজা মিলে,
গাব খেতে গপ্ করে বিচি ফেলি গিলে।
ঘ-এর ঘরেতে ঘন্টা, মরি ঘেমে ঘুরে,
অঘটন ঘটে নাক চলে যাই দূরে।
চানা খাই কাঁচা তুলে, ছোলা যার নাম;
জ এ জাম, জামরুল, গোলাপাখ্য জাম।
ঝ-এ ঝাল, ট-এ টক্ কোন ফল নাই,
ট-এতে টেপারি শুধু, ঠ-এ ঠকে যাই।
ডরাই খাইতে বড় ডেহুয়া, ডেঁফল,
সুস্বাদু ডালিম ফল—দাড়িম্ব কেবল।
ডাব—সেত নারিকেল, জানা আছে বেশ,
ঢক্ করে' খেলে জল দূরে যায় ক্লেশ।

ভরমুণ্ড, তেঁতুল, তুঁত পাকা খাই তুলে,
কাঁচা বেলা তাল শাঁস, পাকা খাই গুলে।
থওধএ থোলো থোলো ফল নাহি ধরে,
দাড়িম্ব, দ্রাক্ষার কথা আছে অন্য ঘরে।
ন-এ নোড়, নারিকেল, নোনা, নেশপাতি,
নারাঙ্গ নেবু বা লেবু নেই খুঁজি পাতি।
পেস্তা, পেয়ারা, পীচ, পেঁপে ফল খাই;
পনস কাঁঠাল নামে বঙ্গদেশে খাই।
ফ এ ফুটি ফাটে মাঠে, ভ-এ মিছে খোঁজা,
বাদাম বাতাপি বেল বইঁচির বোঝা।
ম এতে মটর কাঁচা, মনক্কা কাশ্মিরী,
য-র-এ খুঁজিতে ফল মিছে ঘুরি ফিরি।
ল-এতে লকেট লিচু দেশী বলে মানি,
লকুচ সংস্কৃত নাম, কি ফল না জানি।
তিক্ত-লকুচ বঙ্গদেশে তেলাকুচ গুলি;
মানুষে না খায় কভু, খায় বুল বুলি।
শ-এ শসা, শপেটা, নাহি আর বেশী;
স-এ সেব্ আপেলের এই নাম দেশী।
ষ এ যত ষাঁড়া গাছি নাহি হয় ফল,
হত হলে হ'ত ভাল হয়রানি কেবল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কাগজ।

এমন সময় ছিল যখন মানুষ লিখিতে শিখিয়াছে, কিন্তু কাগজ বানাইতে শিখে নাই। কোন কোন দেশে তখন পাথরে খোদাই করিয়া লিখিবার রীতি ছিল। কেহবা নরম মাটিতে লিখিয়া সেই মাটি পরে পোড়াইয়া ইঁটের টালি বানাইয়া লইত। সেই ইঁটেতেই তাহাদের কাগজের কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু এইরূপ ইঁটের টালি নিয়া লেখাপড়া করা যে বিশেষ

অসুবিধার কথা তাহা সহজেই বুঝিতে পার। মনে কর কোন ছাত্র পাঠশালায় যাইতে অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন ঝুড়ি ইঁটের পুঁথি চলিল—আর লিখিবার জন্য এক কাদা। সামান্য কয়েকখানা চিঠি পাঠাইতে হইলেই প্রাণান্ত পরিশ্রম—মাটি আনরে, আনরে, ঠাসিয়া কাদা কররে, চৌকস্ কররে, টালি বানাওরে, তবে তাহাতে অক্ষর লেখ পোড়াওরে, ঠাণ্ডা কররে, মুটে ডাকরে—হাঙ্গামের আর অন্ত নাই।

ইহার চাইতে আমাদের দেশে যে গাছের পাতায় লেখার রীতি অনেকদিন চল আসিয়াছে সেটা অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক। ৬০০০ বৎসর আগে ইজিপ্তে 'পেপীরা গাছের কচি ছাল পিটিয়া থ্যাৎলাইয়া কাগজের মত একরকম জিনিষ তৈয়ার করিত। পেপীরাস্ কথা হইতেই ইংরাজি পেপার (paper) শব্দটা আসিয়াছে। কিন্তু এই পে রাস্ জিনিসটাকেও ঠিক কাগজ বলা যায় না। কাগজ তৈয়ারীর উপায় প্রথম বাহির হই ছিল চীনদেশে; কিন্তু চীনারা এই বিদ্যা আর কাহাকেও শিখাইত না। প্রায় বার শত বৎ হইল কতকগুলি চীনা কারিকর আরবীদের সঙ্গে যুদ্ধে ধরা পড়ে। তাহাদের কাছে আ বের কারিকরেরা কাগজ বানাইতে শিখিয়া লইল, এবং সেই সময় হইতেই এই বিদ্যা চা দিকে ছড়াইয়া পড়ে। আরব হইতে ইজিপ্ত, ইজিপ্ত হইতে আফ্রিকার অন্যান্য জায় হয়।

তারপর স্পেন, জার্ম্মানি, ইংলণ্ডে সকল জায়গায়ই ক্রমে ক্রমে কাগজের কারখ দেখা দিল। সে সময়ে ছেঁড়া নেকড়া দিয়া সমস্ত কাগজ তৈয়ারি হইত এবং সেটা আ গোড়াই হাতে হইত। পরিস্কার নেকড়াকে ভিজাইয়া একটা দাঁতাল জিনিষ দিয়া ঠে হইত; তাহাতে নেকড়াটা ছিঁড়িয়া সুতার আঁশের মত টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইত। তাহা জল মিশাইয়া আরও অনেকক্ষণ পিটিলে কতকটা পাৎলা মণ্ডের মত একটা জিনিষ হ এই নেকড়ার মণ্ডকে চাল্‌নিতে চালিয়া নানারকমে ছাঁকিয়া ঝাঁকাইয়া, লুচির মত বেলি তবে কাগজ তৈয়ারি হইত। সে সময়ে লোক কাগজটাকে খুব একটা সৌখীন জিনিষ ব য়াই মনে করিল, কিন্তু ক্রমে কাগজের দাম কমিয়া আসিল, কাগজ বানাইবার নানার কল বাহির হইল আর কাগজের কাট্‌তি এত বাড়িয়া গেল যে কাগজওয়ালারা দেখিল এ ছেঁড়া নেকড়াই জোগাড় করা সম্ভব নয়। তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল, আর জিনিষ হইতে কাগজ করা যাইতে পারে। প্রথমত স্পেন দেশের এস্পার্টো ঘাসে কাগজ হইত, তার পর ক্রমে দেখা গেল তাহাতেও কুলায় না। সেই হইতে কাগজ বা ইবার জন্য কত জিনিষ লইয়া যে পরীক্ষা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আঁখের ছিব

র খোসা, পাট, খড়, ঘাস, বাঁশ, কাঠ—সুতার মত আঁশওয়ালা, আখের মত ছিবড়াওয়ালা রকম জিনিষ আছে তার কোনটিই বাকী নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে কাঠ াটো ঘাস আর পুরাতন নেক্‌ড়া ও কাগজ হইতেই আজকাল কাগজ প্রস্তুত হয়।

বোল্‌তা যে চাক বানায় তাহার মধ্যে একটা জিনিষ থাকে সেটা ঠিক কাগজের মত; তারা গাছের শাঁস খায় এবং সেই শাঁসকে চিবাইয়া হজম করিয়া এই কাগজ বাহির করে। আজকাল কাগজের কলেও সেইরূপে কাঠ ঘাস প্রভৃতি জিনিষ হইতে নানা-রকম কাগজ তৈয়ারি হয়। অবশ্য কাগজ ওয়ালাদের ঐ সব জিনিষ বোল্‌তার মত চিবাইতে হয় না; এ সব কাজই কলে হয়।

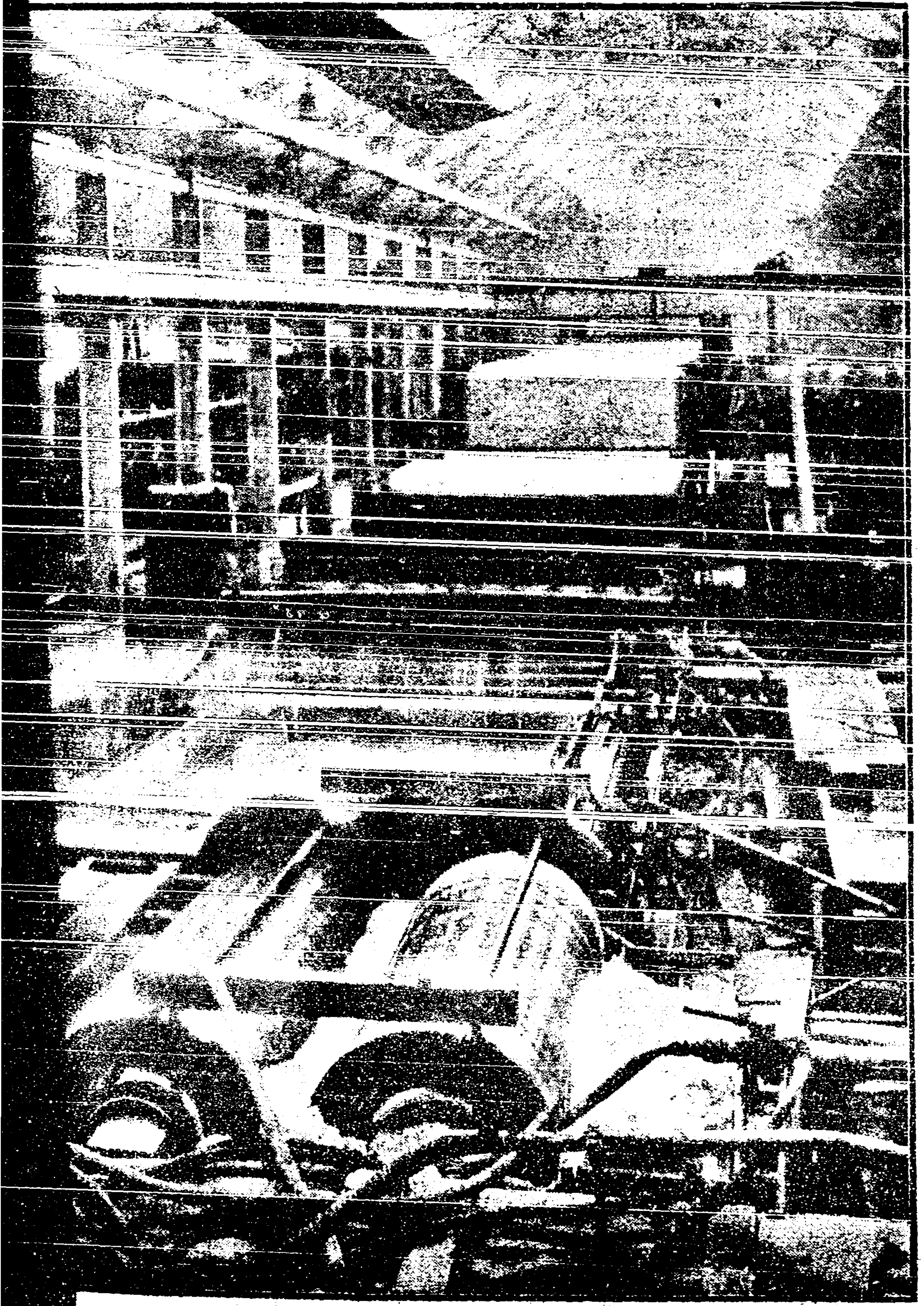

যে কাঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয় সেই কাঠ আসে আমেরিকা ও নরওয়ের জঙ্গল হইতে। জঙ্গলওয়ালারা বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া কলের মুখে ফেলিয়া দেয়—আর কলের আর এক মাথায় কাঠ কুচি হইয়া বাহির হয়। সেই কুচিকে গুঁড়াইয়া, সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিতে হয় তারপর সেই ক্ষীরের মত াঠকে চাপ দিয়া পাৎলা পাৎলা পাটালি বানান হয়—এবং সেই পাটালি কাগজওয়া-কাছে চালান দেওয়া হয়।

কাগজওয়ালারা এই পাটালিকে আবার জলে ঘুঁটিয়া মণ্ড তৈয়ারি করেন, সেই মণ্ড সিদ্ধ করিয়া ঝোলের মত করেন। এই ঝোল লোহার নলে করিয়া কাগজের কলের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। কল একদিকে কাঠ ঘাস বা নেকড়ার ঝোল খাইতে থাকে আর অন্য দিকে ৪।৫ মাইল লম্বা কাগজের খান বাহির করিতে থাকে। আগের পৃষ্ঠায় যে কলের ছবি দেওয়া হইল এই কলে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৭ মণ কাগজ তৈয়ারি হয় সমস্ত দিন রাত কল চলিলে বারো হাত চওড়া আড়াই মাইল লম্বা একখানা কাগজের থান বাহির হয়। ছবির গোড়াতেই দেখ তুলার মত মণ্ড প্রস্তুত হইতেছে। তাহার পরেই গরম জলের চৌবাচ্চা তার মধ্যে সেই মণ্ড গুলিয়া ঝোল তৈয়ারি হয়।

ঝোলটা যখন কলের মধ্যে চালান হয় তখন সেটা একটা লম্বা চলন্ত ছাক্‌নির উপর পড়ে। ছাক্‌নিটা চলিতে থাকে আর মাঝে মাঝে কেমন একটা ঝাঁকানি দেয়, তাহাতে জল ঝরিয়া যায় এবং ঝোল ক্রমে চাপ বাঁধিয়া আসে। এমনি ভাবে চলিতে চলিতে ঝোল কলের আবেক মাথায় আসিয়া পড়ে—সেখানে লুচি বেলিবার বেলুনের মত অনেক 'রোলার' খাটান থাকে। ছাঁক্‌নিটা এইখানে আসিয়া ঝোলটাকে একটা রোলারের গায়ে ছিটকাইয়া দেয়। কিন্তু সে ঝোল আর এখন ঝোল নাই; এখন তাহার চেহারা অনেকটা ভিজা ব্লটিং কাগজের মত। এতক্ষণে তাহাকে ঠিক কাগজ বলা চলে।

রোলারের গায়ে কাগজ লাগিবা মাত্র রোলার তাহাকে টানিতে থাকে। তার পর সেই টানে কাগজ ও অনেকগুলি রোলারের মধ্যে ঘোর পাক খাইতে থাকে। এমনি করিয়া

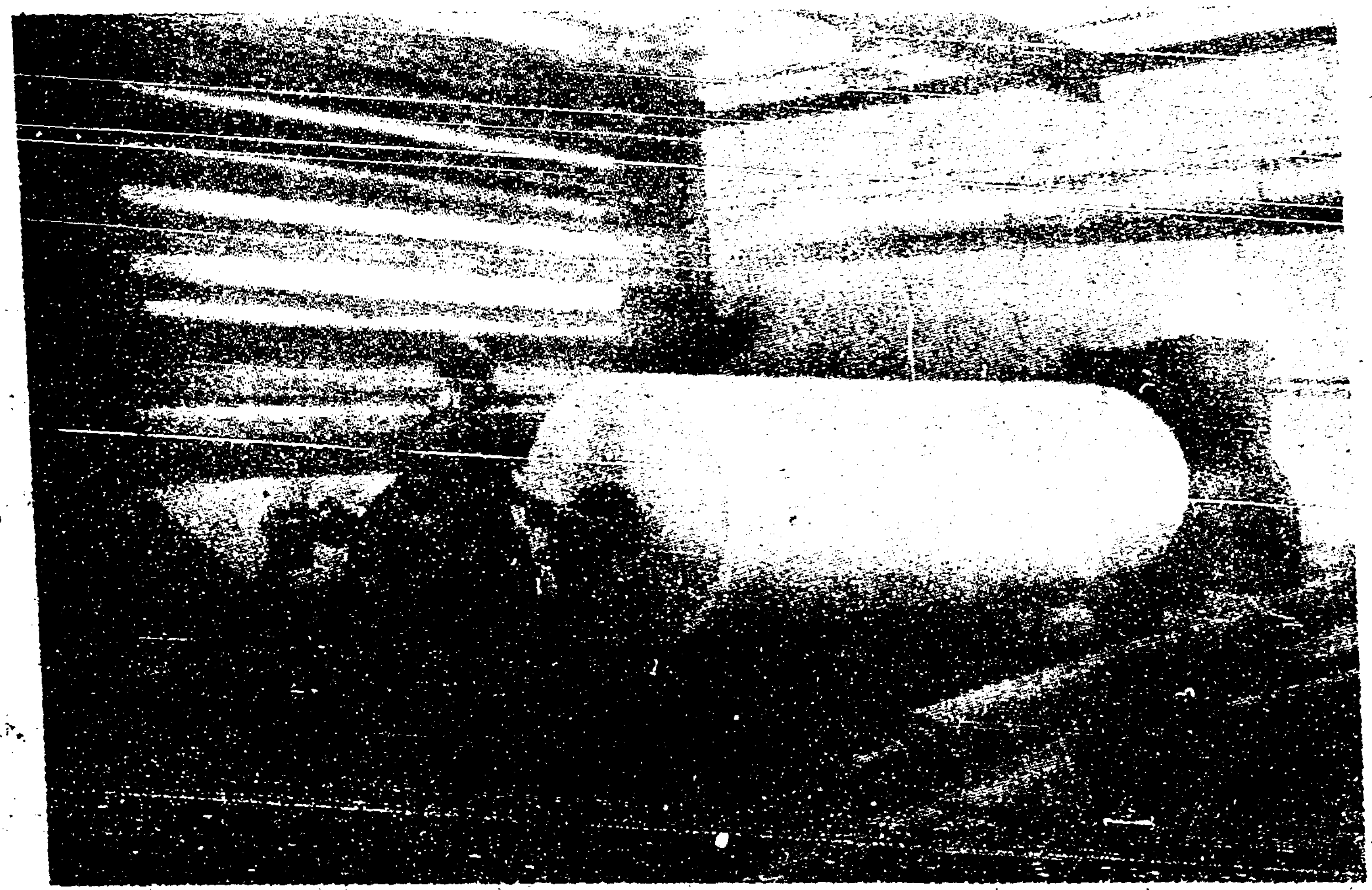

কাগজকে ক্রমাগত চাপি[illegible] হয়, লুচির মত বেলিতে [illegible] ঘষিতে ও পালিশ ক[illegible] হয়, তাহাতেই কাগজ [illegible] পাৎলাও মোলায়েম [illegible] আসে। সন্দেশ যে কা[illegible] ছাপা হয় সেই কাগ[illegible] এই রকম অন্তত [illegible] ত্রিশটা রোলারের মধ্য[illegible] আসিতে হইয়াছে তবে তাহার চেহারা খুলিয়াছে।

অবশ্য এই সমস্ত কাজই কলে আপনা আপনি হইতে থাকে। দু একজন লোক থাকে তারা কেবল দেখে সমস্ত কল ঠিকমতে চলিতেছে কিনা। চব্বিশ ঘণ্টা সমান হিসাবে কাজ চলে; কলের এক মাথায় অনবরত ঝোল আসিয়া পড়িতেছে—সেই ঝোল শুদ্ধ ছাঁকনি কেবলই ছুটিতেছে, ছাঁক্নি হইতে জমাটবাঁধা কাগজ ক্রমাগতই রোলারের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে; রোলারের ও বিশ্রাম নাই, সেও কাগজ টানিতেছে আর ঠেলিয়া বাহির করিতেছে।

ছবিতে দেখ একটা লাটাইয়ের মত রোলারের গায়ে কেমন করিয়া কাগজ জড়াইয়া রাখা হয়। দুইচার মাইল কাগজ জমিলেই এক একটা "লাটাই" ভরিয়া উঠে, তখন "লাটাই" বদ্‌লাইয়া আবার নূতন "লাটাই" বসাইয়া দিতে হয়।

বনের খবর।

আমরা হাতীর কাছ থেকে লুশাই বুড়োকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত রয়েছি, ততক্ষণে আমাদের বাকি লোক সব এসে পৌঁছিয়েছে। তারা ত বন্দুকের আওয়াজ শুনে ভারী ফুর্ত্তি করতে করতে আসছে যে, আজ খুব কষে হরিণের মাংস খাবে। এসেই সামনে পেয়েছে শ্যামলাল, গঙ্গারাম আর খাবার-ওয়ালা খালাসীকে আর তাদের মুখে ভাল করেই শুনেছে, ব্যাপারখানা কি রকম। তখন আর কারুর মুখে হাসি নাই। লুশাই দোভাষী একজন ছিল, সে আরো কয়েকজন কুলীকে নিয়ে দেখতে গেল, হাতীটা কি করছে; দু চার জন খালাসীও তাদের সঙ্গে গেল।

খানিক দূর গিয়েই তারা চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছে! তার পরেই দোভাষী আর দুই জন লুশাই ছুটে এসে বল্ল, "চল! হাতীটা যেন কুড়ঙ্গের ভিতর পড়ে আছে। আমরা খাই হাতীর মাংস!" আমি কিন্তু কিছুতেই তাতে রাজী হলাম না; বল্লাম, "বিপদ কেটে গেছে, লোকটার প্রাণ বেঁচেছে, এই ঢের; আর হাতীর মাংস খেয়ে কাজ নেই।"

তখন তারা বন্দুকটা চাইল। তাও দিলাম না দেখে শুধু দা কুড়ল নিয়েই গেল। তার পর তারা কুড়ঙ্গের দিকে খানিক দূর নেমে গিয়েছে, অমনি আবার চ্যাঁচামেচি, আর তার পরেই আবার তারা ছুটে এসে হাজির। বলে, "শীগ্‌গির এসো! শীগ্‌গির এসো! হাতীর বাচ্ছা!"

ছোট্ট একটা বাচ্ছা, যেখান দিয়ে হাতীটা কুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে নেমেছে, সেইখান দিয়ে নামছে। ঐ হাতীটারই বাচ্ছা (হাতীটা কুনকী ছিল)। বাচ্ছাটার এক পায় চোট টোট লেগে থাকবে, তাই খোঁড়াচ্ছে। দোভাষী দৌড়ে গিয়ে তার শুঁড় ধরেছিল, আর ব্যস্ত হয়ে আর সকলকেও ধরবার জন্য ডাকছিল, কিন্তু কারু যেতে ভরসা হয়নি। বাচ্ছা হলে কি হবে? হাজার হোক, হাতীর ত

বাচ্ছা! সে টিপ টাপ খানি দোভাষীকে ঢুঁ মারতে লাগল—আর তার ঐ ছোট্ট ছোট্ট পায় লাথি। দোভাষী তাতে থতমত খেয়ে ছুটে এসেছে, খবর দিতে।

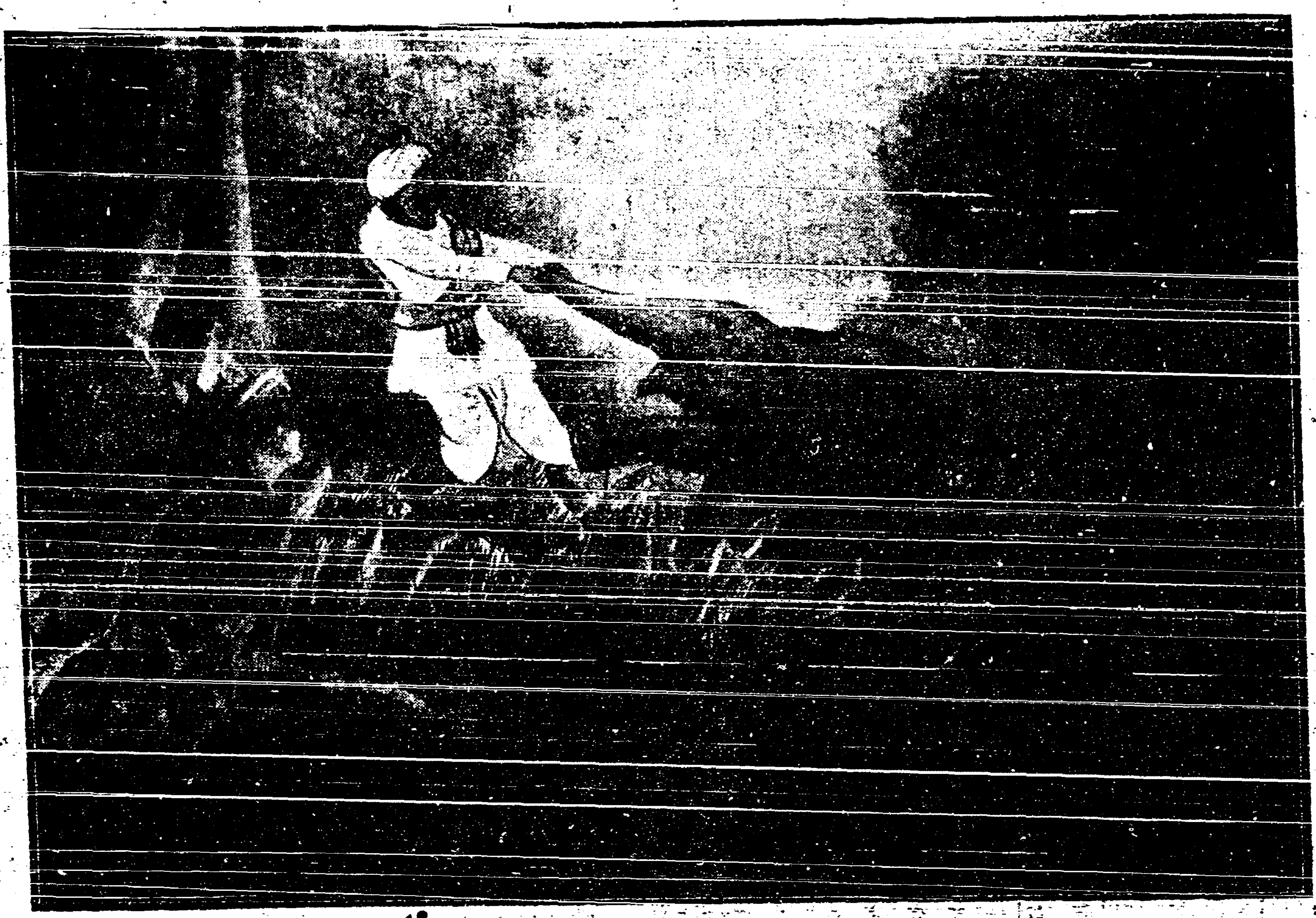

ঐ বাচ্ছাটির খাতিরেই তার মা লুশাই বুড়োকে মারতে গিয়েছিল। সন্তানের মায়া!—বাচ্ছাটি চলতে পারেনি বলে সে তাকে নিয়ে দলের পিছনে পড়ে যায়। তার পর বুড়ো গিয়ে হঠাৎ তার সামনে পড়তেই বোধ হয় বেচারীর মনে হল যে, "ঐ! হতভাগা বুঝি তবে আমার বাচ্ছাকে ধরে নিতে এসেছে!"

হাতী বড় বেখাপ্পা জানোয়ার! এর সম্বন্ধে একটা কথা বলছি শুন।

একটা পাহাড়ের উপর কোন গ্রাম নাই। একজন সাহেব সেখানে জরীপের কাজ করতে গিয়েছিলেন। উঁচু পাহাড়, পথ নাই, আবার বেজায় জঙ্গল। পাহাড়ে হাতীর ভয়ও খুব আছে।

সকালে উঠে সাহেব একজন আমিনের কাজ দেখতে বেরিয়েছেন, লোকজনদের বলে গিয়েছেন যে পাহাড়ের সকলের চেয়ে উঁচু চূড়াটার ঠিক নীচেই যেন তাবু লাগায়। পথ নাই, তাই হাতীর পথ ধরে লোকজনেরা খচ্চরে করে সাহেবের জিনিস পত্র নিয়ে উপরে উঠল। বিকালে সেই চূড়াটার নীচে পৌছিয়ে তারা দেখল যে সেখানে বেশ জল আছে, তাই তারা সেইখানে তাবু ফেল্ল।

এ দিকে সাহেব কাজে বেরিয়েছেন। তিনিও সেই জায়গায় আসবেন, তবে, তাঁকে বন জঙ্গল ঘুরে আমিনদের কাজ দেখতে দেখতে আসতে হবে। সে দিন কিন্তু সাহেবের তাঁবুতে পৌঁছান হইল না, বনের ভিতর ঘুরে ঘুরে তার আগেই রাত হয়ে গেল। অন্ধকারে চলতে না পেরে সাহেব আর তার সঙ্গের লোকেরা পাহাড়ের উপরেই এক জায়গায় গাছের নীচে ধুনী জ্বেলে শুয়ে রইলেন, ভাবলেন, সকালে উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাবে।

এ দিকে তাঁবুতে সকলে পথ চেয়ে আছে, কখন সাহেব আসবেন; কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা নাই। ডাকাডাকি করে করে বেচারাদের গলা ভেঙ্গে গেল, কিন্তু সাহেব ঢের দূরে, সে ডাক শুনতে পেলেন না। শেষে তারা সাহেবের আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে রইল।

অনেক রাত্রে খচ্চরগুলোর ছুটোপুটিতে তাদের ঘুম ভেঙ্গেছে। তারা ভাবল, ব্যাপারখানা কি? ...ল, যেই তাদের একজন খালাসী তাঁবুর দরজা একটু ফাঁক করে গলা বার করেছে, অমনি দেখে যে, ...বারে! এয়া বড় দাঁতওয়ালা হাতী, তার পিছনে আরো হাতী। সে আস্তে আস্তে সকলকে সাবধান করে দিয়ে সেই তাঁবুর পিছনের দিক দিয়ে বেরুতে যাবে, অমনি হাতীটাও তাঁবুর উপর এসে পড়েছে। তখন সকলে গড়িয়ে খাদের ভিতরে ঢুকে কোন মতে প্রাণ বাঁচাল, আর হাতীগুলো সেই রাস্তায় রাস্তায় চলে গেল। তাঁবু টাবু যা কিছু তাদের সামনে পড়েছিল, সব তারা শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল। খচ্চরগুলো সেই রাস্তার উপরেই বাঁধা ছিল, তারা সকলেই দড়ি ছিঁড়ে পালাল; খালি একটা খচ্চর মজবুত নতুন রশি দিয়ে বাঁধা ছিল, সে বেচারা তা ছিঁড়তেও পারেনি, পালাতেও পারেনি। হাতীরা সেটাকে মাড়িয়ে একেবারে পিষে দিয়ে গেল। পরদিন সাহেব তাঁবুতে ফিরে ত অবাক!

বৈশাখের ধাঁধাঁর উত্তর।

এইরূপ তারে লাইন টানিতে হইবে :—

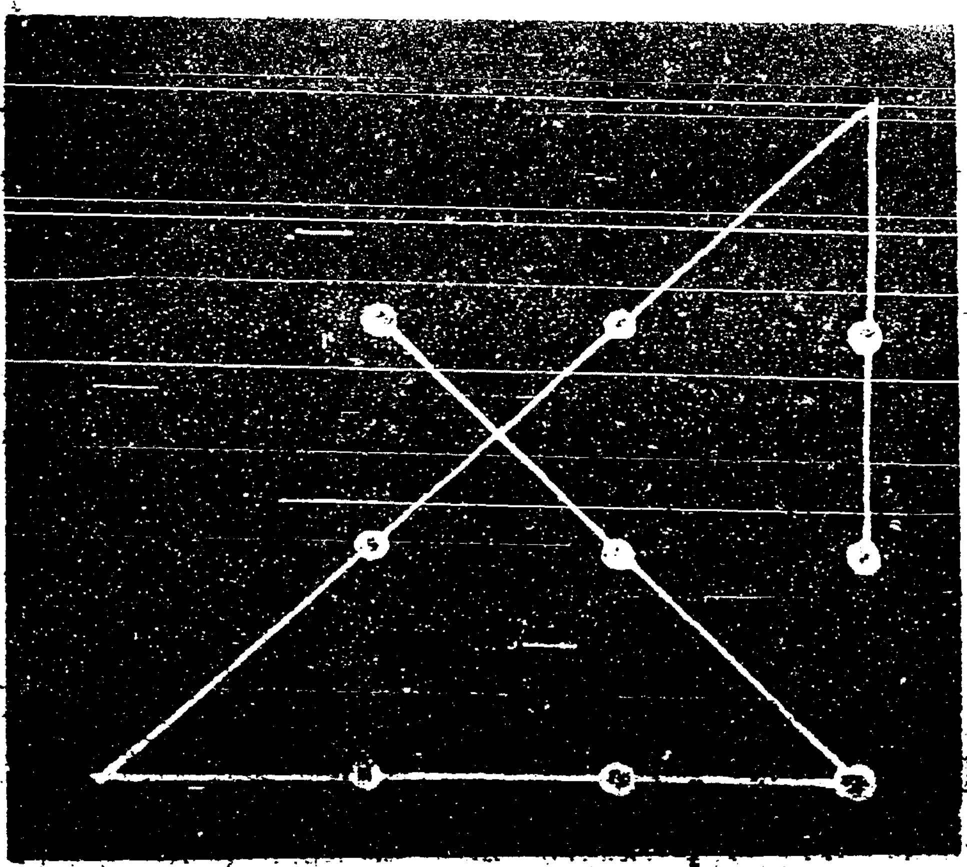

ঘরে মজা।

স্কুলে সাজা।

১৪২৮৫৭

এটা আবার কি? একলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশো সাতান্ন। এ আবার কিসের হিসাব? কিছু হিসাব নয়, একটা মজার অঙ্ক। এর মধ্যে আবার মজা কি হ'ল? আরে, শোনই না।

এটাকে দুই দিয়ে গুণ কর। কত হ'ল?— ২৮৫৭১৪। আচ্ছা তিন দিয়ে গুণ করত?

কত হ'ল?—৪২৮৫৭১

চার দিয়ে গুণ কর্‌লে—৫৭১৪২৮

পাঁচ দিয়ে গুণ কর্‌লে—৭১৪২৮৫

ছয় দিয়ে গুণ কর্‌লে—৮৫৭১৪২।

'মজা' টা যে কি তা আর তোমাদের বুঝতে বাকী নেই নিশ্চয়ই। ওই কটা অঙ্কই যে উল্‌টে পাল্‌টে বস্‌ছে তা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। আচ্ছা এবার সাত দিয়ে গুণ করত। একি হ'ল? ——৯৯৯৯৯৯

একটা কাগজে লেখা ছিল "ষড়্‌ত্রিংশাধিকাষ্টাদশ শততম"। এক ভদ্রলোক এটা পড়তে গিয়ে পাঁচবার ঠেকেছিলেন। শেষটায় অনেক কষ্টে "ষড়—ত্রিংশা—ধিক—অষ্টাদশ— শততম" —এম্নি করে পড়্‌লেন। তোমরা ধাঁ ক'রে চট্‌ পট্‌ পড়ে ফেলত, দেখি কে কেমন বাহাদুর!

কে কেমন পরিস্কার উচ্চারণ কর্‌তে পার তা পরীক্ষা কর্‌তে হ'লে নীচের কথা গুলোর যে কোনটা খুব তাড়াতাড়ি ব'লে দে'তে পারঃ—

কাঁচা ডাব পাকা গাব।

কাটা কাঁচ কাঁচা কাঠ।

[illegible]

যো হুকুম ! (৮৪ পৃষ্ঠা)

U. RAY & SONS, Calcutta

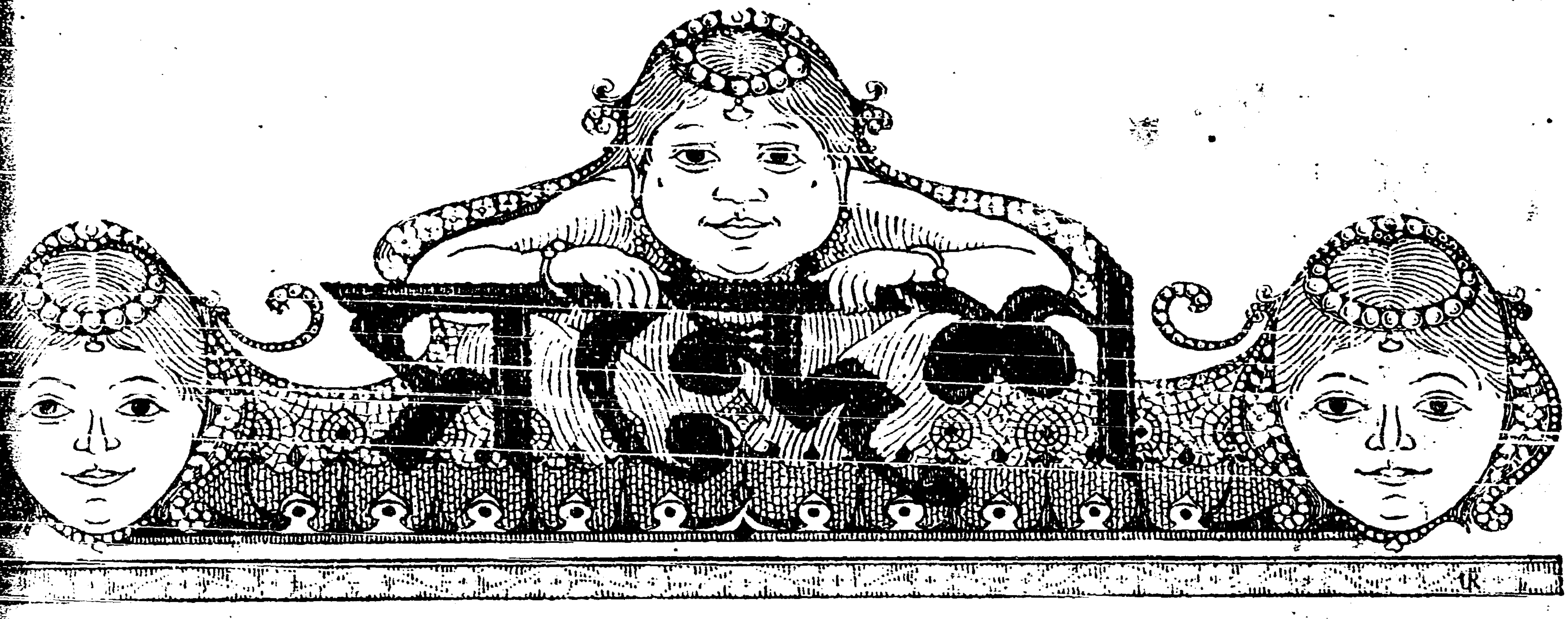

ীয় বর্ষ　　আষাঢ়, ১৩২১　　তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ়ে ছড়া।

এ বুঝি আষাঢ় মাস,
তাই ছুটে চারি পাশ
শুধু করে হাঁসফাঁস
　　পূবের বাতাস।
কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেট ফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
　　জুড়িয়ে আকাশ॥
হাতির মতন ধড়,
নাহি তাহে নড় চড়,
নাক ডাকে ঘড় ঘড়,
　　চারিদিক ছেয়ে।
এত হল অন্ধকার,
দিবারাত্রি একাকার,
পাখী সব চিৎকার
　　করে ভয় খেয়ে॥

দু'হাত না চলে দৃষ্টি,
ধুয়ে পুঁছে সব সৃষ্টি
অবিশ্রাম ঝরে বৃষ্টি
　　ঝর ঝর ঝরে।
দেখে ভয়ে কাঁপে বুক,
আকাশ ভেঙচায় মুখ,
বিদ্যুতের সবটুক্
　　জিভ্ বার করে'॥
চিল খায় ঘুরপাক,
ডালে বসে' কাঁপে কাক্,
আকাশেতে বাজে ঢাক
　　ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।
সারস মেলিয়া পাখা
নাচে হয়ে আঁকাবাঁকা,
ময়ূর ধরেছে কেকা,
　　গায় কোলা ব্যাঙ॥

হাঁস, রাজ আর পাতি,
খালে বিলে সার গাঁথি,
ফুলিয়ে বুকের ছাতি,
হেসে ভেসে চলে।
ব্যাঙদের মক্‌মকি,
বিদ্যুতের চক্‌মকি,
দেখেশুনে বক বকি
এক পায়ে টলে॥
গাছেদের মাথা ছুঁয়ে
আকাশ পড়েছে নুয়ে,
জল ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
মেঘের চুলের।
শিউলি ভুঁয়েতে লুটে,
কদম উঠেছে ফুটে,
ভিজে গন্ধ আসে ছুটে
কেতকী ফুলের॥
মেঘেদের হুড়োহুড়ি
শুনে যত বুড়োবুড়ি,
জ্যেঠাজ্যেঠি খুড়োখুড়ি
ভয়ে মরে আজ।
কখন্ সড়াৎ করে',
অথবা হড়াৎ করে',
বেজায় কড়াৎ করে'
শিরে পড়ে বাজ॥

ছেলেপিলে মহানন্দ,
ঘরে ঘরে হয়ে বন্ধ
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব,
মহা তাল ঠুকে।
পা ছড়িয়ে নারীকুল,
উনুনে শুকোয় চুল,
দু'নয়ন বাষ্পাকুল,
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে॥
মাতিয়া বরষা-রসে,
ভাঙা গলা মেজে ঘসে'
কোন যুবা ভাঁজে কসে'
সুরট-মল্লার।
কেহবা মনের ঝোঁকে
কবিতা লিখিছে রোখে,
গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে
কুমুদ-কহ্লার॥
বলি শুন, ওহে বর্ষা!
আবার যে হবে ফর্সা
এমন হয় না ভর্সা,
— না হয় না হোক।
তোমার ঐ রঙ কালো,
তোমার ঐ রাঙা আলো,
তার বড় লাগে ভালো,
যার আছে চোখ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রাবণ।

দশগ্রীব শিবের নিকট বর পাইয়া 'রাবণ' হইল, অস্ত্রশস্ত্র ও অনেকগুলি পাইল। তখন হইতে সে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, আর রাজা রাজড়া যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই বলে, "হয় যুদ্ধ কর না হয় হার মান!"

উষীরবীজ নামে একটা জায়গায় মরুত্ত নামে এক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, রাবণ পুষ্পক রথে চড়িয়া হেইয়ো হেইয়ো শব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞের স্থানে দেবতাদের অনেকেই ছিলেন, রাবণকে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুখাইয়া গেল। ছুটিয়া যে পলাইবেন, এতটুকু ভরসাও তাঁহাদের হইল না,—কি জানি, পাছে ধরিয়া ফেলে। তাই তাঁহারা সেইখানেই নানা জন্তুর বেশ ধরিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ূর, ধর্ম্ম হইলেন কাক, কুবের হইলেন গিরিগিটী, বরুণ হইলেন হাঁস।

এদিকে মরুত্তের সঙ্গে রাবণের খুবই যুদ্ধ বাধিবার যোগাড় দেখা যাইতেছে, গালাগালি আরম্ভ হইয়াছে মারামারির ও বিলম্ব নাই; এমন সময় মরুত্তের গুরু সম্বর্ত্ত মুনি তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, কেন না তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হইবে।" কাজেই মরুত্ত চুপ করিয়া গেলেন, আর রাবণ 'জিতিয়াছি! জিতিয়াছি!' বলিয়া খুবই বাহাদুরী করিতে লাগিল। তারপর, সেখানে যত মুনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে খাইয়া, যারপর নাই খুসী হইয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন দেবতা মহাশয়েরা আবার যার যার বেশ ধরিয়া মনে করিলেন, "বাবা! বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছি।" যে সকল জন্তুর সাজ তাঁহারা নিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে অবশ্য তাঁহারা খুবই খুসী হইলেন, আর তাহাদিগকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ময়ূরকে বলিলেন, "তোমার সাপের ভয় থাকিবেনা, আর, আমার যেমন হাজার চোখ, তোমার লেজেও তেমনি হাজার চোখ হইবে।" ময়ূরের লেজে আগে শুধুই নীলবর্ণ ছিল, তখন হইতে তাহাতে চমৎকার চক্র দেখা দিল।

ধর্ম্ম কাককে বলিলেন, "তোমার আর কোন অসুখ হইবে না। মরণের ভয়ও তোমার দূর হইল; কেবল, মানুষে যদি মারে তবেই তোমার মৃত্যু হইবে।"

বরুণ হাঁসকে বলিলেন, "তোমার গায়ের রং ধবধবে শাদা হইবে।" তখন হইতে

হাঁস শাদা হইয়াছে, আগে তাহার আগাগোড়া শাদা ছিল না, পাখার আগা নীল, আর কোলের দিক ছেয়ে রঙ্গের ছিল।

কুবের গিরগিটিকে বলিলেন, "তোমার মাথা সোনার মত হইবে।" সেই হইতে গিরগিটির মাথায় সোনালি রং।

এদিকে, রাবণের আর গর্ব্বের সীমাই নাই। দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি বড় বড় রাজারা তাহার নিকট হার মানিয়া গেলেন, অন্যের ত কথাই নাই। কিন্তু অযোধ্যার রাজা অনরণ্য, কিছুতেই তাহার নিকট হার মানিতে রাজী হইলেন না। তিনি আগেই অনেক সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাবণ তাঁহার রাজ্যে আসিবামাত্র সেই সকল সৈন্য লইয়া তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হায়! তাঁহার সে সৈন্য রাবণের সৈন্যদের হাতে দু দণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল, নিজেও রাবণের হাতে ভয়ানক আঘাত পাইয়া রথ হইতে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাবণ তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "কি? আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন কেমন হইল?" অনরণ্য বলিলেন, "মরিতে ত একদিন সকলকেই হয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে হটি নাই, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছি আর, আমি একথা তোমাকে বলিতেছি যে, আমাদের এই বংশে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইবে, সেই রামের হাতে তুমি তোমার উচিত সাজা পাইবে।"

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই, দেবতারা তাঁহার উপরে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজাও দেহ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া গেলেন।

তিনটী গল্প।

আকাশে চাঁদ উঠেছে, আর ছোট ছোট মেঘ চলছে। কয়েকটি ছেলে খেলা করছিল, তাদের একজন বল্ল, "ঐ দেখ্, চাঁদটা কেমন ছুটে চলেছে!" তা দেখে তাদের সকলে বল্ল, "তাই ত, চাঁদটা এমন ছুটেছে কেন?"

তাদের মধ্যে একটি আট বছরের ছেলে ছিল, সে কিন্তু বিশ্বাস করল না যে চাঁদ ছুটছে। সে তার সঙ্গীদের ডেকে একটা গাছের তলায় নিয়ে বল্ল, "এই গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখ ত, চাঁদ ছুটছে না আর কিছু ছুটছে?"

তখন সকলেই দেখ্ল, "চাঁদ ছুটছে না, মেঘগুলোই ছুটছে।"

ছোট ছেলেটি জান্‌ত যে, একটা স্থির জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে চাঁদ কি মেঘ, কোন্‌টা ছুটছে। গাছের পাতা স্থির, তাই সে সকলকে গাছের পাতার ভিতর দিয়ে তাকাতে বলেছিল। এই ছেলেটি বড় হয়ে শেষে পীটর গ্যাসেণ্ডী বলে মস্ত জ্যোতির্ব্বিদ হয়েছিল।

একটা উঁচু স্তম্ভ বেঁকে গেছে, তাকে আবার সোজা করবার জন্য সকলে মিলে তাতে দড়ি বেঁধে টানছে, কিন্তু কিছুতেই তাকে সোজা করতে পারছে না। চার দিকে অনেক লোক দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছে, আর খালি বল্‌ছে, "এটা কর,' 'ওটা কর,' 'ঐখানটায় বাঁধ," 'এমনি করে টান!' তাতে আরো কাজের গোল লেগে যাচ্ছে। তখন এই হুকুম হল যে, যে আবার কথা বল্‌বে, তার মাথা কাটা যাবে।

তা শুনে সকলেই চুপ কর্‌ল, কিন্তু স্তম্ভ তবু সোজা হয় না। কি কর্‌লে যে স্তম্ভ সোজা হবে, সে কথা কেউ জানে না, জানে খালি একজন লোক। সে বেচারা প্রাণের ভয়ে চুপ করে আছে, কিন্তু তার মনটা সেই কথাটুকু বল্‌বার জন্যে ছট্‌ ফট্‌ করছে। খানিক বাদে সে আর থাক্‌তে না পেরে, বলে ফেল্ল, "দড়ি ভিজিয়ে দাও!"

দড়ি ভিজালে একটু খাটো হবে। সেই খাটো হওয়ার টান মানুষের টানের চেয়ে ঢের বেশী; সে টানে স্তম্ভকে সোজা করে দিবে। কাজেও তাই হল। শত শত লোকের প্রাণ পণ চেষ্টায় যে কাজ হচ্ছিল না, ভিজান দড়ির টানে দেখতে দেখতে তা হয়ে গেল। সেই লোকটিরও অবশ্যি তাতে খুব প্রশংসা হল। তার মাথা কাটবার কথা আর কেউ বল্ল না।

ভট্‌চায্যিমশায় ঘরে বসে ন্যায় শস্ত্রের কথা ভাবছেন, তাঁর ব্রাহ্মণী একটা দরকারী কাজে অন্য ঘরে গিয়েছেন, উনানে ডা'লের হাঁড়ি চড়ান রয়েছে।

এমন সময় হটাৎ সেই ডা'ল উথ্‌লে উঠ্‌ল, আর তা দেখে ভট্‌চায্যি মশায়ের প্রাণ উড়ে গেল! তিনি ন্যায় শাস্ত্রে ভয়ঙ্কর পণ্ডিত বটে, কিন্তু রান্না বান্নার কথা কিচ্ছু জানেন না, আর ডালের এমন তর পাগলামি আর জন্মেও কখনো দেখেন নি। তিনি খালি পাগলের মত ঘর ময় ছুটে বেড়াচ্ছেন আর বলছেন, "হায় হায়! কি হবে?" "হায় হায়! কি হবে?" ততক্ষণে ব্রাহ্মণী ঘরে এসে ডা'লে খানিকটা তেল ঢেলে দিয়েছেন, আর অমনি তার রাগ থেমে সে চুপ হয়ে গেছে।

ভট্‌চাযি্য মশায় সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে যোড় হাতে ব্রাহ্মণীর স্তব করতে করতে বল্লেন, "তেল ঢেলে প্রলয় থামিয়ে দিলে! বল তুমি কোন্ দেবতা!"

বাস্তবিক, খ্যাপা জলকে শান্ত করার ক্ষমতা তেলের খুব আছে। শুনা যায়, সমুদ্রে তেল ঢেলে অনেক জাহাজ নাকি ঝড়ের হাত থেকে বেঁচেছে।

মেঘের মুলুক।

ছিলাম মাঠে, এসেছি মেঘের মুলুকে—দারজিলিঙ্গে—কল্‌কাতার চেয়ে সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে। সাড়ে সাত হাজার ফুটে প্রায় দেড় মাইল হয়, সেটা যে ঠিক কতখানি উঁচু, মনের ভিতরে তার একটা পরিষ্কার আন্দাজ করা ভারী শক্ত।

শকুনগুলো অনেক সময় প্রায় হাজার ফুট উপরে উঠতে পারে। আবার বর্ষার মেঘও মাঝে মাঝে হাজার ফুট নীচু অবধি নেমে আসে; হয় ত তার চেয়েও নীচে আসে। আমি অনেকবার শকুনকে উড়ে উড়ে মেঘের ভিতরে ঢুকে যেতে দেখেছি। বর্ষার মেঘ যতদূর নীচে নামে, বা শকুন যত উঁচুতে উঠতে পারে, সাড়ে সাত হাজার ফুট তার চেয়েও ৫।৭ গুণ উঁচু।

আমরা ছেলেবেলায় বুড়োদের মুখে শুন্‌তাম যে, মেঘেরা বাঁশের পাতা খেতে পাহাড়ে যায়, তখন 'কোচেরা' (এক রকম পাহাড়ী লোক,—যাদের নামে 'কুচবিহার' হয়েছে) তাদের বল্লম দিয়ে মারে। সেই মেঘ তারা নীচের লোকদের কাছে বেচতে আনে, তাকেই আমরা বলি 'অভ্র'।

একথা যে ঠিক নয়, তা অবশ্যি তোমরা সকলেই জান। চিপি পানা মেঘে রোদ পড়্‌লে তার চেহারা অনেকের কাছে অভ্রের মত ঠেকতে পারে। মেঘ হাওয়ায় ভেসে ভেসে ক্রমাগতই গিয়ে পাহাড়ের গায় ঠেকছে, আর সেখানে বাঁশেরও অভাব নাই। এখন যেমন দারজিলিং অবধি রেল হয়েছে, আগে ত আর তেমন ছিল না। সেকালের লোকেরা দূরে থেকেই এসব দেখে অভ্রের গল্প তয়ের করেছিল।

শোনা যায়, একজন সাহেব এক পাহাড়ী মুটের ঝাঁকায় চড়ে প্রথমে দারজিলিং এসেছিলেন। সে অবশ্যি অনেক দিনের কথা, তখন পাহাড়ে উঠবার কোন রকমের পথই ছিল না। জানোয়ার চল্‌বার পথ ছিল, সেই পথ ধরে পাহাড়ীরা গভীর বনের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে আস্‌ত; আর লোক জনের উপর ভারি দৌরাত্ম্যি করত।

সেই পাহাড়ীদের দৌরাত্মি বারণ করবার জন্য আমাদের সরকার বাহাদুর পাহাড়ের নীচে, বনের ধারে, পাহারা রাখ্‌তেন।

পাহাড়ের নীচেকার এসব জায়গার নাম 'তরাই'। তরাই বড় ভয়ানক স্থান, তখন আরো ভয়ানক ছিল। সেখানে গেলে দু তিন মাসের ভিতরে জ্বর আর পিলেয় ভুগে হাড্ডিসার হয়ে যেতে হত। সরকারী পাহারাওয়ালারা এমনি করে ভুগ্‌ত, আর পাহাড়ীদের মুখে শুন্‌ত যে পাহাড়ের উপরকার জায়গা বড়ই খাশা। শেষে দু একজন লোক সাহস করে উপরে গিয়ে দেখে এল যে সত্যি সত্যিই সে সকল জায়গা খুব ভালো।

এমনি করে লোকে প্রথমে দারজিলিঙ্গের কথা জানতে পেরে ছিল। দারজিলিং যাবার পথটি যখন প্রথমে তয়ের হয়, তখন তার প্রত্যেক মাইলে প্রায় ষাট হাজার টাকা খরচ পড়ে। সেই পথের ধারে ধারেই এখন রেলের লাইন বসেছে। খেলানার মতন ছোট ছোট গাড়ী, দেখ্‌লে হাসি পায়। ছোট্ট একটি ইঞ্জিন, তার পিছনে ঐরকম

৮।১০ খানা গাড়ী জুতে ট্রেণ হয়েছে, তারি ভিতরে গুটিসুটি হয়ে বসে, হাঁ করে পথের শোভা দেখতে দেখতে দারজিলিং যেতে হয়।

দারজিলিঙ্গের পথে বনের শোভা বড় চমৎকার। একলা সে বনের ভিতর যেতে হলে প্রাণটি হাতে করে যেতে হয়, কিন্তু ট্রেণে যেতে কোন ভয় নাই। একবার কিন্তু ট্রেণের সামনে একটা মস্ত বুনো হাতী পড়েছিল। সে হয় ত ট্রেণটাকে নতুন রকমের কোন জানোয়ার মনে করে থাকবে, তাই বোধ হয় লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল যে সেটার সঙ্গে লড়্‌বে কি ভাগ্‌বে। এমন সময় ড্রাইভার পোঁ করে বাঁশী বাজিয়ে ট্রেণখানাকে খুব জোরে চালিয়ে দিল, আর হাতীও তা দেখে 'মা গো!' বলে লেজ গুটিয়ে দে প্রাণপণে ছুট!

ট্রেণখানি সেই বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কেন্নোর মতন এঁকে বেঁকে চলে। ত্রিশ ফুট পথ এগুলে তার এক ফুট উঁচুতে উঠা হয়। পথের ধারে বিশাল বড় বড় সব গাছ, তাতে নানা রঙ্গের ফুলও আছে; কোন কোনটাকে প্রকাণ্ড লতার জালে জড়িয়ে রেখেছে, কোন কোনটার গায় লম্বা লম্বা দাড়ির মত শ্যাওলা ঝুলছে। নীচের দিকে তাকাই,—উঃ! কি ঘন বন! পাহাড়ের গা ঢেকে দিনকে রাত করে রেখেছে। যদি গাড়ী থেকে পড়ে যাই, তা হলে অমনি বনের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে কোথায় চলে যাব। উপরের দিকে তাকাই—বাবা! কি উঁচু সব গাছ! জাহাজের মাস্তুলের মত সোজাসুজি সেই কোথায় উঠে গিয়েছে। ৩০।৪০ হাত অবধি তাদের অনেকের গা একেবারে খালি, শুধু মাথায় খানিকটা ডাল পালা। হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় না যে তাদের সঙ্গে আমাদের কোন রকম পরিচয় আছে। কিন্তু একটু ভাল করে দেখ্‌লে মাঝে মাঝে এক একটা শিমুল, কদম বা আর কোন জানা গাছ ধরা পড়ে, তাদেরও সেই রকম হাড়গিলেপানা চেহারা। গাছের আলো না হলে চলে না। সেই আলোর জন্য ব্যস্ত হয়ে তারা রেষারেষি করে কেবলই উঁচু হতে থাকে, কেন না, ঘন বনের ভিতরে পাশ দিয়ে আলো খুব কমই আস্‌তে পারে, পাশাপাশি বাড়বার জায়গাও নাই। এসব বনে যে বাঁশ যথেষ্ট আছে, সে কথা আগেই শুনেছ। এসব বাঁশের এক একটা এমনি মোটা যে, খুব রোগা একজন লোকের কোমরের সঙ্গে তার একটাকে মেপে, বাঁশটাই মোটা দাঁড়িয়েছিল। এর এক একটা চোঙ্গায় এক কলসী জল অনায়াসে ধরে। পাহাড়ী লোকেরা এই চোঙ্গা দিয়েই কলসীর কাজ চালায়। কলসীর চেয়ে এগুলো নিয়ে পাহাড়ে চলতে ফিরতে অনেক সুবিধা, তাতে আবার এগুলো সহজে ভাঙ্গে না। বনের ভিতরে বড় বড় অনেক কলা গাছও দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে কলা বানরেও খেতে পারে কি না সন্দেহ; তাতে এতই বীচি।

এমনি বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে, ঝাঁ করে ট্রেণখানা এক একটা ফাঁকা য়গায় আসে; তখন দেখা যায়, ইস্! কত উঁচুতে উঠে এসেছি! বাঙ্গালার মাঠ ঐ ধ্ করছে। বড় বড় নদীগুলি শাদা শাদা আঁচড়ের মত সেই কোথায় চলে গিয়েছে।

দেড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়। দেশে বসে আকাশের নে তাকিয়ে আমরা যেসব ভারী ভারী মেঘ দেখতে পাই, তারা মোটামুটি এই রকম চুতেই থাকে। ক্রমে হয় ত ট্রেণ তার ভিতরে ঢুকে যায়। তখন আর বুঝতে বাকি কে না যে, আমরা যাকে কোয়াশা বলি, এ ঠিক সেই জিনিস। দূরে থেকে তাকে খলেই সে মেঘ, আর তার ভিতরে ঢুকলেই সে কোয়াশা।

ততক্ষণে বনের শোভা একটু কমে এসেছে, আর মেঘের আর মাঠের শোভা বাড়ছে। ঝে মাঝে একেকটা সুন্দর ঝরণাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আগে 'পাগলা ঝোরা' মে একটা খুব বড় ঝরণা ছিল; তার পাগলামি একটু বেশী হলেই সে রেলের পথ টথ ঙ্গে ঠিক করে দিত। এখন পাহাড়ের গায় নানান দিকে পথ করে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া য়েছে; কাজেই আর তার তেমন রাগ রঙ্গ নাই। তিন হাজার ফুটের উপরে উঠলে এই রাটাকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে যেসব মেঘের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এর পর থেকে রা ক্রমেই নীচে পড়ে যেতে থাকে। তার পর ক্রমে মাঠের যে কি শোভা হতে থাকে, না দেখলে বুঝবার সাধ্য নাই। তখন আমাদের দেশের ভারী ভারী মেঘগুলোকে খে মনে হয় যেন তারা দল বেঁধে ঘাস খাবার জন্য মাঠে গিয়ে নেমেছে।

এক মাইল উঁচুতে উঠলে প্রায় ৯০ মাইল দূর অবধি মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। বশ্য, এত দূর থেকে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু মনের ভিতরে কি যে কটা আনন্দ হয় সে কি বল্ব।

এতক্ষণে আর একটা খুব আনন্দের ব্যাপার ঘটে যায়। প্রায় সাড়ে চার হাজার ট অবধি ট্রেণখানা বড় বড় পাহাড়ের দক্ষিণ দিক বেয়ে চলতে থাকে, সে সব হাড়ের উত্তরে যে কি আছে, তা দেখা যায় না। তারপর যেই হঠাৎ একবার মোড় রে সেই পাহাড়গুলোকে ডান হাতে ফেলে সে উত্তরমুখো হয়, অমনি দেখা যায় , হিমালয়ের শাদা শাদা বরফে ঢাকা চূড়োগুলো রোদে ঝিক মিক করছে। তার পরে কে শীতটিও ক্রমেই জেঁকে উঠতে থাকে, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, রে এক নূতন রাজ্যে আসা গেছে; তার নূতন রকমের হাওয়া, নূতন রকমের ভা; সেখানে নূতন ধরণের মানুষ, নূতন তর মেঘের খেলা।

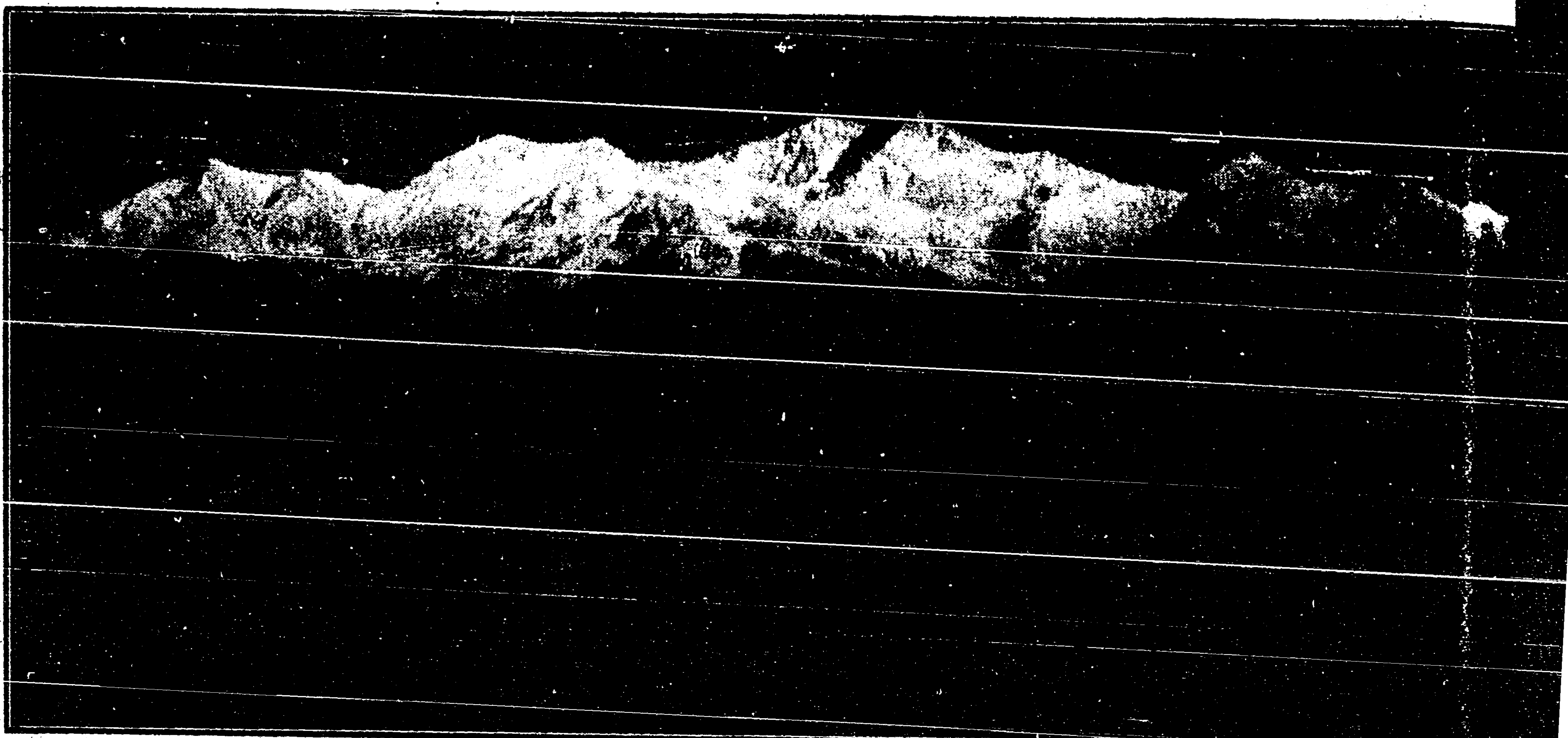

হিমালয়ের শাদা বরফে ঢাকা চূড়োগুলো রোদে ঝিক মিক করছে।

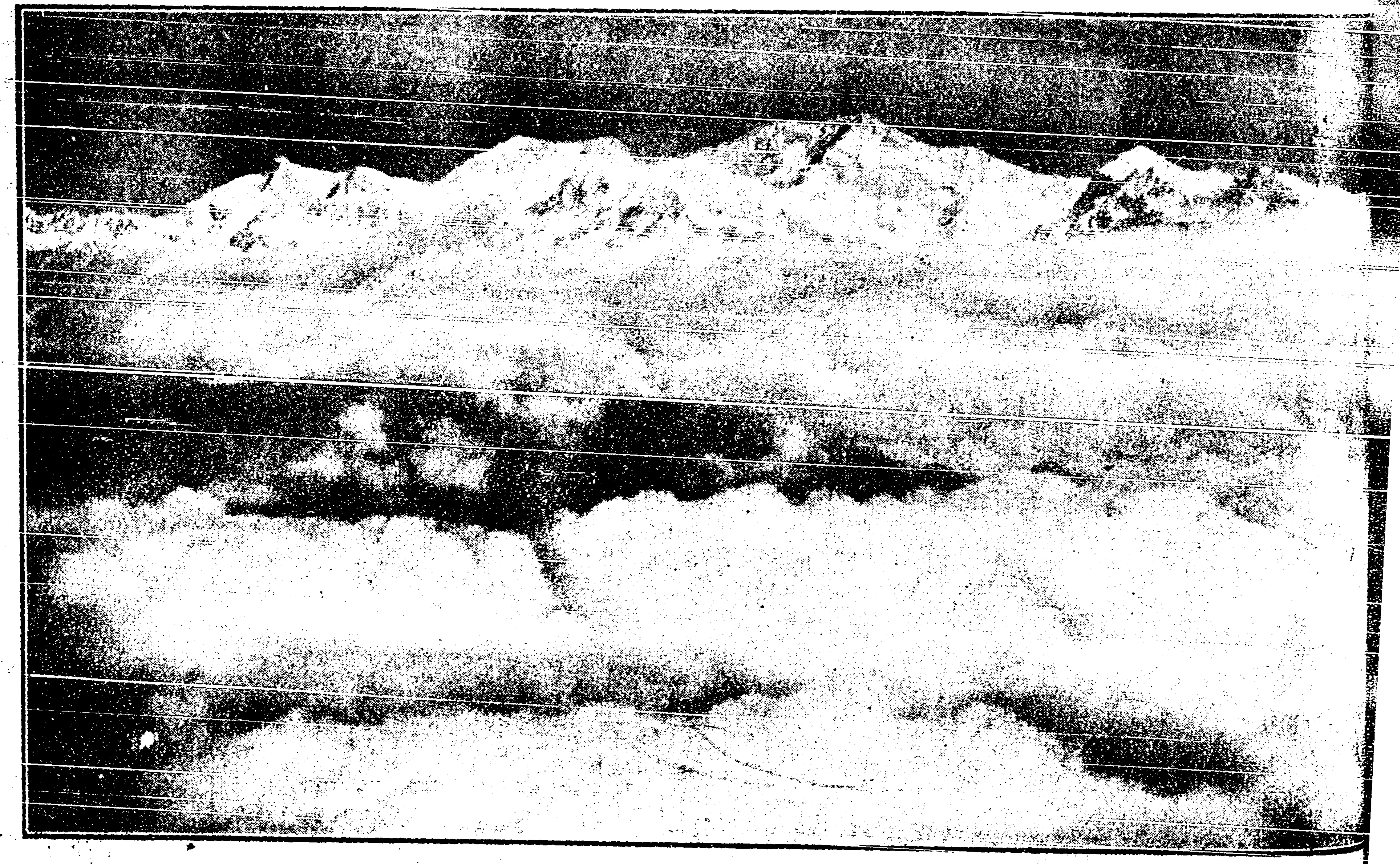

এবারে এক নূতন রাজ্যে আসা গেছে; তার নূতন রকমের শোভা, নূতনতর মেঘের খেলা

দেবতার কাজ।

মানুষেরা মিলে এক সভা করল। শীত গ্রীষ্ম, দিন রাত, মেঘ বৃষ্টি সব দেবতার তে। তিনি তার একটাও গুছিয়ে রাখতে পারছেন না, তাতে সকলেরি ভারি সুবিধা হচ্ছে, কাজেই এর একটা কিছু না হলেই নয়। সবাই বল্লে, "দেবতা সব চুড়ী পাকিয়ে দিয়েছেন ; গরম দেন ত আমাদের পুড়িয়ে মারেন, শীত আনেন ত মাদের জমিয়ে দেন, বৃষ্টি হয় ত সব ভাসিয়ে নেয়, না হয় ত হয়ই না। এমন হলে করে চলবে ? আমাদের হাতে থাকলে এর চেয়ে ঢের ভাল কাজ চল্‌ত।"

দেবতা বল্লেন, "বেশ বাপু! এখন থেকে এসব তোমাদেরই হাতে রইল। দেখো কাজ ভাল মতে চলে। তোমরা সকলে মিলে যেমন বলবে, তেমনি হবে, জনেরও যাতে আপত্তি থাকবে, সে কাজ কখনো হবে না।"

সবাই বল্লে, 'বাঃ বাঃ! কি মজাই হল! আমরা যা চাইব তাই হবে, যা চাইব া কখনো হবে না। তবে আর কিসের দুঃখ? কাল থেকে আমরা সব ঠিক দিব!"

ার পর হাত তালি দিয়ে নাচতে নাচতে সকলে ঘরে গেল। ঘুমোবার সময় ভাবল, "কাল সকালে উঠেই সব ঠিক করে দিব।"

কিন্তু সকাল ত আর হয় না। দশটা বাজল, বারোটা বাজল, তবু সূর্য্যের দেখা কাজের লোকদের কি মুস্কিলই হল। তারা কখন চাষ করবে ? কখন দোকান ? কখন আপিসে যাবে ?

সবাই বলছে, "ব্যাপার খানা কি ? সব যে মাটি হয়।"

ব্যাপার এই যে, কুঁড়েরা ঘুম থেকে উঠতে চাচ্ছে না, তারা বলছে, ভোর হয়ে কাজ নেই। কাজেই ভোর হচ্ছে না। তখন সকলে গিয়ে তাদের গায় হাত বুলিয়ে, লক্ষ্মী বলে অনেক কষ্টে তাদের ঘুম ভাঙ্গাল, তবে ভোর হল।

ভোর হয়েছে, কিন্তু তার পর আর দুপুর হয় না। সবাই বলে, "এবারে আবার কি ?" আর হবে কি ? এবারে ইস্কুলের দুষ্টু ছেলেরা বেঁকে বসেছে। দুপুর হলেই স্কুলে যেতে হবে, তাতে তারা রাজী নয়। তখন তাদের বাবারা ব্যস্ত হয়ে লাঠি, কাণ া, যা দিয়ে যে পারল, তাদের রাজী করিয়ে দিল, তবে দুপুর হল,—দুষ্টু ছেলেরা হাঁড়ি করে ইস্কুলে গেল।

সে দিনকার দুপুর যে কি লম্বা হয়েছিল, কি বলব। সূর্য্য মাথার উপর এসে আর এগুতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল, তবু ঘড়ীতে খালি বারোটাই বাজে। ছাত্র মাষ্টার হাকিম সকলে ত্যক্ত হয়ে উঠল। বলে, "কি বিপদ! দেখ দেখ আবার কে আটকাচ্ছে।"

এবারে আটকিয়েছে এক বুড়ী। তার বড়ী ভাল করে শুকোয়নি, তাই সে খালি বলছে, দুপুর গিয়ে কাজ নেই। বুড়ী আবার এমনি ঠ্যাঁটা, তাকে ফুস্‌লিয়ে বকে, ভয় দেখিয়ে কিছুতেই রাজী করা যাচ্ছে না। তার সব বড়ী শুকাল তবে সে দিন বিকাল হতে পেল।

তার পর দোকানীরা বলছে, শীগ্‌গি সন্ধ্যা হয়ে কাজ নাই, আমাদের দোকা আরো খানিক খোলা থাকুক আরো বিক্রি হোক। কাজেই সন্ধ্যা হতে আরো দ ঘণ্টা লেগে গেল।

এমনি করে দিন যায়; একটি দি হতে দু তিন দিন লাগে। দু তিন মা চলে যায়, তবু একটি মাসের ত্রিশটি দিন পূরো হয় না। চাক্‌রেদের বিপদে আর সীমাই নাই; মাস ফুরোচ্ছে না, বেতন কি করে পাবে? এদিকে ক্ষি এসে পেট খালি হতেই দেখা দেয়; কাজেই খেতে হচ্ছে ঠিক আগেরই মত টাকাও লাগছে তেমনি।

চাষারা বলে 'বৃষ্টি হোক', পথিকেরা বলে 'শুক্‌নো থাকুক'। এমনি কা কেহ চায় জল, কেহ চায় রোদ, কেহ চায় গরম, কেহ চায় শীত, কাজে কোনটাই হতে পারে না। দেখতে দেখতে সব কাজের এমনি গোল লেগে গেল যে সংসার যায় যায়।

তখন সকলে মিলে আবার সভা করে দেবতাকে বল্ল, "প্রভু, আমাদের ঢের হয়েছে

মাদের সংসার চালিয়ে কাজ নেই, এখন তোমার কাজ তোমার হাতে নিয়ে আমাদের ছাও।"

দেবতা বল্লেন, "এই যে বাপু! আমি তয়ের আছি। তোমাদের সাধ মিটল ত?"

ভূতের খেলা।

একটি ছেলে ছিল ভারী দুষ্টু, আর তার একজন মাষ্টার ছিলেন বড্ড রাগী। ছেলেটি পড়া শোনা একেবারেই করত না, তাই মাষ্টারের হাতে রোজই কাণমলা খেত, র আড়ালে গিয়ে তাঁকে 'কলা' দেখাত।

এক দিন সন্ধ্যা বেলায়, প্রদীপের আলোতে, ছেলেটি পড়তে বসেছে। প্রদীপের সামনে আলো পড়েছে, পিছনে ছায়া পড়েছে; সেই ছায়ার অন্ধকারে মাষ্টার মশাই তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে তার পড়া দেখছেন।

মাষ্টার মশাই অন্ধকারে বসেছেন, ছেলেটি তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না, আর ভাবছে, মাষ্টার মশাইও তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। তাই সে একবার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি তুলে তাঁকে 'কলা' দেখিয়েছে। মাষ্টার মশাই কিন্তু সবই দেখতে পেয়েছেন; দেখে তিনি কি করলেন তা আর বলে কাজ নেই।

তার পর পড়া শোনা শেষ হয়ে গেল, মাষ্টার চলে গেলেন, আর, ছেলেটি কাণে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবল, "তাই ত! আমি দেখতে পেলাম না, ও কি করে দেখল?"

তোমরা ইচ্ছা করলেই এটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। একটা উজ্জ্বল আলোর সামনে একজন বস, আর, আলোর পিছনের দিকটায় কোন রকমে ছায়া করে দিয়ে, সেই ছায়ায় একজনকে বসিয়ে দাও। তখন দেখতে পাবে যে, ছায়ার ভিতর থেকে আলোর সামনের লোকটিকে পরিস্কার দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আলোর সামনে থেকে ছায়ার ভিতরকার লোকটিকে দেখতে পাওয়া যায় না;—সে দিক পানে তাকাতে গেলেই চোখে আলো পড়ে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

কথাটা খুবই সহজ, কিন্তু সকল সময় এটা মনে থাকে না। তোমরা ইচ্ছা করলে এ থেকে এক রকম ভূতের খেলা দেখাতে পার। এ খেলার আয়োজন হচ্ছে, দুটি খুব

উজ্জ্বল ল্যাম্প, খান কতক পর্দ্দা, গোটা দুই শাদা টেবিল, আর কয়েকটি ছোট ছোট শাদা 'জিনিস'।

প্রথমে কালো পর্দ্দা খাটিয়ে একটি যাদুঘর তয়ের করতে হবে।

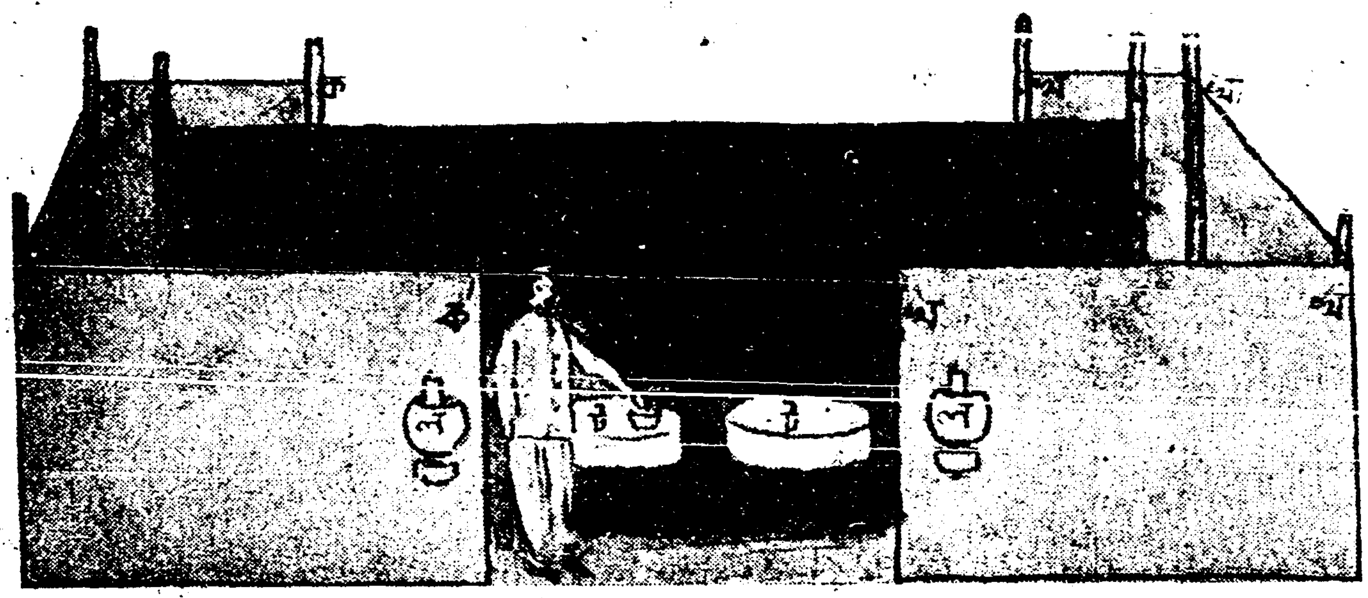

'ক ক ক ক' 'খ খ খ খ' আর 'গ গ গ গ', এই তিনটি পর্দ্দা (ভিতরে কালো বাইরে শাদা) ছবির নমুনার মতন করে খাটালেই ঘরটি হয়ে যাবে। ঘরের সামনের দিকে দরজা আছে, তার দু পাশে 'ল ল' দুটি ল্যাম্প 'ট ট' দুটি টেবিল। পিছনের দুই কোণে দুটি পথও রাখা হয়েছে, তা দিয়ে ঘরের ভিতর বার করা যায়। ঘরের ভিতরে দুটি টেবিল বসান আর দু জন লোক নড়বে চড়বে, এইটুকু জায়গা হলেই হল। ল্যাম্প দুটি এমন ভাবে বসান থাকবে যেন তাদের আলো টেবিল দুটি ছাড়িয়ে আর পিছনে না যায়।

এখন, যারা তামাসা দেখবে, তাদের এনে ঘরের সামনে বসিয়ে দাও। বেশী কাছে বসিয়ো না, তাহলে কিন্তু সব টের পেয়ে ফেলবে।

তামাসা দেখাতে, দুজনের দরকার। একজন রোজা, আর একজন—ভূত! রোজার খুব জমকালো উজ্জ্বল রঙ্গের পোষাক চাই। ভূত অবশ্যি কালো হবে। তেমনি মিস্‌মিসে কালো একটি সুপুরুষ জুটলে ত আর কথাই নাই, নইলে তাকে কালো করে নিতে হবে। পোষাক কালো হবে, নখ অবধি কালো হবে। চোখের ভিতরটা কালো হতে পারলে ভালই ছিল; তদভাবে অগত্যা মাথা হেট করে থাকতে হবে,—বাইরে থেকে যাতে চোখের শাদাটা দেখা না যায়।

এখন যাদু ঘরের পিছন থেকে দুই কোণের দুই পথ দিয়ে ভূত আর রোজা ঘরের ভিতরে এস। বাইরের লোকেরা শুধু রোজাকেই দেখতে পাবে, ভূতকে তারা দেখতে পাবে না; কিন্তু ভূত ভায়া খবরদার! যেন ল্যাম্পের আলো কখনো গায় না পড়ে।

রোজার হাতে একটি চায়ের পিয়ালা; ঘরে ঢুকে তিনি পিয়ালাটি টেবিলের উপরে রাখলেন; অমনি ভূত সেটিকে নিয়ে দে ছুট! বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে যেন পিয়ালাটিই ছুটে পালাল। এর পর ঘরময় সেই পিয়ালাকে তাড়িয়ে বেড়াও, তামাসার

হবে। শেষে কিন্তু অনেক কষ্টে সেটাকে ধরে এনে টেবিলে রাখা চাই নইলে পোষ থেকে যাবে।

অন্য টেবিলটিতে কালো কাপড়ে ঢাকা এক থালা মিঠাই আছে। কালো কাপড়ে ঢাকা ব'লে বাইরের লোকেরা তার কিছুই টের পাচ্ছে না। এখন চায়ের পিয়ালাকে টেবিলে বসিয়ে রোজা মশাই তিন বার হাতে তালি দাও, আর ভূত এসে ঝাঁ করে রের থালার ঢাকনা তুলে নিক। বাঃ! কোত্থেকে থালা ভরে মিঠাই সন্দেশ এসে র হল!

এমনি করে অনেক তামাসা দেখান যেতে পারে; বুদ্ধিমান লোককে আর তার কথা য়ে বলবার দরকার দেখি না। বিশেষতঃ সন্দেশের জায়গা কম।

সব তামাসা আগে থেকে তামিল দিয়ে ঠিক করে নিবে, আর দেখাবার সময় পাটি করে গুছিয়ে দেখাবে। যদি মজা হয়, তবে মিঠাই শুদ্ধ থালাটি আমাকে য়ে দিবে।

লেখা পড়া।

টি ছোট্ট ছেলে প্রথম স্কুলে এসেছে, আর কেমন করে পড়া শোনা হয়, ভারী শ্চর্য্য হয়ে তাই দেখছে। মাষ্টার মশাই রাগী লোক, তিনি কথায় কথায় বেত দিয়ে লেদের ঠাঁই ঠাঁই করে মারেন। ছোট্ট ছেলেটি তাঁকেই সকলের চেয়ে বেশী করে খেছে।

ছুটির পর বাড়ী এসে ছেলেটি তার মাকে বল্ল, "মা! বড় হয়ে যদি মাষ্টার হই, ব কেমন মজা হবে!"

মা বল্লেন, "কেন বাবা? কি মজা হবে?"

ছেলেটি বল্ল, "মজা হবে না? আমার এই বড় বেত থাকবে, আর তা দিয়ে লকে ঠ্যাঙ্গাব!"

সেই ছেলেটি এখন আমাদের দেশের একটা খুব বড় কলেজের কর্ত্তা। সে বুড়ো ছে, তার চুল দাড়ি শাদা হয়ে গেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাউকে ঠেঙ্গাতে পায় নি। র মা এখনো বেঁচে আছেন; তিনি তাকে বলেন, "বাবা! সেই মাষ্টার হলে, কিন্তু উকে ঠেঙ্গাতে পেলে না!"

তখনকার মাষ্টাররা এখনকার মাষ্টারদের চেয়ে ঢের বেশী সাজা দিতেন। তা বলে, আগেকার ছেলেরা বেশী দুষ্টু ছিল, এখনকার ছেলেরা তার চেয়ে লক্ষ্মী হয়ে গেছে, এমন কথা কেউ ভেবো না। দুষ্টু ছেলে আগেও ছিল, এখনও আছে, লক্ষ্মী ছেলেও সকল সময়েই পৃথিবীতে জন্মিয়েছে। দুষ্টু ছেলের কথা শুনেছি তারা মাষ্টার বাড়ীতে এলেই গিয়ে গাছে উঠে বসে থাকৃত। মাষ্টার মশাই মিঠাই হাতে করে তাদের খুঁজতে যেতেন, আর যেই সেই মিঠাইয়ের লোভে তারা গাছ থেকে নামৃত, অমনি বলতেন, “লক্ষ্মীটি, আগে পড়া করে নাও, তার পর মিঠাই খেয়ো।”

আবার, লক্ষ্মী ছেলেও এমন ছিল, সে ঘুমোবার সময় বিছানায় চিনি ছড়িয়ে রাখত। সেই চিনির লোভে পিঁপড়ে এসে তাকে কামড়িয়ে জাগিয়ে দিত, আর সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে বসত।

আমার বোধ হয়, পড়াশুনায় মন না থাকলেই তাকে ‘দুষ্টু’ ঠাউরিয়ে নেওয়া অন্যায়; তার চেয়ে তাদের বোকা বল্লে অনেকটা ঠিক হতে পারে। বড় হলে প্রায় এ দোষ শুধরে আসে। যত ছেলে দিন রাত বই নিয়ে নাড়া চাড়া করে, তাদের সকলেই যে যারপরনাই ‘লক্ষ্মী’, এ কথাও ঠিক নয়। স্কুলে যত ছেলে পড়া বলতে পারে না, তাদেরও সকলেই যে বাড়ীতে দুষ্টুমি করে বেড়ায়, তাই বা কেমন করে বলি? অনেকে দিন রাত খেটেও পড়া তয়ের করে উঠতে পারে না। তার মানে অনেক সময় এই হয় যে, বুঝে খাটতে পারলে অল্পেতেই পড়া হয়ে যায়, আর না বুঝে শুধু খাটলে সেই পড়াই বড্ড শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। একটি ছেলের ভারী ইচ্ছা ছিল, সে বড়লোক হবে, কিন্তু ক্লাশে সে পড়া বলতে পারত না। মাষ্টার মশাই তাকে বল্লেন, “বড় লোক কি ইচ্ছা করলেই হওয়া যায়? বড় লোক হতে হলে তেল পুড়িয়ে রাত জেগে মেহন্নত করতে হয়।” ছেলেটি সেদিন বাড়ী গিয়েই অনেক তেল কিনে আন্‌ল, আর তাতে বড় বড় ন্যাকড়া ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তার পর সমস্ত রাত ধরে সে ঘরময় ডিগবাজী খেয়ে বেড়া’ল। সে ছেলে শেষে বড় লোক হয়েছিল কি না, সে কথা কোন পুস্তকে লেখা নেই; কিন্তু পর দিন যে তার গায় বড্ড ব্যথা হয়েছিল, তা বুঝতেই পারা যাচ্ছে।

আমি কিন্তু এমন কথা আদবেই বলতে চাচ্ছি না যে, সকলে দিন রাত বসে খালি বই নিয়ে পড়বেই। আর যাই কর, এমন কাজ ক’রো না। এই সেদিন এতগুলো ছেলের পরীক্ষা হয়ে গেল। শুনলাম, একটি খুব ভাল ছেলে সারা বছর ভয়ানক খেটে পড়া করেছিল, পরীক্ষার সময় তার মাথা গরম হয়ে গিয়ে সে পরীক্ষা দিতে পারে নি।

মরুত্তের যজ্ঞে রাবণ।

(৬৭ পৃষ্ঠা)

ন আরো অনেক ছেলে খেটে খেটে শরীর মাটি করে পরীক্ষার সময় ঠকেছে। দুঃখের কথা!

পড়া শুনা যেমন চাই, রোজ পরিষ্কার হাওয়ায় বেশ করে খেলান বেড়ানও তেমনি ই। সেদিন কাগজে পড়েছিলাম যে, খাঁচায় আটকা থেকে একটা সিংহের ভারী সুখ করেছিল, তাকে বনের ভিতরে ছেড়ে দিতেই তার অসুখ সেরে গেল। বনটির র ধার ঘেরা ছিল, আর তার মাঝখানে একটি জেব্রা বাঁধা ছিল। জেব্রাটা আসলে ন্তু নয়; শুধু চামড়া, তার ভিতরে বাজারের মাংস পোরা। কিন্তু সিংহ তার ঘাড়ে ফিয়ে পড়ে আর সেই মাংস খেয়েই এত সুখী হয়েছিল যে, তার অসুখ সেরে গেল।

আমাদেরও ত এক একটা দেহ আছে, আর তারও ত একটু ভাল করে চলা ফেরা, ওয়া খাওয়া আর আনন্দ করার দরকার, নইলে সে যে ভেঙ্গে পড়বে। একথা যে ল যায় সে বোকা। পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা, এই দুই কাজই যে ভাল র করতে পারে, সে বুদ্ধিমান।

পৃথিবীর আকার প্রকার।

ছেলেবেলায় দেখিতাম, মেয়েরা উঠানে ছবি আঁকিয়া ব্রত করিত। চাঁদের ছবি, র্য্যের ছবি, ঘোড়ার ছবি, খড়মের ছবি, কত কিছুর ছবি, তাহার ভিতরে পৃথিবীরও কটি ছবি।

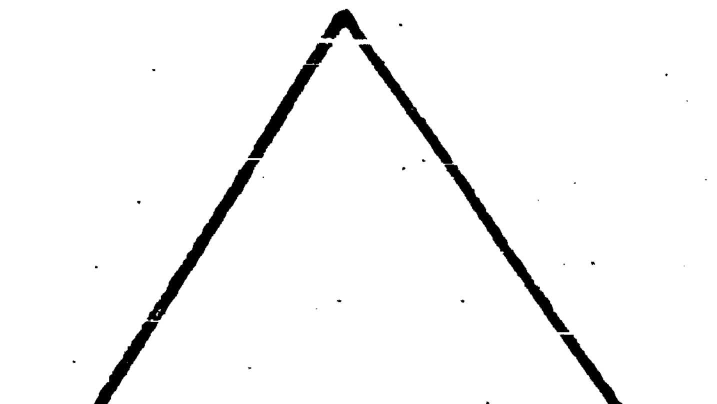

পৃথিবীর ছবিটি তাহারা ঠিক তিন কোনা করিয়া কিত, কেন না বুড়া ঠাকরুণেরা বলিতেন, 'তিন কোণা থিমী।' তাই আমরাও জানিতাম, তিন কোণা পৃথিবী।

তারপর ভূগোল পড়িতে গিয়া দেখি,—'পৃথিবী লাকার, কিন্তু কমলা লেবুর ন্যায় উত্তর দক্ষিণে ঞ্চিৎ চাপা।' তখন হইতে পৃথিবীর কথা ভাবিতে লেই ঠিক কমলা লেবুর মত একটা জিনিসের চেহারা মনে আসিত।

আজকাল লোকে পৃথিবীর চারিদিকে বেড়াইয়া আসিয়াছে, তাহাকে জরীপ রয়াছে, তাহার নক্সা আঁকিয়াছে। কাজেই, পৃথিবী যে গোল, একথা আর বুঝিতে

বাকি নাই; তাহার উত্তর আর দক্ষিণ দিক যে চাপা, তাহাও ধরা পড়িয়াছে; আ ঠিক কত খানি চাপা, তাহারও হিসাব হইয়াছে।

সে চাপা এতই সামান্য যে, শুধু চোখে তাহা বুঝিবার যোই নাই। পূর্ব্ব পশ্চি পৃথিবী যত খানি চওড়া, উত্তর দক্ষিণে মোটামুটি তাহার তিন শত ভাগের এক ভা মাত্র কম চওড়া। এই হিসাবে পৃথিবীর চেহারা আঁকিলে ১ম ছবির মত আ কম্পাস দিয়া ঠিক গোল করিয়া আঁকিলে ২য় ছবির ম

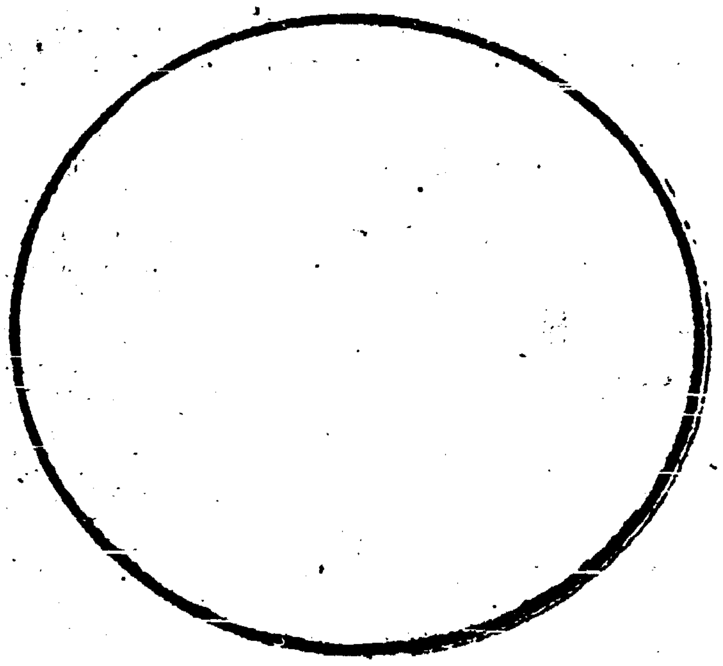

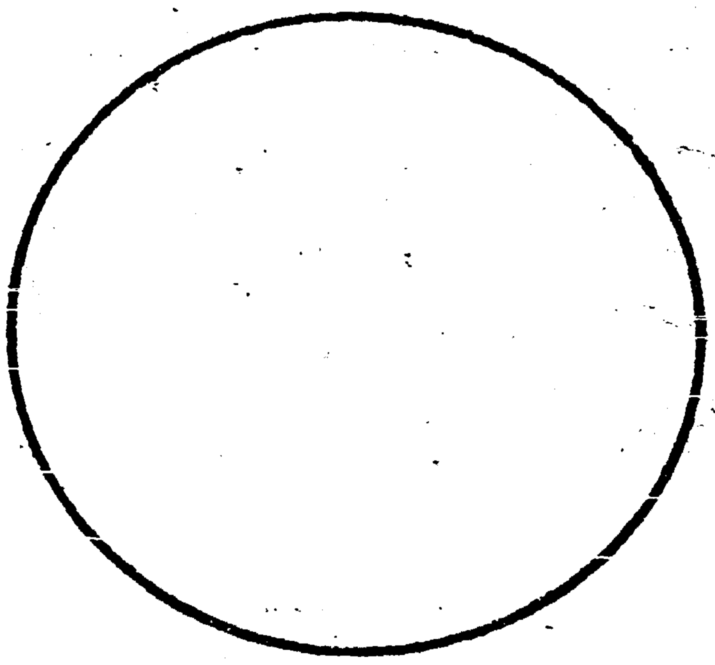

হইবে। এ দুটার মা তফাৎ কোন খানটা তোমরাই বল দেখি উপরের ছবিটির চা জায়গাটা কোথায়, তা বুঝিতে পার কি?

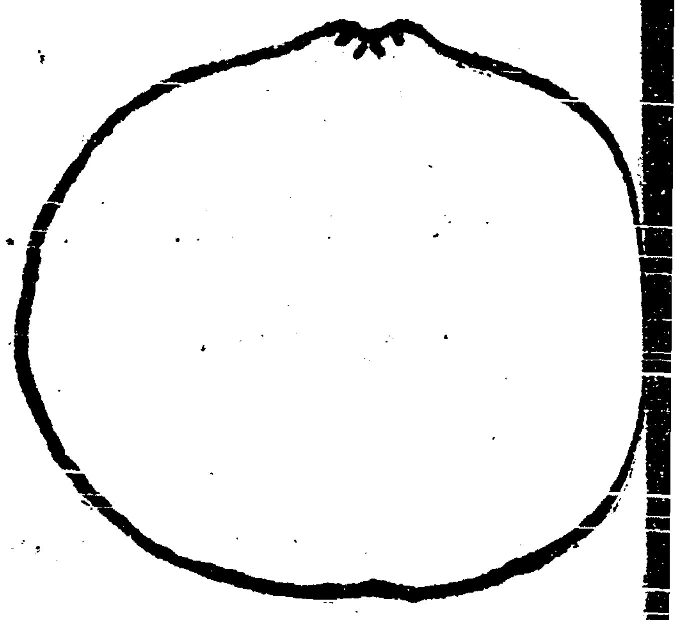

আর কমলা লেবুর চেহারা যে কেমন তাহা ত আমরা ভাল করিয়াই জানি। ইহার সঙ্গে পৃথিবীর চেহারার কত তফাৎ! সুতরাং কমলা লেবু যতই মিষ্ট হউক না কেন, পৃথিবীর চেহারা যে তাহার মত নয়, একথা আমরা বলিতে বাধ্য। তাহার চেয়ে বরং আমাদের পুরাতন জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে কদম ফুলের তুলনা দেওয়া হইয়াছে, সে অনেকটা ভাল। কদম ফুলের গোল নেড়ীটি যেন পৃথিবী, আর তাহার কে গুলি যেন উহার চারি ধারে মানুষ দাঁড়াইয়া আছে।

পৃথিবীর সম্বন্ধে আমাদের সেকেলে পণ্ডিতেরা অনেক কাজের কথা বলি গিয়াছেন, কিন্তু সকলে তাহা বিশ্বাস করে নাই। তাঁহারা বলিলেন, 'পৃথিবী শূ আছে,' সাধারণ লোকে সেকথা মানিল না; তাহারা জানে, পৃথিবীকে সাপে, হাতী আর কচ্ছপে বহিয়া রহিয়াছে, নহিলে পৃথিবী পড়িয়া যাইত। পণ্ডিতেরা তা উত্তরে বলিলেন, 'চারিদিকেই ত আকাশ সমানভাবে রহিয়াছে, পৃথিবী কোথায় পড়িবে সাধারণ লোকে বলিল, "কেন? শূন্যে থাকিলে সকল জিনিসই ত পড়িয়া যায়

ণ্ডিতেরা বলিলেন, "পৃথিবী জিনিসকে টানে, তাই তাহা পৃথিবীতে পড়ে।" অর্থাৎ, থিবীকে ত আর কেহ টানিতেছে না, সে আবার কোথায় পড়িবে ?

এখনকার মানুষ পৃথিবীর সকল স্থানেই যায়, আর সকল স্থানেই মাথার উপরে কাশ দেখিতে পায়। সুতরাং পৃথিবী শূন্যেই আছে।

পৃথিবী যে ঘোরে, তাহাও আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, র সে জন্য অন্য পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে ঠাট্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, থিবী যদি ঘোরে, তবে পাখী বাসা ছাড়িয়া উড়িলে আবার তাহাতে ফিরিয়া আসে রূপে ? পাখী উড়িলেই ত বাসাটি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া পলাইবে'।

এত ভাল কথা,—ইটালী দেশে গ্যালিলীয়ো 'পৃথিবী ঘোরে' বলিয়াছিলেন বলিয়া হাকে সেখানকার লোকেরা জেলে পূরিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, পাখী বাসা ছাড়িয়া আবার কিরূপে তাহাতে ফিরিয়া আসে, এ কথার ত্তর তোমরা দাও দেখি।

লুপ্ত সহর।

"লুপ্ত সহর" লিখিলাম বটে—কিন্তু আসলে সে সহর এখনও একেবারে লোপ পায় ই। সহরের পথঘাট, দোকানপাট, এমন কি ঘরের আসবাব পর্য্যন্ত অনেক য়গায় ঠিক রহিয়াছে অথচ সে সহর আর এখন সহর নাই—সেখানে লোক থাকে না, ান কাজ চলে না—মাঝে মাঝে নানা দেশ হইতে লোক আসে কিন্তু সেও কেবল ামাসা" দেখিবার জন্য।

পম্পেয়াই—আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন সহর, ইটালির পাগ্‌লা পাহাড় ভিসু-য়াস্ তাহাতে ছাই চাপা দিয়া আগুণ ঢালিয়া একেবারে সহরকে সহর বুজাইয়া য়াছিল। প্রায় আঠার শত বৎসর এম্‌নি ভাবে সহর চাপা পড়িয়াছিল—সেখানে সহর ছিল সেই কথাই লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল—কারণ বাহির হইতে সহরের চিহ্ন ত্র দেখা যাইত না। চাষারা নিশ্চিন্তে চাষ করিত, লোকে স্বচ্ছন্দে চলা ফিরা করিত, হারও মনে হয় নাই যে এই মাটি খুঁড়িলেই প্রকাণ্ড সহর বাহির হইয়া পড়িবে। রপর, সে প্রায় এক শত বৎসরের কথা, সেই মাটির নীচ হইতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত জিনিষ বাহির হইতে লাগিল। বাড়ীর টুকরা, পাথরের বেদী, বাঁধান রাস্তা এই সকল

দেখিয়া তখন লোকের মনে পড়িল দু হাজার বৎসর আগে এইখানে প্রকাণ্ড সহর ছিল।

পম্পেয়াই বড় যেমন তেমন সহর ছিল না—সেকালের ইতিহাসে লেখে, তিন লক্ষ লোক সে সহরে বাস করিত। জায়গাটা সমুদ্রের ধারে আর খুব স্বাস্থ্যকর, তাই বড় বড় রোমান্ ধনীরা অনেকে সেখানে থাকিতেন। খুব জম্‌কালো সহর বলিয়া সে সময় পম্পীয়াইএর খুব নাম ছিল। তাহার বাড়ীঘর, পথঘাট, বাগান, সাজসজ্জা বড় লোকের সহরেরই মত ছিল। ভিসুভিয়াসের যে কোন রকম দুষ্ট মৎলব আছে তাহা কেহ তখন জানিত না তাই একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া সহর বসান হইয়াছিল।

সহর ধ্বংস হয় ৭৯ খৃষ্টাব্দে। তখন রোমান্ ধনীরা তাঁহাদের সুন্দর সহরকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আরামে আলস্যে দিন কাটাইতেছেন—পম্পেয়াই সহর বাবুয়ানায় মত্ত। কোন বিপদের চিহ্ন নাই, তখন বলিতে গেলে পৃথিবীময় রোমান্ রাজ্য—রোমের বিরুদ্ধে

চায়, রোমানদের সঙ্গে শত্রুতা করে কার সাধ্য। লোকে নিশ্চিন্ত আছে কোথাও নাই! মাঝে মাঝে একটু আধটু ভূমিকম্প হইত, পাহাড়ের ভিতরে গুর গুর শব্দ না যাইত, কিন্তু তাহাতেও লোকের বিশেষ কোন ভয় নাই। কিছুদিন দেখিয়া শুনিয়া েরই সে সব অভ্যাস হইয়া গেল। তারপর একদিন হঠাৎ পাহাড়ের চূড়া ভাঙ্গিয়া া ধোঁয়া দম্‌কা হাওয়ার মত চারিদিকে ছুটিয়া বাহির হইল। সেই ধোঁয়ায় পঞ্চাশ ল পথ এমন অন্ধকার হইয়া গেল যে মাটি আর আকাশ তফাৎ করা যায় না। পরে খানিকক্ষণ গরম ধূলার তুফান চলিল। ইহার মধ্যে যাহারা সহর ছাড়িয়া ইয়াছিল তাহাদের অনেকে বাঁচিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সহরের মধ্যে একজন ও বাঁচে নাই। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, ক্রমাগত ভয়ানক পড়িতে লাগিল। ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, বাড়ীঘর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে া, ভিসুভিয়াস্ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ফুলিয়া ফুলিয়া শেষটায় ভয়ানক শব্দে া গেল। পাহাড়ের ভিতর হইতে লক্ষ লক্ষ মণ জ্বলন্ত পাথর ছিট্‌কাইয়া চারিদিকে া বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার পরেও হয় ত অনেক লোক বাঁচিতে পারিত, কিন্তু েই বিপদের শেষ হইল না। ভিসুভিয়াসের ভিতরকার পাথর গরমে গলিয়া পাহাড়ের ফাটল্ দিয়া সহরের উপর গড়াইয়া পড়িল, সমস্ত সহরটা যেন টগ্‌বগ্ া ফুটিয়া উঠিল। অনেকে আগুণের ভয়ে সমুদ্রের দিকে পালাইয়াছিল কিন্তু ানেও রক্ষা নাই। এই প্রলয় কাণ্ডের মধ্যে সমুদ্র কি স্থির থাকিতে পারে? সে টা তীর হইতে পিছাইয়া গেল। দেখিয়া বোধ হইল যেন সমুদ্র আগুণের ভয়ে য়া যাইতেছে। সমুদ্রের জন্তুগুলি শুক্‌না ডাঙায় পড়িয়া কত যে মারা গেল তাহার নাই। কিন্তু সমুদ্র যাইবে কোথায়? একটু পরেই ভূমিকম্পের একটা ধাক্কার সে আবার আসিয়া পড়িল, এবং নৌকা ঘর বাড়ী পথঘাট যাহা ছিল সমস্ত ভাঙ্গিয়া াইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, "আমিও বড় কম নই"। জল, মাটি, আকাশ—এই নের রেষারেষির মধ্যে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেশটার চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল। ভিয়াসের উপরটা আগে ছাদের মত সমান ছিল—সেই জায়গাটা বাটির মত গর্ত্ত হইয়া —সেই বাটির মধ্যে আবার একটা নূতন ছুঁচাল চূড়া বাহির হইল। আর পেয়াই?—পম্পেয়াই যেখানে ছিল সেখানে প্রায় ত্রিশ হাত উঁচু পাথর মাটি আর ছাই! সেই পম্পেয়াইকে আবার এতদিন পরে মানুষে কত যত্নে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া বাহির তেছে। দু হাজার বৎসর আগে মানুষেরা কি খাইত, তাহাদের ঘর বাড়ীর

বন্দোবস্ত কি রকম ছিল, তাহাদের হাট বাজার সরাইখানা, সভাঘর, মন্দির, কিরূ ছিল এখন আমরা চোখের সাম্‌নে দেখিতে পাই। ভিসুভিয়াস্ এক দিকে যে সহরকে নষ্ট করিয়াছে, আর এক দিকে আবার সেই ভাঙা সহরকে ছাই চাপা দি এতকাল আশ্চর্য্য রকম রক্ষা করিয়াছে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে কত মানুষের মৃত দে

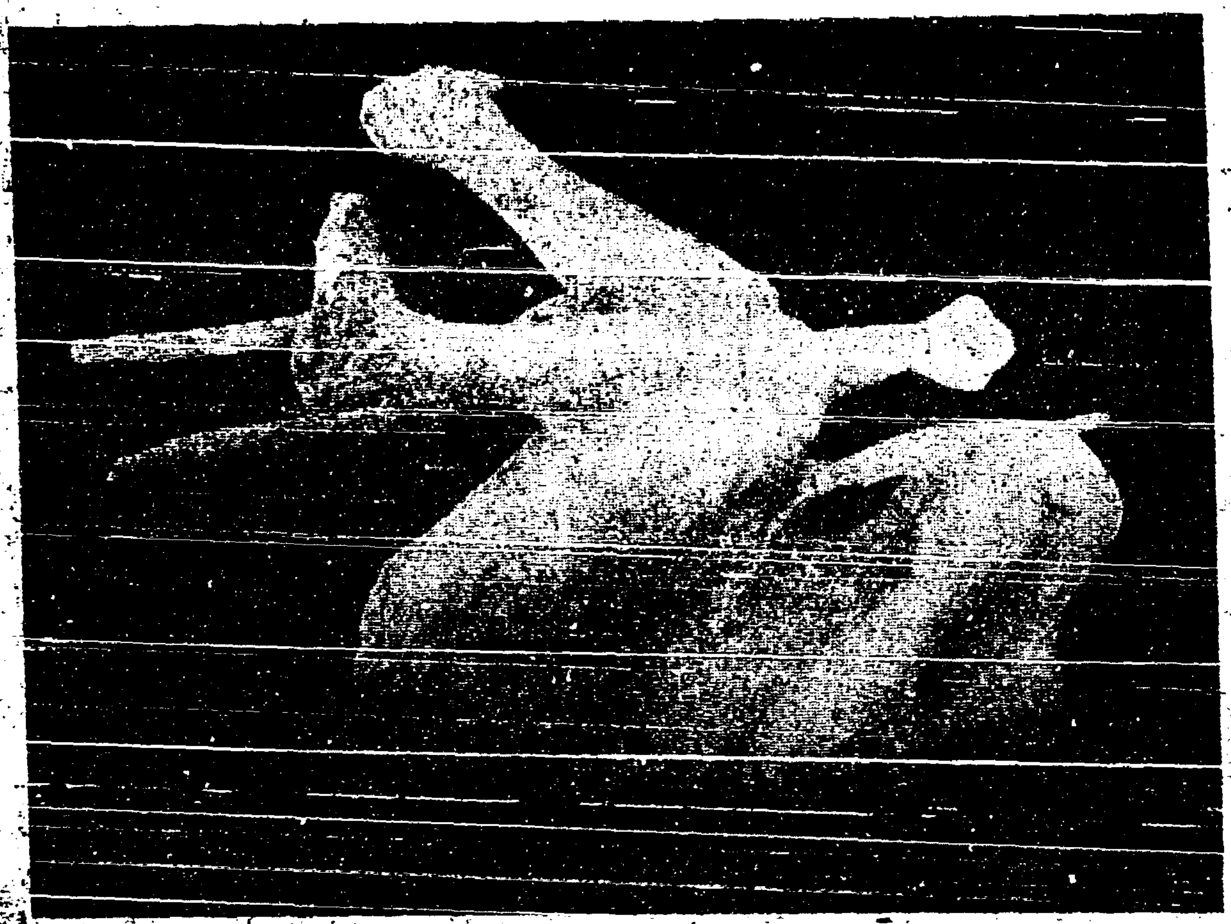

পাওয়া যায়—সেগুলি সমস্তই জমি পাথর হইয়া রহিয়াছে। ছবিতে দেখ এ জন লোক একটা গাছের ডাল হা করিয়া মারা গিয়াছে। বেচারা নী আগুণের স্রোত দেখিয়া গাছে উঠিয়াছি কিন্তু ডাল ভাঙিয়া আবার সেই আগুণে মধ্যেই পড়িয়া গেল! কোন জায়গা দু একটি, কোথাও অনেকগুলি লো একত্র মরিয়া আছে। কোথাও অন্ধকারে তাঁহার শিশুকে খুঁজিতে গিয়া মারা পড়িয়াছেন। কাহারও হাতে টাক থলি, কাহারও হাতে গহনার বাক্স!

চারিদিকে ভয়ের ছবি; লোকে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে পলাইয়াছে—অন্ধকা পথ হারাইয়া দিক্‌বিদিক্ ভুলিয়া পাগলের মত ছুটিয়াছে। এই গোলমাল ব্যস্ততা ঠিক মধ্যেই এক রোমান্ প্রহরী ফটকে পাহারা দিতেছিল। আশ্চর্য্য তাহার সাহ সে তাহার জায়গা ছাড়িয়া এক পাও নড়ে নাই পালাইবার চেষ্টাও করে নাই ফটকে থাকিতে হইবে এই তাহার কর্ত্তব্য—সুতরাং "যো হুকুম!" সে ফটকের সাম খাড়া থাকিয়াই মারা গেল এবং এইরূপ অবস্থাতেই অস্ত্র শস্ত্র বর্ম্ম শুদ্ধ তাহার দেহ পাও গিয়াছে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এরূপ আশ্চর্য্য পরিচয় জগতে খুব কমই পাওয়া যায়। এবা যে রঙীন্ ছবি দেওয়া হইল, তাহাতে চিত্রকর এই ঘটনারই একটা ছবি আঁকিয়াছেন।

এখন সেই সহরের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে কেমন অদ্ভুত লাগে। অনে জায়গায় দু হাজার বৎসর আগে যে জিনিষটি যেখানে ছিল এখনও ঠিক তেমি আছে—এক জায়গায় একটা টেবিলে খাওয়া দাওয়া চলিতেছিল হঠাৎ লো

ওয়া ফেলিয়া পালাইয়াছে—সেই টেবিল সেই খাওয়া তেম্‌নি রহিয়াছে—রুটিটা

পম্পেয়াইএর সরাইখানা।

য়া পাথরের মত হইয়া গিয়াছে—ছিপি আঁটা মাটির বোতলে মদ ছিল সেই মদ ন্ত ঠিক রহিয়াছে! এক জায়গায় হাঁড়িতে কি যেন জ্বাল হইতেছিল—সেই ড় এখনও চুল্লীর উপর সেইভাবে বসান রহিয়াছে! কোন জায়গায় বাড়ীর ইঁট ড়িয়া ঝাঁঝা হইয়া গিয়াছে; আবার কোথাও সাদা টালি, লাল কাল নানা রকম পাথরের জ, সমস্তই পরিষ্কার রহিয়াছে। একটা দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন লেখা আছে—

"আসেলিনাস্ ও স্মাইরিনে বলিতেছেন—ফস্‌কাস্‌কে তোমাদের অল্‌ডারম্যান্ দ নিযুক্ত কর।" ফস্‌কাস্ বেচারা এই সম্মান পাইয়াছিল কি না তাহা জানিবার র কোন উপায় নাই।

বাঁশি।

আমের আঁটি থামে ঘষে,'
গাল ফুলিয়ে আচ্ছা কসে'
ভজা বাজায় বাঁশি,
তাকায় ঘন বোনের পানে ;
"আমি ওস্তাদ" তাহার মানে,
চোখে খেলায় হাসি।
বোন্‌টি কাঁদ কাঁদ সুরে,
বল্‌ছে দাদার সাথে ঘুরে,
"দে না আমি বাজাই ;"
বোনের হল মিছে সাধা,
খাতিরে না আনেন দাদা !
যেন তিনি রাজাই !
ঐ যা ; ফেটে গেল বাঁশি !
বল্লে হয়ে খুসি,
"বেশ্ হয়েছে ! কেমন মজা ?"
অম্‌নি বোনের পিঠে ভজা
লাগাল এক ঘুষি !
মেরে ধরে ভজা পালায়।
কাঁদুনিতে পুঁটির গলায়
বাজে নূতন বাঁশি।
বল দেখি এখন তবে,
গল্প শুনে আমরা সবে,
কাঁদি কিংবা হাসি ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বুদ্ধিমান চাকর।

এক কাজি সাহেবের এক চাকর ছিল তার নাম বুদ্ধু। চাকরটা একে বিদেশী, তাতে শুদ্ধির ধার ধারে না—কাজেই কাজি সাহেবের মহা মুস্কিল। চাকরটা কায়দা কানুন ই জানে না—বাড়ীতে লোক আস্‌লে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। এক দিন কাজি সাহেব ক তুই ধমক দিয়ে বল্‌লেন "ফের যদি এরকম বেয়াদবী করিস্—কাউকে সেলাম না স্ তবে তোকে আমি দেখাব। সকলকে খাতির কর্‌বি আর 'সেলাম' বল্‌বি"। সেই থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যাকে দেখে সকলকেই বুদ্ধু "সেলাম" করে। ছেলে মানুষ গরু কাউকে বাদ দেয় না। এক গাধাওয়ালা তার গাধা নিয়ে চলেছে—রটা তাকে সেলাম কর্‌ল আর গাধাগুলোকেও খুব খাতির ক'রে বল্ল "সেলাম"। শুনে গাধাওয়ালা খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল আর বল্ল "দূর আহাম্মক, ওদের বুঝি সেলাম তে হয়; ওদের "হেই হেই" ক'রে চালাতে হয়। বুদ্ধু বেচারা কিছু দূর গিয়ে ল একজন শিকারী ফাঁদ পেতে বসে আছে, আর অনেকগুলো পাখী সেই ফাঁদের চ ঘুর্‌ছে। তাই দেখে সে 'হেই হেই' করে এম্‌নি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল যে পাখী টাখী সব ড় পালাল। শিকারীত চটে লাল!

আর এক দিন এক বড় লোকের বাড়ীতে কাজি সাহেবের নেমন্তন্ন। বুদ্ধুও সঙ্গে গিয়েছে। তারা নবাব বংশের লোক—আশ্চর্য্য তাদের আদব কায়দা। খেতে ত নিমন্ত্রণকর্ত্তার দাড়িতে একটা ভাত পড়ল—অম্নি একজন চাকর যেন গান ছে এম্‌নি ভাবে গুণ গুণ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল—

ফুলের তলে বুল্‌বুল্ ছানা
তারে উড়িয়ে দেনা—উড়িয়ে দেনা—

ম তার মনিব ইসারা বুঝ্‌তে পেরে দাড়ি ঝেড়ে ভাত ফেলে দিল। কাজি সাহেব ড়ী এসে বুদ্ধুকে বল্লেন "দেখ্‌লি ত কেমন কায়দা! আমার দাড়িতে যদি খাবার সময় ত লাগে তুইও ঠিক তেম্‌নি ক'রে বল্‌বি"। তারপর একদিন কাজি সাহেবের ড়ীতে খুব ভোজ হ'চ্ছে কাজি সাহেব চাকরের কেরামতি দেখাবার জন্য ইচ্ছা ক'রে তাঁর ড়িতে একটা ভাত ফেলে দিলেন আর বুদ্ধুকে চোখটিপে ইসারা কর্‌লেন। বুদ্ধু অম্‌নি চিয়ে বল্ল "সেই যে সে দিন অমুক্‌দের বাড়ীতে না কিসের কথা হ'য়েছিল? আপনার ড়ীতে তাই হ'য়েছে—তানানা তানা"। শুনে সব লোক হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।

একদিন মনিব বল্লেন "দেখ্ তুই বড় বিশ্রী ভাত রাঁধিস্। তুই এখনও মে গাল্‌তেই শিখিস্ নি। আজ যখন ভাত বানাবি, ভাত সিদ্ধ হ'লেই আমাকে ডাকি আমি দেখিয়ে দেব। আমাকে না দেখিয়ে কিছু করিস্‌নি।

সে দিন ভাত সিদ্ধ হ'তেই ত চাকর মনিবকে ডাক্‌তে গিয়েছে। দরজার বাই থেকে উঁকি মেরে একটা আঙুল দিয়ে ইসারা করে সে মনিবকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল কাজি সাহেব তখন দরজার দিকে পিছন ফিরে কি যেন লিখ্‌ছিলেন তিনি এ সব কিছু জানেন না। চাকরটা ঘণ্টাখানেক এই রকম "ডেকে" শেষটায় হয়রান হ'য়ে পড়্‌ল তখন সে রেগে চীৎকার করে বল্ল "আর কতক্ষণ ডাক্‌ব ?—এদিকে ভাতটাত স পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল"। তখন কাজি সাহেব ফিরে দেখেন চাকর তাঁকে একটা আঙু দিয়ে ইসারা কর্‌ছে—ওদিকে সত্যিসত্যিই ভাত পুড়ে ছাই।

একদিন রাত্রে কাজি সাহেবের বাড়ী চোর ঢুকেছে। বুদ্ধু খচ্‌মচ্ শব্দ শু জিজ্ঞাসা কর্‌ল "কেরে ?" চোরটা গম্ভীর ভাবে বল্ল, "কেউ নই বাবা, কেউ নই"। শুনে বুদ্ধু আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাতে লাগ্‌ল। সকালে উঠে কাজি সাহেব দেখে তাঁর সব চুরি হ'য়ে গিয়েছে। বুদ্ধুকে জিজ্ঞাসা ক'রে যখন রাত্রের কথা সব শুনলে তিনি খুব রেগে গালাগালি কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু বুদ্ধু তাতে মুখ ভারি বেজায় ক বল্ল—"তা কি কর্‌ব—সে আমায় বারবার করে বল্লে "কেউ নই, কেউ নই" লোকটা দেখ্‌ছি শুধু চোর নয়—ব্যাটা বেজায় মিথ্যাবাদী"।

একদিন কাজি সাহেব সহরের বাইরে কোথায় যাবেন। যাবার সময় বুদ্ধুকে ব গেলেন, "দেখিস্ দরজাটার উপর ভাল ক'রে চোখ রাখিস্—দরজা ছেড়ে কোথা যাস্‌নে, তা'হলে চোরে আমার সব নিয়ে যাবে"। কাজি সাহেব চলে গেলেন—চা বেচারা এক লাঠি নিয়ে দরজায় পাহারা দিতে লাগ্‌ল। এক দিন গেল, দু দিন গেল, ত পর দিন বুদ্ধু শুন্‌ল এক জায়গায় ভারি তামাসা দেখান হচ্ছে। তাইত, বেচারা কি করে ? অনেক ভেবে সে কর্‌ল কি বাড়ীর দরজাখানা খুলে সেটাকে ঘাড়ে নি তামাসা দেখ্‌তে গেল। এদিকে বাড়ীতে চোর ঢুকে যা কাণ্ড ক'রে গেল সে আর কি বল্‌ব। কাজি সাহেব বাড়ীতে এসে দেখেন—সর্ব্বনাশ, বাড়ীর সিন্ধুক আল্‌মারি স খালি। ওদিকে বুদ্ধু ব'সে তামাসা দেখ্‌ছে আর খুব সাবধানে দরজা পাহারা দিচ্ছে।

বনের খবর।

একেতো বিশ্রী রাস্তা, দেওয়ালের মতন খাড়া পাহাড়, তাতে আবার বৃষ্টি হয়েছে—দের উপর যেন বিষ ফোঁড়া। আমি কাজে গিয়েছি, লোকজনদের বলে দিয়েছি জায়গায় নিয়ে তাঁবু ফেলতে। ৩ টার সময় কাজ শেষ করে ফিরতে আরম্ভ ছি। বেজায় বন, মানুষের সমাগম নাই, খালি দলে দলে হাতী ফেরে। তাই ছুটাছুটি করে পথ চলছি, পাছে রাত হয়ে যায়।

লোকদের যেখানে যেতে বলে দিয়েছিলাম, তার ২।২৷৷০ মাইল আগেই তাঁবু ম। একটা হাতী পিছলে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে, তাকে নিয়ে আর বেশী তারা যেতে পারেনি। কাজেই আর কি করা যায়? সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এখন না থাকলেও সেইখানেই থাকতে হবে। তাঁবুটি একটি ছোট্ট নদীর ধারে, রাস্তা ২০।২৫ হাত দূরে। নদীর উপরে একটা বাঁশের পোল আছে।

খাওয়া দাওয়া করে সকলে শুয়েছি। এপ্রিল মাস, বেজায় গরম, তাই তাঁবুর বন্ধ করিনি। ডম্বর আর সোধন বলে দুজন খালাসী নদীর ধারে বালির উপর করে খেয়ে সেইখানেই শুয়ে আছে। তাদের ডাকা হল, কিছুতেই এল না।

প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমারও একটু একটু চোখ লেগেছে, এমন সময় নাম, গঙ্গারাম দোভাষীকে বলছে, "দোভাষী ভাই, ওটা কি? ঐ দেখ, পোলের দিয়ে আসছে!" আমি কাণ খাড়া করে শুনতে লাগলাম,—বাঁশের পোলটার দিয়ে একটা বেশ বড় আর ভারী জানোয়ার আসছে; পোলটা তাতে ক্যাঁচ ম্যাচ ছ। পাশেই বন্দুক আর টোটা ছিল, হাতে নিয়ে চুপি চুপি তাঁবু থেকে বেরুলাম। টার মাঝামাঝি এক জায়গায় গাছের ফাঁক দিয়ে একটু চাঁদের আলো পড়েছিল। খানটায় জানোয়ারটা আসতেই দেখি, প্রকাণ্ড বাঘ! সেটা কিন্তু তখনি আবার কারে ঢাকা পড়ে গেল। তারপর আমি বন্দুকে ছিটা ভরে গুড়ুম্ গুড়ুম্ দুটো য়াজ করতেই সে দুই লাফে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়ল। গুলি মারতে আমার হয়নি, কেন না, অন্ধকারে এক গুলিতে সেটা না মরারই কথা। মিছামিছি তাকে লাগিয়ে বিপদ ডেকে আনা কেন?

বন্দুকের আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। সোধন ত উঠেই এক দৌড়ে মধ্যে! ডম্বর কিন্তু এল না। হাতীর মাহুত ডেকে বল্ল, "ভাগ, ডম্রা, ভাগ!

শের আয়া !” ডম্বরের তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। তখন দু তিন জন ছুটে গিয়ে তা
ঠেলতে লাগল। সে জেগেই ছিল, ঠেলা খেয়ে চটে বল্ল, “কেঁউ দিক্ করতা ? শে
আয়া তো ক্যা হুয়া ? খায়েগা তো হামকো খায়েগা, তুম লোগ্‌কা ক্যা হৈ ? হাম ন
যায়েগা !” সমস্ত রাত সে সেইখানেই কাটাল। গোলটা তার কাছ থেকে ১০।
হাত মাত্র দূরে ছিল।

লুশাই পাহাড়ে বাঘ মারার এক মজার ফন্দি দেখেছিলাম। বনের ভিতর ব
ভালুক চলবার পথ আছে। সেই সব পথের কোন কোনটা দিয়ে বাঘ বেশী যাও
আসা করে, লুশাইরা আগে তার খোঁজ নেয়। তারপর সেই সব পথের ধারে ধা
যে যেখানে পাহাড়ের গা বড্ড ঢালু, সেখানে কোদাল দিয়ে খুঁড়ে আরো বেশী ঢা
আর গর্ত্ত করে দেয়। তারপর লম্বা লম্বা বাঁশের খোঁটা পুতে, পাহাড়ের গায় রাস্তা
সমান উঁচু মস্ত মাচা বেঁধে, তাতে মাটি ফেলে, ঘাস লাগিয়ে, ঠিক সমান জমির মত বেমালুম করে রাখে। মাচার তলায় থাকে ফাঁক, আর তার ঠিক নীচে, মাটিতে থাকে এই বড় বড় ভয়ঙ্কর ধারাল সব ‘বল্লম’ পোতা। এসব জিনিসকে ডাল পালা দিয়ে ঢেকে এমনি ঝোপের মতন করে দেওয়া হয় যে হঠাৎ দেখে বুঝবার যো নাই। আর, মাচার উপরে বেশ মোটা সোটা একটি কুকুর বা শূয়রের বাচ্ছা এমনি ভাবে বেঁধে রাখা হয় যে, মাচায় না উঠে তাকে পাবার যো নাই।

বাঘ মশায় তুল্‌তে তুল্‌তে পথ দিয়ে আসেন, আর দেখতে পান, ফলার তয়ে
বাস্! অমনি ‘হাল্লুম !’ বলে দে লাফ, আর হুড় মুড়িয়ে মাচা শুদ্ধ পড়ে, সে

ল্লমগুলোর উপরে। ফলার রইল মাথায়, আর বল্লম ঢুকল পেটে, আর আকাশ ফাটল চাচানির চোটে। তারপর ছটফটানি চল্ল, ততই আরো বল্লম গায় বিঁধতে লাগল। এমনি করে ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই সব শেষ।

বনের ভিতরে জরীপের কাজ করতে হলে, সামনে পিছনে দুজন লোকে নিশান ধরে, আর ঐ নিশান দেখে জরীপ দিয়ে মেপে যায়। অনেক সময়ই কিন্তু নিশানও দেখা যায় না। ততক্ষন একখানা ছোট্ট আয়না নিয়ে চম্‌কাতে হয়, তার ঝিকিমিকি ৩।৪ জরীপ দূর থেকেও দেখতে পাওয়া যায়। আয়না চম্‌কাবার সময় সামনের লোকটি সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করতে থাকে, তাতে ঠিক তার সোজাসুজি জরীপ দিয়ে মেপে যাবার সুবিধা হয়।

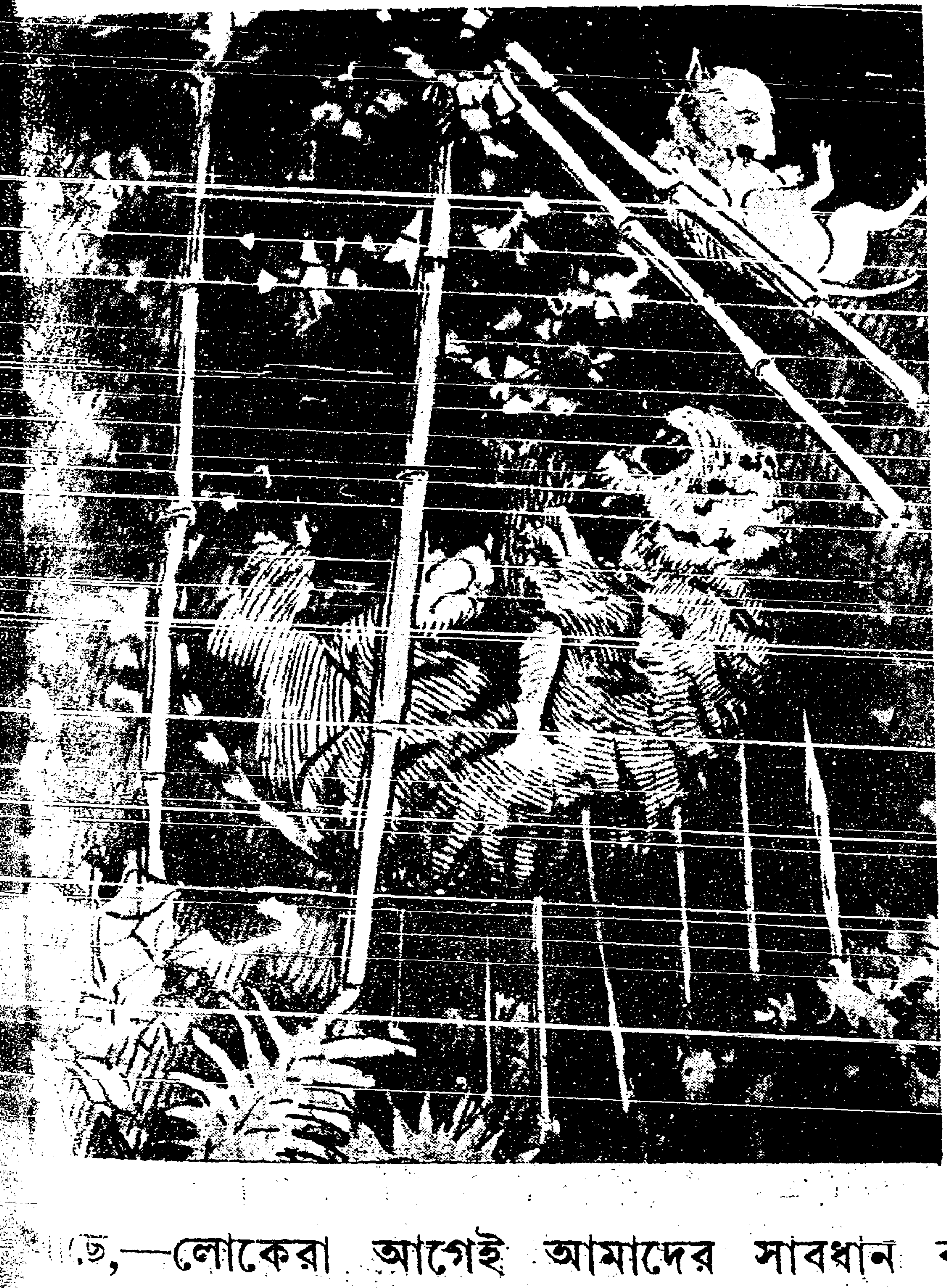

'ফুটকিয়া' নূতন লোক; সামনে থেকে চমক্ দিবার কাজটি তার হাতে। চমক্ দিয়েছে ঠিক, কিন্তু আওয়াজ আর দেয় না! ব্যাপার কি? সে পথে বাঘের ভয় আছে,—লোকেরা আগেই আমাদের সাবধান করে দিয়ে ছিল। কাজেই আমার একটু সন্দেহ হল, আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে চল্লাম।

খানিক দূর গিয়েই দেখি কাদার উপরে ফুটকিয়ার পায়ের দাগ, আর তার পাশেই প্রকাণ্ড বাঘের পাঞ্জা! বাঘটা এইমাত্র গিয়েছে, তখনো চারদিকের জল গড়িয়ে এসে সেই দাগে জমছে। আমি খুব চীৎকার করে হাঁক দিলাম, "ফুটকিয়া!" হাত ২০।২২ সামনে ভাঙ্গা গলায় আওয়াজ হল, "হুজুর!" তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন একটা

কি জানোয়ার জঙ্গলে গা ঢাকা দিলে। দৌড়ে ফুট্‌কিয়ার কাছে গেলাম। বেচারা রাস্তার মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখে কথা নাই।

'কি রে! কি হয়েছে?' বল্লে, 'একটা কি আমার পিছু পিছু আসছিল।' 'কোথায় গেল?' 'এইখানেই ত ছিল। হুজুর ডাকলেন, আর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।' যেখানটায় ছিল বলে দেখাল, সে জায়গাটা ফুট্‌কিয়ার কাছ থেকে ৭৷৮ হাত দূরে হবে।

"কেমন জানোয়ার ছিল রে?" "তানি মটুকে তো থা।" (বলে হাত দিয়ে মাটি থেকে ফুট তুই উঁচু দেখাল)। লাল লাল ঔর কালা ভি থা। এৎনা বড়া উস্কা শির থা, ঔর তুম হিলাতা থা!" "আরে শের থা রে?" "নহি হুজুর! শের হোতা তো হামকো খা ডালতা নেহি?" ভাল! যে প্রকাণ্ড পায়ের দাগ, আর মিনিট খানেক আমার দেরী হলেই "খা ডালতা" কি না বুঝতে পেত!! আসল কথা, ফুট্‌কিয়া আর কখনো বাঘ দেখে নাই।

অনেকে সন্দেশের "বনের খবর" লেখাগুলি গল্প মনে ক'রে পড়েন। এ সব যে সত্য ঘটনারই বর্ণনা তা অনেকেই জানেন না। যিনি বনের খবর পাঠান তাঁকে বাস্তবিকই ওই রকম বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কাজ কর্‌তে হয়। শশী, গঙ্গারাম এ সবই সত্যিকার লোকের নাম। "বনের খবর" ঘরে বসে কল্পনা ক'রে লেখা গল্প নয়—সত্যি সত্যিই বনের খবর।

বিচার।

একজন দুষ্টু লোক এক বেচারা পণ্ডিতের কিছু টাকা নিয়েছিল। শেষে সে টাকাটা কিছুতেই দিতে চায় না—বলে "আমি ত তোমার টাকা নিই নি"। এই নিয়ে ক্রমে রাজার কাছে নালিশ গেল। রাজা দুজনকেই ডেকে পাঠালেন; প্রথম পণ্ডিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "পণ্ডিত জী, ওই লোকটা আপনার টাকা নিয়েছে?" পণ্ডিত বল্লেন "হাঁ, মহারাজ ও আমার টাকা নিয়ে দিচ্ছে না"। রাজা বল্লেন "বটে! ব্যাটা এম্‌নি পাজি, যান এখনি এই ছুরী নিয়ে ব্যাটার দুকাণ কেটে আনুন"। পণ্ডিত মহাশয় জিভ কেটে কাণে হাত দিয়ে বল্লেন "মহারাজ, কয়টা টাকার জন্য একজনের কাণ কেটে ফেল্‌ছ? তা আমি পার্‌ব না"। তখন সেই লোকটাকে ডাকা হ'ল। রাজা বল্লেন "কি

, পণ্ডিত মশায়ের নালিশ সত্যি ত” ? সে বল্ল “না মহারাজ, ও মিথ্যে কথা বল্‌ছে”। জা বল্লেন “বটে! মিথ্যে নালিশ! তবে কাট পণ্ডিত মহাশয়ের কাণ।” তাই শুনে াকটা ভারি স্ফূর্ত্তি ক’রে যেই পণ্ডিত মহাশয়ের কাণ কাট্‌তে গিয়েছে, অম্‌নি রাজা ল্লেন “থাম্! ব্যাটা হতভাগা, বদ্‌মায়েস্! তুই সামান্য টাকার জন্য লোকের গায়ে ছুরি াতে পারিস্? তবে তুই সব করতে পারিস্! দে এক্ষুনি সুদে আসলে সব টাকা ; নৈলে তোকে চাব্‌কিয়ে দেশছাড়া কর্‌ব”। হতভাগা ভয়ে ভয়ে তখনি টাকা য়ে ফেল্ল।

জানোয়ারের বয়স।

জানোয়ারের মধ্যে তিমি মাছ নাকি সব চেয়ে বেশী দিন বাঁচে। অনেকের মতে মি মাছ হাজার বৎসর বাঁচে—কিন্তু কথাটা কতদূর সত্য বলা যায় না। হাতী ধারণতঃ একশ’ বৎসর বেশ বাঁচ্‌তে পারে। গ্রীক রাজা আলেক্‌জান্দার যখন সেছিলেন তখন তিনি একটা হাতী এখান থেকে নিয়ে যান। সেটা নাকি ৩৫০ ৎসর বেঁচেছিল। কচ্ছপ আর কুমীর খুব অনেক দিন বাঁচে তার অনেক প্রমাণ াছে। আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় এক পোষা কুমীর আছে তার বয়স তিনশ বৎসরের কম নয়। সে এখনও বেশ মজ্‌বুত আছে। প্রায় একশ বছর াগে একটা বড় কচ্ছপকে ধ’রে তার গায়ে তারিখ ইত্যাদি লিখে দেওয়া হয়েছিল— ই কচ্ছপ এখনও বেঁচে আছে। ঘোড়া ৩০।৪০ বৎসরের বেশী বড় বাঁচে না কিন্তু ট প্রায় একশ বৎসর বেশ বেঁচে থাক্‌তে পারে। শেয়াল, ভালুক, নেক্‌ড়ে প্রভৃতি ৫।২০ বৎসরের বেশী সাধারণতঃ বাঁচে না। বেড়ালেরও প্রায় ওই রকমই।

পাখীদের মধ্যে রাজহাঁস খুব দীর্ঘজীবি—একশ বৎসর বয়সের রাজহাঁস ত দেখা াছেই—কোন কোনটা নাকি তিনশ’ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে! কাক, বিশেষত দাঁড়-কাক, নেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচে—আশি নব্বই একশ পর্য্যন্ত পার হ’য়ে যায়! কাক যে অনেক া বাঁচে এই বিশ্বাস লোকের মনে বরাবরই আছে। আমরা ছেলেবেলায় ভূষণ্ডি কের কথা শুনেছি—সে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখে বলেছিল “এর চাইতে রামরাবণের যুদ্ধ র দেবতা অসুরের যুদ্ধটা ভাল হ’য়েছিল—তখন আমি হাঁ ক’রে কাছে ব’সে থাক্‌তাম

আর আপনা থেকে রক্ত এসে মুখে পড়্ত"। ঈগল পাখীও কখন কখন প্রায় একশ বছর পর্য্যন্ত বাঁচে। আমরা একটা টিয়া পাখীর কথা জানি সেটা প্রায় পঁচিশ বছর বেঁচেছিল।

ধাঁধা।

১। এক জাহাজের কাপ্তেন ৩০ জন লোক সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা কর্‌লেন। সমুদ্রের মাঝখানে পথ হারিয়ে ফেলায় জাহাজের খাবার কম পড়্‌ল, আর কাপ্তেন ঠিক কর্‌লেন যে ১৫ জনকে জলে ফেলে দিতে হবে। ১৫ জন লোক ছিল কাপ্তেনের দেশী, আর ১৫ জন বিদেশী। তাদের সার বেঁধে দাঁড় করান হ'লো, আর ঠিক হ'লো যে এক দুই তিন চার ক'রে গুনে গুনে প্রত্যেক দশম লোককে জলে ফেলে দেওয়া হবে। কাপ্তেন তাই করলেন কিন্তু লোকদের এমন ভাবে সাজালেন যে কেবল বিদেশী লোকদেরই জলে ফেলা হ'লো, দেশী লোক সব বেঁচে গেল। বল দেখি কেমন ভাবে সাজান হয়েছিল?

২। ১৩টি গুলি একটি যোগচিহ্নের আকারে এমন ভাবে সাজান হইয়াছে যে উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত ৭টি, ডানের শেষ গুলি হইতে নীচের শেষ গুলি পর্য্যন্ত ৭টি, বামের শেষ গুলি হইতে নীচের শেষ গুলি পর্য্যন্ত ৭টি গুলি গুনিতে পারা যায়, এইরূপ;—

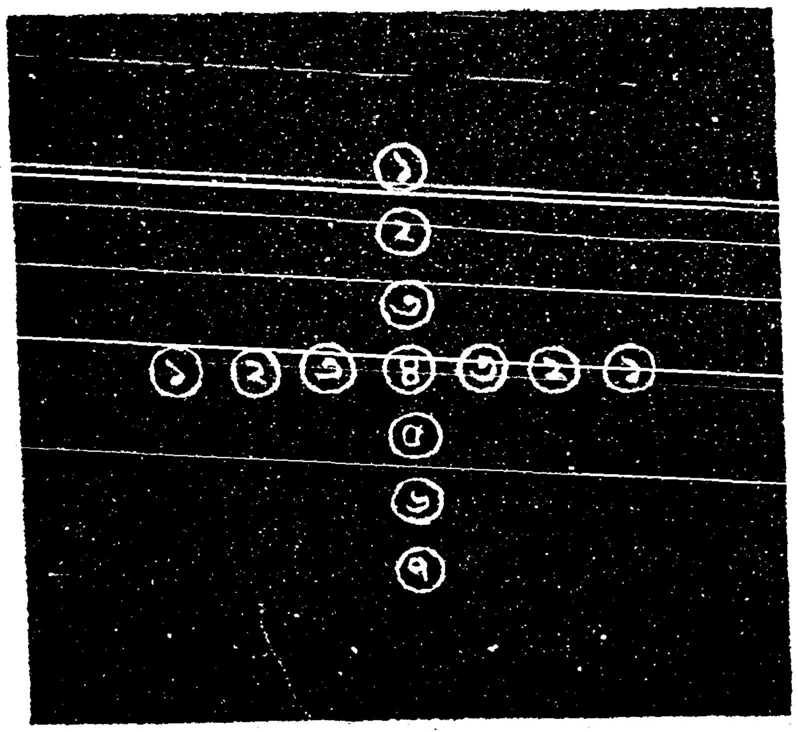

এই ১৩টি গুলি হইতে ২টি গুলি সরাইয়া লইয়া ১১টি গুলি এমন ভাবে সাজাও যে তখনও আগের মত উপর, ডান, অথবা বাম হইতে গুনিলে ৭টি গুলিই গোনা যায়।

৩। ৪৫ কে এমন ৪টি ভাগে বিভক্ত কর যে প্রথম ভাগে ২ যোগ করিলে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে ২ বিয়োগ করিলে, তৃতীয় ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিলে, এবং চতুর্থ ভাগকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যোগফল, বিয়োগফল, গুণফল এবং ভাগফল একই হইবে।

পাঁচ পুতুলের ঘরকন্না মানুষটি এক রত্তি,
রকমখানা এম্‌নি, যেন মা হয়েছেন সত্যি।
কাপড় চোপড় কর্‌ছে সেলাই একলা বসে চুপ্‌টি,
দুষ্টু ছেলের দস্যিপানায় ভাবনা ভরা মুখ্‌টি।

Blocks and Printing by U. RAY & SONS

য় বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২১ | চতুর্থ সংখ্যা

সাগর যেথা লুটিয়ে পড়ে নতুন মেঘের দেশে—
আকাশ ধোয়া নীল যেখানে সাগর জলে মেশে।
মেঘের শিশু ঘুমায় সেথা আকাশ দোলায় শুয়ে—
ভোরের রবি জাগায় তারে সোনার কাঠি ছুঁয়ে।
সন্ধ্যা সকাল মেঘের মেলা—কূলকিনারা ছাড়ি,
রং বেরঙের পাল তুলে দেয় দেশ বিদেশে পাড়ী।
মাথায় জটা, মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে,
জোছ্‌না রাতে চাঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে।
বর্ষাধারা মাথায় ব'য়ে কোন্ পথে যায় ভেসে—
পথহারা কোন্ গ্রামের পরে নাম-জানা-নেই দেশে।
ঘূর্ণীপথের ঘোরের নেশা দিক্‌বিদিকে লাগে,
আগল ভাঙা পাগল হাওয়া বাদল রাতে জাগে ;
ঝড়ের মুখে বাঁধন খসে, আঁধার আসে ঘিরে !
মেঘের প্রাণে বিজলী হানে আকাশ চিরে চিরে !
বুকের মাঝে বেদনা বাজে—শঙ্খরবের ঘটা !
লুটিয়ে পড়ে অবশ তনু ছিন্ন মেঘের জটা।
মেঘের মরণ ঘনিয়ে এল শ্রাবণ দিনের শেষে—
বর্ষামেঘের অশ্রুধারায় সৃষ্টি যায়রে ভেসে ॥

রাবণ।

একবার রাবণ মানুষ তাড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দেখিল যে মেঘের উপর দি
নারদ মুনি হরিনাম গান করিতে করিতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে নমস্কার ক
বলিল, "কি ঠাকুর মহাশয়! মঙ্গল ত? কি জন্য আসিয়াছেন?"

নারদ বলিলেন, "আসিয়াছি যে বাপু, একটা কথা আছে। এই সব মানুষ
মৃত্যুর বশ, তখন এরা ত মরিয়াই রহিয়াছে; ইহাদিগকে মারিবার জন্য তুমি আ
এত পরিশ্রম কেন করিতেছ? ইহারা আপনা আপনিই একদিন যমের বাড়ী যাই
বাস্তবিক, যমই যত নষ্টের গোড়া। অতএব, সেই বেটাকে যদি জব্দ করিতে পা
তবে সকলকেই জয় করা হইবে।"

রাবণ বলিল, "বড় ভাল কথা বলিয়াছেন, ঠাকুর মহাশয়, আমি এখনি যাইতেছি
বলিয়াই আর এক মুহূর্ত্তও দেরী নাই,—অমনি রাবণ যমপুরীর পথ ধরিয়াছে! অ
নারদ ভাবিলেন, "এবারে মজাটা হইবে ভাল! যাই, একবার দেখিয়া আসি।"

নারদ রাবণের আগেই গিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম বিচারা
বসিয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া সকলের পাপ পুণ্যের বিচার করিতেছিলেন, নারদকে দে
ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "মুনিঠাকুরের আজ কি চাই?"

নারদ বলিলেন, "সাবধান হও বাছা, রাবণ তোমাকে জয় করিতে আসিতে
মুস্কিল হইতে আটক নাই কিন্তু বেটা বড় বেখাপ্পা লোক!"

বলিতে বলিতেই রাবণের ঝক্‌ঝকে পুষ্পক রথও আসিয়া দেখা দিল। রথ হ
নামিয়াই সে দেখিল যে নরকের কুণ্ডে দলে দলে পাপী সকল যমদূতগণের তাড়
চীৎকার করিতেছে। অমনি আর কথাবার্ত্তা নাই,—সে যমদূতগুলিকে বিধি
ঠ্যাঙ্গাইয়া সকল পাপীকে ছাড়িয়া দিল! সে বেচারারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া, যে
আশ্চর্য্য আর খুসী হইল, তাহা আর বলিবার নয়। তখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল,
বড়ই ভয়ঙ্কর। যমপুরীতে অসংখ্য সিপাহী সান্ত্রী থাকে, তাহাদের এক একজন ভয়া
যোদ্ধা। তাহারা রাবণ আর তাহার লোকদিগকে মারিয়া রক্তারক্তি করিয়া দি
মার খাইয়াও কিন্তু রাবণ যুদ্ধ করিতে ছাড়ে না। শূল শক্তি প্রাস গদা গাছ প
কত যে সে ছুঁড়িল, তাহার লেখা জোখা নাই। তখন যমের লোকেরা আর রাক্ষ
ছাড়িয়া কেবল রাবণের উপরেই এমন ভয়ানক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তা

ক রথ অবধি ডুবিয়া গিয়া রাবণের দম আটকিয়া মরিবার গতিক! দুর্দ্দশার এক ; রক্ত ধারায় দেহ ভাসিয়া গেল ; কবচ কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। কাজেই তাহাকে রথ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।

এতক্ষণে আর রাবণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এবারে একটু বেগতিক, একটা রকমের অস্ত্র না ছাড়িতে পারিলে আর চলিতেছে না। কাজেই সে তখন ধনুকে পত অস্ত্র যুড়িয়া যমের লোকদিগকে বলিল, "দাঁড়া বেটারা! এবারে তোদের ইতেছি!" এই বলিয়া সে সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছুঁড়িবা মাত্রই, তাহার তেজে যমের সিপাহি ভস্ম হইয়া গেল। তখন রাবণের আর রাক্ষসগণের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড আর কি!

সেই সিংহনাদ শুনিয়াই যম বুঝিতে পারিলেন যে রাক্ষসদিগের জয় হইয়াছে। কাজেই রথে চড়িয়া তাঁহাকে স্বয়ংই বাহির হইতে হইল। সে যে কি ভয়ঙ্কর সে কথা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার উপর আবার স্বয়ং মৃত্যু প্রাস মুদ্গর লইয়া ভীষণ বেশে যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কালদণ্ড প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সকল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে।

সেই রথ আর তাহার ভিতর মৃত্যুকে দেখিয়াই রাবণের লোকেরা "বাপরে! দের যুদ্ধে কাজ নাই!" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে না পাইয়া, যমের সঙ্গে খুবই যুদ্ধ করিতে লাগিল। অস্ত্রের ভয় ত তাহার , কারণ, সে জানে যে ব্রহ্মার বরের জোরে সে মরিবে না। কাজেই অনেক চা যেমন খাইল, খোঁচা দিলও ততোঽধিক। খোঁচা খাইয়া যম রাগে অস্থির হইয়া লেন, তাঁহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তখন মৃত্যু যমকে বলিল, "আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এখনি এই দুষ্টকে মারিয়া ছি। আমি ভাল করিয়া তাকাইলে আর ইহাকে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে হইবে না।" বলিলেন, "দেখ না, আমি ইহাকে কি সাজা দিই।" এই বলিয়াই তিনি রাগে চোখ লাল করিয়া তাঁহার সেই ভীষণ 'কালদণ্ড' হাতে নিলেন। সে দণ্ড যাহার র পড়ে, তাহার আর রক্ষা থাকে না॥

যমকে কালদণ্ড তুলিতে দেখিয়া ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, কে কোন দিক পালাইবে তাহার ঠিক নাই, দেবতাদের অবধি বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। ব্রহ্মা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া যমকে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! কর কি?

এই কালদণ্ড তুমি ছুঁড়িলেই যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কালদণ্ডও আমি গড়িয়াছি, রাবণকেও আমিই বর দিয়াছি। আমিই বলিয়াছি যে কালদণ্ড কিছুতে ব্যর্থ হইবে না, আবার আমিই বলিয়াছি যে রাবণ কোন দেবতার হাতে মরিবে না। এখন, এই অস্ত্রে যদি রাবণ মরে, তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়, যদি না মরে তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়। লক্ষ্মীটি! আমার মান রাখ, এ অস্ত্র ছুঁড়িয়ো না।”

কাজেই যম তখন আর কি করেন? তিনি বলিলেন, “আপনি হইতেছেন আমার প্রভু, সুতরাং আপনার হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু, যদি এ দুষ্টকে মারিতেই না পারিলাম, তবে আর আমার এখানে থাকিয়াই কি ফল?” এই বলিয়া যম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তাহা দেখিয়া রাবণ হাত তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, “দূয়ো! দূয়ো! হারিয়া গেলি! হারিয়া গেলি!!” ততক্ষণে অন্য রাক্ষসদেরও খুব সাহস হইয়াছে, আর তাহারা আসিয়া ‘জয় রাবণের জয়!’ বলিয়া আকাশ ফাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

তার পর?

এক যে রাজা, তার ভারী গল্প শোনার সখ। কিন্তু তা থাকলে কি হয়,—রাজা মশাইকে কেউ গল্প শুনিয়ে খুসী করতে পারে না।

রাজা মশাই বলেন, “যে আমাকে গল্প শুনিয়ে খুসী করতে পারবে, তাকে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য দিব; না পারলে কান কেটে নিব।” তা শুনে, দেশ বিদেশের কত ভারী ভারী নামজাদা গল্পওয়ালা কোমর বেঁধে গোঁফে তা দিয়ে গল্পের ঝুড়ি নিয়ে আসে, কিন্তু কেউ রাজামশাইকে খুসী করতে পারে না। যাবার সময় সকলেই কাটা কান নিয়ে দেশে যায়।

গল্প বলতে গেলেই রাজা মশাই খালি বলেন, “তার পর?” ‘তারপর’ ‘তারপর’ করে গল্পওয়ালার দফা শেষ করে তবে তিনি ছাড়েন। ‘রাক্ষস মরে গেল’—‘তারপর?’ ‘রাজপুত্র বেঁচে গেলেন’—‘তারপর?’ ‘বৌ নিয়ে দেশে এলেন’—‘তার পর?’ ‘তারপর আনন্দ হল’—‘তার পর?’ ‘আমার কথা ফুরুল’—‘তার পর?’ ‘নটে গাছটি মুড়ল’—‘তার পর?’

এমনি করে আর কত বলবে? কাজেই শেষে একবার তাকে বলতে হয়, 'আর নি না' বা 'আর বলতে পারছি না।' তাহলেই রাজা বলেন 'তবে গল্প বলতে সেছিল কেন? কাট তবে বেটার কান!'

এই ত ব্যাপার। রাজা মশাইয়ের 'তার পরের' শেষও কেউ করে উঠতে পারে না, র্দ্ধেক রাজ্যও পায় না, লাভের মধ্যে কানটি যায়।

সেই দেশে থাকে এক নাপিত, সে বড্ড কুঁড়ে, কিন্তু ভারী সেয়ানা। সে ভাবল, অর্দ্ধেক রাজ্য যদি পাই, তবে নেহাৎ মন্দ হবে না; একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি ? না হয় কানটা যাবে।"

এই বলে সে জামা যোড়া পরে, মস্ত পাগড়ী বেঁধে, লম্বা ফোঁটা কেটে, রাজার সভায় য়ে লম্বা সেলাম ঠুকে যোড় হাতে বল্ল, "মহারাজের জয় হো'ক! হুকুম হয় ত কিছু া শোনাই।"

রাজা বল্লেন, "ভাল, ভাল! কিন্তু আমার সর্ত্ত জান ত? খুসী করতে পারলে র্দ্ধেক রাজ্য দিব, না পারলে কানটি কেটে নিব।"

নাপিত বল্ল, "আমার গল্পের আগাগোড়া সব শুনতে হবে, মাঝখানে থামতে বলতে রবেন না।"

রাজা বল্লেন, "তাই সই, আমিও ত তাই চাই।"

তখন নাপিত চাকর মহলে গিয়ে আচ্ছা করে ছিলিম আট দশ তামাক টেনে এসে গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল।—"মহারাজ! এখান থেকে অনেক দূরে এক আজব া আছে।" অমনি মহারাজ বল্লেন, "তার পর?"

"সেইখানে অনেক দিন আগে ভারী নামজাদা এক রাজা ছিলেন।"—"তার পর?"

"তাঁর রাজ্যের একধার থেকে আরেক ধারে যেতে ছ মাস লাগত।"—"তার পর?"

"আর সে রাজ্যের মাটি যে কি সরেশ ছিল, কি বলব?—"তার পর?"

"তাতে এক সের ধান বুনলে, দশ মণ ধান পাওয়া যেত।"—"তার পর?"

"তাই দেখে রাজা মশাই তার রাজ্যের সকল জমিতে ধানের চাষ করালেন।"—তার পর?"

"আর তাতে ধান যে হল! সে ধান রাখবার জন্য যে গোলা তয়ের হয়েছিল, তার ধারে দাঁড়ালে আরেক ধার দেখা যেত না।"—"তার পর?"

"লাখে লাখে মোষের গাড়ী লেগেছিল, সে ধান গোলায় আনতে। এত বড়

গোলা তাতে একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, আরেকটু হলেই ফেটে যেত।”—
“তার পর?”

“তার পর সেই ধানের খবর পেয়ে পঙ্গপাল যে এল! পঙ্গপালে দশ দিক ছেয়ে গেল, আকাশ অন্ধকার, হাওয়া চলবার যো নাই, শ্বাস টান্‌লে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল নাকে ঢোকে।”—“তার পর? তার পর?”

“বেটারা এসেছে ধান খেতে। কিন্তু রাজা মশায়ের গোলা কি যেমন তেমন করে গড়া? পঙ্গপালের সাধ্যি কি, তাতে ঢুকবে? দশ দিন বেটারা বন্ বন্ করে গোলার চারধারে ঘুরে বেড়াল, বেড়ার কোনখানে একটা বিঁধ বার করতে পারল না!”—
“তার পর? তার পর?”

“তার পর এগার দিনের দিন কয়েকটা ডানপিটে ছোকরা পঙ্গপাল খুঁজে খুঁজে কোত্থেকে গিয়ে একটা বিঁধ বার করেছে, অনেক ঠেলাঠেলি করলে তা দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়।”—“তার পর? তার পর?”

“তখন তাদের পালের গোদাটা এসে সেই বিঁধের মুখে বসে বল্ল, ঠ্যাল্ ত রে বাপু সকল তোরা সবাই মিলে, দেখি, ভিতরে ঢুকতে পারি কি না।”—“তার পর?”

“তার পর, ওঃ! সে কি বিষম ঠেলা ঠেলি! গোদা বেটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল, তবু বল্‌লে ‘ঠ্যাল্! ঠ্যাল্’!”—“তার পর?”

“শেষে অনেক কষ্টে, অর্দ্ধেক ছাল বাইরে রেখে তবে গিয়ে বেটা ভিতরে ঢুক্‌ল।”
—“তার পর?”

“ঢুকে, একটি ধান মুখে করে নিয়ে, বিঁধের কাছে এসে বল্ল, এবারে আমাকে টেনে বার কর্!”—“তার পর?”

“ওহ্! সে কি টানাটানি! আরেকটু হলেই বেটা ছিঁড়ে যেত। যা হোক, অনেক কষ্টে সে ধানটি নিয়ে বাইরে এল।”—“তার পর?”

“তার পর আরেক বেটা গিয়ে বসেছে সেই বিঁধের মুখে, আর তেমনি ঠেলাঠেলির পর ভিতরে ঢুকেছে, আর একটি ধান নিয়ে তেমনি টানাটানির পর বাইরে এসেছে।”—“তার পর?”

“তার পর আরেক বেটা গিয়ে ঢুকেছে, আর একটা ধান নিয়ে বাইরে এসেছে।”—
“তার পর?”

“তার পর আরেক বেটা!”—“তার পর?”

"আরেক বেটা !"—"তার পর ?"
"আরেক বেটা !"—"তার পর ?"
"আরেক বেটা !"————

রাজা মশাই যত বলেন, "তার পর ?"
নাপিত ততই খালি বলে, "আরেক বেটা !"

দণ্ডের পর দণ্ড এমনি ভাবে গেল। রাজা মশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু না নে উপায় নাই,—বলেছেন, আগাগোড়া সব শুনবেন, থামিয়ে দিতে পার্‌বেন না। ন্ধ্যার সময় রাজা মশাই আর থাকতে না পেরে বল্লেন, "আরে, আর কত বল্‌বে ? খনো কি শেষ হল না ?"

নাপিত যোড় হাতে বল্ল, "সে কি মহারাজ ? সবে ত আরম্ভ। গুটিকয়েক পঙ্গ-াল সবে গুটিকয়েক ধান নিয়েছে। এখনো গোলা ধানে বোঝাই, আকাশ পঙ্গপালে ন্ধকার।"

কাজেই আর কি করা যায় ? আরো দু দিন বসে রাজা মশাই পঙ্গপালের কথা নলেন। তারপর আর কিছুতেই থাকতে না পেরে, কেঁদে বল্লেন, "আমার ঢের য়েছে বাবা ! অর্দ্ধেক রাজ্য নেও, নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি একটু হাঁপ ছেড়ে াচি।"

তখন নাপিতের খুব মজাই হল।

অপমানের শোধ।

কুচবিহারের রাজসভায় মন্ত্রী ও অমাত্যগণ নিজ নিজ আসনে বসিয়া আছেন, হারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ আসিলেই সভার কাজ আরম্ভ হইবে। এমন সময় পণ্ডিত মুকুন্দ-াম সার্ব্বভৌম আসিয়া রাজার সিংহাসনের পাশে বসিয়া গেলেন। মুকুন্দ সার্ব্বভৌম সাধারণ পণ্ডিত এবং মহৎ লোক, তিনি কোন রাজার সিংহাসনের পাশেই বসিবার যোগ্য নহেন, কিন্তু রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া বড়ই রাগ হইল, তিনি চোখ লাল করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর ! তুমি রাজাসনের কাছে বসিবার যোগ্য নও !"

ইহাতে মুকুন্দ সার্ব্বভৌম যারপরনাই অপমান বোধ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া সিলেন। তেজস্বী লোকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে পারে, কিন্তু অপমান সহ্য

করিতে পারে না। মুকুন্দও সেই অপমান সহিতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রাজাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে হইবে।

সে সময়ে দিল্লীর বাদসাহ ছিলেন নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর সাহ। তিনি হিন্দুর দৌহিত্র ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল, বিশেষতঃ, মুকুন্দ সার্ব্বভৌমকে তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

মুকুন্দ পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট অপমান পাইয়া সেই বাদসাহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতজী, আপনার কি চাই?" মুকুন্দ বলিলেন, "আমি রাজাসনের নিকটে বসিয়াছিলাম, সে জন্য, আমার দেশের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ আমাকে অপমান করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাকে এখানে আনাইয়া, তাঁহার চক্ষের সামনে আপনার সিংহাসনের নিকটে আমাকে বসিতে দেন, তবে আমার দুঃখ দূর হয়।"

তখনই লক্ষ্মীনারায়ণকে দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য গৌড়ের শাসনকর্ত্তার বরাবরে হুকুম গেল, শাসনকর্ত্তাও সে হুকুম পাইয়া কুচবিহার রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিলেন, দিল্লী না গেলে রাজ্যই যায়, সুতরাং নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে সেখানে যাইতে রাজী হইতে হইল। তখন আর গৌড়ের শাসনকর্ত্তারও তাঁহাকে জ্বালাতন করিবার কোন প্রয়োজন রহিল না।

তারপর কিছু দিন গিয়াছে, মহারাজ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বাসা লইয়াছেন, সঙ্গে আসিয়াছেন রাজকুমার বজ্রনারায়ণ আর ভীমনারায়ণ। বাদসাহের সঙ্গে এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই অবসরে মহারাজ নগরের শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছেন। একটা সরু গলি, তাহার দুধারে বড় বড় বাড়ী। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই পথে আসিয়া মহারাজ এক ক্ষ্যাপা হাতীর সামনে পড়িলেন। গলির ভিতর দিয়া হাতীটাকেই তাহার রক্ষকেরা অতি কষ্টে লইয়া আসিতেছে, তাহার পাশ দিয়া আর কাহারও গলিয়া যাইবার স্থান একেবারেই নাই। মাহুত মহারাজকে বলিল, "হটিয়া যাও!" মহারাজ বলিলেন, "তোমার হাতী হটাইয়া নেও!"

দুষ্ট মাহুত একথায় মহারাজ এবং কুমারদিগের উপর দিয়াই হাতী চালাইয়া দিবার আয়োজন করিল। তখন মহারাজ বলিলেন, "বাবা বজ্রনারায়ণ, দেখ ত বেটার আস্পর্দ্ধা!" অমনি বজ্রনারায়ণ নহারোল হাতীর দুই দাঁত ধরিয়া এমনি ঠেলা দিলেন যে সে চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে তখনই হটিয়া গেল। তখন আর মহারাজের চলিবার কোন বাধা রহিল না।

এ দিকে হাতীর মাহুৎ তখনই গিয়া বাদসাহের দরবারে এই ঘটনার সংবাদ [দ]িয়াছে। বাদসাহ তাঁহার কথায় যারপরনাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, এমন [বী]র না জানি কোথা হইতে আসিয়াছে!” সেখানে মুকুন্দ সার্ব্বভৌম উপস্থিত [ছিলে]ন, তিনি বলিলেন, “বিশ্ব সিংহের (মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ) সন্তান ছাড়া [এমন] বীর আর কোথায় সম্ভবে? নিশ্চয় মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ এখানে আসিয়াছেন।”

আর এক দিন মহারাজ যমুনায় নামিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় বিশাল এক [দ]াঁড়ী পান্সী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মাল্লারা রাজাকে ধমকাইয়া বলিল, [“পথ] ছাড়িয়া দাও!” মহারাজ আর রামকুমারেরা তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া [বলি]লেন, “ভাই, নৌকাখানা একটু পাশের দিকে ভিড়াও না।” মাল্লাগুলি এমনি [দুষ্ট ছি]ল, তাহারা সে কথায় কান দিবে না, তাহারা মহারাজের উপর দিয়াই নৌকা [চালা]ইয়া নিবে। তখন ভীমনারায়ণ বুক পাতিয়া দিয়া, পাহাড়ের মতন অচল ভাবে নৌকার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন; নৌকা তাঁহার বুকের ধাক্কায় ঠিকরাইয়া পিছু [হটিয়া] গেল!

এমন লোককে দেখিতে ব্যস্ত না হইয়া কি বাদসাহ থাকিতে পারেন? তিনি [লক্ষ্মী]নারায়ণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতেও আবার একটু মুস্কিল দেখা [দিল।] লক্ষ্মীনারায়ণ যে তেজী পুরুষ, তিনি ত কাহাকেও সেলাম করিবার লোক [নহেন]; আবার তিনি সেলাম না করিলে বাদসাহেরও যে মান থাকে না; ইহার উপায় [কি হই]বে? উপায় অতি চমৎকারই হইল। একটা খুব ছোট্ট দরজার সামনে বাদসাহকে [বসান] হইয়াছে, সেই দরজার ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট আসিতে হইবে; কাজেই [লক্ষ্মী]নারায়ণের হেট হওয়া ভিন্ন আর গতি নাই। মুকুন্দ পণ্ডিতকে পাশে লইয়া [বাদসা]হ সেই ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন, এখন লক্ষ্মীনারায়ণ আসিলেই হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ আসিয়াই দেখিলেন, ফন্দিটা হইয়াছে মন্দ নয়। তিনি তখন একটু [থতম]ত খাইয়া যেই রাজকুমারদের পানে তাকাইয়াছেন, অমনি বজ্রনারায়ণ আসিয়া [ঠেলি]য়া ঠেলিয়া দরজার খিলান তুলিয়া ধরিলেন, মহারাজের আর হেট হওয়ার দরকার [হইল] না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাদসাহ মনে ভাবিলেন যে ইঁহারা কখনও [সাধারণ] মানুষ নহেন, নিশ্চয় দেবতা।

[মু]কুন্দ সার্ব্বভৌম এতক্ষণ বাদসাহের সিংহাসনের পাশেই বসিয়াছিলেন। লক্ষ্মী-[নারায়]ণ ঘরে আসিতেই তিনি উঠিয়া স্নেহের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,

২

"মহারাজ! দিল্লীর বাদসাহ আমাকে তাঁহার সিংহাসনের পাশে বসিবার অযোগ্য ম করেন না!"

যে লক্ষ্মীনারায়ণ জীবনে আর কখনও মাথা হেট করে নাই, এইবারে লজ্জায় তাঁ মাথা হেট হইল।

মেঘের মুলুক।

দারজিলিঙ্গের পথে সব চেয়ে উঁচু ষ্টেশন হচ্ছে ঘুম। দারজিলিং তারই ষ্টেশন পরে, আর খানিকটা নীচে। এই পথটুকু ট্রেণখানি আপনা হতেই গড়ি যায়, ইঞ্জিনের আর তাকে টানতে হয় না। নেমে আসবার সময়, দারজিলিং থে ঘুম অবধি ট্রেণখানাকে ইঞ্জিনে টেনে পৌঁছিয়ে দেয়; তারপর, ঘুম থেকে সু অবধি ট্রেণ অমনি চলে আসে। ইঞ্জিনখানা তাকে সামলে রাখবার জন্য সঙ্গে থা বটে, কিন্তু তার টানতে ত হয়ই না, বরং, ব্রেক্ কসে একটু পিছনবাগে রাখতে হয়।

ঘুম থেকে দারজিলিং মোটে পাঁচ মাইল, এইটুকু যেতে আর বেশী সময় লাগে চলতে চলতে হঠাৎ একবার মোড় ফিরেই দারজিলিঙ্গের সহরটি দেখতে পাওয়া যা ময়রার দোকানে যেমন করে মিঠাইয়ের থালাগুলি সাজিয়ে রাখে, পাহাড়ের বাড়ীগুলি অনেকটা সেই ভাবে সাজান; দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। দারজিলিঙ্গের আসল শোভা ঘর বাড়ীতে নয়, সে হচ্ছে, মেঘের, আর হিমাল আর আলো আর ছায়ার শোভা।

দেশে থেকে ঘরে বসে আমরা এই মেঘকেই দেখতে পাই; এই মে সমুদ্রের কোলে জন্ম লাভ করে, বাঙ্গালার মাঠের উপর দিয়ে এতখানি হা বেয়ে এসে দারজিলিং উপস্থিত হয়েছে। দেশে বসে ত শিশুকাল থেকে এ দেখে দেখে বুড়ো হয়ে গেছি, তবে আবার এখানে এসে এর এত নতূন শোভা কোত্থেকে?

শোভা হয়েছে এইজন্য যে, আমাদের দেশে থাকতে দূর হতে উপরবাগে তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখতাম, আর এখন তার নিজের দেশে তার পেটের ভিতরে ঢুকে তার নাড়ী নক্ষত্র সব টের পাচ্ছি। আগে ছিলাম বি

হয়েছি তার দেশের লোক। সে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আমাদের ভিতরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। বেড়াতে বেরুলে আমার দাড়ি য়ে দিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতা করে। হাত ভিজাবে না, নাক মুখ কাণ কিচ্ছু বে না, ধুতি ভিজাবে না, ছাতা ভিজাবে না ; ওর যত ঝোঁক আমার ঐ ঝাঁকড়া গোঁফগুলোর উপরে, আর পশমী কাপড় চোপড়ের উপরেও কতক। এসবের মুক্তার বিন্দু ছড়ানই যেন তার কাজ।

অনেক দিন ভোরের বেলায় উঠে দেখি, পাহাড়ের পিঠের উপরে মেঘের খোকারা আছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে হিমালয়ের ঝাপসা ছেয়ে রঙ্গের চূড়াগুলি ত পাওয়া যাচ্ছে। তখনো সূর্য্য উঠেনি, পূবের আকাশে লাজুকের মত একটু আলো দেখা দিয়েছে মাত্র। ক্রমে হিমালয়ের মুখ হয়ে উঠতে লাগল, ব্যস্ত হয়ে রং ঢেলে তুলি নিয়ে বসলাম, মনে হল কতই আঁকব।

টু, মেঘের খোকা! রোদের গন্ধ পেয়ে সে বেটারাও তাদের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। তার পর এক পা দুপা করে না জানি কোন্ দেশের পানে তারা রওয়ানা হল। হিমালয় দিল ঢেকে, আমার আঁকবার আয়োজন সব দিল মাটি করে। দেখতে দেখতে তারা পাহাড় বন বাড়ী ঘর সব গ্রাস করে ফেল্ল। তখন আর আশ পাশের বাড়ী ঘর গাছ পালা কিছুই দেখবার যো নাই। আমাদের বাড়ী- যে মজবুত পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, পুষ্পক রথের মত শূন্যে উড়ে মুলুকের পানে ছুটে চলছে না, একথাটি বিশ্বাস করা ভার হয়ে উঠ্‌ল। আবার দশ মিনিট পরেই দেখা গেল যে মেঘ সব উড়ে গিয়ে চারদিক রোদে ঝক্ করছে।

মেঘেরা গেঁড়ির মতন হামা দিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠে।

সারাদিন ভরে এমনি তর খেলা। কখনো গেঁড়ির মতন হামা দিয়ে পাহাড় ে ওঠে, কখনো ভেড়ার পালের মত পাহাড়ের গায় বসে দল বেঁধে বিশ্রাম করে, কখনো বিশাল দৈত্যের মতন উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি আড়াল করে ফেলে। ঐ যে ভারী ভারী মেঘগুলো জল ঢেলে আমাদের দেশ ভাসিয়ে দেয়, তাদের এক একটা যে কত উঁচু, তা এখানে এলে বেশ বুঝতে পারা যায়। ঐ দেখ সকল পাহাড়ের হাঁটুর

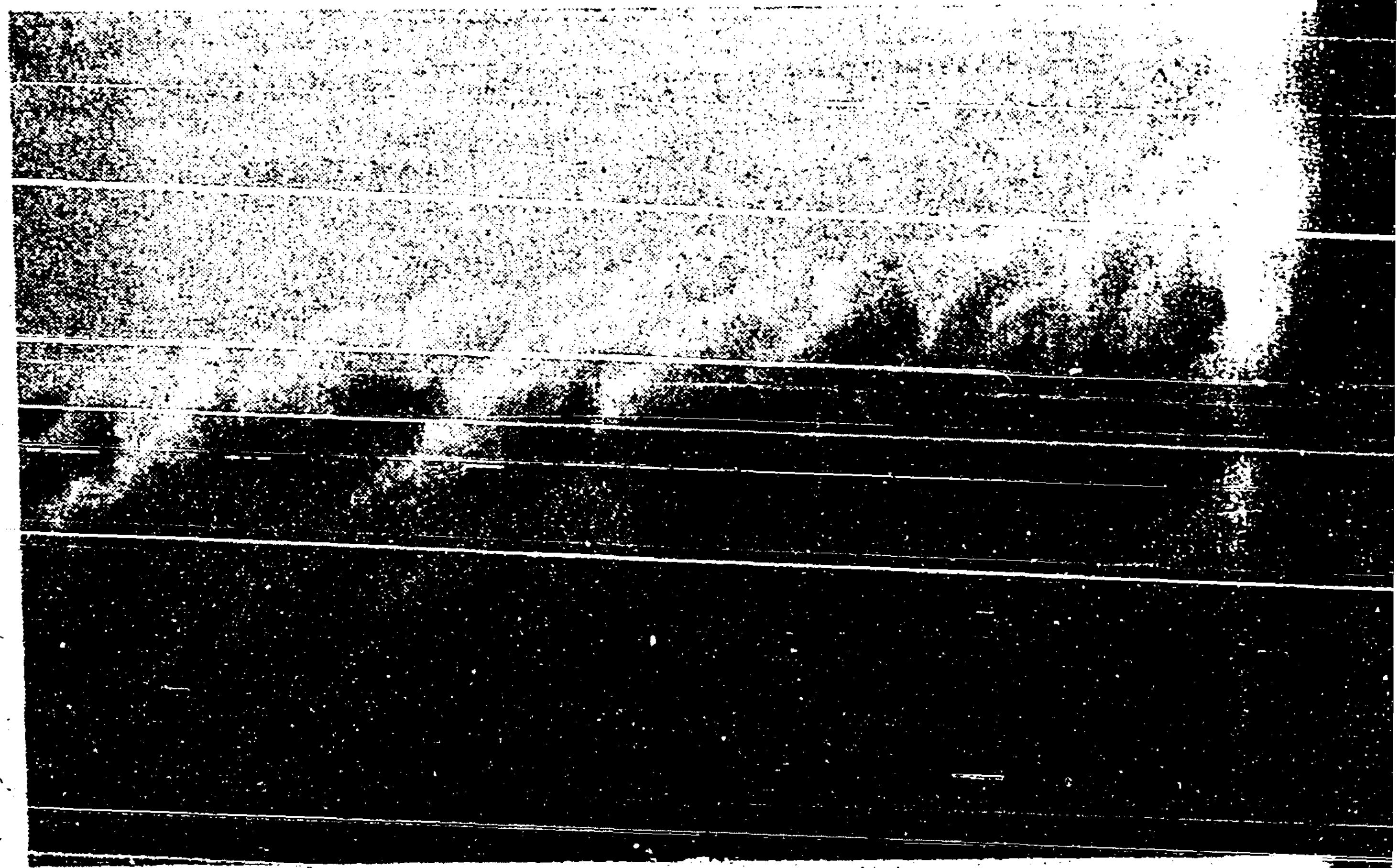

ভেড়ার পালের মত পাহাড়ের গায় বসে দল বেঁধে বিশ্রাম করে

বিশাল দৈত্যের মতন উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি আড়াল করে ফেলে।

নীচে, বাংলা দেশের মাটির কাছে তার তলা থে বৃষ্টির ধারা নামছে, আর তার মাথা, দশ হা ফুট উঁচু পাহাড় ছাড়িয়ে, আরো প্রায় দশ হাজার উপরে উঠে গিয়েছে।

সারাদিন ভরে এমনি তর খেলা। তার সন্ধ্যাবেলায় শীত লেগে আবার হয় ত তা ঘুমের কথা মনে হয়; অমনি তারা পাহাড়ের উ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, না হয় দুই পাহাড়ের মাঝখা গর্ত্তে নেমে তাকে পরিপূর্ণ করে বিশ্রাম ক থাকে। দেখলে মনে হয়, না জানি কোন্ধু মেঘের তুলো ধুনো রেখে দিয়েছে, তা দিয়ে পাড়ানী মাসীর লেপ তয়ের হবে।

মনে ক'রো না যে রোজই এমনি তর এর শোভা নিত্য নূতন। কখনো বা মেঘে রোদে মিলে পাহাড়ের গায় রং বিরঙের

লয়ে চোখ যুড়িয়ে দেয়, কখনো বা ঘড় ঘড় গর্জ্জনে দিক বিদিক্ আঁধার করে, দিনের পর দিন খালি জলই ঢালতে থাকে। বর্ষা-কালের আগা গোড়াই প্রায় এমনি ভাব। তখন প্রাণ ঝালাপালা হয়ে যায়, আর এদেশে থাকতে ইচ্ছা করে না। বৎসরের মধ্যে শরৎ কালটি এখানে সকলের চেয়ে সুন্দর; তখন আকাশ পরিষ্কার থাকে আর

ধুনুরী মেঘের তুলো ধুনে রেখে দিয়েছে।

ালয়ের অতি চমৎকার শোভা হয়। কিন্তু তার কথা আরেক দিন বলব।

লক্ষ্মী।

এক গ্রামে এক ঝগড়াটী দেশ জ্বালানী বামনী থাকে, তার দুই মেয়ে। বড় মেয়ের ম রাণী, সে ভারী দুষ্টু, আর মায়ের মত ঝগড়াটী। ছোট মেয়ের নাম লক্ষ্মী, সে মেও লক্ষ্মী, কাজেও লক্ষ্মী।

বামনী কিন্তু লক্ষ্মীকে দেখতে পারে না। রাণী কি না তার নিজেরি মতন, তাই সে কেই ভাল বাসে, আর লক্ষ্মীকে খাটিয়ে মারে।

রাণী কুঁড়ের রাণী; সে পায়ের উপর পা তুলে খালি ঘরের কোণে বসে থাকে। ক্ষ্মী ছোট হলেও ভারী কাজের মেয়ে। সে রান্না করে, ঘর ঝাঁট দেয়, আর রোজ ভোরে উঠে মস্ত বড় কলসী করে করে বাড়ীর পাশের ঝরণা থেকে জল তুলে আনে।

একদিন সে জল আনতে ঝরণায় গিয়েছে, এমন সময় এক বুড়ী এসে তাকে বল্ল, হ্যাগা, আমাকে একটু জল খেতে দেবে? বড় তেষ্টা পেয়েছে।" বুড়ীর ছেঁড়া ময়লা পড়, সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, কুঁজো হয়ে লাঠি ভর দিয়ে চলে। তাকে দেখে ক্ষ্মীর বড় দুঃখ হল। সে অমনি তাড়াতাড়ি কলসী ধুয়ে, ঝরণার সব চেয়ে পরিষ্কার জায়গাটি থেকে জল এনে তাকে দিল।

বুড়ী কিন্তু আসলে বুড়ী নয়, সে এক পরী। জল খেয়ে সে লক্ষ্মীকে বল্ল, "মা, তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে! আমি তোমার উপর খুব খুসী হয়েছি, তোমাকে একটা জিনিস দিব। তুমি যখনি কথা বল্‌বে, তখনি তোমার মুখ দিয়ে মণি মুক্তা পড়বে।"

বলে বুড়ী চলে গেল, লক্ষ্মীও জল নিয়ে বাড়ী এল। বামনী তাকে দেখেই মুখ খিঁচিয়ে, বল্ল "এতক্ষণ কি করছিলি? এত বেলা হল, কখন রান্না বান্না হবে?" লক্ষ্মী বল্ল, "মা একটি গরীব বুড়ী—"

বল্‌তে বল্‌তেই তার মুখ থেকে ঝরঝর করে মণি মুক্তা পড়তে লাগল। বামনী ত তা দেখে একেবারে হাঁ করে আছে। সে দু হাতে খালি চোখ রগড়াচ্ছে, আর সেই মুক্তা গুলির দিকে তাকিয়ে বল্‌ছে, "য়্যাঁ? য়্যাঁ? য়্যাঁ?"

তখন লক্ষ্মী তাকে সেই বুড়ীর কথা সব বল্ল। শুনে বামনী বল্ল, "ওমা! তাই নাকি? তবে ত রাণীকে কালই সেখানে পাঠাতে হচ্ছে। ও রাণী! রাণী-ঈ-ঈ!! আরে, শীগগির আয়, দেখ্ এসে!" ডাক শুনে রাণী ছুটে আসতেই তাকে বল্ল, "কালকেই ভোর বেলা তুই

...ল আন্‌তে যাবি! দেখিস্‌, বুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া টগড়া করে তাকে রাগিয়ে দিস্‌ না ...ন।”

পরদিন ভোর হতে না হতেই বামনী রাণীর হাতে একটি ছোট্ট কলসী দিয়ে, তাকে ...রণায় পাঠিয়ে দিল। রাণী বেজায় কুঁড়ে, তার কি জল আনতে ভাল লাগে? সে ...লি মনি মুক্তার লোভে, মুখ হাঁড়ি করে, ঝরণায় গিয়েছে। গিয়ে, যেমন সে কলসী ...বাবে, অমনি সেই বুড়ী লাঠি ভর দিয়ে এসে উপস্থিত।

বুড়ী হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল, “হ্যাঁ গা, আমাকে একটু জল দিবে?” রাণী নাক ...টকিয়ে বল্ল, “ঈস্‌!!” বুড়ী তাতে রেগে বল্ল “মা গো! আভাগীর রকম দেখ! ...তা, তোর সাজা ভাল করে দিচ্ছি। তুই কথা বল্‌লেই তোর মুখ দিয়ে খালি সাপ ...র ব্যাঙ্‌ বেরুবে!” তা শুনে রাণী রাগে গজ গজ করতে করতে বাড়ী ফিরে গেল।

সে বাড়ীর দরজায় আসতেই তার মা এক গাল হাসি নিয়ে, “কি রে কি হল?” ...লে ছুটে এসেছে আর রাণী তাকে দাঁত খিচিয়ে সবে বলেছে, “হবে আবার কি ছাই?” ...মনি এয়া বড় বড় দুই কোলা ব্যাঙ্‌ ‘গেঁয়াও!’ বলে লাফিয়ে পড়েছে, তার মুখ থেকে। ...খেই ত বামনী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। “হায় হায়! কি হবে? তুই বুড়িকে ...ক বলেছিলি?” আর এখন দুঃখ করে কি হবে! রাণী যতই কথা বলছে ততই ...র মুখ থেকে খালি সাপ আর ব্যাঙ্‌ বেরিয়ে ঘর ময় কিল বিল করছে!

শেষে তারা মায়ে ঝিয়ে অনেক ভেবে ঠিক করল যে, আর কিছু নয়, নিশ্চয় এসব ...ক্ষ্মীর চালাকি। তখন কাজেই তারা দুজনে দুই ঝাঁটা নিয়ে লক্ষ্মীকে মারতে গেল, ...কিন্তু মারতে আর হল না। হটাৎ সেই ঘর আলো করে যারপর নাই সুন্দর একটি পরী ...এসে তাদের বল্ল, “আমিই সেই বুড়ি। লক্ষ্মীর ত কোন দোষ নাই; রাণী তার নিজের দোষেই সাজা পেয়েছে। তোমরা মিছামিছি লক্ষ্মীকে কষ্ট দাও। সে আর তোমাদের কাছে থাকবে না; আমি তাকে নিয়ে খুব সুন্দর একটা জায়গায় রেখে দিব।”

এই বলে সে লক্ষ্মীকে নিয়ে পরীদের দেশে চলে গেল।

মানস সরোবর।

নদীর ধারে একদল বক বসে খুব মন দিয়ে মাছের আর শামুকের কথা ভাবছে, এমন সময় একটি রাজহাঁস উড়ে এসে সেখানে বস্‌ল। রাজহাঁসের লাল চোখ, লাল মুখ, আর রাঙা পা দুখানি দেখে, বকেরা ভারী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুমি কে হে?"

হাঁস বল্ল, "আমি হাঁস।"

"কোত্থেকে এলে?"

"মানস সরোবর থেকে।"

"মানস সরোবর? সেখানে কি আছে?"

"সেখানে সোনার পদ্মবন আর অমৃতের মত জল আছে। চার ধারে গাছ আছে, তার গোড়ায় নানা রত্নের বেদী বাঁধান।"

"সেখানে শামুক আছে?"

"না; শামুক সেখানে নাই।"

"হোঃ-হোঃ-হো হো!! শামুক নেই, তবে আর কিসের বড়াই করতে এসেছ?" এই বলে বকেরা খুব হাসতে লাগল, আর হাঁস বেচারা বোকা ব'নে গেল।

তোমাদের কেউ কেউ হয় ত ভূগোলে মানস সরোবরের কথা পড়েছ, আর ভাবছ, "হাঁসটা কি মিথ্যাবাদী! মানস সরোবরে ত সোনার পদ্ম ফুল বা রত্নের বেদী বাঁধান গাছপালা, কিছুই নাই!" আমি ভাই অত কথার উত্তর দিতে পারব না; আমি ত আর দেখে আসিনি। হাঁসটা তবে বোধ হয় আমাদের পুরাণো পুথি টুথি কিছু পড়ে থাকবে; তাতে মানস সরোবরের অনেক আশ্চর্য্য বিবরণ লেখা আছে।

পুরাণো বৌদ্ধ পুস্তকে মানস সরোবরকে 'অনবতপ্ত' বলে লেখা হয়েছে। সেই অনবতপ্তের মাঝখানে না কি একটি গাছ আছে, তার ফল খেলে সকল দুঃখ সকল জ্বালা দূর হয়ে যায়। সরোবরের উত্তর দিক দিয়ে একটি নদী বেরিয়েছে, তার বালিগুলি হীরার; পূব দিক দিয়ে একটি নদী বেরিয়েছে, তার বালি পান্নার; দক্ষিণ দিক দিয়ে একটি নদী বেরিয়েছে, তার বালি রূপার; পশ্চিম দিক দিয়ে একটি নদী বেরিয়েছে, তার বালি সোনার। শুধু তাই নয়,—পশ্চিমের নদীটি বেরিয়েছে একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মুখ দিয়ে, দক্ষিণের নদীটি ময়ূরের মুখ দিয়ে, পূর্ব্ব আর উত্তরের দুটি ঘোড়ার আর সিংহের মুখ দিয়ে।

বজ্রনারায়ণ হাতীর দাঁত ধরিয়া ঠেলিতেছেন।

U. RAY & SONS.

ুরাতন পুস্তকে এমনি লেখে। বাস্তবিক তিব্বত আর ভারতবর্ষের লোকেরা ালই এই সরোবরটিকে একটি অতি আশ্চর্য্য আর পবিত্র স্থান মনে করেছে। ারা এখানে থাকতে ভালবাসেন, যোগী সন্ন্যাসীরা এখনো প্রাণপণ করে এখানে করতে আসেন। প্রাণপণ করে এইজন্য বলছি যে, সেখানে যাওয়া বড়ই কঠিন, পদে বরফে চাপা পড়ে মরবার ভয়!

পুস্তকের লেখা আশ্চর্য্য ব্যাপার সেখানে কিছুই দেখা যায় না বটে, তবু সে একটা সুন্দর জায়গা। এত উঁচুতে (প্রায় ১৫৫০০ ফুট) এত বড় মিষ্ট জলের হ্রদ ার আর কোথাও নাই। এর চারিদিক ঘুরে আসতে প্রায় দু'শ মাইল পথ তে হয়। হ্রদটি আট কোণা,—মোটামুটি একটি পদ্মের মত—সেই পদ্মের উত্তর ম কোণে কৈলাস পর্ব্বত শাদা বরফের পোষাক পরে মহাযোগীর মত বসে আছে। র নির্ম্মল জলে তার ছায়া পড়ে এমনি চমৎকার শোভা হয় যে, সে শোভা একটিবার লে প্রাণপণ করে সেখানে যাওয়া সার্থক হয়ে যায়। এই হ্রদেরই আশপাশ ক সিন্ধু, শতদ্রু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এই চারটি নদীর উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং এর রে যে এদেশের লোকের এত ভক্তি হবে, সে আর আশ্চর্য্যের কথা কি?

চন্দ্র ও বুনো।

চীন দেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ছিল বাপের আমলের এক বুড়ো মন্ত্রী। মন্ত্রীর র রাজার বড়ই বিশ্বাস। সে যা বলে তিনি তাই করেন। আসলে কিন্তু বুড়ো ী দুষ্টু, কিসে রাজাকে ফাঁকি দিয়ে দু হাতে তাঁর ধন লুটবে তার কেবল সেই টা। এর মধ্যে আর এক দেশের রাজার বোনের সঙ্গে চীন দেশের রাজার বিয়ে া। নূতন রাণীকে এনে রাজা সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। এমন লক্ষ্মী রাণী াই দেখা যায়। যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী।

রাজ্যের যত কাজ, রাজা বুঝবার আগেই তিনি সব বুঝে ফেলেন। বুড়ো মন্ত্রীর ল সয়তানী তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেল। আর সে বুড়ো কোন মতেই ফাঁকি দেবার ক পায় না। তখন দুষ্টু বুড়ো করল কি—এক দিন চুপী চুপী রাজার কাছে গিয়ে হাত ড় করে বল্ল "মহারাজ, একটা কথা, বলতে সাহস হয় না, কিন্তু না বল্লেও নয়। যদি হুকুম ত বলি।" রাজা বল্লেন "ভয় কি মন্ত্রী, বলে ফেল।" দুষ্টু বুড়ো বল্ল, "মহারাজ, আমি

খোঁজ পেয়েছি; নূতন রাণী আপনাকে মেরে তাঁর নিজের ভাইকে রাজা করবার মত করছেন। মহারাজের জন্য আমার বড্ড ভয় হ'ল, তাই ছুটে খবর দিতে এলাম।"

শুনেই ত বোকা রাজার বুদ্ধি সুদ্ধি সব এলিয়ে গেল। তিনি রাগে দু চোখ লাল ক বল্লেন, "বটে? এমন কথা! এখনি রাণীকে তাড়িয়ে দাও।" যে কথা সেই কাজ। রাণী তখনি ছেঁড়ান্যাকড়া পরিয়ে চীন দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। রাণী তার য ছেলে দুটি আর বাপের দেশের বুড়ো চাকর সঙ্গে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পথ দিয়ে চল্লেন। যেতে যেতে চাকরটি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সাহস দিয়ে বল্ল, "মা চলুন আ দেশে ফিরে যাই। এই যে সাম্‌নে বন দেখছেন, এই বন পার হলেই দেশে যাওয়া যাবে

সে কি ভয়ানক বন! দিনের বেলাই অন্ধকার। অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে তাঁ তার ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে যখন সন্ধ্যা হয়ে এলো, তখন চাক বল্ল, মা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি কিছু শুক্‌নো কাঠ খুঁজে নিয়ে আ

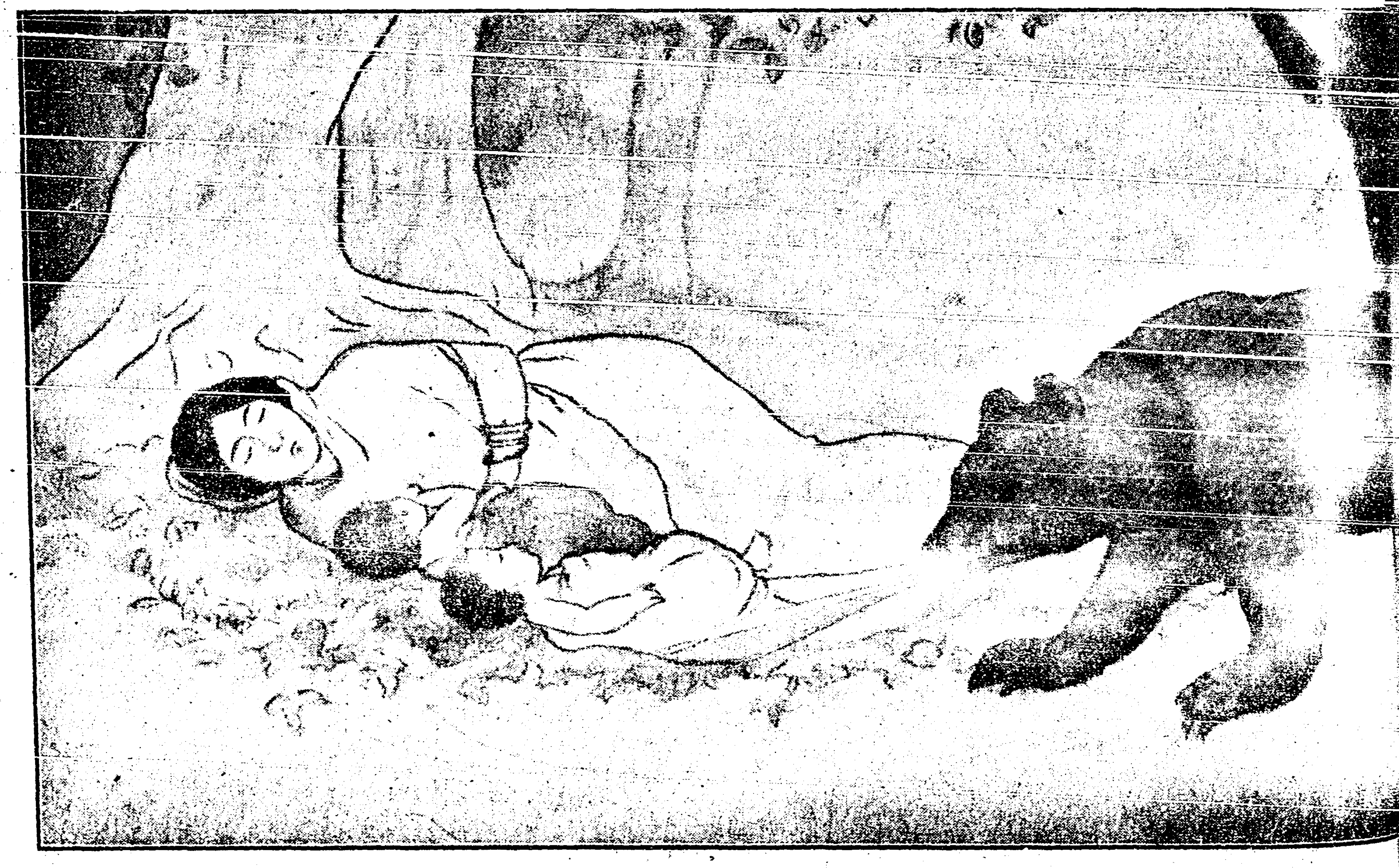

রাত্রে ত আগুন জ্বেলে রাখতে হবে, তা নইলে বাঘ ভাল্লুক আস্‌বে।" এই বলে রাণী আর ছোট ছেলে দুটির জন্য কচি কচি পাতার বিছানা করে দিয়ে কাঠ খুঁজ

রাণী সারা দিন পথ চলে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে চাকর চলে যেতে তেই তিনি সেই পাতার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। খানিক বাদেই হঠাৎ শব্দে রাণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি চমকে চেয়ে দেখলেন ভয়ঙ্কর একটা তাঁর একটি খোকাকে মুখে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। অমনি তিনি চীৎকার কাঁদতে কাঁদতে ভাল্লুকের পিছু পিছু ছুটলেন। অন্য খোকাটা যে একলা পড়ে সে কথা তাঁর মনেই হ'ল না। এর মধ্যে হয়েছে কি রাণীর ভাই সেই যে রাজা তিনি সেদিন সেই বনে শীকার করতে এলেন। সন্ধ্যার সময় শীকার শেষ করে বাড়ী ফিরছেন এমন সময় দেখলেন যে একটা গাছের তলায় পাতার বিছানায় নাই সুন্দর একটি ছেলে ঘুমিয়ে আছে। রাজা তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে টিকে কোলে করে নিলেন, আর বল্লেন, "কি সুন্দর ছেলেটি! আহা, কে এমন একে বনের মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছে।" এই বলে তিনি ছেলেটিকে বাড়ী লেন; আর নিজের ছেলের মতন করে মানুষ করতে লাগলেন। সে দিন রাত ছিল তাই রাজা ছেলেটির নাম রাখলেন চন্দ্রকুমার। এদিকে রাণী সেই র পিছনে ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু ভাল্লুককে ধরতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল যে আরেকটি খোকা ত একলা পড়ে রয়েছে।

অমনি তিনি পাগলের মতন হয়ে সেই গাছের তলায় ছুটে এলেন। এসে দেখলেন য়! সে খোকাটিও নাই, তাকে না জানি বাঘে না ভালুকে না কিসে নিয়ে গেছে, খালি পড়ে আছে!

হা! এত দুঃখ আর রাণী সইতে পারলেন না, তিনি গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লেন। চাকরটিও তখন কাঠ নিয়ে ফিরে এসে এ সব দেখে শুনে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। মন বিপদও মানুষের হয়! কিন্তু এর চেয়েও বেশী বিপদ রাণীর কপালে ছিল। খোকা দুটির শোকে অস্থির হয়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন, এমন সময় ভয়ঙ্কর গর্জনে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে, প্রকাণ্ড এক লোহার দৈত্য, লোহার মুগুর হাতে সেখানে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে চল্ল। চাকর বেচারা যতটুকু পেরেছিল, প্রাণের মায়া সেই দৈত্যের সঙ্গে লড়্‌তে ছাড়েনি; কিন্তু তাদের সঙ্গে পেরে উঠা কি মানুষের? দৈত্য তাকে এক মুগুরের ঘায় অজ্ঞান করে, রাণীকে নিয়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

ডুবুরি জাহাজ।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একজন ফরাসি লেখক একটা গল্প লিখিয়াছিলে তাহাতে এক অদ্ভুত জাহাজের কথা ছিল। সে জাহাজকে মাছের মত জলের উ

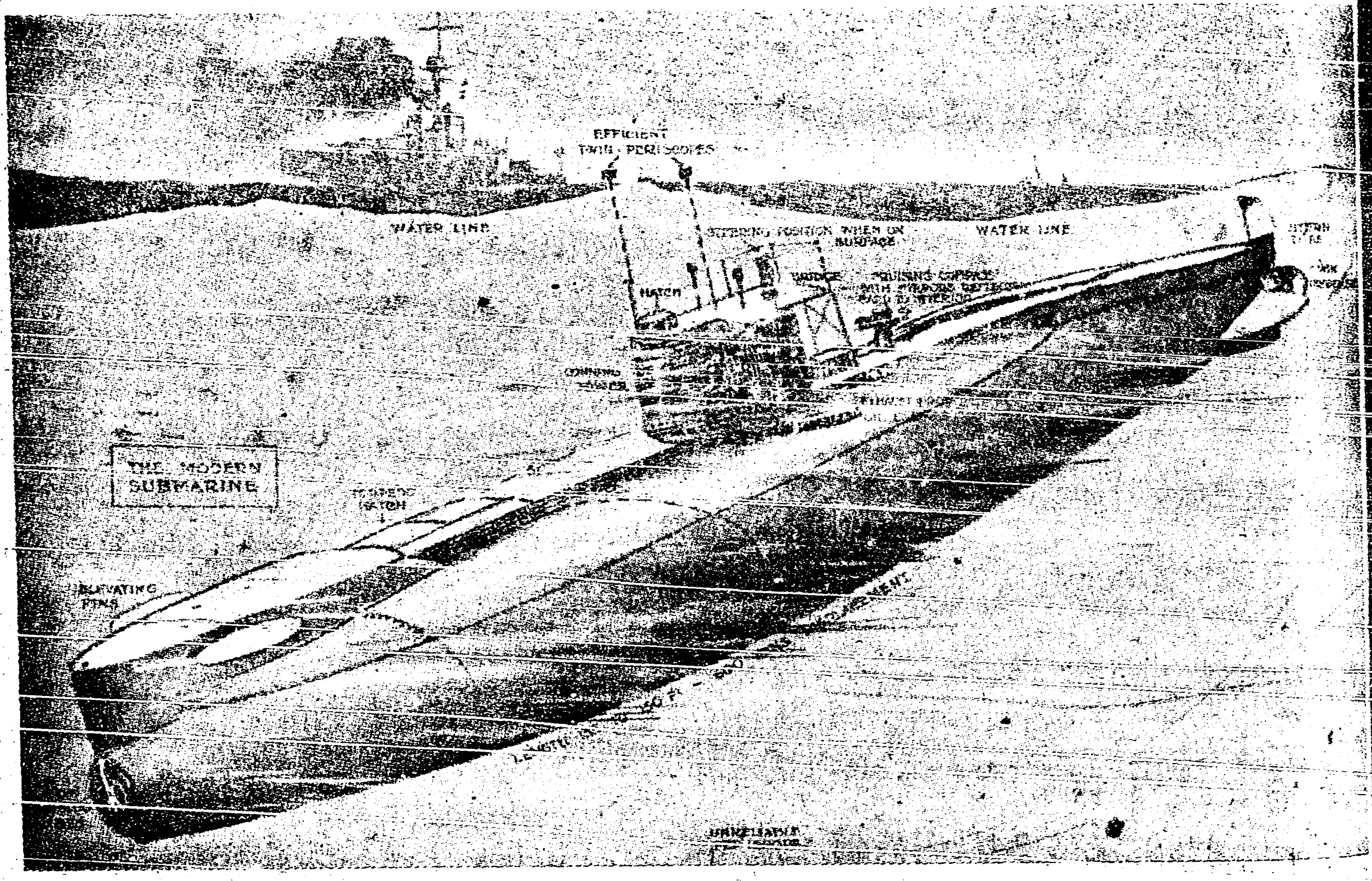

রা নীচ দিয়া যেমন ইচ্ছা চালান যাইত। সে সময়ে লোকের কাছে গল্পটা খু অসম্ভব গোছের শুনাইয়াছিল এবং অনেকে গল্পলেখকের "আজগুবি কল্পনার" প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর এরূপ গল্পে লোকের আশ্চর্য্য হইবার ক নয়,—কারণ, বাস্তবিকই ঐ রকম জাহাজ এখন অনেকগুলি তৈয়ার হইয়াছে। ইংলণ্ডেই এখন অন্তত পঁচাশিটা এইরূপ জাহাজ আছে। তাহার একটার ছবি দেওয়া গে

জাহাজটা যতক্ষণ জলের উপরে থাকে ততক্ষণ তাহার পিঠে নানা রকম মাস্ত দড়ি, কলকব্জা ইত্যাদি দেখা যায়, কিন্তু জাহাজ ডুব মারিবার আগে এ সমস্ত গুটাই লওয়া হয়। তখন কেবল দুটি চোঙা, আর একটা টুপির মত ঢাকনি জাহাজের উপ থাকে। ঢাকনিটার গায়ে পুরু কাঁচের সারসি দেওয়া থাকে, তাহার ভিতর দি

জের কাপ্তান বাহিরের সমস্ত দেখিতে পান। জাহাজটা যতক্ষণ আধ-ডোবা অবস্থায় থাকে ততক্ষণ এই ভাবে দেখার কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আর কয়েক হাত ডুবিলেই সে পথ বন্ধ। তখন ঐ চোঙা দুটিই চোখের কাজ করে—চোঙার আগায় আয়না ও কাচ শুদ্ধ একটি যন্ত্র বসান থাকে, যন্ত্রটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারি দিকে তাকাইতে থাকে—আর জাহাজের কাপ্তান নীচে বসিয়া সেই আয়নার সাহায্যে বাহিরের সমস্ত অবস্থা দেখিতে পান। দশ হাতের নীচে গেলে এই "দিক্‌বীক্ষণ" যন্ত্রও ডুবিয়া যায়, তখন কেবল আন্দাজে আর কম্পাস্ দেখিয়া জাহাজ চালাইতে হয়।

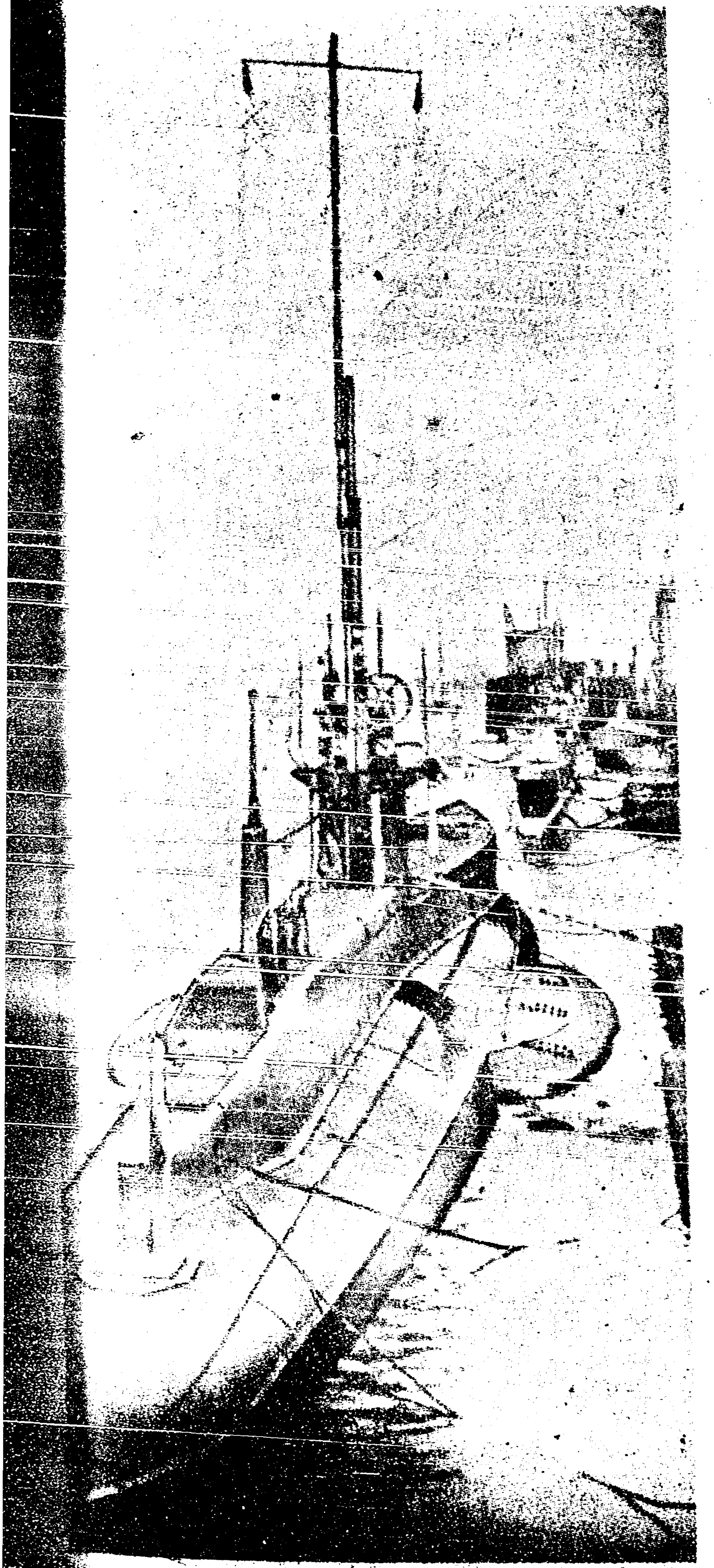

জাহাজের মধ্যে একটা লোহার চৌবাচ্চা থাকে—চৌবাচ্চাটা খালি থাকিলে জাহাজ জলের উপরে ভাসে, কিন্তু চৌবাচ্চাটার মধ্যে জল ভরিলে জাহাজ ভারি হইয়া ক্রমে ডুবিয়া যায়। এই রকমে জল বাড়াইয়া বা কমাইয়া জাহাজকে অল্প বা বেশী ডুবান যায়। তাড়াতাড়ি জল ভরিবার বা খালি করিবার জন্য জাহাজের মধ্যে বড় বড় 'পাম্প্' কল রাখা হয়—তাহার সাহায্যে এক মিনিটের মধ্যে জাহাজকে পঞ্চাশ হাত জলের নীচে ডুবাইয়া দেওয়া যায়। জাহাজের দুই পাশে ও পিছনে মাছের ডানা ও লেজের মত হাল বসান থাকে, সেইগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জাহাজের মুখ ডাইনে বাঁয়ে উপরে

নীচে যেমন ইচ্ছা ফিরান যায়। পিছন দিকে দুইটা পাখার মত ইস্ক্রুপ ঘুরিতে থাকে তাহাই জল কাটিয়া জাহাজকে চালায়। জাহাজের ভিতরে বড় বড় লোহার বোতলে চাপ দিয়া বাতাস ভরিয়া রাখা হয়। তাহাতে জাহাজের বাতাস অনেকক্ষণ পরিষ্কার রাখিবার সুবিধা হয়, এবং অন্যান্য কাজও চালান যায়। ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা জলের নীচে থাকিলেও জাহাজের লোকেরা কোন রকম অসুবিধা বোধ করে না। জাহাজে এরূপ বন্দোবস্ত করা যায় যাহাতে একটা জাহাজ কোথাও না থামিয়া চার হাজার মাইল স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে।

মনে কর আমরা এইরূপ একটা জাহাজের মধ্যে ঢুকিয়াছি—ঢুকিয়াই সকলের আগে চোখে পড়ে—জাহাজের একমাথা হইতে আর এক মাথা পর্য্যন্ত কেবল চাকা আর লোহা, আর কলকব্জা। চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র নাই বলিলেই হয়। সমস্ত জাহাজটা যেন একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক কারখানা সেই বিদ্যুতে জাহাজ চলে এবং জাহাজের বাতিজ্বালা রান্না করা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ হয়। জাহাজের কাপ্তান কোথায়? ঐযে তিনি জাহাজের 'টুপি'র নীচে বসিয়া দিক্‌বীক্ষণ যন্ত্র দিয়া চারিদিক দেখিতেছেন।

কাপ্তান উপর হইতে হুকুম করিতেছেন আর অন্য একটি কর্ম্মচারী নাবিকদিগের দ্বারা সেই হুকুম তামিল করাইতেছেন। প্রত্যেক লোক তাহার নিজের নিজের জায়গায় প্রস্তুত হইয়া আছে—কখন কি হুকুম আসে! কাপ্তান বলিলেন, "জাহাজ ডাইনে ফিরাও", অমনি একটা চাকা

...বা মাত্র জাহাজ ডাইনে ফিরিয়া গেল। "থাম! টর্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও!" ...ডা কেন? শত্রু পক্ষের জাহাজ দেখা গিয়াছে। টর্পিডো বড় সাংঘাতিক অস্ত্র। ...বার বিপক্ষের জাহাজে ভাল মত টর্পিডো দাগিতে পারিলে আর দ্বিতীয়বার ...বার দরকার হয় না। একটা প্রকাণ্ড ছুঁচো বাজির মত তার চেহারা—তার ...রে বারুদ আর অদ্ভুত কল কারখানা। ডুবুরি জাহাজের সাম্‌নেই ...ডোর কলখানা—সেই কলের চাবি টিপিলেই টর্পিডো ঘণ্টায় ৪০০ মাইল ...া ছুটিয়া বাহির হয়, এবং বিপক্ষের জাহাজে বা অন্য কোন শক্ত জিনিষে ...য়া বাধা পাইবা মাত্র ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া ও জাহাজ ফাটাইয়া, এক ... কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। বড় ডুবুরি জাহাজে ৩।৪টি পর্য্যন্ত টর্পিডো কল থাকে। ...র্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও!" হুকুম আসিবা মাত্র তাহারা প্রস্তুত। সকলেই ...নয়াছে বিপক্ষের জাহাজ আসিতেছে—কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি নাই। জাহাজের ...া কেবল কলের বন্‌-বন্‌ শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নাই।

হুকুম আসিল "৪০ হাত নামাও"—বলিতে বলিতে জাহাজ ডুবিতে লাগিল। একটা ...লের কাঁটা আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে লাগিল—২০ হাত, ২৫ হাত, ৩০ হাত। ...এর দাগে কাঁটা নামিল। এখন আর বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। কাপ্তান এখন ...ড়র দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। বিপক্ষের জাহাজটি ঠিক কোন্ দিকে এবং কত ...র তিনি খুব ভাল করিয়া তাহার হিসাব লইয়াছেন—তাঁহার জাহাজ কি রকম জোরে ...লতেছে তাহাও তিনি জানেন—সুতরাং তিনি ঠিক বলিতে পারেন কোন্ মুহূর্ত্তে ...ই জাহাজে কতখানি তফাৎ থাকিবে। নিঃশব্দে জলের নীচে জাহাজ চলিতেছে ...শত্রুজাহাজ কিন্তু তাহার কিছুই জানে না। "জাহাজ উঠিতে দাও"—আবার কলের ...টা নড়িয়া উঠিল—"ত্রিশহাত, বিশহাত, দশহাত—বাস্"!—সম্মুখের টর্পিডো ...সিয়ার হও!" এতক্ষণে দিক্‌বীক্ষণ যন্ত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে—আবার সব দেখা ...ইতেছে। আধ মাইল দূরে শত্রুর জাহাজ—প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজ! প্রায় ২০টা ...বুরির সমান। কাপ্তেন এক মনে হিসাব করিতেছেন, জাহাজটা আরেকটু সাম্‌নে ...রুক, আরেকটু, আরেকটু—বাস্! "ছাড়"। একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগিল—ডুবুরি-...হাজ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় কাৎ হইয়া গেল—হালের নাবিক তাড়াতাড়ি তাহাকে ...মলাইয়া লইল। কিন্তু বিপক্ষের জাহাজে যে টর্পিডো লাগিল সে আর তাহা ...মলাইতে পারিল না। জাহাজের গায়ে বিশহাত গর্ত্ত—জাহাজটা মাতালের মত

টলিতে টলিতে গব্ গব্ করিয়া জল খাইতে লাগিল, তার পর মাথা নীচু করি ডিগ্‌বাজী খাইয়া দেখিতে দেখিতে এত বড় জাহাজটা ডুবিয়া গেল।

ডুবুরি কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে নাই—সে একেবারে ডুব মারিয়া প্রাণপণে ছুটিয়াছে। যতক্ষণ সে তাহার "চোখ"টুকু মাত্র বাহির করিয়া চোরের মত আসিতে ছিল শত্রুরা তাহাকে দেখিতে পারে নাই, কিন্তু টর্পিডো ছাড়িবামাত্র জল তোলপাড় হইয়া উঠিল—আর সকলেই বুঝিতে পারিল "ঐ ডুবুরি"। বিপক্ষের কামান হইতে একটি গোলা যদি ডুবুরির ঘাড়ে পড়ে তবে আর তার রক্ষা নাই। শুধু যে যুদ্ধের সময়েই ডুবুরি জাহাজের বিপদের ভয় থাকে, তাহা নয়। জলের পথে চলা ফিরা করিতে গিয়া তাহার যে কত সময়ে কত রকম দুর্ঘটনা ঘটে ভাবিলেও ভয় হয়।

জলের নীচ হইতে উঠিতে গিয়া হয়ত কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া গেল। হয়ত কোন্‌খানে এতটুকু ফাঁক, কোথায় কলের কব্জা এতটুকু বেঠিক্ বসিয়াছে—আর অমনি জাহাজ বিগড়াইয়া একেবারে পাথরের মত ডুবিয়া গেল—শত চেষ্টায়ও আর তাহাকে উঠান গেল না। এ রকম কতবার ঘটিয়াছে এবং কত লোক তাহাতে মারা গিয়াছে! জাহাজ ডুবিয়া গেল; ডুবুরি নামাইয়া দেখা গেল ভিতরে মানুষ বাঁচিয়া আছে, ঠক্ ঠক্ শব্দ করিলে তাহারা ভিতর হইতে সাড়া দেয়, অথচ তাহাদের বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। যাহাতে এ রকম দুর্ঘটনা না হয়, তাহার জন্য

বৎসর কত নূতন নূতন বন্দোবস্ত করা হইতেছে এবং জাহাজ ডুবিলেও যাহাতে ...রের লোকেরা পালাইয়া আসিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। ছবিতে দেখ, ...া জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে আর তাহার ভিতর হইতে অদ্ভুত পোষাকপরা মানুষগুলি ...ন বাহির হইয়া আসিতেছে। দুর্ঘটনা হওয়া মাত্র এই পোষাক পরিয়া লইলে আর আট্‌কাইয়া বা জলের চাপে চ্যাপ্টা হইয়া মরিবার ভয় থাকে না।

বাঘমার।

'বাঘমার,' কি না, যে বাঘ মারে। কিন্তু তাই বলিয়া, এখনি যদি একটা বাঘ খিঁচাইয়া আমাদের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়, আর আমি দরজার ...াটা লইয়া, অসীম সাহসের সহিত ধাঁই শব্দে তাহার মাথা ফাটাইয়া দেই, তাহাতে ...ন 'বাঘমার' হইয়া যাইব না। সেকালে একদল লোক ছিল, বাঘ মারাই ছিল ...াদের ব্যবসায় ; সেই লোকগুলিকে বলিত বাঘমার।

কোন গ্রামে বাঘের অত্যাচার হইলে এই বাঘমারদিগকে ডাকিয়া আনা হইত। ...ারা বনের ভিতরে গিয়া আগে বেশ করিয়া খুঁজিয়া দেখিত, বাঘ কোন পথে ... ফেরা করে। এ কাজ তেমন কঠিন নহে, কেননা, বাঘ চলিয়া গেলে মাটিতে ...ার পায়ের দাগ থাকে। সেই দাগ দেখিয়াই বলিতে পারা যায়, বাঘটি কত বড়, ... সে কোন দিক দিয়া কতক্ষণ যাবৎ কোথায় গিয়াছে।

...বাঘ রোজই যেখান দিয়া চলা ফিরা করে, এমন একটি পথের সন্ধান পাইলেই ...মারেরা তাহার পাশে তীর ধনুক পাতিয়া রাখিত। তারপর সন্ধ্যার সময় গ্রামে ...সিয়া কত রকমের বুজরুগী যে করিত, তাহার অন্ত নাই। গ্রামের লোকদের ত ...সব কথা শুনিয়া বিস্ময়ের আর সীমাই থাকিত না। বাঘ মারেরা এমনি ভান ...ত, যেন বাঘের গতিবিধি তাহারা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। ...ারা বলিত, "এই, বাঘ তেঁতুল তলা দিয়ে যাচ্ছে!" "এই সে পালেদের ...রে জল খেতে নেমেছে!" যত বলিত, গ্রামের ছেলেদের গা ততই ...রিয়া উঠিত। তাহারা একটিবার মনেও করিত না যে এ সব কথা আবার মিথ্যা ...ত পারে।

যা হোক, আসল কাজে বাঘমারেরা ভুল করে নাই। তাহারা বেশ বুঝি সুঝিয়াই তীর পাতিয়াছে। বাঘ যদি সে পথে আসে, তবে তাহার বড়ই বেগতি পথের উপর একগাছি সরু কালো সূতা, রাত্রে তাহা—বাঘের নজরেও পড়ে না,—সূতায় পা লাগিলেই সড়াৎ করিয়া তীর ছুটিয়া আসিয়া গায় বিঁধিবে। আর বেচার রক্ষা নাই। সে বিষম বিষের জ্বালায় চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে দুই দণ্ডের ভিতরে তা প্রাণ যাইবে।

সে চীৎকার গ্রামে পৌঁছাইলে আর কাহারই বুঝিতে বাকি থাকিবে না, ব্যাপার খানা কি। রাত্রি প্রভাত হইলেই তাহারা মরা বাঘকে খুঁজিয়া বাহির করিবে তখন আর মজার সীমাই থাকিবে না।

আমি বাঘমার দেখি নাই, কিন্তু ছেলেবেলায় বুড়াদের মুখে তাহাদের শুনিয়াছি। শুনিয়া আমার মনে হইল যে, কেমন করিয়া তীর পাতিলে বাঘ আসি মাত্র তাহা ছুটিয়া তাহার গায় বিঁধিতে পারে, এটা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলেই ন অনেক ভাবিয়া তীর পাতা হইল, কিন্তু সে পথে বাঘ না আসিয়া আসিল আমা বুড়া ঝি। ভাগ্যিস ধনুকটি ছিল সরু বাঁকারির, আর তীরখানি ছিল পাকাটি না'হলে সে দিন আর উপায় ছিল না। ঐ পাকাটির তীরের খোঁচা খাইয়াই বুড়ো যে কান্না কাঁদিয়াছিল, তাহা আমার এখনও মনে পড়ে। আর আমরা ত গুরুজনদের ভয়ে যেমন ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়াছিলাম, সে কথাও ভুলিবার নহে।

মোহন-মঙ্গল।

মোহন রায় আর মঙ্গল রায় দুটি ভাই ছিলেন, তাঁদের গায় এত জো ছিল যে সচরাচর তেমন দেখা যায় না। এঁদের সম্বন্ধে অনেক গল্প এখন লোকে ব'লে থাকে। আজ তার দু একটা তোমাদের শোনাব। এসব গল্পে কোন্‌টা মোহন রায়ের বিষয়ে, আর কোন্‌টা মঙ্গল রায়ের বিষয়ে, আমি ভুলে গেছি। যাহোক, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হওয়ার কথা নয়, আ কারুর নাম করতে যাচ্ছি না।

একদিন সন্ধ্যার সময় রায় মশায় হাট থেকে পাঁঠা কিনে বনের ভিতর দি

ফিরে যাচ্ছেন। সঙ্গে চাকর, সে পাঁঠার গলায় দড়ি বেঁধে সেটাকে টেনে আগে চলেছে। রায় মশায় রয়েছেন পিছনে, তাঁর হাতে একটি বেশ মোটা লাঠি।

এর মধ্যে চাকরটি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে আছে। রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, কি হল?" চাকর মুখ ফুটে তার উত্তর দিতে না, খালি হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে দিল। রায় মশায় সেদিকে দেখলেন, প্রকাণ্ড বাঘ পথের উপর দাঁড়িয়ে পাঁঠা খাবে কি চাকর খাবে ভাবছে।

তা দেখেই রায় মশায় তাড়াতাড়ি চাকরটিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে, পাঁঠাটি বগলে নিলেন; তার পর বাঘের নাকের কাছে শন্ শন্ শব্দে লাঠি ঘুরুতে ঘুরুতে লাগলেন। বাঘ খালি নাক সিটকায় আর এক এক পা করে হটে যায়। পাঁঠার লোভও ছাড়তে পারছে না, নাকের মায়াও ছাড়তে পারছে না, তাই ভাবনায় পড়েছে। শেষে রায় মশায়ের চেহারা দেখে বোধ হয় সে বুঝতে যে, এর কাছে আর না থাকাই ভাল। কাজেই সে তাড়াতাড়ি বনের ভিতর গেল।

রায় মশায়ের চেহারার কথা তবে কিঞ্চিৎ বল্‌ছি। একদিন রায় মশায় দেখলেন তিন চারটি লোক তাঁদের বাড়ীর পিছনে মাঠের ধারে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কিহে বাপু! কি খুঁজছ?" তারা বল্লে, "আজ্ঞে, দের হাতী হারিয়ে গেছে, তাই খুঁজছি।" রায় মশায় বল্লেন, "এখানে ত হাতী হয়ে থাকবার কোন সম্ভাবনা দেখি না, এখানে কেন খুঁজছ?" তারা বল্লে, তীর পায়ের দাগ এখানে দেখেছি, তাই মনে হচ্ছে হাতীও থাকতে পারে।" তখন মশায় হেসে বল্লেন, "সে দাগ হাতীর পায়ের, কি আমার পায়ের, তা কি জানলে?" এ কথায় রায় মশায়ের পায়ের দিকে তাদের চোখ পড়ল, পর আর তারা সেখানে হাতী খুঁজে সময় নষ্ট কর্‌ল না। রায় য়ের দুটি পায় দুটি গোদ ছিল, তেমন গোদ আর কেহ কখনো চক্ষে নি।

রায় মশায়দের পাশের গ্রামে এক জমিদার ছিলেন, তিনি রায় মশায়দের সঙ্গে শত্রুতা কর্‌তেন। একবার রায় মশায়দের কেউ বাড়ীতে ছিলেন না, সেই

সুযোগে জমিদারের লোকেরা এসে তাঁদের একটি ষাঁড় নিয়ে চলে গেল। মশায়দের একজন এসে একথা শুনেই ছুটে গিয়ে সেই জমিদারের বাড়ী উপ হলেন। ষাঁড়টি সেইখানেই বাঁধা ছিল। রায় মশায় অমনি সেটিকে জড়িয়ে কাঁধে ফেলে, দে বাড়ীর পানে ছুট। জমিদারের তিনটে পালোয়ান তা 'মার মার' করে তাঁর পিছু পিছু তেড়ে এল। তখন রায় মশায় দেখলেন, মুস্কিল। ষাঁড় ঘাড়ে করে মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে এমনি কাদা প্রায় হাঁটু অবধি তাতে বসে যাচ্ছে, কাজেই পালোয়ানগুলোকে এড়িয়ে যাও আর উপায় নাই। দেখতে দেখতে সেগুলো এসে তাঁকে ধরে ফেল্ল, আর তি অমনি এক হাতে তাদের জড়িয়ে ধরে কাদায় গুঁজে রেখে চলে এলেন। কাদার ভিতর থেকে মাথা বার করে নাক মুখ ঝেড়ে দম ফেলে সুস্থ হতে তা অনেকক্ষণ লেগেছিল। ততক্ষণ আর বেচারাদের মুখ দিয়ে কথা বেরয় নি। যখন কথা বেরুল, তখন তারা বল্ল, "বাবা! ভদ্দর লোকের ঘরে নাকি এমন জানোয়ার হয়!"

বনের খবর।

দু জন সার্ভেয়ার কাছাড়ের বনে কাজ করতে গিয়েছে। একই নালার ধারে, ৩।৪ মাইল উ নীচে তাদের ডেরা। ঘোর জঙ্গল, বুনো হাতীর রাস্তা ছাড়া আর পথ নাই, ১৪।১৫ মাইল থেকে চাল ডাল এনে খেতে হয়, সঙ্গে ১০।১১ জন করে কুলি মাত্র। কাজ কর্ম্ম শেষ হয়ে আস ৪।৫ দিনের বেশী বাকী নাই; তারপর তারা আরেক জায়গায় যাবে।

দু জনেই রাজপুত। ১নং সার্ভেয়ার কাজ শেষ করে তাঁবুতে এসে হাত মুখ ধুয়ে বসেছে। তার চাকরটিও তার সামনেই বসে খাচ্ছে, মাঝখানে হাত দু তিন জায়গা। বেচারারা দু গ্রাস ভাতও মুখে দেয়নি, আর অমনি "হাল্লুম!" বলে এই বড় বাঘ একেবারে দুজনের মাঝখানে লাফিয়ে পড়েছে! বাঘ দেখে ত তারা দুজন গুলির মত দু গিয়ে ছিটকে পড়ল। তারপর, বাপরে বাপ! খাওয়া দাওয়া সব কোথায় রইল,—দে পত্র নিয়ে পিট্টান!

হাতীর রাস্তা ধরে প্রাণপণে তারা ছুটতে লাগল। ২।৩ মাইল গিয়েই তারা দেখল যে সার্ভেয়ার তার কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফিরছে। সে তাদের দেখে ভাবল, বুঝি তাদেরও

হয়ে গেছে। তারপর যখন শুনল, তারা বাঘের ভয়ে কাজ ফেলে পালাচ্ছে, তখন সে ১নং য়ারকে বুঝিয়ে বল্ল যে, "দেখ, কাজ ফেলে পালিয়ে গেলে বড় বদনাম হবে। জঙ্গলের কাজ, মার ত হামেসাই পাওয়া যায়। আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাল থেকে চল দুজনায় মিলে মার কাজ করি। দু তিন দিনেই শেষ হয়ে যাব, তখন সকলে এক সঙ্গে যাব। আমাদের নর ডেরা এক জায়গায় থাকলে আমরা ২০।২২ জন লোক হব, তা হলে আর কোনো য়ার আসবে না।"

একথায় ১নং সার্ভেয়ার রাজী হয়ে ২ নম্বরের সঙ্গে তার তাঁবুতে গেল। সেখানেও ভাত র; দু দলে মিলে তাই ভাগ করে নিয়ে খেতে বসেছে। এক জন খালাসীর খাওয়া হয়ে , সে বেচারা ডেরার পাশেই একটা নালায় গিয়েছে, তার থালাখানা ধু'তে। অমনি বাঘ লাফিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে! কারু মনে হয়নি যে সে বেটা এই ৩।৪ মাইল পথ হেঁটে র পিছু পিছু আসবে। বাঘে ধরতেই ত লোকটি চেঁচিয়ে উঠেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সকলেও এমনি চীৎকার যুড়েছে যে কি বলব!

২নং সার্ভেয়ারের টিণ্ডেল (সর্দার খালাসি) নান্দো বাহাদুর লোক। এর আগেও বর্মায় দু বার বাঘের সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়েছে। সে তখনি ধুনী থেকে একটা জ্বলন্ত বাঁশ নিয়ে গিয়ে, ধাঁই করে বসিয়েছে একেবারে বাঘের মাথায় এক ঘা! বাঘও তাতে সেই লোকটাকে ড় দিয়ে নান্দোকেই ধরে বসতে আর তিল মাত্র দেরী করেনি।

নান্দো কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তার বাঁ হাত রইল বাঘের মুখে, আর ডান হাতে সেই দিয়ে সে দিল বেটার নাক মুখ থেৎলো করে। বাঘ তখন বেগতিক বুঝে তাকে ড় নালার ওপারে যেতে পারলে বাঁচে। তা দেখে নান্দোও সেই লোকটিকে তুলে উপরে এল।

বাঘ কিন্তু যায়নি, ওপারে বসে গড়্ গড়্ করছে। সকলে গিয়ে ভয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকল, র প্রাণপণে তাঁবুর দরজার ধুনীটি উস্কিয়ে দিতে লাগল। বাঘ কি তাতে মানে! তার মুখের কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে সহজে ছাড়বে কেন? নালা ডিঙ্গিয়ে এসে সে তাঁবুর ধারে ঘুরতে লাগল। এক এক বার বিষম রাগে তাঁবুতে থাবা মারে, আর তার গর্জ্জন ভীষণ।

এদিকে তাঁবুর ভিতরে সবাই মিলে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে আর থালা ঘটি কেরাসিনের টিন, যা চ্ছে তাই নিয়ে খুব করে পিটছে। এমনি করে করে ঢের রাত হয়ে গেল, বাঘটাও তখন টু চুপ করল। ধুনীটাও ততক্ষণে একটু নিবু নিবু করতে লেগেছে। বাঘের সাড়া শব্দ নাই, ত চলে গিয়ে থাকবে, এই ভেবে এক জন সাহসে বুক বেঁধে সেই ধুনী উস্কিয়ে দিতে বাইরে । অমনি আর সে যাবে কোথায়? হতভাগা বাঘ ধুনীর পিছনেই বসেছিল, লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়েছে।

বাঘের সঙ্গে নান্দোর লড়াই।

খন এ বেচারাকে কে ছাড়ায়? আর কে ছাড়াবে? নান্দোর হাত দিয়ে দরদর করে রক্ত; তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নাই,—আবার ধূনী থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে কসে বাঘের মাথায় এক ঘা দিল। বাঘ নান্দোকে বেশ চিনে নিয়েছে, তাই এক ঘা খেয়ে আর সে দু ঘার জন্য দাঁড়াল র মনে হল যে এবারে লেজ গুটিয়ে সরে পড়াই ভাল।

তখন সেই লোকটিকে তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভিতরে এনে সকলে মিলে চেঁচিয়ে আর থালা ঘটি য়ে রাত কাটাল। সকালে উঠেই জিনিস পত্র সব ফেলে, শুধু নক্সাগুলো নিয়ে, দে চম্পট। পরে সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে, বাঘটা রাগে তাঁবুটিকে কামড়িয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছ। এক বস্তা চাল আর একটা 'তেপাই' ছিল, তাকে চিবিয়ে আর কিছু রাখেনি। প্রথমে লোকটিকে বাঘে ধরে ছিল, সে তিন দিন পরে মরে গেল। নান্দো আর অন্য লোকটি তিন গে ভাল হল।

ধাঁধা।

ব্যাকরণে যে কাজ কর্‌তে বলে না, তা যদি কর, তবে তার ফল ভারী উৎকট হতে পারে। কেমন উৎকট, তার নমুনা দেখ—

ক্যারামারাহারাহাটা
ঘ্যাকামারাতারাদারী
নারাচারা হা হা হা হা!

ভূতের হাসি নয়, রাক্ষসের গানও নয়; তোমরা আমারই ভাষায় সহজ কথায় সুমিষ্ট সংবাদ লেখ রেছে। বল দেখি সেটি কি সংবাদ?

আর বল ত, এটা কিসের গল্প?—

ভূতকে দিয়ে ভূতকে মারে
কোন্ শেয়ানের চাঁই?
জন্মিল তায় আজব জোয়ান,
তুলনা তার নাই
হস্ত পদের নাইক লেশ,
উদরটিতেই দেহের শেষ;
বদন মেলে সাগর গেলে,
শির খুঁজে না পাই।

জোয়ান গেল গিল্‌তে ভূতে
বিষম তুলে হাই,
গিল্‌ছে যত হাস্‌ছে তত,
বল্‌ছে 'আরো চাই'।
গেলার যখন হল শেষ,
আর সে হাসির নাইক লেশ,—
তখন দেখে, ভূতের পেটেই
জুটেছে তার ঠাই!

আষাঢ়ের ধাঁধার উত্তর।

১। কাপ্তেন এইরূপ ভাবে লোক গুলিকে সাজাইয়া ছিলেন :—

০০×০০০×××××০০××০০০০×০×××০××০০×

(০ চিহ্ন গুলি দেশী লোক ও × চিহ্ন গুলি বিদেশী লোক)

২।

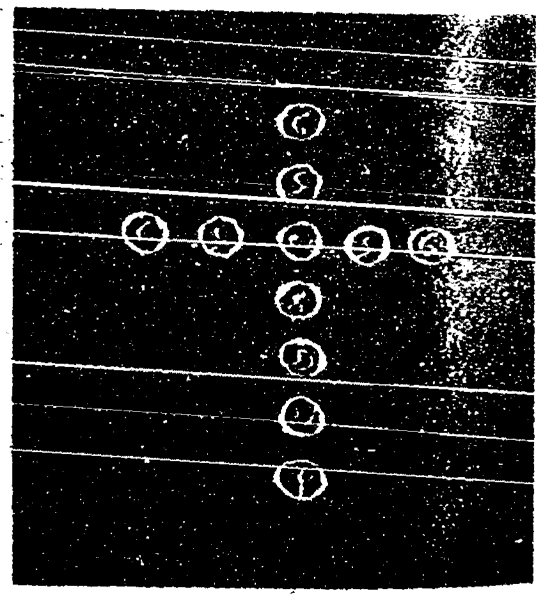

১১টি গুলি এইরূপ ভাবে সাজাইলে, উপর, ডান, এবং বাম হইতে ৭টি গুলিই গোণা যায়।

৩। ৪৫ কে ৮, ১২, ৫, ২০, এই চারটি ভাগে ভাগ করিতে হইবে।

৮ + ২ = ১০, ১২ − ২ = ১০, ৫ × ২ = ১০, ২০ ÷ ২ = ১০।

৮ + ১২ + ৫ + ২০ = ৪৫।

শ্রেণী নং
কলিকাতা

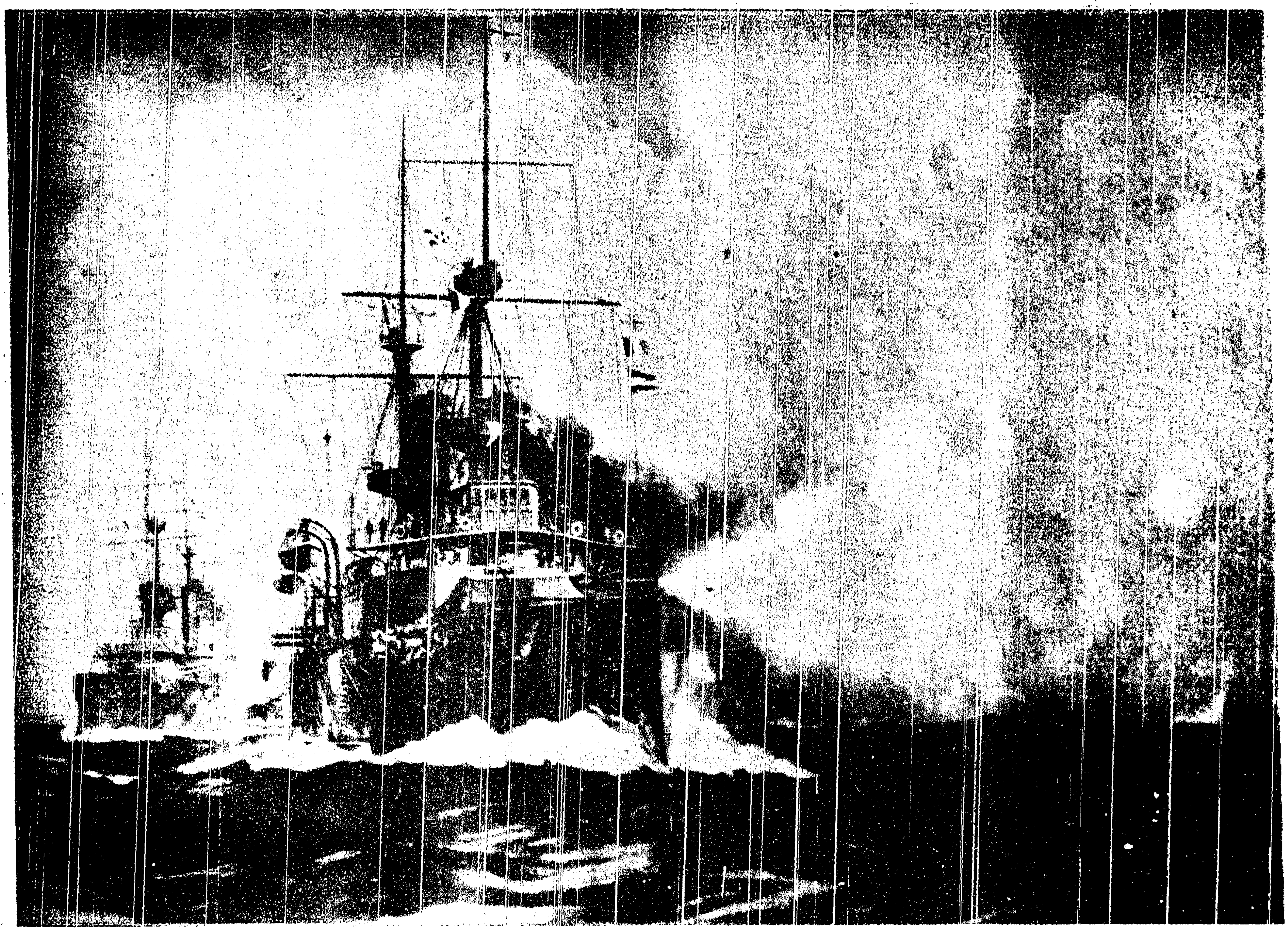

যুদ্ধ জাহাজ।

Colour-Blocks and Printing by

…য় বর্ষ ভাদ্র, ১৩২১ পঞ্চম সংখ্যা

ভাদুরে জ্যোৎস্না

ভাদ্র মাসের জলে নদীর দু'কূল গেছে ভেসে ;
ধোয়ামোছা আকাশেতে, চাঁদ উঠেছে হেসে।
জলে স্থলে ফুল ফুটেছে, ছুটেছে সুবাস কত ;
তরুলতার সবুজ পাতা দুলছে অবিরত।
আহার নিদ্রা ভুলে গেছে, যারা নিশি ধ'রে,
ঝিঁঝিঁর দল সানাই বাজায় গাছের আগায় চ'ড়ে।
জোনাকি সব জ্বালছে বাতি ঝোপের আঁধার কোলে ;
খেয়ালভরে শেয়ালগুলো একসুরে তান্ তোলে।
দলে দলে বাদুড় চলে খাবার যেথায় আছে ;
বকের ছানা ঝাড়্‌ছে ডানা পুকুরপাড়ের গাছে।
শান্তিমাখা এমন আলো, এমন ফুলের হাসি,
এমন সবুজ তরুলতা, এমন শোভার রাশি ;
এমন আকাশ, এমন বাতাস, এমন পাখির গান,
শস্যে ভরা মাঠের মাঝে নদীর কল তান।
এই আমাদের বাঙলা ছাড়া নাই ত কোথাও আর ;
এসো সবে দেশমাতাকে করি নমস্কার।

এই দেশেতে জন্মিয়াছি ; এই দেশেরই আলো,
প্রথম যে দিন এলাম ভবে আমার চোখ্ ফুটা'ল।
এই দেশেরই বায়ু রাশি কর্‌লে জীবন দান ;
এই দেশেরই ফলে জলে আছে আমার প্রাণ।
এই বাঙলায় জন্মিয়াছি, বাঙালী নাম ধরি ;
সোণার বাঙলার ছেলে আমরা মাকেই প্রণাম করি।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাবণ।

ব্রহ্মার কথায় যম যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেন, রাবণ ভাবিল, সেটি তাহার নিজে বাহাদুরী। তখন আর তাহার গর্ব্বের সীমাই রহিল না। সে বাছিয়া বাছিয়া বড় যোদ্ধাদের সহিত বিবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণের পুত্রগণ তাহার নি হারিয়া গেলেন, বরুণ নিজে ব্রহ্মার বাড়ীতে গান শুনিতে যাওয়ায় সেখানে উপস্থি ছিলেন না, তাই তাঁহার মান বাঁচিল। সূর্য্য যুদ্ধ না করিয়াই বলিলেন, "আমি হা মানিতেছি!" রাবণের ভগ্নীপতি বিদ্যুজ্জিহ্ব বেচারাও তাহার হাতে মারা গেল।

কিন্তু সকল জায়গায়ই যে রাবণ বাহাদুরী পাইয়াছিল তাহা নহে। বলির বাড়ী গিয়া সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। বলি তাহাকে ধরিয়া নিজের কোলে বসাই বলিলেন, "কি চাও বাপু?" রাবণ বলিল, "শুনিয়াছি বিষ্ণু নাকি আপনা আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।"

একথা শুনিয়া বলির ভারী হাসি পাইল। তারপর তিনি কথায় কথায় তাহা বলিলেন, "ঐ যে ঝক্‌ঝকে চাকাটি দেখিতেছ ওটি আমার কাছে লইয়া আইস তা এ কথায় রাবণ নিতান্ত অবহেলার সহিত গিয়া সেই জিনিসটা উঠাইল, কিন্তু কিছুতে সেটাকে লইয়া আসিতে পারিল না। সে লজ্জিত হইয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

খানিক পরে রাবণের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তখন আর লজ্জায় বেচারা মাথা তুলিতে পারে না। তখন বলি তাহাকে বলিলেন, "এই চাকাটি আমার পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্য কশিপুর কুণ্ডল!"

আর একবার রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া একটি দ্বীপে আগুনের মত তেজস্বী এক পুরুষকে দেখিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ বলিল, "যুদ্ধ দাও!" তারপর তাহাকে কত শূল, কত শক্তি, কত ঋষ্টি কত পট্টিশের ঘা মারিল, কিন্তু তাঁহার করিতে পারিল না। তখন সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ রাবণকে টিকটিকিটির মতন দুহাতে এমনি চাপিয়া দিলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ যায় যায়। তারপর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন।

কিঞ্চিৎ পরে রাবণ উঠিয়া রাক্ষসদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই ভয়ঙ্কর লোকটা কোথায় গেল?" রাক্ষসেরা একটা গর্ত্ত দেখাইয়া বলিল, "সে ইহারই ভিতরে ঢুকিয়াছে।" অমনি রাবণও তাড়াতাড়ি সেই গর্ত্তের ভিতর ঢুকিল। তারপর পাতালের খুঁজিতে খুঁজিতে এক জায়গায় গিয়া দেখিল সেই মহাপুরুষ একটা খাটের উপর বসিয়া আছেন। সেখানে গিয়া রাবণ সবে দুষ্ট ফন্দি আঁটিতেছে, এমন সময় সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, আর তাহাতেই রাবণ কাণে তালা লাগিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল! তখন ভয়ঙ্কর পুরুষ তাহাকে বলিলেন, "আর কেন? এই বেলা চলিয়া যাও। ব্রহ্মা তোমাকে অমর হইবার বর দিয়াছেন। তাই তোমাকে বধ করা হইল না।" সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ ছিলেন ভগবান কপিল।

আর একবার রাবণ গিয়াছিল মাহিষ্মতীর রাজা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে। মাহিষ্মতীতে গিয়া সে অর্জ্জুনের মন্ত্রীদিগকে বলিল, "তোমাদের রাজা কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব!" মন্ত্রীরা বলিলেন, "তিনি বাড়ী নাই।"

এ কথায় রাবণ সেখান হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতে চলিয়া আসিল। বিন্ধ্য অতি সুন্দর পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতের নীচ দিয়া নর্ম্মদা নদী বহিতেছে, তাহার শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এমন নির্ম্মল জল, এমন শীতল বায়ু, এত রকমের ফুল আর অতি অল্প স্থানেই আছে। রাবণ মনের সুখে সে জলে নামিয়া স্নান করিল।

ঠিক সেই সময়ে সেখানে একটা ভারী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছিল। নর্ম্মদার জল স্বভাবতই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু সেদিন দেখা গেল যে তাহা একবার হঠাৎ উঁচু হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে রাবণ যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া শুক সারণকে বলিল, "দেখ ত ব্যাপারটা কি।"

শুক সারণ তখনই পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল, আর, খানিক পরেই ব্যস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, প্রকাণ্ড শাল গাছের মত উঁচু একটা লোক নর্ম্মদায়

নামিয়া স্নান করিতেছে। উহার এক হাজারটা হাত। সেই হাজার হাতে সে এক একবার নদীর জল আগলাইয়া ঠেলিয়া দিতেছে, আর তাহাতেই সে জল এত উঁচু হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

এ কথা শুনিয়াই রাবণ বলিয়া উঠিল,—"অর্জ্জুন!" তারপর আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া অমনি গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিল। অর্জ্জুনের লোকেরা তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া গিলিয়া খাইয়া নাকাল করিয়াছিল।

অর্জ্জুন এ কথা শুনিতে পাইয়াই বিশাল গদা হাতে ছুটিয়া আসিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সেই গদার সম্মুখে তাহারা কিছুতেই টিকিতে না পারিয়া শেষে ছুটিয়া পলাইল। তখন রাবণ আর অর্জ্জুনের যে যুদ্ধ হইল, সে বড়ই ভয়ানক। দুজনেরই যেমন বিশাল দেহ, হাতে তেমনি ভীষণ গদা। রাবণ ভয়ানক তেজের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্জ্জুনের গদার ঘায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। অর্জ্জুনও অমনি তাহাকে ধরিয়া এমনি বাঁধন বাঁধিলেন যে সে কথা আর বলিবার নয়! তাহা দেখিয়া দেবতাগণের কি আনন্দই হইল! তাঁহারা যে যত পারিলেন, অর্জ্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

এদিকে রাক্ষসেরা আসিয়া অর্জ্জুনের হাত হইতে রাবণকে ছাড়াইয়া নিতে কত চেষ্টাই করিল, কিন্তু সে কি তাহাদের কাজ? অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিধিমতে ঠেঙ্গাইয়া রাবণকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

এখন রাবণের ত আর সঙ্কটের সীমাই নাই, এ সঙ্কট হইতে তাহাকে কে বাঁচায়? বাঁচাইবার লোক একটি মাত্র আছেন, তিনি হইতেছেন উহার পিতামহ পুলস্ত্য মুনি। মুনি ঠাকুর নাতির মায়া এড়াইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "বাছা, আমার নাতিটিকে ছাড়িয়া দাও। উহাকে যে সাজা দিয়াছ, তাহাতেই তোমার খুব নাম হইবে, আর উহাকে রাখিয়া লাভ কি?"

একথায় অর্জ্জুন খুসী হইয়া তখনই রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন; সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া চোরের মত সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের লজ্জা আর কতকাল থাকে? দু দিন পরেই দেখা গেল যে, রাবণ আবার রাজাদিগকে খোঁচাইয়া ফিরিতেছে।

মানুষ পুতুল

আমেরিকায় একজন ডাক্তার একটা ঔষধের দোকানে কিছু জিনিস কিনিতে গিয়াছিলেন। টেবিলের কাছে একটা লোক দাঁড়াইয়া ছিল, ডাক্তার তাহার নিকট গিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু লোকটা তাহার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। এখন ডাক্তার মহাশয় একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সেটা মানুষ নহে পুতুল। ইহাতে তিনি একটু অপ্রস্তুত হইয়া দোকানের কেরাণীকে বলিলেন, "এখানে পুতুলটা রাখিয়া দিয়াছ কেন? অহংকার গড়িয়াছে, যা হো'ক!" এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময় পুতুলটা বেশ ভদ্রভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিল। তাহা দেখিয়া ডাক্তার মহাশয়ের ত চক্ষুস্থির।

আসলে কিন্তু সে লোকটা মানুষই ছিল, পুতুল নয়। উহার নাম টার্ণার, বাড়ী আমেরিকায়। তোমরা দেখিয়া থাকিবে, অনেক দোকানে পোষাকের নমুনা দেখাইবার জন্য মোমের পুতুলকে কাপড় চোপড় পরাইয়া জানালায় রাখিয়া দেয়! টার্ণার এই রকম পুতুল সাজিয়া দোকানের জানালায় দাঁড়াইয়া থাকে। এ ব্যবসা আরো দু চার জনে করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। ইহাতে লাভ আছে মন্দ নয়, সপ্তাহে প্রায় ২২৫৲ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এটি বড় কষ্টের ব্যবসা। টার্ণারকে রোজ সাড়ে চার ঘণ্টা এমনি ভাবে পুতুল সাজিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। একটিবার চেষ্টা করিয়া দেখ। সাড়ে চার ঘণ্টা কাঠের মত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, হাত নাড়িবে না, পা নাড়িবে না, মুখ নাড়িবে না, চোখের পাতা অবধি নাড়িবে না। যদি পার, উহাই তোমার যথেষ্ট সাজা হইবে।

শুধু তাহাই যদি হইত, তবুও ত কতক রক্ষা ছিল। ঠিক পুতুলের মতন করিয়া সাজ গোছ করা অতি কঠিন ব্যাপার। টার্ণারের সাজ গোছ পৌনে দুই ঘণ্টার কমে হয় না। কত তেল, চর্ব্বি, রং, আর চূর্ণ যে মুখে মাখাইতে হয়, তাহা শুনিলে অবাক হইবে। এত আয়োজনের পরেও চুলগুলোকে ঠিক পুতুলের চুলের মত করিতে না পারিলে সকলই বৃথা। পুতুল সাজার ব্যবসায়ের আর সকলে পরচুলা পরিয়া এ কাজ সারে, কিন্তু টার্ণার তাহার নিজের চুলগুলিকেই ঠিক পুতুলের চুলের মত করিতে পারে। কেমন করিয়া যে করে, সে সঙ্কেতটুকু টার্ণার কাহাকেও বলে না।

দিনের কাজ শেষ হইলে এ সব সাজ খুলিয়া রং উঠাইয়া আবার ভাল মানুষ হইতেও কম ক্লেশ পাইতে হয় না। টার্ণারের এ কাজে প্রায় একটি ঘণ্টা লাগে।

এ সকলও বলিতে গেলে সহজ কাজ। আসল মুস্কিলের কাজ হইতেছে পুতুলের মত স্থির হইয়া থাকা। লোকে যেই মাত্র বুঝিতে পারে যে ওটা একটা মানুষ পুতুল সাজিয়া আছে, অমনি তাহারা শতে শতে আসিয়া জানালার সামনে জড় হয়। সে এমনি ভিড় যে, তাহা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পুলিস ছুটিয়া আসে। যতই লোক আসে ততই তাহাদের পানে না তাকাইয়া একেবারে স্থির থাকা ভার হইয়া উঠে। সে সব লোকও আবার এমনি দুষ্ট,—তাহারা সে বেচারাকে ঠকাইতে বিধিমতে চেষ্টা করে। নাম ধরিয়া ডাকা, ঠাট্টা করা, হাসির কথা বলা, চটাইতে চেষ্টা করা, এসব ত করেই, পারিলে সুড়সুড়ি দিতেও ছাড়ে না!

এ কাজে আবার মজাও আছে। সাধারণ পুতুলের মত আড়ষ্ট হইয়া না থাকিয়া, কলের পুতুলের মত খট্ মট্ করিয়া নড়িতে চড়িতে পারিলে, তাহাতে লোকের আরো তাক লাগিয়া যায়। এক জায়গায় কতকগুলি মোমের পুতুল দেখান হইতেছিল, তাহার মধ্যে একটা পুতুল ছিল পুলিসম্যান্। টার্ণার পুতুল সাজিয়া আসিয়া সেই পুলিস্‌টার একখানি হাত নিজের কাঁধে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেন পুলিসটা তাহাকে 'গ্রেপ্তার' করিতে যাইতেছে।

খানিক বাদে দুটি ছেলে তাহাদের মায়ের সঙ্গে আসিয়াছে, তামাসা দেখিতে। টার্ণারের কাছে আসিয়াই একটি ছেলে বলিল, "মা, দেখ দেখ, কি মজার পুলিসম্যান্ মোমের পুতুলটাকে ধরতে যাচ্ছে!" এ কথায় যেই তাহার মা ফিরিয়া তাকাইয়াছেন, অমনি টার্ণার তাহার ড্যাব্‌ডেবে চোখ আর খট্‌মটে হাত পা শুদ্ধ টলিতে টলিতে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে জানিত না যে মেম বেচারা তাহাতে ভয় পাইয়া প্রায় অজ্ঞান হইয়া যাইবেন।

পথে খুব ভিড় হইয়াছে, এমন সময় টার্ণার মাঝে মাঝে সাজিয়া গুজিয়া ঠিক দম দেওয়া কলের পুতুলের মত আড়ষ্ট চঞ্চল ভাবে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। তখন যে সকলে কি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেয়, সে কি বলব। টার্ণারের তখন অবশ্য খুবই হাসি পায়, কিন্তু সে কিছুতেই হাসে না। সে নাকি বলে যে, কেহ তাহাকে হাসাইতে পারিলে অনেক টাকা দিতে রাজী আছে। কত টাকা, তাহা আমি শুনিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার লোভে এত কষ্ট আর খরচ পত্র করিয়া এখান

...তে আমেরিকায় যাওয়া পোষায় কিনা, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ রহিল। আর, ...র যে খুবই শক্ত লোক, তাহা দেখিতেই পাইতেছ; দেশলাই জ্বালিয়া তাহার ...খের একেবারে কাছে ধরিলেও সে চোখ বোঁজে না।

চন্দ্র ও বুনো।

এদিকে হয়েছে কি, সেই ভাল্লুকটা রাণীর ছেলেটিকে মুখে করে, তার গর্ত্তে নিয়ে, ...চ্ছাদের খেতে দিয়েছে, কিন্তু বাচ্ছারা কিছুতেই তাকে খেতে চাচ্ছে না। তারা তার কাছে এসে তার গা চাটতে আর লাফিয়ে লাফিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে লেগেছে; ছেলেটিও তাতে ভারি খুসী হয়ে তার ছোট্ট ছোট্ট গোদা গোদা হাত দুখানি দিয়ে তাদের গলা জড়িয়ে আদর করছে। তাই দেখে ছেলেটির উপর ভাল্লুকের এমনি মায়া হ'ল যে সে আর তাকে মারতে পারল না। সেই থেকে ভাল্লুক ছানাদের সঙ্গে ছেলেটি বাড়তে লাগল। সে তাদেরি মত হামাগুড়ি দিয়ে চলে, ছোট ছোট জন্তু দেখতে পেলে তাদেরি মতন করে ধরে, কাঁচাই চিবিয়ে খায়। ক্রমে যত সে বড় হ'তে লাগল, ততই তার গায়ে ভয়ানক জোর হ'ল। সকলে তাকে 'বুনো' বলে ডাকে। সে তখন মানুষের মত সোজা হ'য়ে চলে, কিন্তু জানোয়ারের মত চ্যাচায়। আর তার চেহারা বড়ই বিকট হয়েছে। তার সেই লম্বা লম্বা চুল দাড়ি, বড় বড় নখ, আর বিষম দাত খিচানি দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। মানুষের উপর তার বড্ড রাগ। তার ভয়ে আর সে বনে কারু যাবার যো নাই। রাজার পর্য্যন্ত শীকার বন্ধ হয়ে গেল।

আর চন্দ্রকুমারের কি হল? রাজার বাড়ীতে সে খুব সুখেই বাড়ছে। লেখা পড়ায়, সাহসে, জোরে, কোন কথায়ই সে দেশে আর তার মত কেউ নাই। রাজা তাকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু তিনি জানেন না যে সে তাঁরি ভাগ্নে।

বুনোর ভয়ে সে বনের ভিতর দিয়ে আর লোকে যাওয়া আসা করতে পারে না। কাঠুরেদের কাঠ কাটা বন্ধ, রাজার শীকার বন্ধ, মহা মুস্কিল। রাজা দেশের বড় বড় পালোয়ানদের ডেকে বল্লেন, "যে বুনোকে মেরে আনতে পারবে তাকে আমি দশ হাজার টাকা বক্‌শিশ দেব!" পালোয়ানেরা তা শুনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল, কিন্তু কারু যেতে সাহস হল না। তখন চন্দ্র যোড় হাতে বল্ল "মহারাজ, আমাকে হুকুম দিন আমি যাব।" রাজা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন "তুমি যাবে? আচ্ছা যাও!"

পর দিন ভোরে উঠে চন্দ্র তার ঢাল আর তলোয়ার খানিকে মেজে আয়নার মত চক্‌চকে করে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বুনোর সঙ্গে লড়াই করতে চল্ল। বনের মধ্যে গিয়ে সে একটা উঁচু গাছে উঠে বসে রইল আর খানিক বাদেই দেখল যে বুনো একটা প্রকাণ্ড মহিষ ঘাড়ে করে চ্যাচাতে চ্যাচাতে সে দিকে আসছে। তাকে দেখে চন্দ্রের বড় মায়া হল, সে ভাবল, কি সুন্দর কি জোয়ান। কেমন লম্বা চওড়া চেহারা, হাত পা কেমন শক্ত; একে মারবনা, ধরে নিয়ে যাব।" এই ভেবে সে গাছের একটা ডাল ভেঙে মাটিতে ফেলে দিল। বুনো তখন উপরের দিকে চেয়ে চন্দ্রকে দেখতে পেয়ে যেই এক লাফে গাছের উপরে উঠে এসেছে, অমনি চন্দ্রও তাড়াতাড়ি গাছের ডাল ধরে ঝুলে নেমে পড়েছে। কাজেই বুনোকেও আবার মাটিতে নামতে হ'ল। মাটিতে নেমে বুনো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে যেই চন্দ্রকে ধরতে যাবে, অমনি চন্দ্র দিয়েছে তার ঝকঝকে আয়নার মত ঢাল খানা তার সামনে ধরে। সেই ঢালের ভিতর নিজের ছায়াটি দেখে, বুনো হটাৎ কেমন থতমত খেয়ে গেল, আর চন্দ্রও সুবিধা বুঝে তাকে তলোয়ারের এক খোঁচা বসিয়ে দিল।

তারপর দুজনে কি ভয়ানক লড়াই যে হল, কি বলব! এক একবার বুনো যখন রেগে দাঁত কড়মড় করে ওঠে, তখন মনে হয় বুঝি চন্দ্রকে খেয়েই ফেলে। কিন্তু চন্দ্রের হাতে ঢাল তলোয়ার, বুনো শুধু হাতে তার সঙ্গে আর কতক্ষণ যুঝবে? কাজেই শেষে বেচারীকে কাবু হয়ে শুয়ে পড়তে হ'ল। চন্দ্র তখন তাকে ইসারায় বল্লে যে "আমার সঙ্গে চল্।" চন্দ্রের সাহস আর বুদ্ধি দেখে বুনোরও ততক্ষণে তার উপর কেমন একটা টান হয়ে গেছে; সে তখনি উঠে তার সঙ্গে চল্ল।

সন্ধ্যার সময় তারা এক সরাইখানায় এসে উপস্থিত হ'য়েছে। বুনোকে দেখেই সরাইএর সব লোক "বাপরে বাপরে!" বলে ছুট্।

চন্দ্র তাদের ডেকে কত করে বল্ল "ভয় নেই! আমরা তোমাদের কিছু করবনা, আমরা শুধু এখানে থাকতে এসেছি।" কিন্তু কে কার কথা শোনে! সবাই এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। সেটা সরাইয়ের খাবার সময় পাত পিঁড়ি প্রস্তুত, লুচি তরকারি সব সাজান। তাদেখে দুজনে মজা করে সেই সব খাবার খেতে বসে গেল। বুনো একলাই সব পাত খালি করে তারপর জলের চৌবাচ্চায় মুখ ডুবিয়ে ঘোড়ার মতন করে জল খেল। তারপর দুজনে সেখানে ঘুমিয়ে রইল।

ক্রমশঃ

'বুনো' মানুষ।

নাইনিতাল থেকে খবর এসেছে যে সেখানকার কোন বনে নাকি একটি আট নয় বছরের 'বুনো' মেয়ে পাওয়া গিয়েছে। প্রথমে যখন তাকে আনা হয়, তখন সে ভয়েই জড় থাকত, আর শুধু ঘাস আর কাঁচা আলু ছাড়া কিছু খেত না। তার পর একটু একটু করে সে দুধ রুটি খেতে আরম্ভ করল।

মেয়েটি কথা কইতে পারে না, খালি কাঁদে আর খুঁৎ খুঁৎ করে। তবে, তার ভয় অনেকটা কমে এসেছে। বনে থেকে থেকে তার চেহারা অনেকটা বানরের মত হয়ে গেছে, তার গাল আর পিঠ লম্বা লম্বা রোঁয়ায় ঢাকা। তবু সে যে মানুষেরই মেয়ে, বানর নয়, তাতে আর ভুল নাই, কেন না, তার দুহাতে টিকার দাগ রয়েছে। সে বানরের মতন করে বসে, সেই রকম মিট্ মিট্ করে তাকায়, স্বভাবটিও তার অনেকটা বানর গোছের। হাত দুখানি সরু সরু আর লম্বা, তাতে মস্ত মস্ত নখ। বনে থাকতে বোধ হয় সে মানুষের মত দুপায়ে ভর করেই চল্‌ত জানোয়ারের মত চার হাত পায়ে চললে হাতে আর হাঁটুতে যেমন দাগ থাকবার কথা, তেমন তার কিছুই নাই। কে জানি কার মেয়ে কেমন করে বনে চলে গিয়েছিল।

এমনি আর একটি বুনো মানুষের কথা আমরা ছেলে বেলায় শুনেছিলাম। সে নাকি বাঘ ভালুকের মত, জন্তু মেরে চিবিয়ে খেত। তাকে ধরে এনে অনেক দিন রাখা হয়েছিল। সে দু একটা কথা বলতে শিখেছিল; মাথা ধরলে বলত, "শির দরদ্ করতা হ্যায়।"

বরফের দেশে 'সিনামেটোগ্রাফ।'

বরফের দেশে সীল, সিন্ধু ঘোটক, শ্বেত ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু থাকে। আজ কাল অনেক সাহেব এই সকল জন্তু শীকার করতে যান; তাঁদের সঙ্গে বায়স্কোপের ক্যামারা থাকে, শীকারের সঙ্গে সঙ্গে তা দিয়ে ছবিও তোলা হয়।

সিন্ধু ঘোটকের ছবি তোলা বড় সহজ কাজ নয়। এ সকল জন্তু দেখ্‌তে ভারী বোকার মত, কিন্তু কখ্‌নো কখনো আবার বড্ড চালাক হয়ে দাঁড়ায়। কাপ্তেন ক্লৈনশ্মিট্ নামে একটি সাহেব একজন ফোটোওয়ালাকে নিয়ে অনেক দিন চেষ্টা করেও

সিন্ধু ঘোটকের ছবি তুলতে পারেন নি। তাদের কাছে যাবার ঢের আগেই তা বরফ থেকে ঝুপ করে জলে প'ড়ে চম্পট দেয়। তখন সাহেব বুদ্ধি করে তা নৌকায় সাদা কাপড় জড়িয়ে নিলেন, নিজেরাও সাদা চাদর জড়িয়ে তাতে গিয়ে বসলে সাদা দেখে সিন্ধু ঘোটকেরা ভাবল, বুঝি বরফই হবে, কাজেই তারা আর পালা চেষ্টা করল না। তিনটা সিন্ধু ঘোটক ছিল, তাদের দুটো যুদ্ধ জুড়ে দিল, আরে বরফে গড়াগড়ি দিয়ে আরাম করতে লাগল। ততক্ষণে সাহেবেরা মজা করে তা চমৎকার ছবি তুলে নিলেন।

এর চেয়ে বেখাপ্পা জন্তু হচ্ছে ভাল্লুক। সে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে থপা থপাস করে চলে, সাহেবেরা কিছুতেই তার সামিল হতে পারেন না। তারা যতই তা কোণ ঠেসা করতে চেষ্টা করেন ততই সে চটে। শেষে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে ফোটো ওয়ালা সাহেবকে তাড়া করল। ভাগ্যিস্ ক্লাইন্‌শ্মিট্ সাহেব তৎক্ষণাৎ সেটাকে গুলি

মেরে ফেলেছিলেন, নইলে সেদিন বিপদই হত। এমনি করে ক্রমাগত পাঁচটি ... মেরে তবে একটির ভাল ছবি তোলা হয়েছিল।

শাদা ভাল্লুক আর সিন্ধুঘোটকে যুদ্ধ।

এদের মধ্যে সীলই হচ্ছে সকলের চেয়ে ভাল মানুষ। সাহেব বলেছেন যে এদের ফোটো তুলতে গেলে নাকি এরা বেশ খুসী হয়। একটা বুড়ো কর্ত্তা গোছের সীল সাহেবের ক্যামারা দেখে খুসী হয়ে তার ছেলে, মেয়ে, গিন্নী, সকলকে ডেকে এনে তার সামনে দাঁড়িয়ে কেঁয়াও মেঁয়াও করে গান যুড়ে দিল। সেই গান শুনে আরেকটা গোঁয়াড় গোবিন্দ ছোকরা সীল সেখানে বেয়াদবি করতে এসেছিল, বুড়ো কর্ত্তা তাকে এমনি দুই থাপ্পড় লাগিয়ে দিল যে থাপ্পড় যাকে বলে। সাহেবেরা এর সবই সিনামেটোগ্রাফ করে এনেছেন।

নোংরা লোক।

একজন জাপানী সাধু অনেক দিন তির্ব্বতে ছিলেন। তিনি বলেছেন, সে দেশের লোক নাকি অসম্ভব রকমের নোংরা। সে দেশের একজন চাকর তাঁকে ভয়ঙ্কর ... একটা পেয়ালায় করে এনে চা খেতে দিয়েছিল। তিনি বল্‌লেন, "ইস্!

পেয়ালাটা বড় ময়লা!” তাতে চাকরটি আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, “সে কি মহাশয়? এ সবে কাল পেয়ালা পরিস্কার করলুম, আর আপনি বলছেন ময়লা!”

তিব্বতের লোকেরা নাকি স্নানও করে না, কাপড়ও কাচে না। একখানি কাপড় ছিঁড়ে একেবারে টুকরা টুকরা না হয়ে গেলে, তাকে গা থেকে খোলেও না। তার শেষে কি রকম রং আর গন্ধ হয় হয়ে দাঁড়ায় সে না দেখলে বুঝবার সাধ্য নাই। স্নান না করার দরুন ফরসা লোকের রংও কালো হয়ে যায়। ধূলোয় তেলে আর কালিতে মিসে তাদের গায় আর একখানি চামড়ার মত জমে থাকে। আর সেইটেই নাকি তারা খুব পছন্দ করে। গা পরিস্কার করা সে দেশে বড় নিন্দার বিষয়। কোন যুবক যদি এমন অপরাধ করে, আর সে কথা সে দেশের গিন্নীরা আর কনেরা জানতে পারে, তবে না কি সেই যুবকের বিয়ে হওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে।

ঠান্‌দিদির বিক্রম।

আমাদের এক ঠান্‌দিদি ছিলেন। অবশ্য, ঠাকুরদাদাও ছিলেন, নইলে ঠান্‌দিদি এলেন কোত্থেকে? তবে ঠাকুরদাদাকে পাড়ার ছেলেরা ভালরকম জানত না। ঠাকুরদাদার নাম রামকানাই রায়; লোকে তাঁকে কানাই রায় বলে ডাকত, কেউ কেউ রায় মশায়ও বলত।

ঠাকুরদাদাকে যে ছেলেরা জানত না,—তার একটু নমুনা দিচ্ছি।—ঠান্‌দিদির বাড়ীতে এক ঝাড় তল্‌তা বাঁশ ছিল, ঐ বাঁশে ভাল মাছ ধরবার ছিপ হত। একবার কয়েকটি ছেলে, ছিপ তৈরী করবে বলে, চুপি চুপি একটি বাঁশ কেটে, যেমন রাস্তায় টেনে এনেছে, অমনি দেখে, রায় মশায় সম্মুখে। তারা তখনি হাতযোড় করে বল্লে, “আপনার পায়ে পড়ি, ঠান্‌দিদিকে বলবেন না!” তিনি ত শুনে অবাক! “আরে, বলিস কি? আমার বাঁশ নিয়ে পালাচ্ছিস, আর বলছিস ‘বলবেন না’!”

ছেলেগুলি সকলে মিলে কেবলই বলতে লাগল, “আপনার পায়ে পড়ি, ঠান্‌দিদিকে বলবেন না।” তখন রায় মশায় বেগতিক দেখে বল্লেন, “তোরা বাঁশ দিয়ে কি করবি?” “আজ্ঞে, ছিপ করব।” “আচ্ছা, নিয়ে যা।” তখন আবার “দেখবেন, ঠান্‌দিদিকে যেন বলবেন না” বলে ছেলেগুলো বাঁশ নিয়ে ছুট। এখন বোধ করি তোমরা বুঝতে

রায় মশায়ই যে ঠাকুরদাদা তা অনেক ছেলেই জানত না। ছেলেরা জানত, ...দির বাড়ী, ঠান্‌দিদির বাঁশ ঝাড়, ঠান্‌দিদির কাঁঠাল গাছ, বিশেষভাবে ঠান্‌দিদির ...ছ আর পেয়ারা গাছ।

...ান্‌দিদির পুত্র সন্তান নাই, কেবল তিনটি মেয়ে। বড় মেয়ে দুটির বিবাহ হয়ে ...ছ, ছোটটির বয়স ৯।১০ বৎসর। ঠান্‌দিদির বয়স চল্লিশের উপর। বাড়ীতে ... লোকজন নাই, কিন্তু তা হলেও, ঠাকুরদাদা বিদেশে গেলে, ঠান্‌দিদির চৌকীদার ঘরে শোয়ার জন্য বুড়ো স্ত্রীলোকের দরকার হয় না। ঠান্‌দিদি অনায়াসে একাই ...তে থাকেন।

একবার ঠাকুরদাদা বিদেশে গিয়েছেন, ঠান্‌দিদি কেবল ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ...ড়াতে আছেন, সেই সময়ে একদিন দুপুর রাত্রে মেয়েটি বল্ল, "মা! কে যেন আমার ...য়ে হাত দিল!" ঠান্‌দিদি বল্লেন, "চুপ কর্, কথা বলিস্ না।" ঠান্‌দিদি পূর্ব্বেই ...র পেয়েছেন, ঘরে চোর ঢুকেছে। তারপর চোর যেই বাক্স পেটরার সন্ধানে ঘরের ...ন্য দিকে গিয়েছে, অমনি ঠান্‌দিদি আস্তে আস্তে উঠে, বাটনা বাটা শিলখানা এনে ...িঁদের মুখে চাপা দিলেন।

তোমরা সহরের ছেলেরা বোধ করি বুঝতে পাল্লে না, সিঁদ কি? পাড়াগাঁয়ে অনেক ...মেটে ঘর, ঐ সব মেটে ঘরে সিঁদকাঠি দিয়ে খুঁড়ে চোর ঘরের ভিতর ঢুকে চুরী করে। এবার আরো মুস্কিল হল,—সিঁদকাঠি কি? সিঁদকাঠি যে কি, তা আমিও কখনো চোখে দেখিনি। সম্ভবতঃ ওটা খন্তা বা সাবলের মত লোহার কোন অস্ত্র হবে।

এই সিঁদকাঠি তৈরীর সম্বন্ধে পাড়াগাঁয়ে একটা কথা আছে যে, "চোরে কামারে কখনো দেখা হয় না।" সিঁদকাঠি যখন লোহার অস্ত্র, তখন অবশ্যই ওটা কামারে গড়ে। কিন্তু চোর কি কামারের বাড়ী গিয়ে বলে, "কর্ম্মকার ভায়া, আমাকে একটা সিঁদকাঠি তৈরী করে দাও!" নিশ্চয়ই না; তা হলে ত সেইখানেই সে চোর বলে ধরা দিল। কামার ভায়া চোরের নিতান্ত বন্ধু হলেও, সময় মত অন্য ২।১০ জন বন্ধুর নিকট সে গল্পটা করবেই, দরকার হলে পুলিশের কাছেও বলতে পারে।

তবে চোর কি করে সিঁদকাঠি গড়ায়? আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম, চোরের সিঁদকাঠির দরকার হলে, চোর একখানি লোহা আর একটি আধুলি রাত্রে কামারশালের এমন জায়গায় রেখে যায়, যে কামার সকালে কামারশাল খুলবার সময়েই সেটা তার নজরে পড়ে। তখন কামার অন্য কাজ বন্ধ রেখে, সকলের অসাক্ষাতে সিঁদকাঠিটি

তৈরী করে, কামারশাল বন্ধ করবার সময়, ঠিক সেই জায়গায় সেটি রেখে দেয়। রাত্রে চোর এসে সেটি নিয়ে যায়।

এখন আসল কথা শোন। ঠান্‌দিদি সিঁদের মুখে শিলটি চাপা দিয়ে, তার পাশে চুপ করে বসে আছেন। তারপর চোর একটি বাক্স এনে সিঁদের কাছে যেমন নামিয়েছে, অমনি বেটাকে ঝাপ্‌টে ধরেছেন। তখন চোর নাকিসুরে বল্ল, "মা ঠাকরুণ, ছেড়ে দিন!" ঠান্‌দিদি বল্লেন, "বল্ বেটা তুই কে? নইলে এখনি পাড়ার লোক ডেকে তোকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করব।" চোর দেখল, নাম না বল্লে আর নিষ্কৃতি নাই, কাজেই বল্ল, "মা ঠাকরুণ, আমি শীতল!" তা শুনে ঠান্‌দিদি বল্লেন, "হতভাগা! মরতে আর জায়গা পাওনি? যাও!—ঐ বাইরে কলসী আছে—পুকুরে গিয়ে জল আন, তারপর কাদা করে সিঁদ বোজাও। ঐ গোয়ালে গোবর আছে; গোবর দিয়ে ভিতর বা'র ভাল করে নিকিয়ে দিয়ে যাও। আমি সকালে উঠে এসব হাঙ্গামা কত্তে পারব না।"

শীতল তখন কলসিটি নিয়ে আস্তে আস্তে পুকুরঘাটে গেল। তখন ফাল্গুন মাস, পাড়াগাঁয়ে বেশ শীত। সেই শীতে পুকুর থেকে জল এনে, কাদা করে, সিঁদ বুজিয়ে, ভাল করে নিকিয়ে, তবে শীতল ছুটি পায়!

তোমরা চালাক ছেলেরা ভাবছ, চোরটা কি বোকা, কলসী নিয়ে অমনি পালাল না কেন? শীতল কলসী নিয়ে পালালে তার কি দশা হত, তা আরেক দিন তোমাদের বলব।

মেঘের মুলুক।

যত উঁচুতে উঠা যায়, ততই শীত। কলকাতার চেয়ে দারজিলিঙ্গে বেশী শীত আর দারজিলিঙ্গের চেয়ে হিমালয় পর্ব্বতের উপরে বেশী শীত। সেখানে বারোমাসই বরফ প'ড়ে থাকে, তাই সে সব পাহাড় দেখতে শাদা।

অবশ্য, দারজিলিংও হিমালয়ের উপরে, কিন্তু তত উঁচুতে নয়। আগে কতকগুলো ছোট ছোট পাহাড় পার হয়ে তবে হিমালয়ে পৌঁছাতে হয়। দারজিলিং সেই ছোট পাহাড়ের উপরে। এগুলোকে বলে উপ-হিমালয়।

দারজিলিং থেকে উত্তর দিকে তাকালে হিমালয় যে কি সুন্দর দেখা যায়, কি বল্‌ব। এত উঁচু পাহাড় পৃথিবীতে আর কোথাও নাই ; এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সারবাঁধা এতগুলো বিশাল পর্ব্বতও আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। নীচের দিকে তাকাও, রঙ্গিত নদী দেখতে পাবে, সে প্রায় বাংলার মাঠের সমানই নীচু। উপরের দিকে তাকাও, দেখবে, হিমালয়ের চূড়াগুলি যেন আকাশের গায় ঠেকে আছে, তার সকলের চেয়ে উঁচুটি পাঁচ মাইলেরও বেশী উঁচু। রঙ্গিতের ধারে প্রায় আমাদের এখানকার মতনই গরম, আর হিমালয়ের উপরে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। সেখানে আজও কেউ যেতে পারেনি, যদিও অনেকে চেষ্টা করছে। গাছপালা সেখানে জন্মায় না, খুব উপরে জীব জন্তু থাকবারও যো নাই।

এত উঁচুতে বাতাস এমন হাল্কা যে, নাক দিয়ে ভাল করে নিশ্বাস ফেলাই কঠিন। কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে গেলেই হাঁপ ধরে অস্থির করে দেয় ; কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে গেলে কি রকম হবে তা ত কেউ বলতেই পারে না।

কাঞ্চনজঙ্ঘাই হচ্ছে দারজিলিঙ্গের ওখানকার সব চেয়ে উঁচু পর্ব্বত (২৮১৫৬ ফুট

উঁচু), তারপর জান্নু (২৫৩০৪ ফুট), তারপর কব্রু (প্রায় ২৪০০০ ফুট), তারপর পণ্ডিম (২২০১৭ ফুট), তারপর নর্সিং (১৮১৪৫ ফুট), এমনি করে পরপর কত দাঁড়িয়ে আছে, আমি তা বলে শেষ করতে পারব না; আর এই বুড়া বয়সে তাদের সবকটার নাম মুখস্থ করতে গেলে আমার প্রাণই বেরিয়ে যাবে।

আমরা বলি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা,' কিন্তু আসলে নাকি সেটা বাংলা কথা নয়। আসল কথাটি হচ্ছে 'খাঁচেন্ ঝ ঙ্গা,' তার মানে বলছি, শুন। 'খাঁচেন্,' কি না 'বড্ড হিম', 'ঝ' মানে 'পাঁচ'; আর 'ঙ্গা' হচ্ছে পর্ব্বত। অর্থাৎ কি না, পাঁচটি পর্ব্বত মিলে এই পর্ব্বতটি হয়েছে, আর, সেখানে বড্ড হিম। একথা আমি একটি পুস্তকে পড়েছিলাম, সুতরাং সত্য হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

হিমালয়ের আরেকটা চূড়া আছে, সে কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়েও উঁচু। তোমরা অনেকেই তার নাম শুনেছ। ইংরাজেরা তাকে বলেন 'এভারেষ্ট্' (Everest), দেশী লোকেরা বলে 'গৌরীশঙ্কর,' পাহাড়ীরা নাকি বলে 'দেওধঙ্গা'—তার মানে যে কি, সেকথা আমি বলতে পারব না। আর একটু হলেই এই পর্ব্বতটি দারজিলিং থেকে দেখা যেত। সিঞ্চল থেকে তার আগা দেখতে পাওয়া যায়।

এতগুলো বড় বড় পর্ব্বত এক জায়গায় থাকার একটু অসুবিধা আছে। এ বলে 'আমাকে দেখ,' ও বলে 'আমাকে দেখ,' কাজেই ওরা যে বাস্তবিকই কত বড়, সেকথা চট্ করে মাথায় আসে না। আমাদের বাংলার মাঠে এর একটাকে পাওয়া যেত, তবে তার আদর বেশ ভাল করেই হত। এ দেশের পরেশনাথ পর্ব্বতখানি ৪৫০০ ফুট মাত্র উঁচু, তাকে দেখেই কত লোকে অবাক্ হয়ে যায়।

আর এক কথা এই হচ্ছে যে, এসকল পর্ব্বত যে দারজিলিংঙ্গের খুবই কাছে, তা নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা সেখান থেকে সোজাসুজী ৪৫ মাইল দূরে। কিন্তু পাহাড়ের পথ দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে প্রায় দুশ মাইল হাঁটতে হয়। অথচ, সেখানকার হাওয়া যার পর নাই পরিস্কার বলে তাকে এতই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে, তাকে এত দূরের জিনিস বলে বোঝাই কঠিন হয়। কাজেই সে আসলে যত বড়, দেখলে মনে হয় যেন তার চেয়ে ঢের ছোট।

যে হিমালয়ে না গিয়েছে, সে বুঝতেই পারবে না, সেখানকার হাওয়া কত পরিস্কার। ১০ মাইল দূরের জিনিসটিকে এত স্পষ্ট দেখা যায়, যে, মনে হয় যেন সে ২।৩ মাইল মাত্র দূরে। ২০ মাইল ২৫ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে বাড়ী আছে, পরিস্কার দিনে

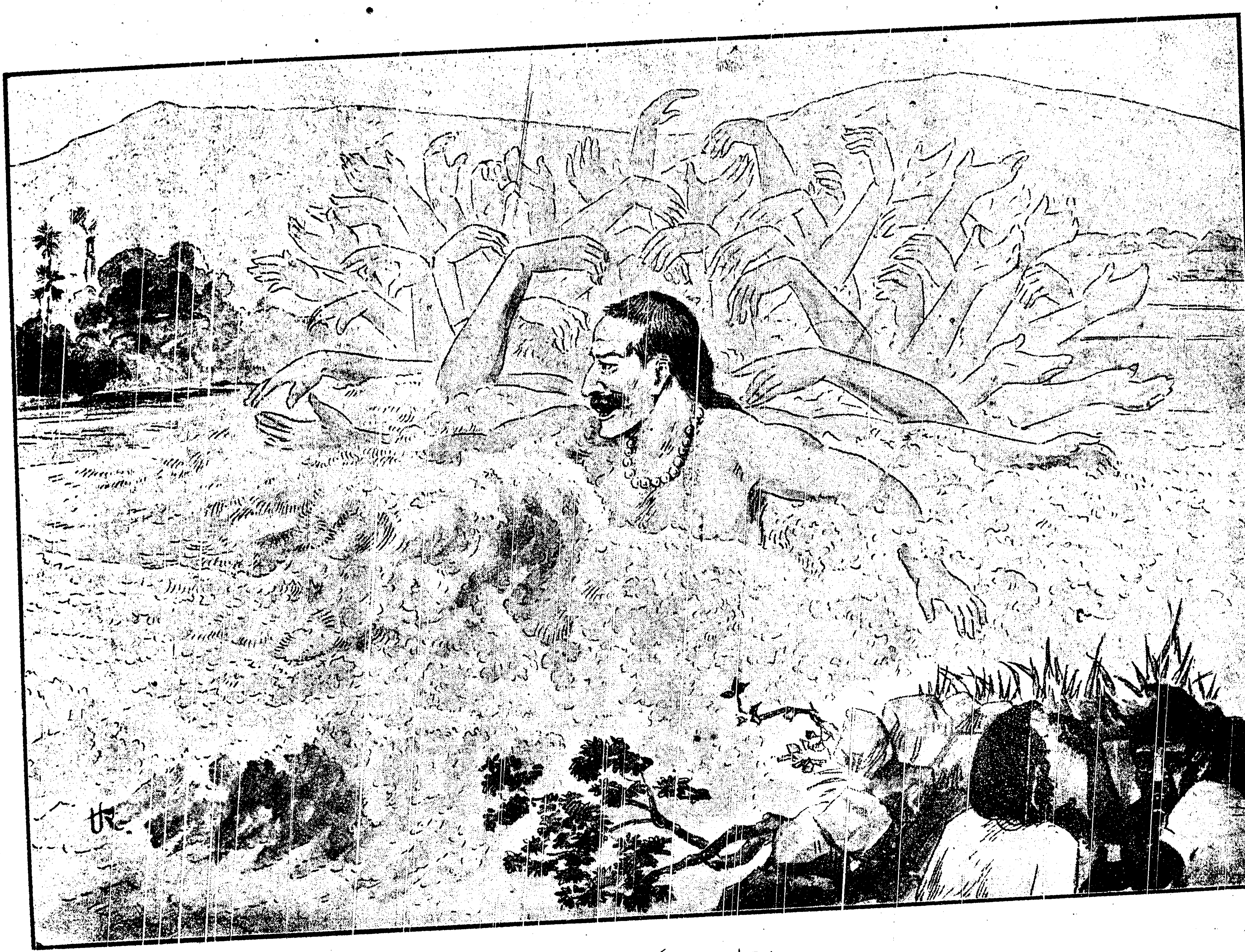

অর্জ্জুনের নর্ম্মদায় স্নান।

U. RAY & SONS

রোদ পড়ে ঝক ঝক করতে থাকে। এত দূর থেকে নিতান্তই বিন্দুটির মত দেখায়, নইলে তার দরজা জানালা গুণে দেওয়া যেত।

এই পরিস্কার বাতাসেই হিমালয়কে এমন ঝকঝকে করে রেখেছে। সেখানকার দের একটা জ্যোতি আছে, যা আমাদের এই ধূলো মাখা রোদে নাই। তার উপরে ার ঝকঝকে বরফ। তার উপরে রোদের খেলা একবার যে দেখেছে, সে আর তা ভুলতে পারবে না। যদি পারে, সে বড় দুঃখী লোক।

ভোরে আর সন্ধ্যায় যখন ঘন ঘন রোদের রং বদলাতে থাকে, তখন হিমালয়ের ও পলে পলে নূতন হতে থাকে। এই মিছরির কুঁদোর মত, এই আগুনের মত, সোনার মত, এই মুক্তার মত, এই গরদের উপর চাঁদীর কাজের মত, এই খড়ির -যেন যাদুকরের ভেল্কী। এমনি করে দিনটি কেটে গিয়ে বিকালে আবার সোনার , আগুনের মত, মাণিকের মত হয়ে পালা শেষ করে। বেগুণী রঙের পাহাড়ের ায় সেই মাণিকের মত বরফ, সে যে কি সুন্দর, তার তুলনা কোথাও নাই। রাণীর বহুমূল্য পোষাক আর মুকুট তার কাছে লাজে মাথা হেট করে।

এমনি করে রাত্রি এসে উপস্থিত হয়। তখন যদি আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ থাকে, ব তার শোভা হয় যেন আরো চমৎকার। অবশ্য তাতে তেমন তাক লাগিয়ে না, কাজেই সকলের কাছে তার তেমন আদর নাও হতে পারে। কিন্তু যে বোঝে, দেখেই বলে, 'আহা!'

লোকে বলেছে, ওখানে দেবতাদের বাস। এমন সুন্দর জিনিস দেখে ও কথা রে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। ও যে কতখানি সুন্দর, এসব কথায় তাই াঝা যাচ্ছে।

যা হোক, দূরে থেকে সুন্দর হলেও ও সকল বড় ভয়ঙ্কর স্থান। হিমালয় পার য়ে তিব্বত যেতে হয়, কিন্তু পার হওয়ার মত নীচু জায়গা ওতে বেশী নাই। যে য়েকটি জায়গা আছে, তার কোনটাই প্রায় পোনের ষোল হাজার ফুটের কম উঁচু র না। তাতেও আবার শীতকালে যাবার যো নাই, কারণ তখন সে সব জায়গা ফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে চমরীর পিঠে চড়ে, ঝড়ের শীতের আর বরফের তাড়ায় কাল হয়ে অনেক কষ্টে সে পথে চলতে হয়।

চোখের কথা।

আমাদের দুটো করে চোখ থাকে কেন ? একটা থাকলে কি হত ?

শুধু একটা চোখ যদি থাকত, তবে আমরা আমাদের সামনের সব জিনিস এক স দেখতে পেতাম না। এ কথার পরীক্ষা এই ছবির সাহায্যে তোমরা সহজেই কর পার।

কাগজখানিকে ঠিক করে চোখের ফুটখানেক সামনে ধর, তোমার মাথাটিও ঠি সোজা রাখ। এখন ডান চোখ বুঁজে, বাঁ চোখে একদৃষ্টে খানিক ঐ ইঁদুরটির পা তাকাও। তারপর কাগজ আর তোমার মাথা খুব স্থির রেখে, বাঁ চোখটি ধীরে ধী ফিরিয়ে ইঁদুরের কাছ থেকে ব্যাঙের দিকে নিয়ে যেতে থাক। কাজটি খুব ধীরে ধী করবে, আর খেয়াল রাখবে, দুটি ছবিই দেখতে পাচ্ছ কি না। চোখ ইঁদুরকে ছে ব্যাঙের দিকে যেতে যেতে একবার এমন একটা জায়গায় পৌছাবে, যেখান থেকে আ ইঁদুরটিকে দেখা যায় না। বাঁ চোখ বুঁজে, ডান চোখে যদি ব্যাঙের দিকে তাকা আর তারপর ধীরে ধীরে চোখ সরিয়ে ইঁদুরের দিকে আনতে থাক, তাহলেও দেখ একটা জায়গায় এসে আর ব্যাংটিকে দেখতে পাওয়া যায় না।

দু একবার এই পরীক্ষাটি করতে ভুল হতে পারে, তাতে নিরাশ হয়ে ছেড়ে দি না। একটিবার যথার্থ ভাবে ব্যাপারটিকে দেখতে পেলে সকল পরিশ্রম সার্থক হ যাবে। তখন বুঝতে পারবে যে, আমাদের চোখগুলির একটি স্থান কাণা, সেই জ দু চোখে না দেখলে কোন কোন জিনিস দেখতে বাকি থেকে যায়।

একটি চোখ অন্ধ করলে যতটুকু জায়গা দেখতে পাও, দু চোখে দেখবে তার দে গুণ বেশী। একথাটা সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার। সুতরাং চোখের য কোন দোষ নাও থাকে, তথাপি এক চোখের চেয়ে দু চোখে দেখার ঢের লাভ আছে।

দুটি করে চোখ থাকার আরেকটা সুবিধাও আছে। দেখবার কাজটি নাকি চোখে পক্ষে বেশ পরিশ্রমের কাজ, তাই ভগবান এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে কাজের সঙ্গে সঙ্গে ওরা পালা করে একটু একটু বিশ্রামও করতে পাবে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা ক

...ছেন যে, ডান চোখটা যখন খুব করে দেখতে থাকে, বাম চোখটা ততক্ষণ একটু ...গা দেয়! তারপর আবার বাম চোখের উপর কাজের ভার দিয়ে ডান চোখটা ...র বদ্‌লিয়ে নেয়। এমনি করে তাদের কাজ চলে।

আমাদের দুটি চোখ দু জায়গায়। তার ফলে এই হয় যে, আমরা আমাদের ...নের জিনিসগুলোকে দু চোখে একটু ভিন্ন ভিন্ন রকমের দেখি! এই 'সন্দেশ' ...জখানাকে বন্ধ করে, তার ঘাড়ের দিকটি তোমার মুখের পানে ফিরিয়ে, কাগজ-...কে তোমার সামনে ধর। দেখবে, এক চোখে যদি মলাটের প্রথম পৃষ্ঠাটি দেখতে ...ও, তবে আরেক চোখে দেখবে শেষ পৃষ্ঠা।

ডান হাতের তর্জ্জনী আঙ্গুলটি তুলে তোমার চোখের সামনে আধ হাত দূরে ধর, ...র বাঁ হাতের তর্জ্জনী উঠিয়ে এক হাত দূরে ধর। এখন যদি ডান হাতের আঙ্গুলটির ...ক ভাল করে তাকাও তবে বাঁ হাতে দুটো তর্জ্জনী দেখতে পাবে। ~~বাঁ হাতের~~ ...ঙ্গুলটির দিকে বিশেষ করে তাকাও, ডান হাতে দুটো তর্জ্জনী হয়ে যাবে। আবার ...আর হাত না নেড়ে দূরের কোন একটা জিনিষের দিকে তাকাও, দু হাতেই দুটো ...র তর্জ্জনী দেখবে।

বাস্তবিক আমরা যে জিনিষটির দিকে বিশেষ করে তাকাই, খালি তাকেই একটি ...খি; আর সব জিনিষ দেখি দুটো দুটো।

আবার ভাল করে দেখ। যখন যে আঙ্গুলটিকে দেখতে চাও, চোখ দুটিকে বাগিয়ে ...নে তার উপর ফেলতে হবে নইলে তাকে একটি আঙ্গুল বলে মনে হবে না। একটু ...নোযোগ দিলেই দেখবে যে দূরের আঙ্গুলটি দেখবার সময় দুটি চোখের তারা একটু ...ক ফাঁক থাকে, কাছের আঙ্গুলটি দেখতে হলে সেই ফাঁক একটু কমিয়ে আনা চাই। এই কাজটুকু করতে যে চেষ্টার দরকার, সেটি আমরা চট্ করে বুঝতে পারি না, কিন্তু তথাপি তার হিসাব আমাদের রাখতে হয়। তাই থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে 'এই জিনিষটা এতখানি দূরে।'

অবশ্য, এক চোখে দেখতে হলেও অন্য উপায়ে এ হিসাব আমরা রাখতে পারি। কিন্তু তাতে যে সকল সময় ভাল করে কাজ চলে না, একটি মজার খেলা খেল্‌লেই সে ...থা বুঝতে পারবে।

একটি সরু লাঠি খাড়াভাবে মাটিতে বসিয়ে, তার আগায় একটি পয়সা রেখে দাও। ...য়, তোমরা লাঠি থেকে হাত কুড়ি দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াও। এখন খেলা হচ্ছে এই

যে, যদি তোমার একটি মাত্র চোখ খোলা থাকে, আর অপরটি বেঁধে দেওয়া হয়, তাহা তুমি সেই বাঁধা চোখ নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে ছুটে গিয়েই অমনি একটি টোঁকা মে পয়সাটিকে ফেলে দিতে পার কি না? কথাটা হঠাৎ শুনলে হয় ত মনে হবে 'খুব পারি!' কিন্তু একবার করে দেখ, কেমন মজা। বাস্তবিক, এক চোখ দিয়ে কোন্ জিনিস কত দূরে, তা ভাল করে বোঝা যায় না। তিন টোকা মারলে হয় তার একটি মাত্র পয়সায় লাগবে, আরগুলি হাওয়ার উপর দিয়েই যাবে। দু চোখে দেখতে পেলে একাজে তেমন মুস্কিল বোধ হয় না।

দু চোখে দেখার খেলা আরেক রকমের আছে।

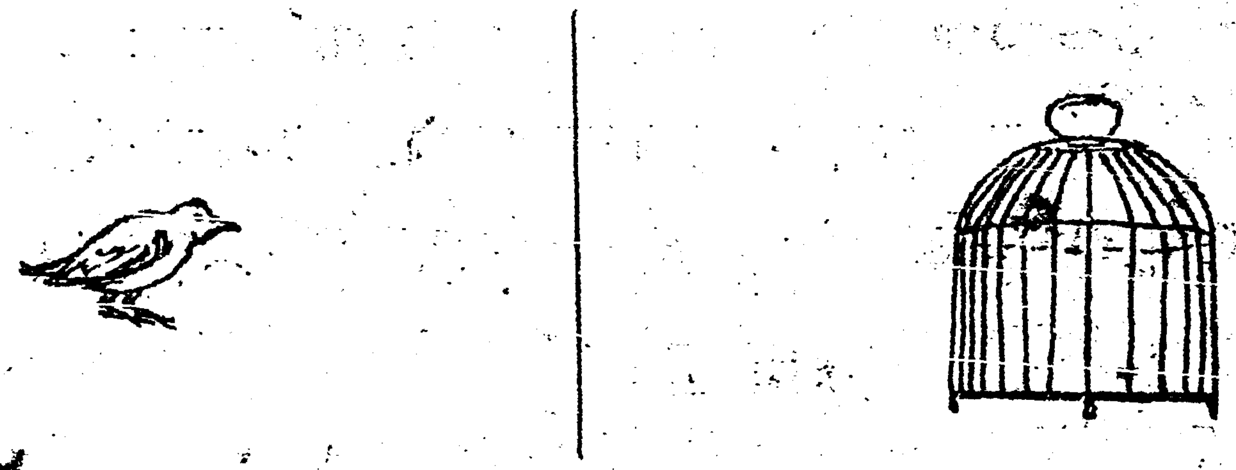

এই একটি পাখী, আর এই একটি খাঁচা, আর এই তাদের মাঝখানে একটি লাইন। এই লাইনটির উপরে একখানা কার্ড খাড়া করে ধর, আর সেই কার্ডে নাক ঠেকিয়ে পাখীটি বা খাঁচাটিকে দেখতে চেষ্টা কর। খানিক বাদে দেখবে, পাখীটি খাঁচার দিকে আর খাঁচাটি পাখীর দিকে চলে আসছে, হয় ত বা পাখীটি খাঁচায় ঢুকেও যেতে পারে। পাখী বা খাঁচার উপর চোখ স্থির রাখতে পারলে এমনটি হয় না। কিন্তু এত কাছে জিনিসের উপর বেশী ক্ষণ চোখ রাখতে কষ্ট হয়। তখন চোখ ক্লান্ত হয়ে সরে যায়, আর তাতেই ছবি দুখানিও সরে আসে।

আরেক উপায়েও পাখীকে খাঁচায় ঢোকান যেতে পারে।—

একখানা কার্ডের এক পাশে একটি পাখী, আর এক পাশে একটি খাঁচা আঁকা, আর কার্ডখানির দু মাথায় দুগাছি সূতা বাঁধা। এই সূতার ধারে কার্ডখানিকে তাড়াতাড়ি ঘুরালে, একবার পাখী, একবার খাঁচা, ঘন ঘন দেখতে পাওয়া যাবে। তখন মনে হবে যেন পাখীটি খাঁচার ভিতরে বসে আছে। আমরা যে জিনিসের দিকে

...হ, চোখের ভিতরে তার ছবি পড়ে। জিনিসটি হঠাৎ সরে গেলেও চোখের ভিতরে ...ছবিটি খানিকক্ষণ থেকে যায়। এই জন্যই পাখীটি আর খাঁচাটি বার বার আড়াল ...লেও চোখের ভিতরে তাদের ছবি দুখানি আগাগোড়াই বজায় থাকে। তাতেই ...রা খাঁচা আর পাখী একসঙ্গে দেখতে পাই। এই সামন্য ব্যাপার থেকেই ...স্কোপের সৃষ্টি হয়েছে।

মাইডাস্।

অনেক দিন আগে লিডিয়া বলে একটা দেশ ছিল, সেই দেশের এক রাজার নাম ... মাইডাস্। ধন রত্নে মাইডাসের ঘর ভরা ছিল, কিন্তু তাতে তার মন উঠ্‌ত না; ...নি খালি ভাবতেন, 'আহা, যদি আমার আরো ঢের ঢের ধন থাকৃত!'

এর মধ্যে এক দিন এক মাতাল টলতে টলতে তাঁর সভায় এসে উপস্থিত। লোকটা ...তাল হলেও বড় লোক, ব্যাক্কাস্ নামক দেবতার গুরু। বেচারা বনের ভিতরে পথ ...রিয়ে ফেলে নেশার ঝোঁকে আর সে পথ খুঁজে বার করতে পারছে না, তার ...ত্রের কাছে যেতেও পারছে না। মাঠে বনে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, দেশ বিদেশে সেই ... খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে সে মাইডাসের কাছে এসে বল্ল, "রাজা মশাই, ...মার পথ ত হারিয়ে গেছে; এখন উপায় কি হবে?"

মাইডাস্ তাকে চিনতে পেরে তখনি তাকে ব্যাক্কাসের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। ...ক্কাস তাতে যার পর নাই খুসী হয়ে বল্লেন, "মাইডাস্, আমি তোমার উপর বড় খুসী ...য়েছি, বল তোমার কি বর চাই। মাইডাস্ বল্লেন, "আমি আর কিছু বর চাই না, ...আমাকে শুধু এই বর দিন যে, আমি যা ছোঁব তাই যেন সোণা হয়ে যায়।" ব্যাক্কাস্ ...ল্লেন, "আচ্ছা তাই হোক; এখন থেকে তুমি যাতে হাত দিবে, তাই তৎক্ষণাৎ সোণা ...হয়ে যাবে।"

তখন ত আর মাইডাসের আনন্দের সীমাই রইল না। তিনি যা সামনে পাচ্ছেন, ...তেই হাত দিয়ে দেখছেন, আর অমনি সেটা সোণা হয়ে যাচ্ছে। গাছে হাত দিলেন, ...ছ সোণা হয়ে গেল, পাথরে হাত দিলেন, পাথর অবধি সোণা হয়ে গেল। নিজের ...ড়ী ঘর অবধি ছুঁয়ে সোণা করে ফেল্লেন। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার তা কি ...।

তারপর তিনি হাসতে হাসতে চাকরদের ডেকে বল্লেন, "আরে তোরা শীগ্গির খুব একটা ভোজের আয়োজন কর্; তারপর আমার যত আমীর ওমরাহ্ আছে, সকলকে সেই ভোজে ডেকে নিয়ে আয়।"

সে যে কি রকম ভোজ হয়েছিল, তা বুঝতেই পারছ। পোলাও পায়েস মিঠাই মণ্ডায় সকলের থালা একেবারে বোঝাই; কে কত খাবে? মাইডাসের জিব দিয়ে জল পড়তে লাগল, তিনি যার পর নাই খুসী হয়ে তাড়াতাড়ি মিঠাই তুলে মুখে দিলেন। কিন্তু হায় হায়! সে মিঠাই তিনি আর খেতে পারলেন না। কি করে খাবেন? সে যে সোনা হয়ে গেছে,—তাকে চিবাতে গেলে দাঁত ভেঙ্গে যায়! সরবং অবধি তাঁর হাতে গেলে সোনা হয়ে গেল, তাকে মুখে দিয়ে আর গেলা গেল না, সে মিষ্টি কি তেত, তা অবধি বোঝা গেল না।

হায় হায়! কি হবে? রাজার যে ক্ষুধায় প্রাণ যায়! তাঁর মুখে আর সে আনন্দ নাই, তার বদলে কান্না দেখা দিয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি ছুটে গিয়ে ব্যাকাসের পায় পড়ে বল্লেন, "ঠাকুর! আমার ঢের হয়েছে। আমার আর সোণায় কাজ নাই; এখন দয়া করে আপনার বর আপনি ফিরিয়ে নিন, আমি খেয়ে বাঁচি।"

ব্যাকাস্ বলেন, "তা বাপু তোমার যদি এত শীগ্গিরই সাধ মিটে থাকে, আমার বর ফিরিয়ে নিতে আর মুস্কিল কি? তুমি গিয়ে একটিবার প্যাক্টোলস্ নদীতে স্নান কর, তা হলেই আপদ চুকে যাবে।" মাইডাস্ তখনি প্রাণপণে সেই নদীতে ছুটে গিয়ে তার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নদীর বালি অবধি তাতে সোণা হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাইডাসের বিপদও কেটে গেল।

আর একবার এপলো নামক দেবতার হাতে মাইডাস্ বড় জব্দ হয়েছিলেন। মাইড়াসের একটি আদরের বাঁশীওয়ালা ছিল, তাহার নাম ছিল প্যান্। সেই প্যানের সঙ্গে একবার পাল্লা দিয়ে এপলোর গান বাজনা হয়। মাইডাস্ হলেন বিচারক, যে জিতবে, তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন। এপলো হচ্ছেন সঙ্গীতের দেবতা, আর প্যান্ সামান্য একটা মানুষ, সে তাঁর সঙ্গে কি করে পারবে? কিন্তু মাইডাস্ নাকি তাকে বড়ই ভালবাসতেন, তাই তিনি তার বাজনা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও অন্যায় করে তাকেই পুরস্কার দিয়ে দিলেন।

এতে এপলোর খুব রাগ হওয়ারই কথা, আর মাইডাস্‌কে তিনি সাজাও দিলেন তেমনি। সে সাজা আর কিছু নয়, মাইডাসের নিজেন কাণ দুটির জায়গায় তিনি এক

লম্বা এমনি খাশা দুটি গাধার কাণ করে দিলেন যে, সে কাণ দেখলেই সকলে বারে হাঁ করে থাকবে।

এখন মাইডাস্ ত সে কাণ নিয়ে নিতান্তই বিপাকে পড়লেন। মুকুট পরে আর হবে, যদি তার পাশে অমন দুটো কাণ দাঁড়িয়ে থাকে? সে দুটোকে কেটে ফেল্‌তে লেও বিষম লাগবে, তারপর আর দুটো গজাতেও পারে। তবে উপায়? উপায় আর —ডাক্ শীগ্গির নাপিতকে। নাপিত এলে তাকে বিশেষ করে বলে নেওয়া হল, দেখিস্ বাপু, কাউকে বল্‌তে কিন্তু পারবি না।" তারপর তাকে দিয়ে বিশাল পরচুলা বানিয়ে নেওয়া হল, যাতে রাজা সভায় যাবার সময় সেই পরচুলা পরে কাণ ঢেকে নিতে পারেন, কাজেই প্রজারা আর টের না পায়। বিদায় দিবার সময় আবার নাপিতকে বলে দেওয়া হল, দেখিস্ ব্যাটা, যদি কাউকে বল্‌বি, তবে কিন্তু তখনি তোর প্রাণটি যাবে।" নাপিত সেখান থেকে বাড়ী এসে প্রাণের দায়ে চুপ করে আছে, কাউকে কিছু বলে না। কিন্তু সে কথা কি পেটে থাকতে চায়? বেচারার আহার নিদ্রা অসম্ভব হয়ে উঠল, দিন রাত খালি সে ভাবে, 'এমন কথাটা! আহা এ কথাটা কাউকে বলা হবে না?' শেষটা আর থাকতে না পেরে সে একটা মাঠে গিয়ে খুব গভীর একটা গর্ত্ত খুঁড়ল। সেই গর্ত্তের ভিতরে গিয়ে সে বল্ল যে,

"মুই দেখছি আপন চোখে,—
মাইডাসের কাণ গাধার মতন!"

বলে, তবে বেচারার প্রাণটা ঠাণ্ডা হল, তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তারপর সে বাড়ী চলে এসে নিজের কাজে মন দিয়েছে, তার দিন সুখেই যাচ্ছে, মাইডাসের কাণের কথা নিয়ে আর তার মাথা ঘুরাতে হয় না।

ততদিনে সেই গর্ত্তের মুখে প্রকাণ্ড শরবন হয়েছে। যখন হাওয়া আসে তখন সেই শরবনের শরগুলি দুল্‌তে থাকে, আর ফিস্ ফিস্ করে বলে, "মাইডাসের কাণ গাধার মতন!" সে পথে যত লোক আসে যায়, তারা তাদের সেই কাণা কাণি শুনতে পেয়ে ঘরে গিয়ে বলে, "আরে শোন, রাজা মাইডাসের কাণ নাকি গাধার মতন!" ঘরের লোকেরা তা শুনে পাড়ায় গিয়ে বলে, "আরে শোন, রাজা মাইডাসের কাণ নাকি গাধার মতন।" এমনি করে ক্রমে পথে ঘাটে হাটে মাঠে সকলে বল্‌তে লাগল, "মাইডাসের কাণ গাধার মতন! মাইডাসের কাণ গাধার মতন!"

হিনেমোয়া।

এক রাজা ছিলেন, তাঁর মেয়ের নাম ছিল হিনেমোয়া। সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ ছিল, সেই দ্বীপে, একটা প্রকাণ্ড হ্রদের ধারে হিনেমোয়ার বাবা থাকতেন।

এমন সুন্দর মেয়ে কেউ কখনো দেখেনি। দেশ বিদেশের যত ভাল ভাল রাজপুত্র সকলেই হিনেমোয়াকে বিয়ে করতে এলেন। হিনেমোয়া তাঁদের কাউকে বিয়ে করতে রাজী হল না; সে বল্ল, আমি তুতানিকাইকে বিয়ে করব। কিন্তু তুতানিকাই যে গরীবের ছেলে, কাজেই রাজা কেন তাকে মেয়ে দিতে রাজী হবেন? হিনেমোয়ার কথা শুনে তাঁর এমনি রাগ হল যে, তখন তুতানিকাইকে পেলে হয় ত তিনি মেরে ফেলতেন।

হ্রদের মাঝখানে, একটি দ্বীপের ভিতরে তুতানিকাইর বাড়ী। হিনেমোয়া সেইখানে তাকে খবর পাঠিয়ে দিল, "বাবা বড্ড রেগেছেন, তুমি এদিকে এস না; আমি হ্রদ পার হয়ে তোমাদের ওখানে যাব।"

তখন থেকে তুতানিকাই তার বন্ধু তিকিকে নিয়ে রোজ রাত্রে হ্রদের ধারে বসে বাঁশী বাজায়, আর ভাবে, সেই বাঁশীর শব্দ শুনে হিনেমোয়া পথ চিনে হ্রদ পার হয়ে আসবে।

রাজা মশাই কিন্তু সেই বাঁশী শুনেই বল্লেন, "ও কিসের বাঁশী রে? তবে বুঝি হিনেমোয়া হ্রদ পার হয়ে তুতানিকাইর দেশে যেতে চায়? তোরা শীগ্গির যা; যত নৌকা, সব গিয়ে বেঁধে রাখ্; যত দাঁড়, সব লুকিয়ে ফেল্!"

হিনেমোয়া রোজ রাত্রে হ্রদের ধারে গিয়ে দেখে, সব নৌকা বাঁধা রয়েছে, কাজেই সে আর হ্রদ পার হতে পারে না। তখন সে বল্ল, "নৌকা ত পাওয়া গেল না, আমি তবে সাঁতরেই হ্রদ পার হই।"

সেদিন দিনের বেলায় ছটা বস্ (লাউয়ের খোলা) এনে হিনেমোয়া লুকিয়ে রেখে দিল; রাত্রে সেইগুলো দিয়ে একটি ভেলার মত বানিয়ে, তাই নিয়ে সে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অন্ধকার রাত্রি, কোন্ দিকে যেতে হবে কিছু দেখা যাচ্ছে না; খালি তুতানিকাইর বাঁশীর সুর জলের উপর দিয়ে ভেসে আসছে, তাই শুনে হিনেমোয়া সাঁতরে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ তার হাত পা অবশ হয়ে এল, সে কাঁদতে কাঁদতে বল্ল, "হায় হায়! আর আমার যাওয়া হল না! এখনি জলের দানো তানিহোয়া এসে আমাকে মেরে ফেলবে!"

অমনি জলের ভিতর থেকে তানিহোয়া গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, “ভয় নাই মা! এই র বসে বিশ্রাম কর।” বলতে বলতেই তানিহোয়ার হাতের ধাক্কায় সেইখানে াশ পাথর ভেসে উঠল; হিনেমোয়া তাতে বসে বিশ্রাম করে নিল।

তারপর আবার হিনেমোয়া সাঁতরাতে আরম্ভ করল; কিন্তু হায়, এখন আর নিকাইর বাঁশী শোনা যাচ্ছে না! রাত অনেক হল দেখে সে ভেবেছে, আজ আর মোয়া আসবে না, কাজেই সে তার বন্ধুকে নিয়ে ঘরে চলে গেছে।

এবারে হিনেমোয়ার মনে বড়ই ভয় হল, কিন্তু তবু সে সাঁতরাতে ছাড়ল না। তার-খানিক দূর গিয়েই সে সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ওপারের গাছপালা একটু দেখতে পেল, তীরের উপর ঢেউ ভাঙ্গার কল কল শব্দও একটু একটু তার এল। আর একটু গিয়েই সে দেখল, এই ঘাট, তার পাশে একটা গরম জলের ারা রয়েছে। ঠাণ্ডা জলে সাঁতরে হিনেমোয়ার বড্ড শীত লেগেছিল, কাজেই জলের ফোয়ারাটি পেয়ে তার আনন্দের সীমা রইল না। সে তখনি তাতে নেমে াম করতে লাগল, আর ভাবল, “তাই ত, এখন তুতানিকাইর বাড়ী কি করে বার ?”

এমন সময় তুতানিকাইদের চাকর বস্ হাতে করে সেই ঝরণায় এসেছে জল নিতে। দের দেশে কলশী ছিল না, তারা বসে করে জল রাখত। হিনেমোয়া সেই চাকরটিকে তে পেরে, খুব মোটা গলায় পুরুষ মানুষের মত করে বল্ল, “একটু জল দাও ত ে।”

চাকর ত সে কথা শুনে আগে বড্ডই থত মত খেয়ে গেল, কিন্তু তার পরেই সামলে য়ে জলের বস্‌টা হিনেমোয়ার হাতে দিল। হিনেমোয়াও অমনি সেটাকে নিয়ে দে াথরের উপর এক আছাড়! চাকর তাতে ভারী চটে তার মনিবকে গিয়ে বল্ল যে, র্তা মশাই! কোথাকার একটা বেখাপ্পা লোক এসে ঝরণায় বসে আছে, সে বস্ ভেঙ্গে দিয়েছে।”

তুতানিকাই তা শুনে বল্ল, “আরেকটা বস্ নিয়ে যা।”

চাকর আর একটা বস নিয়ে আবার ঝরণায় এল, আবার হিনেমোয়া তাকে বল্ল, একটু জল দাও।” অচেনা লোকে জল খেতে চাইলে সে দেশে “না” বলতে নাই। জেই চাকর আবার হিনেমোয়ার হাতে বস দিল, হিনেমোয়াও তখনি সেটাকে গুঁড়ো দিল।

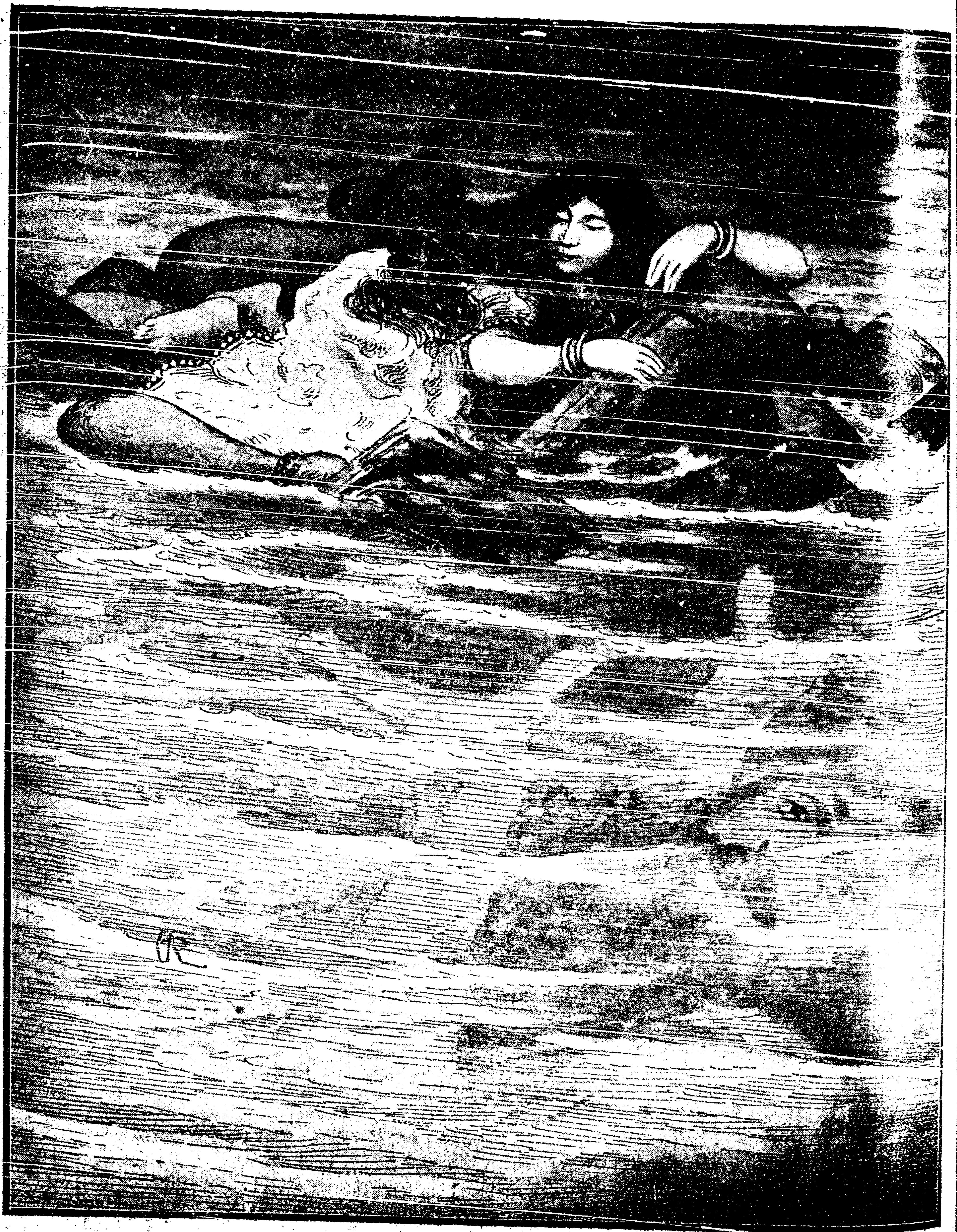

বার এমনি করে চাকর জল নিতে আসে, আর হিনেমোয়া তার হাত থেকে গুঁড়ো করে দেয়। তখন তুতানিকাই রাগের ভরে নিজেই ঝরণায় এসে করে বেটা তুই, আমার বস ভেঙ্গে দিয়েছিস ?" হিনেমোয়া বল্ল, "তুতানিকাই, নেমোয়া !"

যে কি আদরে হিনেমোয়াকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল; আর সকলে মিলে কি আর ধূমধাম করে তুতানিকাইর সঙ্গে তার বিয়ে দিল, সে আর কি বলব ? নিজে াই অবধি সে খবর পেয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। আর হিনেমোয়ার উপর কটুও রাগ রইল না।

তানিকাইর বংশের লোক আজও মাউরী দেশে আছে, তারা আজও হিনেমোয়ার র হবার কথা বলে আনন্দ পায়।

যুদ্ধ-জাহাজ।

১০০ বৎসর আগে যখন ইংরাজে ফরাসিতে জলযুদ্ধ হইয়াছিল, তখনকার যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায়, যে যুদ্ধ করিতে করিতে দুই বিপক্ষের জাহাজে প্রায় ঠেকাঠেকি হইয়া গিয়াছিল, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোলাগুলি চালান হইয়াছিল। সেই রকম একটা জাহাজ যদি সেকেলে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আজকালকার একটা যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে লড়াই করিতে আসে তবে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে ? তাহাকে আর লড়াই করিতে হইবে না—কারণ সে পাঁচ সাত মাইল দূরে থাকিতেই একালের জাহাজ তাহাকে এক গুলিতে অনায়াসে ডুবাইয়া দিতে পারিবে।

এক একটা বড় যুদ্ধ-জাহাজে গোটা দশেক বড় বড় কামান থাকে, তার এক একটার ওজন প্রায় ২০০০ মণ, এক একটি গোলার ওজন প্রায় পনের মণ। ৫ মাইল দূর হইতে সেই গোলা মারিয়া ১ ফুট পুরু লোহার তক্তাকে অনায়াসে ফুঁটা করিয়া দেওয়া যায়। এরূপ একটা জাহাজ দু'মিনিটের মধ্যে একটা ছোট খাট সহরকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে ! কিন্তু এমন যে ভয়ানক জাহাজ তাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার যো নাই। জাহাজের পিছনেও নানা রকম "ফেউ" লাগিয়া থাকে।

প্রথম নম্বর ফেউ ডুবুরি জাহাজ। তাহার কথা গতবারেই বলা হইয়াছে। বড় জাহাজে যখন যুদ্ধ হয় তখন কামানে কামানে লড়াই চলে কিন্তু "ফেউ"গুলির অস্ত্র

যুদ্ধ-জাহাজের বড় বড় কামান।

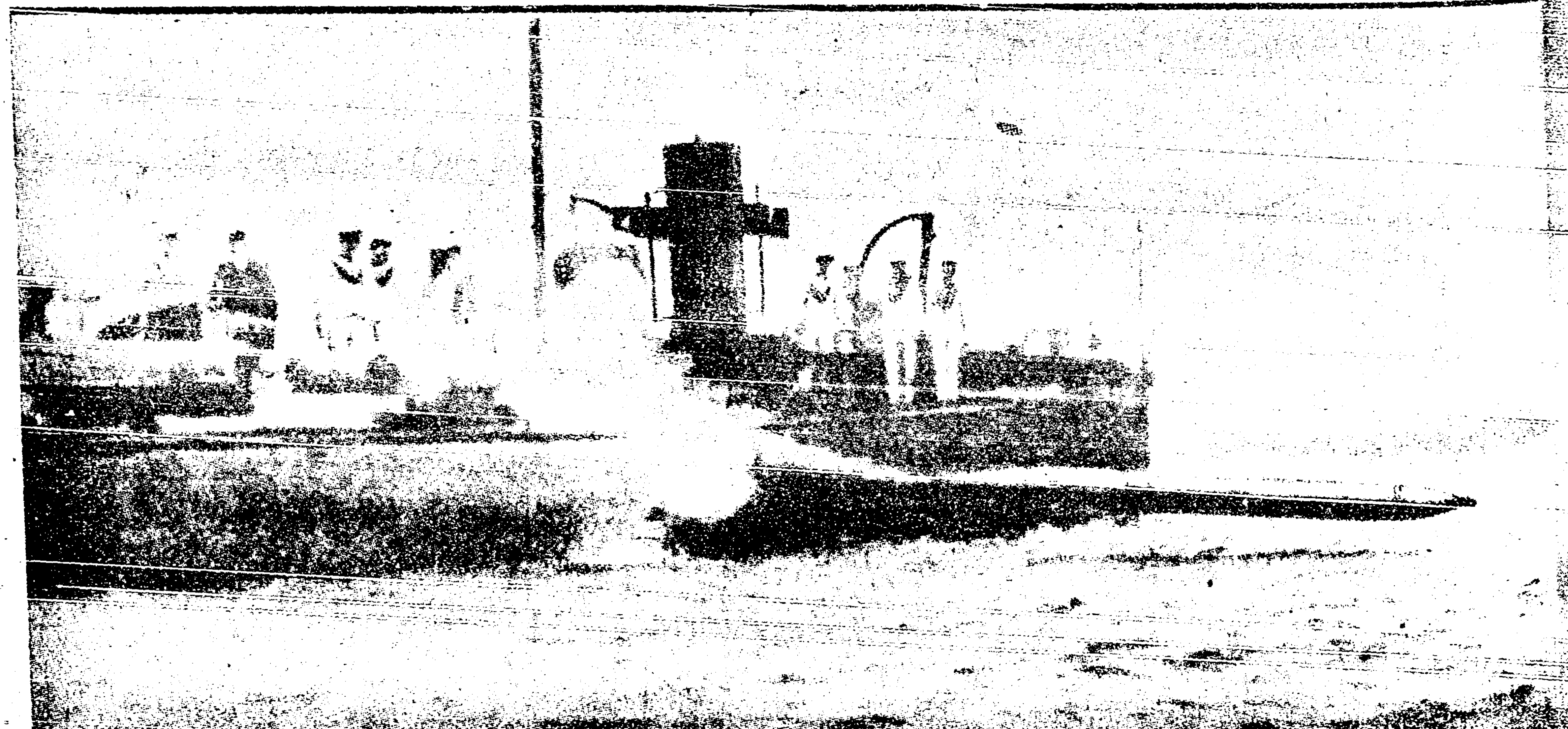

"ফেউ" জাহাজ টর্পিডো মারিতেছে।

টর্পিডো। টর্পিডো ছুঁড়িয়া বড় জাহাজ নষ্ট করিবার জন্য একদল ছোট জাহাজ হয়। এগুলি খুব জোরে চলে কোন বড় জাহাজকে ফাঁকতালে মাইল দুই-এর মধ্যে পাইলেই টর্পিডো মারিবে। মারিয়াই আর কথাবার্ত্তা নাই—একেবারে চোখ বুজিয়া সেখান হইতে ছুট্! একসঙ্গে আট দশটা "ফেউ" যদি একটা জাহাজকে আক্রমণ করে তবে জাহাজের পক্ষে একটু মুস্কিল। সেই জন্য বড় জাহাজের সঙ্গে ছোট ছোট কামানওয়ালা কতগুলি জাহাজ থাকে—এগুলিকে "ফেউ মারা ফেউ" বলা যাইতে পারে কারণ টর্পিডোবোট্ নষ্ট করা ইহাদের কাজ। টর্পিডো জিনিষটা কামানের গোলার চাইতে অনেকখানি আস্তে চলে, সেই জন্য তাহাকে এড়ান অনেকটা সহজ, তাছাড়া টর্পিডো ধরিবার জন্য যুদ্ধের প্রত্যক জাহাজের পাশে বড় বড় জাল ঝুলান থাকে। তাহাতেও যদি টর্পিডো ঢুকানো পড়ে, তবেই সর্ব্বনাশ! কারণ জলের নীচে টর্পিডো একবার ভালমত লাগাইতে পারিলে অতিবড়ভয়ানক জাহাজেরও নিস্তার নাই!

বনের খবর।

জোঁক যদি দেখতে চাও ত কাছাড়ের বনে একটিবার যাও। অনেক জায়গায় ঘুরেছি, এমন জোঁক আর কোথাও দেখিনি। সে জোঁকই বা কত রকমের! ছোট, বড়, মাঝারি। এক একটা ২ ইঞ্চি ২॥ ইঞ্চি লম্বাও আছে; সে যখন রক্ত খেয়ে পটলের মত মোটা হয়, তখন তাকে দেখলে প্রাণ উড়ে যায়। কত রঙ্গেরই বা জোঁক। মেটে, কটা, কালো, ফ্যাকাসে, সব্জে, ছেয়ে। এক একটার আবার গায় ডোরা ডোরা—জলের ভিতরে দেখলে হঠাৎ মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা পোকার মতন। দু চার ফোঁটা জল পড়লে আর জোঁকের জ্বালায় ঘাসের উপর দিয়ে বা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলবার জো নাই। আধ মাইল যেতে না যেতেই দুটি পা একেবারে জোঁকে বোঝাই হয়ে যায়। ১৫।২০টা করে এক সঙ্গে এসে ধরে। যাদের খালি পা, তাদের ত অনেক সময়ই দা দিয়ে চেঁছে তবে জোঁক ছাড়াতে হয়। এতেও যদি অব্যাহতি পাওয়া যেত তবে দুঃখ ছিল না। অনেক জায়গায়, নীচে ত জোঁক রয়েছেই, তার উপর আবার গাছ থেকেও টুপ্ টাপ্ মাথায় পড়ে।

সার্ভেয়ার খালাসি পাঠিয়েছে, ডাকের জন্য। চিঠি পত্রও আনবে, আর সঙ্গে চাল ডালও কিছু আনবে। এর মধ্যে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফিরবার সময় খালাসিটি একটা 'জলা'র উপর দিয়ে পোল বেয়ে আসছে—২ খানা করে আড়া আড়ি বাঁশ, তার উপর লম্বা লম্বি তিন খানা বাঁশ পাতা, তাই

হল ‘পোল’, তারি উপর দিয়ে আসছে। এমন সময় সে নীচের দিকে চেয়ে দেখে,—মাছ!—কই মাছ, আর ল্যাটা মাছ—বৃষ্টির জল জমেছে ইঞ্চি তিনেক, তাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

সে মাছের লোভ কি আর সামলান যায়? খালাসি ভায়া ত তখনি লাফিয়ে গিয়ে মাছ ধরতে নামল। আর সে যায় কোথায়! বেচারা আর উঠবার পথ পায় না, এমনি জোঁকে তাকে ধরেছে। অনেক কষ্টে উপরে উঠে, পা দুখানির দিকে চেয়েই তার চোখ একেবারে গিয়ে কপালে উঠল। সে পা দুটো যেন তার জোঁক দিয়েই তৈরী হয়েছে, এত জোঁক! ভাগ্যিস্ আরেক জন লোক সঙ্গে ছিল, সে দা দিয়ে অনেক কষ্টে জোঁক ছাড়াল; নইলে সেদিন মাছ খাওয়া ভাল করেই হয়েছিল আর কি।

আমার ত ভাই বাঘ ভালুককে তত ভয় করে না, এই জোঁককে যত ভয় করে। ভয় করবে না? কত ফন্দিই করি, যাতে এর হাত এড়াতে পারি, কিন্তু এড়াবার যো কি! কখন ধরে তাও বুঝবার উপায় নাই; বুঝবার আগেই সে যত খুসী রক্ত খেয়ে পেট ঢাক করে বসে থাকবে। মোজা, তার উপর বুট, তার উপর পা-জামা, তার উপর হাঁটু অবধি পট্টি জড়ান—তবুও তাকে ফাঁকি দিবার জো নাই—এতগুলো জিনিসের ভিতরেও সে অনায়াসে বেমালুম ঢুকে যাবে। এমন জানোয়ারকে ভয় করব না ত কাকে করব?

ত্রিপুরার মহারাজের রাজ্যে ভারী ভারী সব বন আছে। কোন কালে এসব জায়গায় মানুষের বাস ছিল। বনের ভিতর বড় বড় পুকুর পাওয়া যায়; উত্তর দক্ষিণে লম্বা, দেখলে মনে হয় হিন্দুর পুকুর। কোন কোন জায়গায় এখনো নহর (ক্ষেতে জল নিবার খাল) রয়েছে, কিন্তু তাতে জল নাই, আর সে সব ক্ষেতও অবশ্য এখন নাই। এখন খালি ২০।২২ ফুট উঁচু শরবন, আর নল, আর বেত—আর জঙ্গল। কতকাল যাবৎ যে এসব গ্রাম লোপ পেয়েছে, তার ঠিক নাই; ওদেশের লোকেরাও বোধ হয় ভাল করে বলতে পারেন না। আজ কাল আবার একটু একটু আবাদ আরম্ভ হয়েছে। ২।৪।৬ ঘর করে লোক এক এক জায়গায় গ্রামের পত্তন করছে।

এদের বড় কষ্ট। বর্ষায় জ্বরে মরে, তারপর হাতী শূয়রে ধান খেয়ে যায়। দিনের বেলায় তারা ধান কাটে, আর রাত্রে জেগে সেই ধান পাহারা দেয়, নইলে হরিণে আর শূয়রে তার আর কিছু রাখে না। এদের একজন মুসলমান আমাকে অনেক আদর করে বল্ল, “হুজুর, দু একটা শূয়র মারতে পারলে বড় উপকার হয়।” তার কথায় আমি শূয়র মারবার জন্য অনেক রাত্র অবধি বন্দুক হাতে নিয়ে বসে রইলাম, কিন্তু সে দিন আর শূয়র এলই না, লাভের মধ্যে আমি সেখানকার বিষম হিমে একেবারে ভিজে গেলাম। তখন আমি বিরক্ত হয়ে তাঁবুতে এসে সবে একটু ঘুমিয়েছি, অমনি একজন লোক ‘হুজুর-হুজুর’ বলে ছুটে এসে বল্ল, “৪০।৫০টা এসে নেমেছে! আসুন!” কিন্তু তখন আর কে যায়?

আরেক দিন সেখানকার কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে আমাকে শীকারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। হাতীতে করে ৫।৬ মাইল যেতে হবে। সঙ্গে লোক জন বিস্তর চলেছে, তাদের ঘাড়ে এই বড় বড় জাল। সেই জাল দিয়ে বনের এ দিকটা ঘেরা হবে। দুটো দুটো জালের মাঝখানে ১৫।২০

করে ফাঁক থাকবে, সেই ফাঁকে ফাঁকে একেক জন শীকারী দাঁড়াবে, বন্দুক নিয়ে। বনের পাশে খোলা মাঠ, আরেক পাশে নদী। এমাথায় ত জালই রয়েছে; এর প্রায় ১॥ মাইল ওমাথায় গিয়ে সঙ্গের লোকেরা সার বেঁধে সোর গোল করে, ঢোল পিটে, কেরাসিনের টিন বাজিয়ে জঙ্গল ভেঙ্গে আসতে থাকবে। বনের ভিতরে জানোয়ার যারা আছে, তারা তখন বেগতিক দেখে এই সকল জালের ফাঁক দিয়ে পালাবার জন্য ছুটে আসবে। সেই সময়ে বন্দুক দিয়ে তাদের মারতে হবে।

আমরা ৫ জন বন্দুক ওয়ালা, আর একজন বুড়ো শীকারী, বল্লম হাতে। এ লোকটি খুব খানদানী শীকারী, অনেক বাঘ শীকারের পাণ্ডা। কে কোথায় দাঁড়াবে, সেই সব ঠিক করে দিল।

আমরা দাঁড়িয়েছি, লোক জন সব আমাদের আশ পাশে দু চার জনকে গাছে তুলে দিয়ে অন্য দিকে চলে গিয়েছে। এদের উপর কড়া হুকুম, কোন্ দিক দিয়ে জানোয়ার পালায় তার খেয়াল রাখবে। বুড়ো শীকারী বলতে লাগল যে, "বড় শিয়াল,—বাঘ—বেরোবার খুবই সম্ভাবনা; এই জঙ্গলটুকু বাঘের আড্ডা বল্লেই হয়। শুনেই ত শীকারীরা গাছে উঠবার পথ দেখতে লাগলেন। দুজন উঠে পড়লেন, আর দুজন তার সুবিধা না পেয়ে, একটা খোলা জায়গায় গিয়ে এক সঙ্গে দাঁড়ালেন।

আমি মাটিতেই বসে আছি; মোটা মানুষ, গাছে ওঠা আসে না। খানিক পরে বুড়ো আস্তে আস্তে এসে আমাকে মাটিতে দেখে কি যেন ভাবল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কর্ত্তা বুঝি গাছে উঠবেন না?" আমি বল্লাম, "না।" তা শুনে সে বল্ল, "তবে আমি কর্ত্তার কাছেই দাঁড়াব।" যেখানে বসেছিলাম, বুড়োর সে জায়গাটা পছন্দ হল না; সে আমাকে নিয়ে একটা বাঁশ ঝোপের পিছনে দাঁড় করিয়ে দিল। বুড়ো বল্ল, "যদি হরিণ আসে, সামনে থাকতেই মারবেন; কিন্তু যদি 'বড় শিয়াল' বেরয়, তা হলে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেলে তবে মারবেন—পাঁজরার দিকে।"

দুজনে বসে আছি। ঢোলের আর টিনের একটু একটু আওয়াজ কাণে আসছে, বনের ভিতরে জানোয়ার নড়ার শব্দ ও শোনা যাচ্ছে। শুনেইত আমি একেবারে বন্দুক তুলে তৈয়ার!—রাম! রাম! আমি কি জানি শেষে একটা শেয়াল এসে বেরুবে? আমার যে রাগ হলো! এতক্ষণে লোক জনের চীৎকার ও একটু একটু শোনা যাচ্ছে। তখন আবার বনের ভিতর জানোয়ার নড়ার শব্দ—শুকনো পাতার উপর পায়ের আওয়াজ—এবারে সেই যে দুটি ভদ্রলোক এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সামনে। কিন্তু একটু আওয়াজ হয়েই তখনি আবার চুপ চাপ হয়ে গেল।

বুড়ো আমাকে হুঁসিয়ার করে দিল, "জানোয়ার যাই হোক ওদিক থেকে আমাদের দিকে আসছে।" এতক্ষণে লোকের গোলমাল বেশ কাছেই। ঐ! আবার জানোয়ারের! গড়্‌ড়্—গড়্‌ড়্। একবার আওয়াজ হতেই আমি বন্দুকের দুই মোড়া তুলে তয়ের। পরক্ষণেই হুড় মুড় করে সব ভেঙ্গে পাঁচটা হাতী এসে বেরুল—পোষা হাতী।

আমরা প্রাণপণে হাউ মাউ করে, বাঁশ দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে হাতীগুলোকে ফিরাতে কত চেষ্টা করলাম,

কিন্তু তারা কি তা শোনে? একে হাতী, তাতে পোষা। হাউ মাউ তারা ঢের শুনেছে, ঠেঙ্গা তারা হিসাবই করে না। জাল টাল সব ছিঁড়ে তাহা বাইরে গেল। ওদেশে হাতীগুলোকে ছেড়ে দেয়, তারা তাদের ইচ্ছামত চরে খায়। দিনে, কখনো বা দু দিন পর একবার মাহুতেরা তাদের দেখে যায়।

সেদিন যে আর আমাদের শীকার জুটল না, একথা আমি বলবার আগেই নিশ্চয় তোমরা বুঝে নিয়েছ।

শ্রাবণের ধাঁধার উত্তর।

১। বাংলা শব্দের সন্ধি করতে নাই। গতবারের সেই উৎকট কথাগুলো আর কিছুই না, কতগুলো বাংলা কথার সন্ধি করার ফল অমনি হয়েছে।

ক্যারামারাহারাহাটা
ঘ্যাকামারাতারাদারা
নারাচারা হা হা হা হা।

এই কথাগুলোর সন্ধি ভাঙ্গলে এমনি হয়—

কি আর আমার আহার? আহা, আটা,
ঘী, আঁক আর আতা আর আদা আর
আনার, আচার, আ হা হা হা হা!

২। কলসী।

হেঁয়ালি।

(সাতটি প্রশ্নের এক ছত্রে উত্তর)

আসামের কোন্ দ্রব্য সভ্য-জন-পেয়?
রাজার নিকটে হয় প্রজার কি দেয়?
ধর্ম্মের কি মূল? কেবা নিতান্ত দুর্জ্জন?
শঠের কি কাজ? কেবা নহেক আপন?
গৃহে থেকে শত্রু কেবা হয় নিরন্তর?
চাকর বিশ্বাসহন্তা প্রবঞ্চনাপর।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

[illegible]ত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
[illegible]
ক[illegible]তা।

বালী খপ্ করিয়া রাবণকে ধরিয়াছে।

(১৬২ পৃষ্ঠা)

U. RAY & SONS,
100, Garpar Road, Calcutta

দ্বিতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩২১ ষষ্ঠ সংখ্যা

"ছোট" বলি কারে?

ছোট বলি ঘৃণা করি রাখি যাঁরে দূরে—
কাল সে উঠিতে পারে সবার উপরে।
নাহি জানি জীবনের কোন্ পথ দিয়া,
বিধাতা আনেন তারে সুন্দর করিয়া।
জ্ঞান প্রেম লভি কত শুভ ইচ্ছা ল'য়ে
সে রহে তাঁহারি কাজে চিরমগ্ন হ'য়ে।
ফুটন্ত ফুলের মত ফুটিয়া ধরায়
গুণের সৌরভ সেও জগতে ছড়ায়॥

রাবণ।

মুনির কথায় অর্জ্জুন রাবণকে ছাড়িয়া দিলেন, আবার তাহার সহিত বন্ধুতাও করিলেন। কাজেই তখন আর তাহার দর্পের সীমাই রহিল না। যে কোন বীরের নাম শুনিলেই সে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া উপস্থিত হয় আর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। এমনি করিয়া একদিন সে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া বড়ই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল,—"বালী কোথায়? আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব!"

বালী তখন বাড়ী ছিল না, সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যা করিতে গিয়াছিল। অন্য বানরেরা রাবণকে বলিল, "বালী সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। ততক্ষণ তুমি এই বিচিত্র সংসারখানি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লও; কারণ বালী আসিলে আর তোমার প্রাণের আশা তিল মাত্রও থাকিবে না। আর, যদি তোমার নিতান্তই শীঘ্র শীঘ্র মরিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে না হয় দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়াই লও।"

রাবণ তখনই বানরদিগকে বকিতে বকিতে পুষ্পক রথ হাঁকাইয়া চলিয়া গেল, আর খানিক দূর গিয়াই দেখিল, বালী সোনার পাহাড়ের ন্যায় সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছে, তাহার মুখখানি সকালবেলার সূর্য্যের মত লাল আর উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। রাবণ ভাবিল, "চুপি চুপি গিয়া বানরকে হঠাৎ জাপটিয়া ধরিতে হইবে!" এই বলিয়া সে খুবই চুপি চুপি যাইতে লাগিল; সে জানে না যে, বালী ইহার আগেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে, আর তাহার মনের কথাটি ঠিক বুঝিয়া লইয়া তাহারই জন্য চুপ করিয়া বসিয়া আছে—একটিবার হাতের কাছে পাইলেই তামাসাটা দেখাইয়া দিবে!

চোখে ভ্রূকুটি, মুখে খামাটি, হাত দুটি বিষম ব্যগ্রভাবে বাড়ান, এমনি ভাবে আসিয়া রাবণ চোরের মত বালীর পিছনে দাঁড়াইল; ভাবিল, 'এইবার ধরি!' কিন্তু হায়, তাহার আগেই বালী তাহাকে ধরিয়া বগলে পূরিয়া ফেলিল। সে একটিবার পিছনবাগে তাকাইয়াও দেখে নাই, অথচ ঠিক ফড়িংটির মত রাক্ষসের বাছাকে ধরিয়া বগলে পূরিয়াছে। রাবণের সঙ্গের রাক্ষসগুলি অবশ্য তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া বালীকে মারিতে গিয়াছিল, কিন্তু বালীর কয়েকটা হাত পা নাড়া খাইয়াই তাহারা কাঁপিয়া অস্থির, যুদ্ধ আর করিবে কি?

এদিকে রাবণ বালীর বগলে থাকিয়া প্রাণপণে তাহাকে আঁচর কামড় দিতেছে,

কিন্তু বালীর কাছে তাহা পিঁপড়ার কামড়ের মতও ঠেকিতেছে না। বালী সে সব অগ্রাহ্য করিয়া নিজের সন্ধ্যাবন্দনায় মন দিল। দক্ষিণ সাগরের সন্ধ্যা শেষ হইলে, রাবণকে বগলে লইয়াই সে শূন্যপথে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া সন্ধ্যা করিতে লাগিল। তারপর উত্তর সমুদ্র আর পূর্ব্ব সমুদ্রেও ঠিক সেইরূপ সন্ধ্যা শেষ না করিয়া সে কিষ্কিন্ধায় ফিরিল না। ততক্ষণে, সেই বগলের চাপে আর গন্ধে আর ঘামে রাবণের কি দশা হইয়াছিল, বুঝিয়া লও!

কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া বালী রাবণকে বগল হইতে বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" রাবণ যাতনায় মিটি মিটি চোখে বলিল, "আমি লঙ্কার রাজা রাবণ, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে পশুর মত ধরিয়া এত পথ ঘুরাইয়া আনিলেন, আপনার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুতা করিব।" সুতরাং তখন দুজনে বন্ধুতা হইয়া গেল। কাজেই সাজা পাইয়াও রাবণের শিক্ষা হইল না। সে আবার ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কোন ছলে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু বাহাদুরী লইতে পারে কি না।

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একদিন নারদ মুনির সঙ্গে রাবণের দেখা হইয়াছে। রাবণ বলিল, "মুনি ঠাকুর, বলুন ত, কোন্ দেশের লোকের গায় সকলের চেয়ে বেশী জোর? তাহাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিব!" মুনি বলিলেন, "ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের লোকের মত বলবান আর ধার্ম্মিক মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।" একথা শুনিবামাত্রই রাবণ শ্বেতদ্বীপের দিকে পুষ্পক রথ চালাইয়া দিল, মুনি ঠাকুরও একটু চিন্তা করিয়া তামাসা দেখিবার জন্য সেইখানেই চলিয়া গেলেন।

তারপর রাক্ষসেরা ত সিংহনাদ করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সে স্থানের এমনি তেজ যে, তাহারা কিছুতেই সেখানে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। হাওয়ায় পুষ্পক রথ উড়াইয়া নিল, রাক্ষসেরা সকলে ভয়ে পলায়ন করিল। কাজেই তখন রাবণ আর কি করে? সে রথ আর লোকজন সব ছাড়িয়া দিয়া নিজেই গিয়া দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেখানে কয়েকটি মেয়ে বেড়াইতেছিল। তাহারা দেখিল, দশ মাথা আর কুড়ি হাতওয়ালা একটা লোক পথ দিয়া যাইতেছে, আর প্রাণপণে নিজের চেহারাটাকে

ভয়ঙ্কর করিবার চেষ্টা করিতেছে.। এসব দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাওয়ায় তাহাদের একজন আসিয়া রাবণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে বাপু? তোমার বাবার নাম কি? এখানে আসিয়াছ কি করিতে?” একথায় রাবণের একটু রাগ হইল। সে খুব গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, “আমি বিশ্রবার পুত্র রাবণ। এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।”

শুনিয়া মেয়েরা সকলে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন এক হাতে রাবণের কোমর ধরিয়া অন্য মেয়েদের সামনে নিয়া তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, “দেখ দেখ, আমি কেমন একটা কালো পোকা ধরিয়াছি: এর আবার দশটা মাথা, কুড়িটা হাত!” বলিয়াই সে সেটা আর একজনকে ছুঁড়িয়া দিল, সে আবার দিল আরেক জনের হাতে ছুঁড়িয়া। তখন ত রাবণকে লইয়া খুবই একটা লোফালুফির ধূম পড়িয়া গেল। মেয়েদের তাহাতে আমোদের সীমাই নাই, কিন্তু রাবণ বেচারার প্রাণ লইয়া টানাটানি। কাজেই তখন সে আর কি করে? সে দশ মুখের তিন শত বিশ দাঁতে “কট্রাশ্!” করিয়া এক মেয়ের হাতে এক কামড় বসাইয়া দিল। সে মেয়ে ত তখনই “মা-া-া-া গো-া-া-া-া!!” বলিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রাণপণে হাত ঝাড়িতে লাগিল। ততক্ষণে আরেকটি মেয়ে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে লইয়া গিয়াছিল, তাহার হাতে সে দিল ভয়ানক আঁচড়াইয়া! সে মেয়েটি তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ছুঁড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারদমুনি অবশ্য এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন, আর আনন্দে অস্থির হইয়া কেবলই হো হো শব্দে হাস্য আর করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছিলেন!

বলা বাহুল্য, রাবণের যুদ্ধের সাধ সেদিন সেই সমুদ্রের জল খাইয়াই মিটিয়াছিল।

গরীব ব্রাহ্মণ।

একটি ব্রাহ্মণ ছিল, বড় গরীব। বেচারা সারাদিন ঘুরে সারা হয়ে সন্ধ্যা বেলা সে দুটি ডাল চাল ঘরে আনত, তাতে সব দিন ভাল করে তার নিজের পেটই ভরত না; তার ব্রাহ্মণী বেচারী ত কত দিন না খেয়ে কাটাত।

একদিন এমনি ব্রাহ্মণী খেতে পায় নি, তা দেখে ব্রাহ্মণ যারপরনাই দুঃখ করে

বল্ল, "হায় ব্রাহ্মণী, তুমি এমন হতভাগার হাতে পড়েছিলে যে, দু বেলা যে দুটি তোমাকে খেতে দিব সে ক্ষমতাও আমার নাই।"

ব্রাহ্মণী বল্ল, "ও গো, তুমি দুঃখ ক'রো না। রাজার কাছে যাও, তিনি আমাদের দুঃখ দূর করে দিবেন।"

ব্রাহ্মণ বল্ল, "হায়, আমি মুর্খ মানুষ, আমি রাজার কাছে গিয়ে কি করব? পণ্ডিতেরা সুন্দর সুন্দর কবিতা বানিয়ে রাজাকে শোনান; রাজা খুসী হয়ে তাদের টাকা দেন। আমি ত কবিতা বানাতে জানি না, আমি গিয়ে রাজাকে কি শোনাব?"

ব্রাহ্মণী বল্ল, "সে জন্য তুমি ভেব না। ভগবান কবিতা জুটিয়ে দিবেন, তুমি তাঁর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়।"

পরদিন ভোর বেলায় ব্রাহ্মণ নামাবলীখানি কাঁধে ফেলে আর লাঠিগাছটি বগলে নিয়ে যোড় হাতে বল্ল, "হে ভগবান! তুমি জান!" বলে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল, আর মনে মনে কেবলই বলতে লাগল, "হে ভগবান, তুমি জান।" "হে ভগবান! তুমি জান!" "হে ভগবান, তুমি জান!"

এমনি ভাবে ক্রোশ খানেক চলে ব্রাহ্মণ একটি নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল, আর ঠিক সেই সময়ে ওপারের গাছের পিছন থেকে সূর্য্যও আকাশে উঁকি মারল। তা দেখে ব্রাহ্মণ বল্ল, "বাঃ, বেশ হয়েছে! এইখানে স্নান আহ্নিকটা সেরে নি!"

স্নান দেখতে দেখতে হয়ে গেছে; তারপর ব্রাহ্মণ আহ্নিকে বসেছে। এমন সময় খাঁটুর খুঁটুর একটা শব্দ তার কানে এল, সে চেয়ে দেখল, একটি ছোট্ট ইঁদুর খুব মন দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ইঁদুরটিকে দেখেই ব্রাহ্মণ বল্ল, "খাঁটুর খুঁটুর খুঁড়্ছ মাটি!" অমনি তার মনে হল, "বাঃ! এইত আমার কবিতার এক ছত্তর হয়ে গেছে!—

"খাঁটুর খুঁটুর খুঁড়্ছ মাটি!"

তারপর আহ্নিক শেষ করে ব্রাহ্মণ আবার পথ চলতে লেগেছে, "হে ভগবান! তুমি জান!—খাঁটুর খুঁটুর খুঁড়্ছ মাটি!"

এমনি ভাবে আর খানিক দূর গিয়ে ব্রাহ্মণ দেখল, একটা প্যাঁচা গাছের উপর থেকে ভারী ব্যস্ত হয়ে, তার দিকে খালি উঁকি ঝুঁকি মারছে। তাকে দেখে ব্রাহ্মণ বল্ল, "ভয়েতে ভয়েতে চাও!" অমনি তার মনে হল, "বাঃ, এই যে কবিতার আরেক ছত্তর!—

খাঁটুর খুঁটুর খুঁড়্ছ মাটি,
ভয়েতে ভয়েতে চাও!"

ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে চলছে আর তার কবিতাটি আওড়াচ্ছে, আবার ভগবানকে ডাকছে, এমন সময় রাজার কোটাল পোষাক টোষাক প'রে ভারী গম্ভীর ভাবে এসে সেই পথে উপস্থিত হ'ল। তাকে দেখে ব্রাহ্মণ বল্ল, "রাজার কোটাল মশাই গজগমনে যাও!"—আরে বাঃ! এই ত আমার কবিতা হয়ে গেছে—

খাঁটুর খুঁটুর খুঁড়্ছ মাটি,
ভয়েতে ভয়েতে চাও,
রাজার কোটাল মশাই
গজগমনে যাও!"

আর সে ব্রাহ্মণ কোথাও দাঁড়াল না, কারুর সঙ্গে কথা কইল না, কিছুর পানে তাকালও না। সে সটান একেবারে রাজার নিকট গিয়ে বল্ল, "রাজা মশাইকে একটা কবিতা শোনাব!" রাজা বল্লেন, "বলুন ঠাকুর মশাই।". ব্রাহ্মণ বল্ল—

"খাঁটুর খুঁটুর খুঁড়ছ মাটি,
ভয়েতে ভয়েতে চাও,
রাজার কোটাল মশাই
গজগমনে যাও।"

কবিতা শুনেই ত রাজা হো হো করে হেসে অস্থির; বল্লেন, "ও আবার কি কবিতা হল ঠাকুর মশাই?" ব্রাহ্মণ কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্ল, "ক্ষিদের জ্বালায় আর ওর চেয়ে ভাল কবিতা তয়ের করতে পারি নি।" শুনে রাজা মশায়ের বড় দুঃখ হল, তিনি দশটি টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণকে বিদায় করলেন। ব্রাহ্মণ দু হাত তুলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগল।

সে দিন রাত্রে রাজকার্য্য শেষ করে, আহারান্তে রাজা মশাই বিছানায় শুয়েছেন, আর অমনি সেই গরীব ব্রাহ্মণের কবিতাটি তাঁর মনে পড়েছে। তিনি চেঁচিয়ে আওড়াতে লাগলেন,—

খাঁটুর খুঁটুর খুঁড়ছ মাটি—"

এখন হয়েছে কি,—রাজা মশায়ের কোটালটি ছিল ভয়ানক চোর। সে ঠিক সেই সময়ে রাজার ঘরের পিছনে বসে সিঁদ কাটছিল। যেই রাজা মশাই বলেছেন, 'খাঁটুর খুঁটুর খুঁড়ছ মাটি', অমনি ত ভয়ে কোটাল বেটার প্রাণ উড়ে গেছে, আর সে এদিক ওদিক তাকাতে লেগেছে। অমনি রাজা মশাই বল্লেন,

"ভয়েতে ভয়েতে চাও!—"

সে কথা শুনে সেই দুষ্ট কোটাল ছুটে পালাতে যাবে, অমনি রাজা মশাই আবার বল্লেন,

"রাজার কোটাল মশাই
গজ্র গমনে যাও!"

কোটালের আর চুরী করা ত হলই না, সে ঘরে গিয়ে এই ভেবে কেঁপে অস্থির হল যে, "আর রক্ষা নাই! রাজা মশাই আমাকে চিনে ফেলেছেন, এবারে নিশ্চয় আমার মাথা কাটবেন!"

পরদিন ভোর হতে না হতেই সে এসে রাজার পায় পড়ে বল্ল, "দোহাই রাজা মশাই! এবারে আমাকে মাপ করুন, আমি আর কখ্‌খনো এমন কাজ করব না!"

রাজা মশাই প্রথমে ত অবাক্। তার সব কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেই ব্রাহ্মণের কবিতার গুণেই তাঁর সর্ব্বস্ব বেঁচে গিয়েছে নইলে সে রাত্রেই কোটাল বেটা সব চুরী করে নিয়ে যেত। তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আবার ডেকে এনে, তাকে দশ হাজার টাকা বখ্‌শিস্ দিয়ে দিলেন।

চন্দ্র ও বুনো।

সকালে উঠে বুনোকে নিয়ে চন্দ্র রাজার বাড়ী চলেছে, আর পথের লোকেরা তাদের দেখেই বাড়ীর ভিতর ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এমনি করে তারা রাজার বাড়ীর সদর দরজায় আসতেই অমনি দরজার পাহারাওয়ালারা বিষম ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে মার টেনে দৌড়। চন্দ্র কত ডাকছে "দরজা খোল, দরজা খোল।" কিন্তু দরজা খুলবে কে? খবর পেয়ে নিজে রাজা মশাই অবধি গিয়ে খাটের তলায় লুকিয়েছেন।

তখন চন্দ্র বুনোকে ইসারায় বল্ল,—"দরজা ভাঙ্গ!" আর অমনি সে দরজায় কাঁধ লাগিয়ে এমনি ঠেলা দিয়েছে যে, ঘড়াং করে সেই প্রকাণ্ড লোহার দরজা ভেঙ্গে একেবারে খান খান। তারপর এসে উঠানে দাঁড়িয়ে চন্দ্র চীৎকার করে বল্ল "আপনারা সকলে আসুন। বুনো কাউকে কিছু বল্‌বে না। সে এখন পোষ মেনেছে।" একথা শুনেই রাজা মশাই বেরিয়ে এলেন; আর সকলেও ক্রমে এসে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

এখন হতে বুনো রাজবাড়ীতেই থাকে। চন্দ্রকে সে ভয়ানক ভালবাসে; খানিক তাকে না দেখ্‌লে চীৎকার করে' বাড়ীময় খুঁজে বেড়ায়। রাত্রে তার ঘরে মাটিতে ঘুমিয়ে থাকে।

একদিন রাজা সভায় বসে আছেন, এমন সময় একদল লোক এসে তাঁর কাছে কেঁদে বল্ল "মহারাজ! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে! সেই উত্তর দিকের লোহার পাহাড়ের লোহার দৈত্যটা রাত্রে এসে আমাদের গ্রামে ঢুকে অনেককে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আর সকলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। সে দৈত্য না মরলে ত আর আমাদের রক্ষা নাই।" একথায় রাজা, তাঁর বড় বড় যোদ্ধাদের ডেকে বল্লেন "তোমরা শীগ্‌গির গিয়ে সেই দৈত্যটাকে মেরে এস!" কিন্তু লোহার দৈত্যকে মারা কি তাদের কাজ? তারা তার নাম শুনেই ভয়ে কেঁপে অস্থির! তাদের গতিক দেখে শেষে চন্দ্রই বুনোকে নিয়ে দৈত্যকে মারতে চল্ল।

সে লোহার পাহাড়ে যাওয়া কি সহজ কথা? কত দেশ কত বন, কত মাঠ, কত নদী পার হয়ে তবে সেখানে পোঁছাতে হয়। চন্দ্র আর বুনো মাসের পর মাস ক্রমাগত উত্তর দিকে গিয়ে শেষে একদিন সকালে সেই পাহাড়ের নীচে এসে উপস্থিত হ'ল। সে পাহাড়ে গাছ নেই পালা নেই, সবই কেবল লোহা। অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে তারা তার উপরে উঠল। সেখানে পিতলের পাঁচিলে ঘেরা রূপায় গড়া সোনার চূড়াওয়ালা বিশাল দৈত্যপুরী, তার প্রকাণ্ড পিতলের ফটকে শত শত ঘণ্টা ঝুলছে, কেউ ফটক দিয়ে ঢুকতে গেলেই সেগুলি বেজে ওঠে।

বুনো আর চন্দ্র দরজার নীচে আস্‌তেই ঘণ্টাগুলো 'ঢং—ঢং' করে বাজতে লাগল আর অমনি সেই লোহার দৈত্য ঝড়ের মতন ঘোরতর গর্জ্জনে ছুটে এসে হাজির। চন্দ্র তাকে দেখেই বল্ল, "আয়! তোর সঙ্গে লড়াই করব!" শুনে দৈত্য খানিক হাঁ করে রইল, তারপর 'হো—হো' করে এমনি হাসতে লাগ্‌ল যে সে হাসি আর থামেই না, "হাঃ—হাঃ—হাঃ—হা হা হা হা!!! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবি? হাঃ—হাঃ—হা হা!! আচ্ছা, দেখি তুই কেমন বীর! ঐ যে গাছের উপর আমার ঢালটা ঝুলছে, ওটাকে নামা ত!" চন্দ্র গিয়ে সেই ঢালটা ধরে অনেক টানাটানি করল, কিন্তু সেটাকে একটু নাড়তেও পারল না।

তখন দৈত্য হাস্‌তে হাস্‌তে বুনোকে বল্ল "তুই পারিস?" বুনো গিয়ে হাত দিবামাত্র ঢালখানা ত অমনি খসে এলই, তার সঙ্গে সঙ্গে গাছটাও মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল;

লোহার পাহাড়টা অবধি কেঁপে উঠ্‌ল আর চারিদিকে ঝড়ের মত শব্দ হতে লাগল। এবারে আর দৈত্যের সে তেজ নাই। ভয়ে তার লোহার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হাত পা কাঁপছে, মুগুরটি তোলবারও ভরসা হচ্ছে না। তখন বুনো এক লাফে গিয়ে তার উপর পড়ে দু চার লাথিতেই তার দফা শেষ করে দিল। মরবার সময় দৈত্য বল্ল, "তুমি কখনো যে সে লোক নও। ঐ ঢালটা যে নামাবে, তার হাতেই আমার মরবার কথা। কিন্তু, বনের জন্তুর কাছে মানুষ হয়েছে, এমন কোন রাজার ছেলে ছাড়া আর কেউ ও ঢাল নামাতে পারে না।"

দৈত্য ত মরল, এখন যে সব লোককে সে ধরে এনেছিল তাদের খুঁজে বার করতে হবে। বুনো সেই পুরীর ভিতর ঢুকে ঘরে ঘরে দেখতে লাগল।

দুষ্ট দৈত্য সেই গ্রামের লোক ছাড়া আরও কতজনকে এনে যে সেখানে বেঁধে রেখেছিল, তার শেষ নাই। তাদের বাঁধন খুলে দিতেই তারা বুনো আর চন্দ্রের পা জড়িয়ে ধরতে লাগল। তারা ভাবে নাই যে তারা আবার বাঁচবে।

তারপর আর একটা ঘরে গিয়ে তারা দেখল, যে একটি মেয়ে, সেখানে পড়ে ভয়ানক কাঁদ্‌ছেন, তাঁর হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা, গায় শুধু হাড় কখানি ছাড়া যেন আর কিছুই নাই,—না জানি কত দিন ধরে কিছু খায়নি। চন্দ্র তাঁকে বল্ল, "মা, আপনি কে? আপনাকে দেখে বড় ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে।" তিনি বল্লেন "আমি চীন দেশের রাণী। আজ কুড়ি বৎসর হ'ল দৈত্য আমাকে এনে এই ঘরে বন্ধ করে রেখেছে।"

রাণী তাঁর সকল কথাই চন্দ্রকে বল্লেন। কেমন করে তাঁকে চীন দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কেমন করে তাঁর ছেলে দুটি হারিয়ে গেল, দৈত্য তাঁকে কেমন করে ধরে আনল, কোন কথাই বাকি রাখলেন না। তারপর বল্লেন "আমাকে আনবার সময় দৈত্য—একটি বামনকেও ধরে এনেছিল, তাকে তোমরা ছেড়ে দাও।"

তখন তারা আবার খুঁজতে খুঁজতে এক ঘরে গিয়ে দেখল যে, একটা প্রকাণ্ড থামের উপর একটা পাথরের মাথা রয়েছে, আর সেই থামের পাশে একটি বামন বসে আছে। বামনটি বল্ল "তোমরা আমাকে বাঁচালে, আমিও তোমাদের একটু উপকার করব। এই যে পাথরের মাথাটা দেখছ, এটার কাছে যা জিজ্ঞাসা করবে তারই উত্তর পাবে।"

তখন সেই মাথার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চন্দ্র জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা, দৈত্য যে মরবার সময় বল্ল, 'বুনো যে সে লোক নয়' ; তাহলে সে কে ?"

মাথা বল্ল "তোমাদের সঙ্গে যে মেয়েটি আছেন, তিনি চীন দেশের রাণী, তোমাদের রাজার বোন। তাঁর যে ছেলেটিকে ভাল্লুকে নিয়ে গিয়েছিল, বুনো সেই ছেলে। ভাল্লুক তাকে নিজের ছানাদের সঙ্গে মানুষ করেছিল।"

শুনে, চন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা, আমার মা বাবার কথা কিছু বল্‌তে পার ?"

মাথা বল্ল "তুমি চীনের রাণীর অন্য ছেলেটি, তোমাকে তোমাদের রাজা বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।"

এ সব কথা শুনবামাত্র রাণী তাঁর ছেলে দুটিকে বুকে জড়িয়ে কত কাঁদলেন, কত হাসলেন, আর তাদের কত চুমোই খেলেন !

চন্দ্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় করে নিল। বুনো এখনো অতটা বুঝতে শিখেনি, তবু রাণীর মুখের দিকে চেয়ে অবধি তারও মনে কেমন একটা আনন্দ এসেছে। চন্দ্র তাঁর পায়ের ধূলা নিবার সময় সে আগে একটু আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখল, তারপর নিজেও কতকটা সেই রকম করতে গেল, শেষে আর আনন্দ রাখতে না পেরে, ধেই ধেই করে রাণীর চারদিকে নাচতে লাগল।

এখন ত আর সুখের সীমাই নাই। মাকে নিয়ে দুটি ভাই মহানন্দে রাজবাড়ীতে ফিরে এসেছে। আহা ! বোনকে আর ভাগ্নে দুটিকে এক সঙ্গে পেয়ে রাজার কি আনন্দ ! তাঁর শুধু মনে হচ্ছে বুঝি স্বর্গে গেলে এমনি সুখ হয়।

আর সেই চীনের রাজা মশাই ? তাঁর কাছেও খবর গিয়েছে। সেই দুষ্টু মন্ত্রীকে তিনি অনেক দিন আগেই চিনতে পেরেছেন, তার সাজাও ভাল করেই দিয়েছেন, আর সেই হতে রাণীর আর ছেলে দুটির দুঃখে তাঁর বুক ফাট্‌ছে। খবর পেয়েই তিনি পাগল হয়ে ছুটে এলেন। তখন সকল দুঃখের শেষ হল।

পেঙ্গুইন্ পাখী।

দক্ষিণ মেরুর কাছে অনেক পেঙ্গুইন্ থাকে। পেঙ্গুইনদের চাল চলন বড় মজার; যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলেন, ঠিক যেন মানুষের মত। তাদের পিঠের পালক কালো, সামনের পালক শাদা,—শাদা জামার উপরে যেন কালো চোগা। এমনিতর পোষাক পরে, তারা ঠিক মানুষের মত সোজা হয়ে চলে। দুখানি ডানা আছে বটে, কিন্তু তাতে উড়বার কাজ চলে না, কেন না তাতে পালক নাই। সাঁতরাবার সময় ডানা দুখানিতে খুব কাজ দেয়, আর ঝগড়ার সময় তা দিয়ে ঘুসোঘুসি করারও বিশেষ সুবিধা।

আমাদের দেশে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ মেরুতে, পেঙ্গুইনদের দেশে তখন শীতকাল। সে বড় ভয়ানক শীত; বরফের তাড়ায় তখন মেরুর কাছে থাকবার যো নাই। কাজেই পেঙ্গুইনেরাও সেই সময়টা একটু উত্তরদিক পানে এসে কাটিয়ে যায়। মার্চ্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর, এ কয় মাস তাদের এমনি ভাবেই চলে; আর এ সময়টাতে কাজ কর্ম্মও বেশী থাকে না।

তারপর অক্টোবর মাস এলে তাদের বসন্তকাল উপস্থিত হয়, আর তখন তাদের বাড়ীর আর ঘরকন্নার কথা মনে পড়ে। তখন দেখা যায়, দলে দলে পেঙ্গুইন বরফের উপর দিয়ে দক্ষিণমুখী রওয়ানা হয়েছে। কেউ বেজায় গম্ভীর হয়ে পাড়াগেঁয়ে বড় লোকের মত দুলতে দুলতে চলেছে, আবার কেউ যাচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়ে, পিছলাতে পিছলাতে। বরফ না থাকলে তারা জলের উপর দিয়েই সাঁতরে যাবে। যেমন করেই হোক, শেষটা ঠিক গিয়ে তারা তাদের দেশে পৌঁছাবে, পথ ভুলে যাবে না।

তাদের দেশ কি রকম জান? সে আর কিছু নয়, খোলা সমুদ্রের ধারে খানিকটা খালি জায়গা, সেখানে অনেক নুড়ি পাথর, আর ছোট বড় অনেক ঢিপি আছে, কিন্তু বরফ বেশী নাই। সেখানে বড্ড হাওয়া, তাতে বরফ উড়িয়ে নিয়ে যায়।

এই হল তাদের দেশ। তোমার আমার কাছে যেমনই লাগুক, ওদের কাছে ঐ ভাল। এইখানে তাদের জন্ম হয়েছিল; তাদের খোকা খুকীরা সকলেই এইখানে হয়েছে। বছর বছরই তারা লাখে লাখে এইখানে আসে। কত যুগ যুগান্তর ধরে এমনি চলেছে, তার ঠিকানা নাই।

দেশে পৌঁছেই গিন্নীরা সকলে একেকটি ছোট্ট ঢিপি খুঁজে বার করে, তার উপর একটি ছোট্ট গর্ত্ত খুঁড়ে নিয়ে, তাতে খুব গম্ভীর হয়ে বসবে। আরেক বাড়ীর গিন্নী যদি এর খুব কাছে আরেকটা ঢিপিতে এসে বাসা নেয়, তবে এ ওর হাওয়া আটকাচ্ছে বলে দুজনায় বিষম বচসা লেগে যাবে, আর নিজের বাসা না ছেড়ে ঠোকরাবার সুবিধা পেলে তাতেও কসুর হবে না।

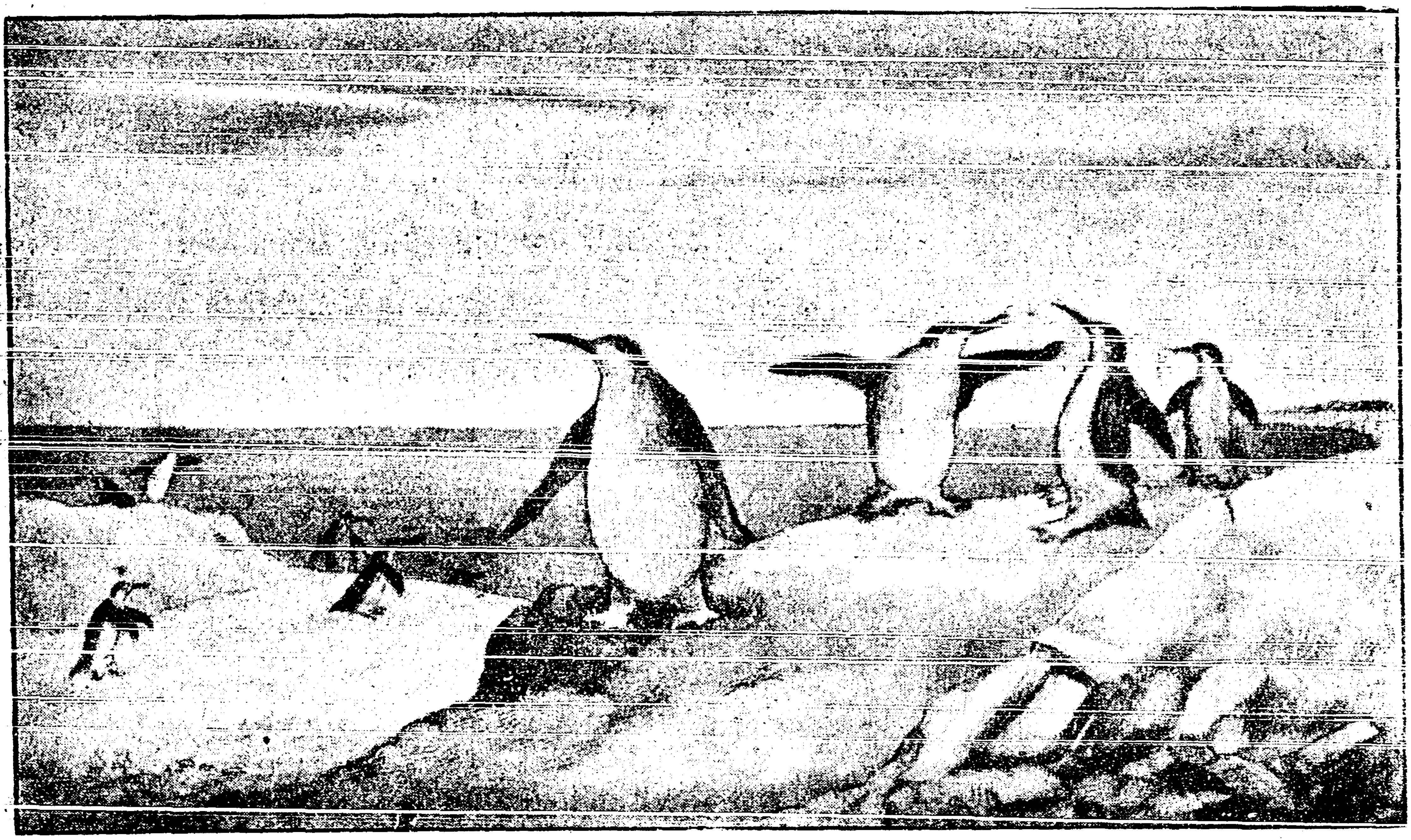

এদিকে, বাড়ীর যে কর্ত্তা, সে বেচারা এখনো বাড়ীতে ঢুকতেই পায়নি। চার পাঁচ জনে সকলেই বলছে 'আমি কর্ত্তা!' 'আমি কর্ত্তা!' এখন এর মধ্যে কার কথা ঠিক, তাই নিয়ে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেছে। পেঙ্গুইনেরা ভারী ভদ্রলোক, তারা ঠোকরাঠুকরী করাকে অসভ্যতা মনে করে। যুদ্ধের সময় তারা শত্রুকে কাঁধ দিয়ে ঠেলে বার করে দিতে চেষ্টা করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর এক হাতে ধাঁই ধাঁই থাপ্পড় লাগায়।

এমনি করে সকল শত্রুকে তাড়াতে পারলেই যে কর্ত্তার সব আপদ চুকে যায়, তা নয়। গিন্নী যেই দেখে যে কর্ত্তার জয় হয়েছে, অমনি সে এসে তাকে প্রাণপণে ঠোকরাতে থাকে।

কর্ত্তা খুব বীর পুরুষ হলেও, গিন্নীর ঠোকরগুলি সে নিতান্ত ভালমানুষের মত চোখ বুজে শুয়ে হজম করে। সে বেশ বুঝতে পারে যে এত দিনে তার একটি মনিব জুটেছে, এখন থেকে এর হুকুম মেনে চলতে হবে।

এর পর কর্ত্তা খুঁজে খুঁজে নুড়ি আনবে, গিন্নীরা ঢিপীর উপর বসে তাই দিয়ে বাসা বানাবে। কর্ত্তাদের মধ্যে আবার দু একজন চোরও আছেন, তাঁরা পরিশ্রম করে নুড়ি কুড়ানর চেয়ে, অন্যের বাসা থেকে না বলে নিয়ে আসতে খুব মজবুত! ধরা পড়লে এঁদের সাজাটাও হয় তেমনি।

বাসা তয়ের হলে গিন্নী তাতে একটি কি দুটি ডিম পেড়ে দিনরাত উপোস থেকে তাতে তা দিতে আরম্ভ করে। কর্ত্তা ততক্ষণ সমুদ্রে গিয়ে দিন পোনের খুব খেয়ে দেয়ে নেয়। তারপর সে নিজে এসে ডিমের উপর বসে গিন্নীকে ছুটি দেয়। গিন্নীও তখন সমুদ্রে গিয়ে দিন কতক স্নানাহারে কাটায়।

ছানা হলে দুজনায় মিলে তাদের খাওয়ান নিয়ে ব্যস্ত হয়, আর প্রাণপণ তাদের বিপদ আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। বিপদ সেখানে অনেক আছে। পাড়ায় গুণ্ডার অভাব নাই, তারা বাড়ী ঘরের ধার ধারে না, খালি অন্যের বাসা ভেঙ্গে আর ছানা মেরে বেড়ায়। তা ছাড়া এক রকম পাখী আছে, তারা সুবিধা পেলেই এসে ডিম বা ছানা খেয়ে যায়। সমুদ্রে নানারকম জানোয়ার থাকে, তারা অনেক সময় ধাড়ী পাখীগুলোকে মেরে ফেলে, তখন ছানাগুলির বড়ই বিপদ হয়।

পেঙ্গুইনদের মধ্যে আবার কতকগুলি স্কুল মাষ্টার থাকে। পেঙ্গুইনদের ছানারা একটু বড় হলে তাদের এই সব স্কুল মাষ্টারের জিম্মা করে দেওয়া হয়। স্কুল মাষ্টারদের কাছে নানারকম আদব কায়দা শিখে তারা দেখতে দেখতে পাকা পেঙ্গুইন হয়ে দাঁড়ায়।

ততদিনে গ্রীষ্মকাল ফুরিয়ে আসে, পেঙ্গুইনেরাও সে বছরের মত ঘরকন্না শেষ করে আবার শীত পড়বার আগে উত্তরে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়।

ঠানদিদির বিক্রম।

ঠানদিদির মেজ মেয়ে হরিবোলা, আমার চাইতে বয়সে তিন বৎসরের বড় হলেও, হরিবোলা আমার খেলার সাথী ছিল। জয়চন্দ্র দারগার সাথে হরিবোলার বিবাহ হলে, যে দিন সে শ্বশুর বাড়ী চলে যায়, সে দিন হরিবোলাকে দেখবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু দারগার নামে আমি সে বাড়ী মুখো হই নাই। আমার জেঠীমা কত বল্লেন "দারগা থানায়, এখানে সে জামাই, তোর ভয় কি ?" কিন্তু জেঠীমার কথায় আমার ভয় ভাঙ্গ্‌ল না, হরিবোলাকেও আমার দেখা হল না।

এবার অনেক দিন পরে হরিবোলা বাপের বাড়ী আসবে, দারগা তিন মাসের ছুটী নিয়েছেন, তিনিও আসবেন। আমাদের বাড়ী থেকে ষ্টেসন চারি মাইল দূর, সকলেই নৌকায় যাতায়াত করে, কিন্তু জয়চন্দ্র দারগা নাকি পাল্‌কিতে আসবেন হরিবোলাও আসবে, ১৬ ষোল বেহারার পাল্‌কি। আমাদের খেলার সাথীর মধ্যে বিপিন সব চাইতে ছোট, সে জিজ্ঞাসা কল্ল "ভাই! পাল্‌কির বাট তো ছোট, তা ষোল জনে কাঁধে করবে কি করে ?" শশী বল্ল, "আমার বোধ হয় পাল্‌কির বাটের সঙ্গে দুই দিকে দুইখানা বাঁশ বাঁধবে, তারপর এক এক দিকে আটজন করে কাঁধে করবে।" নেপাল সব চাইতে বড়, সে তখন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে "তুই যেমন বোকা! একি মড়া নিয়ে যাচ্ছে, যে বাঁশ বেঁধে নিয়ে যাবে ?" বিপিন আবার জিজ্ঞাসা কল্ল "তবে ভাই কি করে কাঁধে করবে ?" নেপাল তখন গম্ভীর ভাবে বল্ল "আমার বোধ হয় দারগার পাল্‌কি আমাদের উমেশ কাহারের পাল্‌কির মত নয়, বাট খুব বড় করেই তৈরী করেছে। শশীর আর সহ্য হল না; সে রেগে বল্ল "আমি বোকা আর তুই বুদ্ধির ঢিপি! পাল্‌কি আবার দারগার এক রকম অন্য মানুষের আর এক রকম ?" নেপালও ছাড়বার পাত্র নয়, তখন দুই জনে খুব ঝগড়া লেগে গেল, ক্রমে মুখো মুখি ছেড়ে হাতা হাতির জোগাড় হয়ে উঠল। আমি এদের চাইতে বয়সে ছোট হলেও আমার কথা সকলেই মান্‌ত। আমি বল্লাম "ভাই ঝগড়া মারামারিতে কাজ কি ? বিকালে যখন পাল্‌কি আসবে তখন দেখলেই তো সব গোল মিটে যাবে।" তখন দুজনেই থাম্‌ল এবং পরামর্শ হল, গাড়ী আসবার সময় নদীর ধারের রাস্তায় গিয়ে সব দাঁড়িয়ে থাকব।

স্কুল ছুটীর পরই নদীর ধারের রাস্তায় গিয়ে সব হাজির; গাড়ী যাওয়ার সময় হয়ে

গেল, কোন সাড়া শব্দ নাই। ক্রমে সন্ধ্যা হল, তবুও গাড়ীর শব্দ শোনা গেল না। অন্ধকার হল, তখন ক্ষুণ্ণ মনে যার যার বাড়ী মুখো ফিরলাম।

ভোরে উঠেই জ্যেঠিমার কাছে শুনলাম হরিবোলারা অনেক রাত্রে এসেছে, কোথায় নাকি রেলের রাস্তা ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই গাড়ি আসতে অনেক দেরী হ'ল। এই শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম, পথেই নেপাল ও শশীর সাথে দেখা হল; বিপিন ছেলে মানুষ অত ভোরে উঠতে পারেনি। আমরা তিন জনেই ঠানদিদির বাড়ীতে গিয়ে দেখি, পাল্‌কী আর কিছুই নয়, সেই আমাদের উমেশ কাহারের পাল্‌কিখানাই রয়েছে, আর তার পাশে বসে উমেশের ছোট ভাই গণেশ তামাক খাচ্ছে। তখন তিন জনেই ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ীতে ফিরে লেখা পড়ায় মনোযোগ দিলাম।

শনিবার, সকাল সকাল ছুটী হয়েছে, বাড়ী এসে শুনি যে জেঠীমাকে হরিবোলাদের বাড়ী থেকে ডাক্‌তে এসেছিল। হরিবোলা অনেক গয়না নিয়ে এসেছে, আমাদের গ্রামে অত গয়না নাকি আর কারিও নাই; তবে সদরালার স্ত্রীর অনেক গয়না আছে বটে, কিন্তু তিনি সব গয়না এক সঙ্গে পরেন না সুতরাং আমাদের গ্রামের অনেকেই কোন্ গয়নার কি নাম এবং কোথায় পরে তাই জানে না। আমার জেঠীমার বাবা কালীঘাটে কবিরাজী করতেন, জেঠীমা কখনও কালীঘাটে বাবার কাছে গিয়ে রয়েছেন, তিনি সেখানে অনেক রকমের গয়না দেখেছেন এবং কোথায় কি গয়না পরতে হয় তাও জানেন। তাই ঠানদিদি জেঠীমাকে ডাক্‌তে এসেছিলেন। পশ্চিম পাড়ায় হরিবোলার বাপের মামা বাড়ী, ঠানদিদি হরিবোলাকে, তাঁদের প্রণাম করাতে নিয়ে যাবেন, জেঠীমা বল্লেন "তুই আমার সঙ্গে যাবিতো চল্। আমিও একবার আমার ভাইপোদের দেখে আস্‌ব।" জেঠীমার বাপের বাড়ী ও হরিবোলার বাপের মামা বাড়ী একই বাড়ী।

জেঠীমা হরিবোলার গয়নাগুলি যেখানকার যেটি পরিয়ে দিলেন, হরিবোলা খুব সুন্দরী ছিল, গয়নাগুলি পরে হরিবোলাকে লক্ষ্মী সরস্বতীর চাইতেও সুন্দর দেখাতে লাগল। মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত গয়না, এত গয়না যে একখানা চাঙ্গারিতে রাখ্‌লে এক চাঙ্গারি গয়না হয়। আমরা সন্ধ্যার আগেই পশ্চিম পাড়া থেকে ফিরলাম, বাড়ী এসে জেঠীমা বল্লেন "হরিবোলার মা কাজটা ভাল করল না, দেশ শুদ্ধ হরিবোলার গয়নার কথা জানা জানি হল, চোরের কাণে কি আর একথা যায়নি? হরিবোলার বাপও বাড়ী নাই, যদি ভাল মন্দ হয় হরিবোলার মায়ের ঘাড়েই দোষ পড়বে।"

ঠানদিদির বাড়ীতে ছয়খানি ঘর, উত্তরের ঘরখানি ঠানদিদির শোবার ঘর, সেই ঘরেই দামী জিনিষ পত্র থাকে, পশ্চিমের ঘরে রান্না ও খাওয়া হয়, পূবেরখানি ঢেকীঘর, দক্ষিণের ঘরখানি চণ্ডীমণ্ডপ ও বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার হয়। এ ছাড়া বাইরে একখানা চালা ঘর, জয়চন্দ্র বাবু ও তাঁর চাকরকে দক্ষিণের ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল। ঠানদিদি তাঁর দুই মেয়ে নিয়ে উত্তরের ঘরেই শুয়েছিলেন। শেষ রাত্রে ঠানদিদি শুনলেন ঝুপ ঝুপ করে মাটি পড়ছে। তাঁর আর বুঝতে বাকী রইল না যে চোরে সিঁদ কাটছে। ঠানদিদি উঠে বসলেন এবং কোন্ দিকে শব্দ হচ্ছে, তাই ঠিক করে, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোর সিঁদটি কেটে দুখানি পা সিঁদের ভিতর গলিয়ে দিল। চোরে নাকি সিঁদের ভিতর মাথা গলিয়ে ঘরে ঢোকে না, পা গলিয়ে উল্‌টো হয়ে ঘরে ঢোকে। চোরের অর্দ্ধেকটা শরীর যখন ঘরের ভিতর ঢুকেছে, তখন ঠানদিদি চোরের একখানা পা ধরে "চোর ধরেছি, চোর ধরেছি" বলে চীৎকার কর্ত্তে লাগলেন, চোরের সঙ্গী যারা বাইরে ছিল, তারা হাত ধরে বার থেকে টানতে লাগ্‌ল। গোলমালে জয়চন্দ্র বাবু জেগে উঠে এসে, চোরের অন্য পা খানা ধরে ফেল্লেন। তখন ভিতর থেকে শাশুড়ী জামায়ে দুই পা ধরে এবং

বার হতে অন্য চোরেরা দুই হাত ধরে "টাগ্ অব ওয়ার চল্ল" (Tug of War) তখন কি মজাটাই না হয়েছিল!

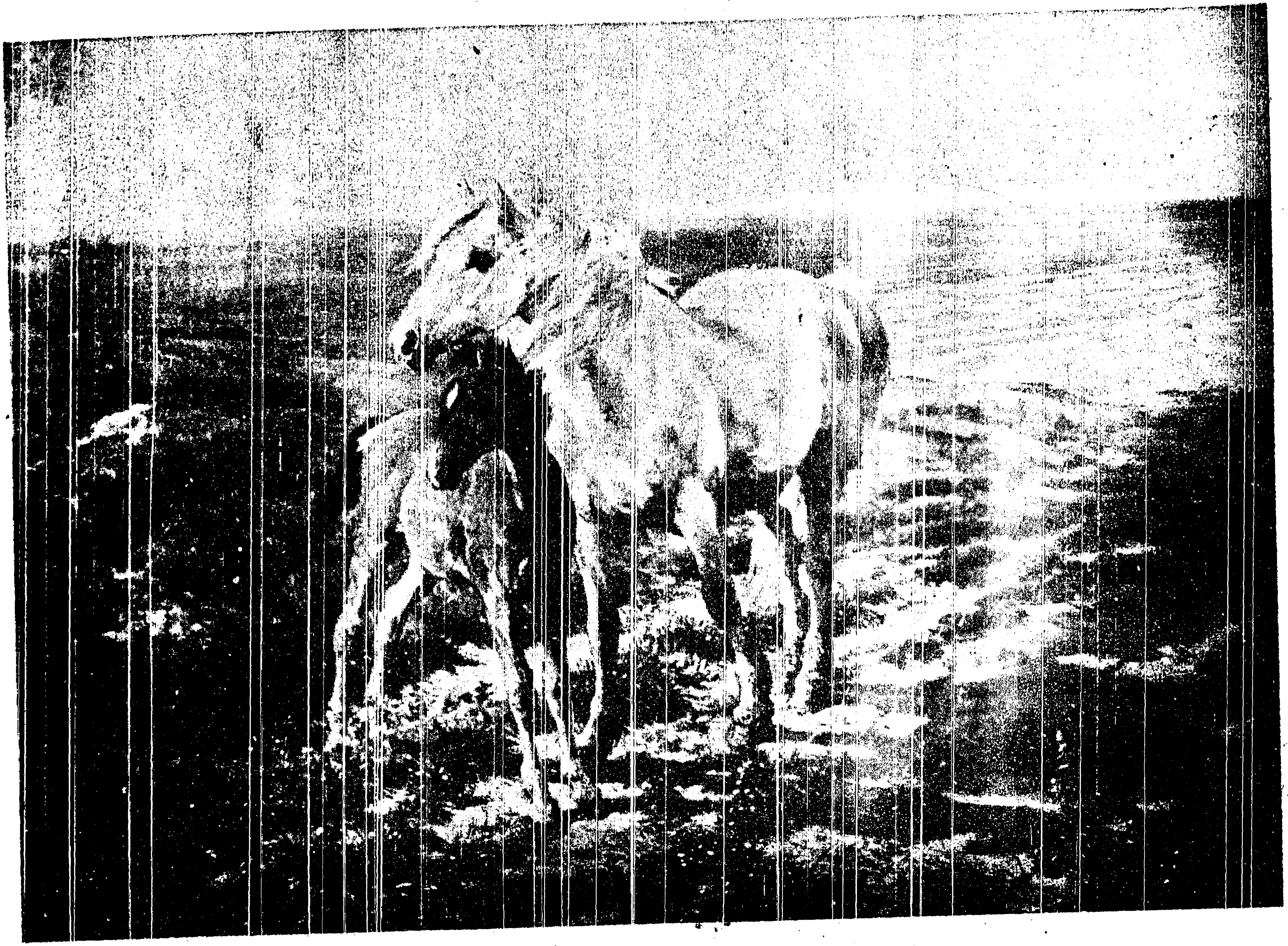

মায়ের কাছে।

U. RAY & SONS,
'00, Gurpar Road, Calcutta.

এর পূর্ব্বে গ্রামে দুইটা চুরি হয়ে গিয়েছিল, পুলিস তার কোন কিনারাই করতে পারে নাই। তাই নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা লেখিও হয়েছিল, সেই জন্যে একজন গোয়েন্দা পুলিসের দারগা ও চারি জন কনষ্টেবল, কয়দিন থেকে ডাকঘরে লুকিয়ে ছিলেন। দারগা সম্পর্কে ডাক-মুন্সীর শালা, তাই লোকে জান্ত ডাক-মুন্সীর কুটুম্ব এসেছেন। ডাকঘর ঠানদিদির বাড়ীর খুব নিকটেই; গোলমাল শুনে তাঁরাও এসে হাজির হলেন, পাড়ার লোকও অনেকে উঠে এল, তখন বাইরের চোর দুজন হাত ছেড়ে দিয়ে পালাল। ঠানদিদির ঘরের পেছনে অল্প জঙ্গল ছিল, তখন পাড়ার লোক ও কনষ্টেবল চারিজন, জঙ্গলের চারিদিকে ঘিরে চৌকী দিতে লাগল, গোয়েন্দা দারগা ঘরের ভিতর ঢুকলেন এবং দুই দারগায় চোরটাকে বেঁধে ফেল্লেন। ভোর হয়ে গেল, তখন বাকী চোর দুজনও ধরা পড়ল, সেই দিনই চোরদের জেলায় চালান দেওয়া হল।

ঠানদিদি পাড়ার মুরুব্বি, পাড়ার এমন স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড় কেউ নাই যে ঠানদিদিকে ভয় করে না, কিন্তু তাহলেও তিনি "বৌ মানুষ" তিনি ত আর আদালতে যেতে পারেন না, কাজেই জয়চন্দ্র বাবু সঙ্গে গেলেন এবং চোর ধরার সমস্ত বাহাদুরীটা তিনি একাই পেলেন। চোরদের নিকট হতে আগেকার চুরিরও কোন কোন মাল পাওয়া গেল, তাদের তিন জনেরই জেল হল।

কয়েক মাস পরে একদিন ঠানদিদি আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসে বল্লেন "আমার জয়চন্দ্রের উন্নতি হয়েছে, দশ টাকা মাইনা বেড়েছে।"

খুকির গল্প।

একটি আড়াই বছরের মেয়েকে গল্প বল্‌তে বলা হ'য়েছিল। সে এই গল্প বল্‌ল—

একটা বাঘ রাস্তায় ব'সে ছিল।
একটা ঘোড়া রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।

ঘোড়া বল্‌ল, "বাঘ তুমি আমার কাঁচি নিয়েছ"?
বাঘ বল্‌ল, "আমি তোমার কাঁচি নিইনি"।
ঘোড়া বল্‌ল, "বাঘ তুমি ব'সে ব'সে খাও—কোন কাজ কর্ম্ম কর না"?
বাঘ বল্‌ল, "হ্যাঁ, আমি তোমার কাঁচি নিয়েছি"।

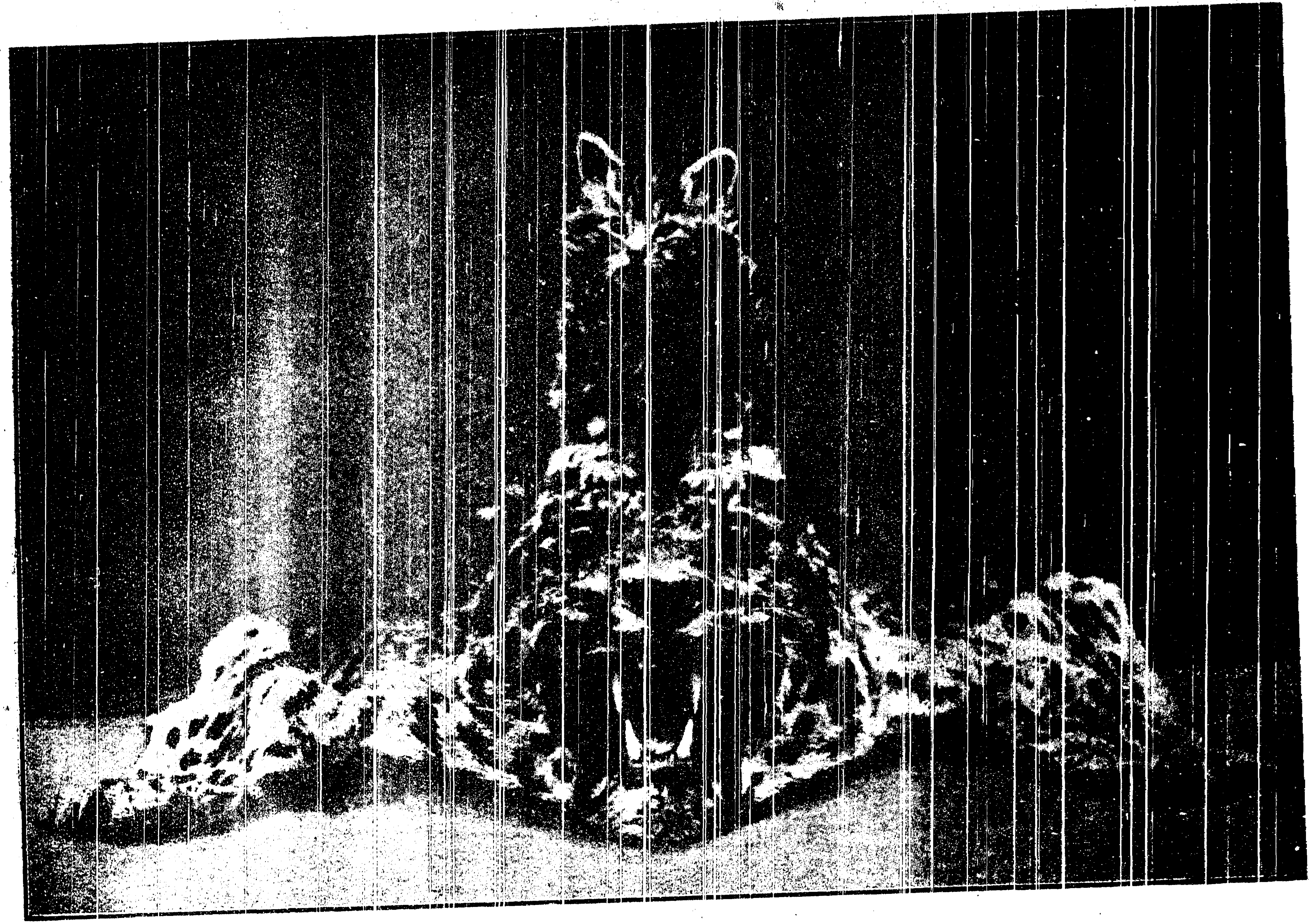

বাঘের মাসী ।

দাতা।

(পারস্য হইতে)

দাতার প্রধান জাফর নিত্য দান করে দুঃখীজনে,
তাহার তুল্য নাহি বদান্য বিশ্বাস মনে মনে।
একদা সহসা উদ্যান মাঝে সান্ধ্য ভ্রমণ কালে,
হেরে তার দাস, ক্ষুধায় কাতর, বসি তরু আলবালে,
দিবস শেষের প্রাপ্ত আহার তিনখানি রুটী তার
একে একে দিল কুকুরের মুখে, বিচিত্র ব্যবহার!
কহিল জাফর, "ওরে কিঙ্কর, সারাদিন উপবাসী
দিবস শেষের খাদ্য তাহাও কুকুরে দিলি হাসি?"
চমকি বান্দা জোড় হাতে কয়, "মানুষ হয়েছি ভবে,
আজিকে ভাগ্যে না হয় আহার কালি পুনরায় হবে।
খোদার এ জীবে আহার কে দিবে ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে নিখিল জীবের সেবা।"
কহিল জাফর আঁখি ছল্‌ছল্‌, "আবিসিনিয়ার দাস,
আজিকে দর্প করিলি চূর্ণ ছিঁড়ে দিলি মোহপাশ।
গুরুর মন্ত্র কাণে দিলি তুই, দে'রে কোল, বুকে আয়,
দুর্দ্দিনে ধীর সেরা দানবীর তুই দিন দুনিয়ায়।
রাজকোষ যেবা মুক্ত করেছে দাতা নাহি কই তারে,
সেই ত্যাগবীর বুকের রুধির হেলায় যে দিতে পারে।
রে চির বান্দা নহিস বন্দী—দিলাম মুক্তি ত্রাণ,
এই বাগিচার মালিক হইয়া প্রাণ ভরে কর দান।"

শ্রীকালিদাস রায়।

দেবতার সাজা।

থর্ নরওয়ে দেশের যুদ্ধ দেবতা।

যুদ্ধের দেবতা কিনা, তাই তাঁর গায়ে অসাধারণ জোর। তাঁর অস্ত্র একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি। সেই সর্ব্বনেশে হাতুড়ির এক ঘা খেলে পাহাড় পর্য্যন্ত গুঁড়া হ'য়ে যায়, কাজেই সে হাতুড়ির সামনে আর কেউ এগুতে সাহস পায় না। তার উপরে থরের একটা কোমর বন্ধ ছিল সেটাকে কোমরে বেঁধে নিলে তাঁর গায়ের জোর দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

থরের মনে ভারি অহঙ্কার তাঁর সমান বীর আর তাঁর সমান পালোয়ান পৃথিবীতে বা স্বর্গে আর কেউ নেই।

একদিন থর্ দেখলেন একটা পাহাড়ের পাশে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য ঘুমিয়ে আছে আর সে এমন নাক ডাকাচ্ছে যে গাছ পালা পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে। থর্ বল্‌লেন "এইও, বেয়াদব নাক ডাকাচ্ছিস্ যে"? বলেই হাতুড়ি দিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে তার মাথায় তিন ঘা লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ওই হাতুড়ির অমন ঘা খেয়েও দৈত্যের কিছুই হলনা, সে খালি একটু মাথা চুল্‌কিয়ে বল্‌ল "পাখীতে কি ফেল্‌ল"?

থর্ আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন "তুমিত খুব বাহাদুর হে, আমার এ হাতুড়ির ঘা সহ্য কর্‌তে পারে, এমন লোক যে কেউ আছে, তা আমি জান্‌তাম না"।

দৈত্য বল্‌ল "তা জান্‌বেন কোত্থেকে, আমাদের দেশেত যাননি কখন। সেখানে আমার চেয়েও বড় আমার চেয়েও ষণ্ডা ঢের ঢের দৈত্য আছে"। থর্ বল্লেন "বটে? তবেত আমায় একবার সেখানে যেতে হচ্ছে।"

দৈত্য তাঁকে দৈত্য পুরীর পথ দেখিয়ে দিল আর বল্‌ল, "দেখবেন, সেখানে গিয়ে বেশী বড়াই টড়াই কর্‌বেন না কারণ, আপনি যত বড়ই দেবতা হ'ন্‌না কেন, সে দেশে বাহাদুরি কর্‌তে গেলে শেষে লজ্জা পেতে হবে"।

দৈত্য পুরীর চারদিকে প্রকাণ্ড বরফের দেয়াল—সে এত বড় যে তার নীচে দাঁড়ালে চূড়ো দেখা যায় না। সেই দেয়ালের এক জায়গায় বড় বড় গরাদ দেওয়া আকাশের মত উঁচু ফটক।

থর্ দেখলেন সে ফটক খোলা তাঁর সাধ্য নয়, তাই তিনি দুটো গরাদের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। দেয়ালঘেরা দৈত্যপুরীর রাজসভায় বসে বসে পাহাড়ের মত বড় বড় দৈত্যরা সব গল্প করছে; তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে, সেই হ'চ্ছে দৈত্যের রাজা।

দৈত্যেরা থর্‌কে দেখেও যেন দেখেনি এম্‌নি ভাবে গল্প কর্‌তে লাগ্‌ল। খানিক পরে দৈত্যরাজা থরের দিকে তাকিয়ে, বড় বড় চোখ ক'রে, যেন কতই আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, "কেও? আরে, আরে, থর্‌ নাকি? আপনিই কি সেই দেবতা, যাঁর গায়ে ভয়ানক জোর। তা হবেও বা, শুধু শরীর বড় হ'লেই ত আর গায়ে জোর হয় না? আচ্ছা, আপনার সম্বন্ধে যে সকল ভয়ানক গল্প শুনি সে সব কি সত্যি"?

থর্‌ বল্লেন "সত্যি কিনা, এখনি বুঝ্‌বে। ওরে কে আছিস্‌, আমায় একটু জল দেত, এক চুমুকে কত খানি খাওয়া যায় তোদের একবার দেখিয়ে দি"।

তখন্‌ রাজার হুকুমে একটা শিঙায় ক'রে ঠাণ্ডা জল এনে থর্‌কে দেওয়া হ'ল। রাজা বল্লেন "আমাদের মধ্যে বড় বড় পালোয়ান ছাড়া কেউ ওটাকে এক চুমুকে খালি কর্‌তে পারে না। সাধারণ দৈত্যেরা দুই চুমুকে শেষ করে। তবে যারা নেহাৎ আনাড়ি, তাদের তিন চুমুক লাগে"।

থর্‌ তাড়াতাড়ি শিঙাটা নিয়ে চোঁ চোঁ চোঁ ক'রে এমন টান দিলেন, যে মনে হ'ল শিঙা নিশ্চয়ই খালি হ'য়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শিঙা যেমন ভর্ত্তি ছিল প্রায় তেমনিই রইল। থর্‌ ভারি লজ্জিত হ'য়ে আবার জল খেতে লাগ্‌লেন—ঢক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ কিন্তু তবু জল ফুরাল না।

রাজা হো হো ক'রে হেসে বল্লেন "তাইত, অনেকটা যে বাকী রাখ্‌লেন"।

থর্‌ তখন রেগে খুব একটা দম্‌ নিয়ে আবার চুমুক দিলেন; খাওয়া আর থামে না—পেট ঢাক হ'য়ে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হ'য়ে এল, কিন্তু জল তবু ফুরাতে চায় না! তখন থর্‌ আর কি করেন?

তিনি বল্লেন, "না, জল খাওয়াতে আর বেশী বাহাদুরী কি? পেটুকের মত খানিকটা জল গিল্‌লেইত আর গায়ের জোর প্রমাণ হয় না। দেখিত আমার মত ভারি জিনিষ কে তুল্‌তে পারে"।

দৈত্য রাজ বল্‌লেন "তা বেশ্‌ত। একটা সহজ পরীক্ষা দিয়েই আরম্ভ করা যাক্‌—ওরে, আমার বেড়ালটাকে নিয়ে আয়ত। বল্‌তেই ছেয়ে রঙের বেড়াল ঘরের মধ্যে ঢুকল। থর্‌ তাড়াতাড়ি বেড়ালটাকে ঘাড়ে ধ'রে ছুঁড়ে ফেল্‌তে গেলেন। কিন্তু বেড়ালটা এমনি শক্ত ক'রে মাটি আঁকড়ে রইল যে অনেক টানাটানির পর তার একটি পা মাটি থেকে মাত্র এক আঙুল উঠান গেল!

দৈত্যরাজা বল্লেন "না আমারই অন্যায় হয়েছে এতটুকু লোক, সে কি ওই ধাড়ি বেড়ালটাকে তুল্‌তে পারে" ?

থর্‌ তখন ভয়ানক চটে গিয়ে বল্লেন, "বটে! এতটুকু হই আর যাই হই—দেখিত, কে আমার সঙ্গে কুস্তিতে পারে ?"

দৈত্য বল্‌ল "তবেইত মুস্কিলে ফেল্‌লেন! আপনার সঙ্গে লড়াই করবার লোক এখন আমি কোথায় পাই ? আচ্ছা দেখি—ওরে বুড়ি ঝিটাকে ডেকে আন্‌ত।"

মান্ধাতার আমলের এক বুড়ী, তার চুল সব শাদা, তার মুখে দাঁত নেই, গালটাল সব তুব্‌ড়ে গিয়েছে—সে এল কুস্তি কর্‌তে! থর্‌ত চটেই লাল! বল্লেন "একি, তামাসা পেয়েছ ?" দৈত্যেরা তাতে আরো হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্ল "ও বুড়ি, থাক্‌ থাক্‌ ওকে মারিস্‌নে—ও ভয় পেয়েছে।" থর্‌ তখন তেড়ে গিয়ে বুড়িকে এক ধাক্কা দিলেন। তাতে বুড়ী তাঁকে ঘাড় ধ'রে মাটিতে বসিয়ে দিল!

থর্‌ তখন আর কি করেন ? লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সারারাত্রি সে অপমানের কথা ভেবে তাঁর ঘুম হ'ল না। পরদিন সকাল বেলাই তিনি বাড়ী চল্লেন। দৈত্য-রাজা খুব খাতির করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুরীর ফটক পর্য্যন্ত এলেন।

ফটকের কাছে এসে দৈত্যরাজা হেসে বল্লেন "আপনাকে একটা কথা বলছি, কারণ সেটা না বল্লে অন্যায় হয়। কাল কিন্তু সত্যিই আপনার হার হয় নি। আপনার অহঙ্কার ভাঙ্বার জন্যই আমরা আপনাকে একটু ফাঁকি দিয়েছি। ঐ যে শিঙাটা দেখ্লেন, ওটা সমুদ্রের শিঙা। সমস্ত সমুদ্রের জল না ফুরালে ওর জল ফুরায় না। আপনি যে তিন চুমুক দিয়েছিলেন, তাতে কতজায়গায় সমুদ্রের ধারে চড়া পড়ে গিয়েছে।"

আর ঐ বেড়ালটা কি জানেন? ও হ'চ্ছে 'স্ক্রাইমিড্'—যে সাপের মত হয়ে সমস্ত পাহাড়, নদী সমুদ্র শুদ্ধ পৃথিবীটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখে! আপনার টানে পৃথিবীটা প্রায় দশখানা হয়েফাটবার জোগাড় করে ছিল।

আর ঐ বুড়ী ঝি হ'চ্ছে জরা, অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়স। বুড়ো বয়সে কা'কে না কাবু করে? আর, কাল সকালে আপনি যে দৈত্যের মাথায় হাতুড়ি মেরেছিলেন আমিই সেই দৈত্য। সে হাতুড়ি আমার মাথায় একটুও লাগে নি। আমি আগেথেকে মাথা বাঁচাবার জন্য এক মায়া পাহাড়ের আড়াল দিয়েছিলাম—ওই দেখুন আপনার হাতুড়িতে তার কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে!

থর্ যখন এসব ফাঁকির কথা শুন্লেন—তখন তিনি রাগে কাঁপ্তে লাগ্লেন। হাতুড়িটাকে মাথার উপরে তুলে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরিয়ে তিনি যেই সেটা ছুঁড়্তে যাবেন, অম্নি দেখেন—কোথায় দৈত্য, কোথায় পুরী,—চারিদিকে কোথাও কিছু নাই!

মনের রাগ মনে মনেই হজম ক'রে থর্ সেদিন বাড়ী ফির্লেন।

সাহসের কথা।

গতবারে তোমরা ঠান্দিদির বিক্রমের কথা শুনেছ, এবারে আমেরিকার একটি এগার বৎসরের ছেলের সাহসের কথা শোন। গরুবাছুরকে বড্ড মশায় কামড়াত, সেই মশা তাড়াবার জন্য ছেলেটি আগুনের ধূণী জ্বালাচ্ছিল, এমন সময় বনের ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড কালো ভালুক এসে তার সামনে উপস্থিত হল। ছেলেটি তখন তাড়াতাড়ি আর কি করবে,—হাতে কুড়ুল ছিল, তাই দিয়ে গেল ভালুককে মার্তে, কিন্তু কুড়ুল ভালুকের মাথায় লাগল না। তখন ছেলেটি কুড়ুল রেখে দিয়ে একটা মুগুর নিয়ে ভালুককে এমনি ছুঁড়ে মারল যে, সেই মুগুরের ঘা খেয়েই ভালুক মশাই লেজ গুটিয়ে আবার গিয়ে বনের ভিতরে ঢুকলেন।

সে ছোকরা কিন্তু এত সহজে তাঁকে ছাড়তে রাজী নয়। সে তার বাবার বন্দুকটা আনবার জন্য ছুটে ঘরের ভিতর গেল। বন্দুক পেলে সে তা দিয়ে ভালুককে কি করত, জানি না, কিন্তু বন্দুক আর তার আনা হয় নি। তার মা তাকে কিছুতেই বন্দুক নিয়ে যেতে দিলেন না; আর না দিয়ে ভালই করলেন বোধ হয়। বনের ভিতরে ভালুককে মারতে গেলে তার ফল কি হত, কে জানে?

ভালুক যে কি ভয়ানক জন্তু, তা বোধ হয় ছেলেটি ভাল করে জানত না। ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলে জানলে তবে ত তাকে ভয় হবে। এ সম্বন্ধে ছেলেবেলায় একটা মজার গল্প শুনতাম। আমার দিদিমার মদন বলে একটি চাকর ছিল, লোকটি অসাধারণ জোয়ান, আর তার চেয়েও শাদা সিধে মানুষ। দিদিমাদের গ্রামে সে কালে বড্ড বাঘের ভয় ছিল। একদিন সন্ধ্যা বেলায় দিদিমা তাঁর জপের মালা হাতে করে ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন, ঘরের পিছনেই বনের ভিতরে বাঘ ডাকছে। দিদিমা জানতেন ঐ দিকেই মদন বাছুর বেঁধে রেখেছে, কাজেই তিনি ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "মদন, মদন! আরে, শীগ্গির বাছুর ঘরে নিয়ে আয়,—ঐ শোন্, বাঘ ডাকছে!"

বলতেই মদন ছুটে বাছুর আনতে চল্ল, আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোলে করে নিয়ে এসে হাজির হল। দিদিমার ত দেখেই চক্ষু স্থির!—বাছুর ভেবে মদন বাঘটাকেই কোলে করে এনেছে, আবার বলছে,—হুঁ-অ-অ-অ! "হুঁ-অ-অ-অ!"

গরু যখন তার বাছুরকে ডাকে, তখন সে ঠিক ঐ রকম করে বলে, "হুঁ-অ-অ-অ" "হুঁ-অ-অ-অ!" তাই রাখালেরাও অনেক সময় অমনি শব্দ করে বাছুরকে ঠাণ্ডা রাখে। বাঘটা যে বিনা ওজরে মদনের কোলে বসে থাকেনি, এ কথা আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি, কাজেই মদন তাকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেছে। শেষে যখন দিদিমা তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে সেটা বাছুর নয়, তখন সে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁপতে লাগল। বাঘও একবার ছাড়া পেয়ে আর তিল মাত্রও সেখানে দাঁড়াল না। না জানি সে দিন বেচারা ঘরে গিয়ে তার গিন্নীকে কি বলেছিল!

এ গল্পটি আমি দিদিমার মুখে শুনিনি, আর এটা সত্য কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যা হোক, আমি শুধু এই বলতে চাই যে মদন যদি জানত যে সেটা বাঘ, তাহলে সে কখনই সেটাকে কোলে করতে যেত না।

আর একবার পৌষমাসের সন্ধ্যা কালে দিদিমা আগুনের হাঁড়িটি নিয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন, এমন সময় তাঁর মনে হল যেন বাছুরটা ঘরের পিছন থেকে এসে উঠানের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিদিমা মদনকে ডেকে বল্লেন, "মদন! বাছুরটাকে এখনো গোয়ালে বাঁধনি, বাঘে নিয়ে যাবে যে!"

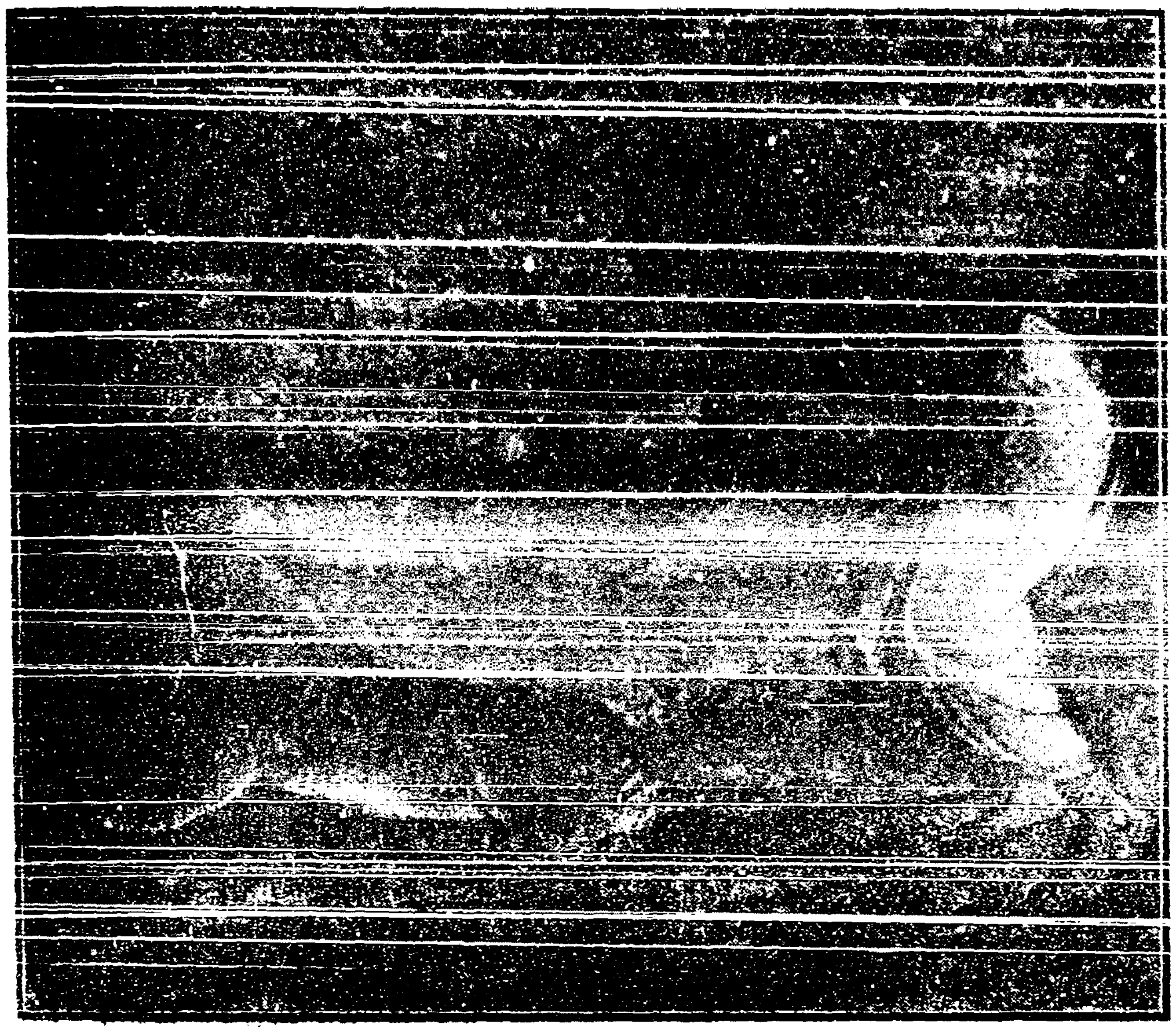

মদনের বাছুর ধরা।

বলতেই সেই জানোয়ারটা হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে, ধাঁই ধাঁই করে দিদিমার দিকেই আসতে লাগল। তখন দিদিমা দেখলেন, সেটা বাছুর নয়, বাঘ,—একেবারে পিঁড়ের উপর উঠে এসেছে, আরেকটু হলেই তাঁকে একটা কিছু বলবে। দিদিমাও সহজে ভড়কাবার লোক ছিলেন না, তিনি তাঁর সেই আগুনের হাঁড়িটি শুদ্ধ জ্বলন্ত কয়লাগুলি সব বাঘ মশাইয়ের নাকে মুখে ঝেড়ে দিয়ে তবে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কাজেই বাঘ মশাই আর সে দিন তাঁর বিশেষ দরকারী কথাটি দিদিমাকে বলতে পেলেন না, তার আগেই বনে ফিরে গিয়ে নিজের নাকটা একটু ভাল করে চুলকিয়ে নেবার দরকার হয়ে পড়ল।

এ সব খুবই সাহসের কাজ, তাতে ভুল নাই। কিন্তু নিতান্ত ভীতু লোকে যদি ইচ্ছা ক'রে কোন একটা সাহসের কাজ করে, তবে তার বাহাদুরী নিশ্চয় এর চেয়ে বেশী বলতে হবে। আমি আর একটি বুড়ো ঠাকুরুণের কথা জানি, তাঁর ভয় বড্ড বেজায় রকমের ছিল। যদি কেউ তাঁকে বলত, "ঠাকরুণ, আপনার কানে কি? অমনি তাঁর মনে হত, বুঝি জোঁক! কাজেই তখন তিনি চেঁচিয়ে আর লাফিয়ে অস্থির হতেন, আর কাছে কেউ থাকলে, তার পিঠে ক্রমাগত কীল মারতেন—সে কেন জোঁকটা ফেলে দিচ্ছে না?

সেই বুড়ো ঠাকরুণ একদিন গিয়েছেন একটা হাঁড়ির ভিতর থেকে কি যেন আনতে; আর, গিয়ে দেখেন, তার ভিতরে একটি সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। বল ত

বুড়ো ঠাকরুণ তখন কি করলেন ? ছুটে পালালেন ?—না ! চ্যাঁচাতে লাগলেন ?—না ! তিনি চুপি চুপি একখানি সরা এনে সেই সাপ শুদ্ধ হাঁড়ির মুখে চাপা দিলেন ; তারপর প্রাণ পণে সেই সরা শুদ্ধ হাঁড়ির মুখ দু হাতে আঁকড়ে ধরে উঠানে এসে নাচতে লাগলেন, আর বাড়ী শুদ্ধ সকলকে ডেকে সেখানে জড় করলেন। তারপর ছেলেরা তাঁর হাত থেকে হাঁড়ীটা নিয়ে সাপটাকে মেরে ফেল্ল। তখন যে বুড়ো ঠাকরুণের কাঁপুনি আরম্ভ হল, সারা দিনের ভিতর আর সে কাঁপুনি থামল না।

ছায়াবাজি।

তামাসা দেখাতে তোমরা সকলেই বোধ হয় ভালবাস। আমি একটা তামাসার কথা বল্‌ব সেটা করা বেশ সহজ আর খুব মজার। সে তামাসা কর্‌তে খালি একটা বাতি, একটা দেয়াল আর তোমার হাত দুখানি আর তার আঙ্গুল ক'খানার দরকার করে। এ তামাসার নাম ছায়াবাজি।

বাতিটাকে দেয়াল থেকে কিছু দূরে রেখে দেয়াল আর বাতির মাঝে তোমার হাত দুখানিকে এনে, হাত আর আঙ্গুলগুলিকে নানা ভাবে সাজিয়ে দেয়ালে এমন সব ছায়া ফেলা যায়, যে কোনটা মনে হয় কুকুরের ছায়া, কোনটা বেড়ালের ছায়া, কোনটা বুড়ো মানুষের মুখের ছায়া;—এরকম নানা রকমের মজার ছায়া হয়। কয়েকটা ছবি দিলাম; এর সাহায্যে তোমরা নিজে নিজেই এই ছায়াবাজি অনেকটা শিখ্‌তে পারবে।

১নং ছবিতে হাঁসের ছায়া দেখান হয়েছে। ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে হাঁসের মাথার ছায়া হয়েছে; হাতটা হয়েছে হাঁসের গলা। বাঁহাত দিয়ে হাঁসের গা হয়েছে।

২নং ছবিতে খরগোসের ছায়া দেখান হয়েছে। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল,

মাঝের আঙ্গুল, আর কড়ি আঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল মিলে খরগোসের পা হয়েছে। বাঁহাতের মাঝের আঙ্গুল আর কড়ি আঙ্গুলের পাসের আঙ্গুলের ছায়ায় খরগোসের দুটো কান হয়েছে; বাঁহাতের বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জ্জনী, আর ডান হাতের তর্জ্জনীর ছায়ায় খরগোসের মাথা হয়েছে।

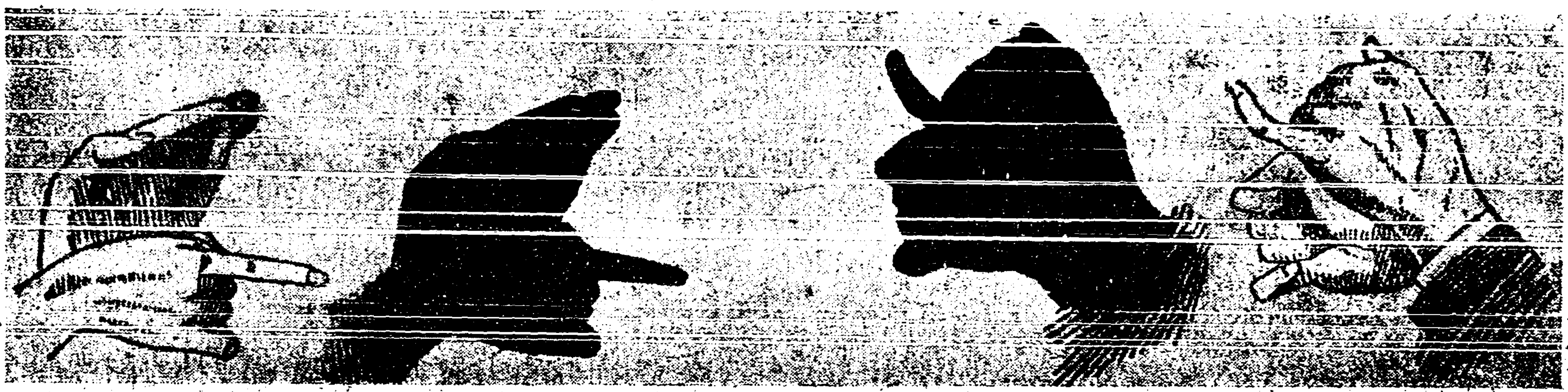

৩নং, ৪নং ছবি টুপিওয়ালা মানুষের। ছবি দেখ্‌লেই আঙ্গুল সাজাবার কায়দা বুঝ্‌বে।

বেড়াল আর হাতীর ছায়ার দুটি ছবি দিলাম। এ দুটি কর্‌তে হ'লে এক টুকরা

কাপড়ের দরকার। ছবিগুলি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, কাপড়টা কেমন ভাবে সাজাতে হবে।

একটু অভ্যাস কর্‌লে আরও নানান রকমের মজার ছায়া ফেল্‌তে শিখ্‌তে পার্‌বে।

পাতালপুরী।

পাতাল দেশটা কোথায় তাহা আমি জানি না। অনেকে বলেন আমেরিকার নামই পাতাল। সে যাহাই হউক, মোটের উপর পাতাল বলিতে আমরা বুঝি যে, আমাদের নীচে একটা কোন জায়গা—আমরা এই যে মাটির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তার উপরে যেন স্বর্গ আর নীচে যেন পাতাল!

এখানে যে জায়গার কথা বলিতেছি সেটাকে পাতালপুরী বলা হইল এই জন্য যে সেটা মাটির নীচে। মাটির নীচে ঘরবাড়ী, মাটির নীচে রেলগাড়ী, মাটির নীচে হোটেল সরাই গির্জ্জা—সমস্ত সহরটাই মাটির নীচে। সহরটা কিসের তৈয়ারী জান? নুণের! আসলে সেটা একটা নুণের খনি। অষ্ট্রিয়ার যেখানে রুশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার ভয়ানক লড়াই চলিতেছে—তারই কাছে—মাটির নীচে এই অদ্ভুত সহর। হাজার হাজার বৎসর লোকে এই খনিতে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া লবণ তুলিয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর এই খনি হইতে প্রায় বিশ লক্ষ মণ লবণ বাহির হয়—কিন্তু তবু লবণ ফুরাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মাটির নীচে পঁচিশ মাইল চওড়া ৫০০ মাইল লম্বা লবণের মাঠ। খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে এক হাজার ফুটের নীচেও লবণ।

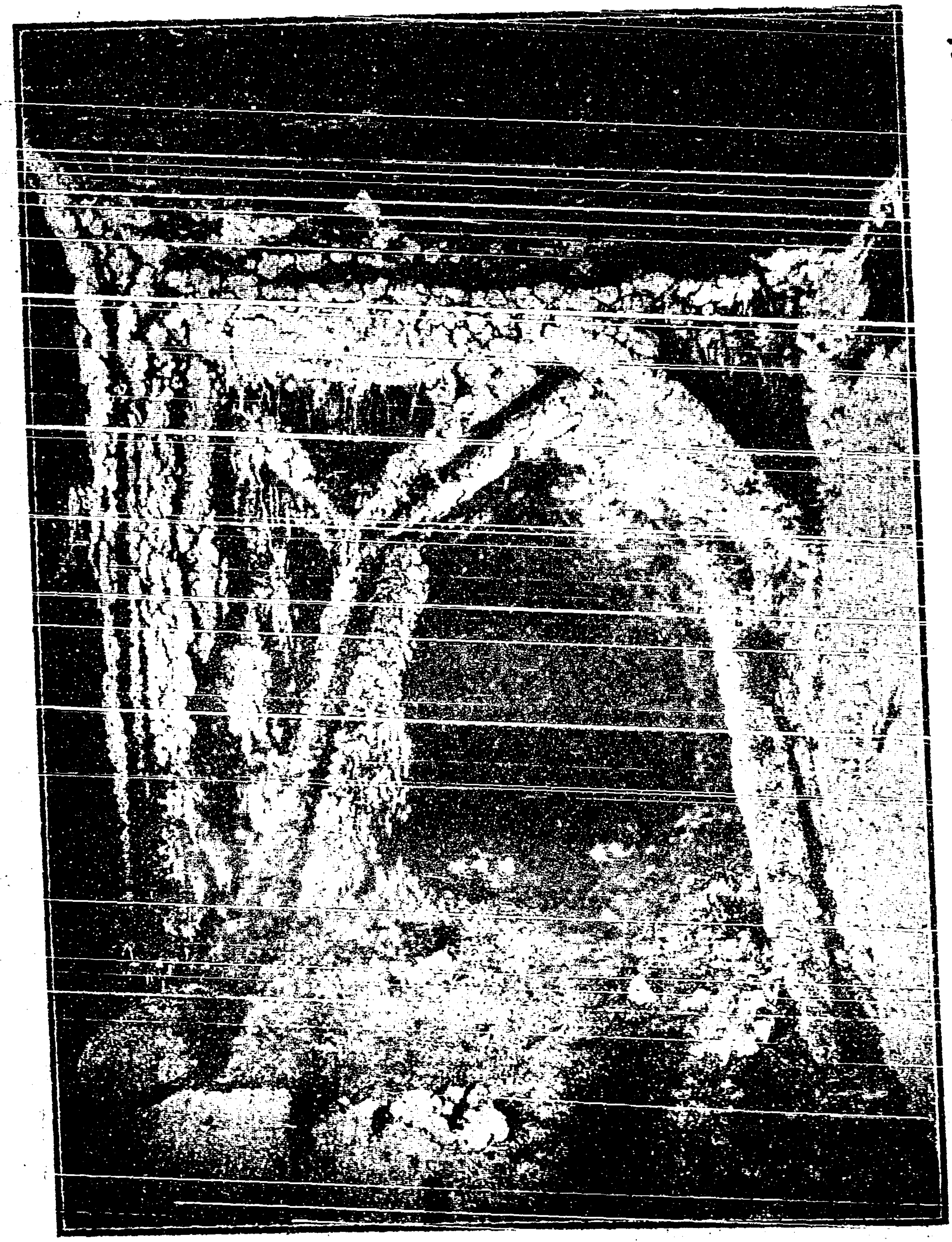

খনির মধ্যে খানিকটা জায়গায় বড় সুড়ঙ্গ কাটিয়া পথঘাট করা হইয়াছে তাহার মাঝে

মাঝে এক একটা বড় ঘরের মত। খনিটা ঠিক যেন একটা সাত তালা পুরী তার নীচের চার তালায় কুলিরা কাজ করে উপরের তিন তালায় লবণ প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে—সেখানে এখন লোকে তামাসা দেখিতে আসে।

খনির মুখে ঢুকিলেই লবণের সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি বাহিয়া লোকে নীচে নামে—কিম্বা যদি ইচ্ছা হয় নীচে নামিবার যে কল আছে সেখানে পয়সা দিলেই কলে চড়িয়া নীচে নামা যায়।

প্রথমতলায় অর্থাৎ উপরের তালায়, একটা প্রকাণ্ড সভাঘর। চারিদিকে লবণের দেয়াল, লবণের থাম, লবণের কারিকুরি, তার মধ্যে লবণের ঝাড় লণ্ঠন। এই ঘর দেড়শত বৎসর আগে তৈয়ারী হইযাছিল। কত বড় বড় লোকে, রাজা রাজড়া পর্য্যন্ত, এই সভায় বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া গিয়াছেন। সভার এক মাথায় একটা সিংহাসন। একখানা আস্ত লবণের টুকরা হইতে এই সিংহাসন কাটা হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে যখন আলো জ্বালান হয়, তখন সমস্ত ঘরটি স্ফটিকের মত জ্বলিতে থাকে। লাল নীল সাদা কত রকম রঙের খেলায় চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। লবণ জিনিষটা যে কতদূর সুন্দর হইতে পারে শুধু খানিকটা নুণের গুঁড়া বা কর্কচের টুক্‌রা দেখিয়া তাহার ধারণাই করা যায় না।

সভাঘরের খুব কাছেই সেণ্ট্ আণ্টনির মন্দির। মন্দিরের মধ্যে আলো বেশী নাই, লবণের থাম গুলি আধা-আলো আধা-ছায়ায় আর স্ফটিকের মত ঝক্‌ঝক্ করে না; এক এক জায়গায় সাদা মার্ব্বেল পাথরের মত দেখায়। মন্দিরের ভিতরটায় জাঁক জমক বেশী নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ—সভাঘরের হৈ চৈ গোলমাল এখানে একেবারেই পৌঁছায় না

এখান হ'তে দ্বিতীয় তালায় নামিবার জন্য আবার সিঁড়ি—সিঁড়িটা একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে নামিয়াছে। ঘরের ছাদটা একটা গম্বুজের মত। চারিদিকে বড় বড় কাঠের

ঠেকা দেওয়া হইয়াছে তা না হইলে ছাদ ভাঙিয়া পড়িতে পারে। ঘরটা এত উঁচু যে তাহার মধ্যে আমাদের গড়ের মাঠের মনুমেণ্টটিকে অনায়াসে খাড়া করিয়া বসান যায়। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লবণের ঝাড় লণ্ঠন তাহার মধ্যে তিন শত মোমবাতি জ্বালান হয়—কিন্তু তাহাতেও এত বড় ঘরের অন্ধকার দূর হয় না।

দেড় শত বৎসর আগে এই ঘরেই খনির আড্ডা ছিল। লবণ খুঁড়িতে খুঁড়িতে খনিতে বড় বড় ফাঁক হইয়া যায়। এই ঘরটিও সেই রকম একটি ফাঁক মাত্র। লোকে উপর হইতে লবণ তুলিতে আরম্ভ করে—ক্রমে যতই লবণ ফুরাইয়া আসিতে থাকে তাহারা একতালা দোতালা করিয়া ততই নীচে নামিতে থাকে।

তৃতীয় তালায় নামিয়া কত গুলি ছোট খাট ঘর ও নানা লোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিয়া লবণের পোল পার হইতে হয়। তার পরেই হোটেল রেলওয়ে ষ্টেশন ইত্যাদি। সেগুলিও দেখিবার মত জিনিষ।

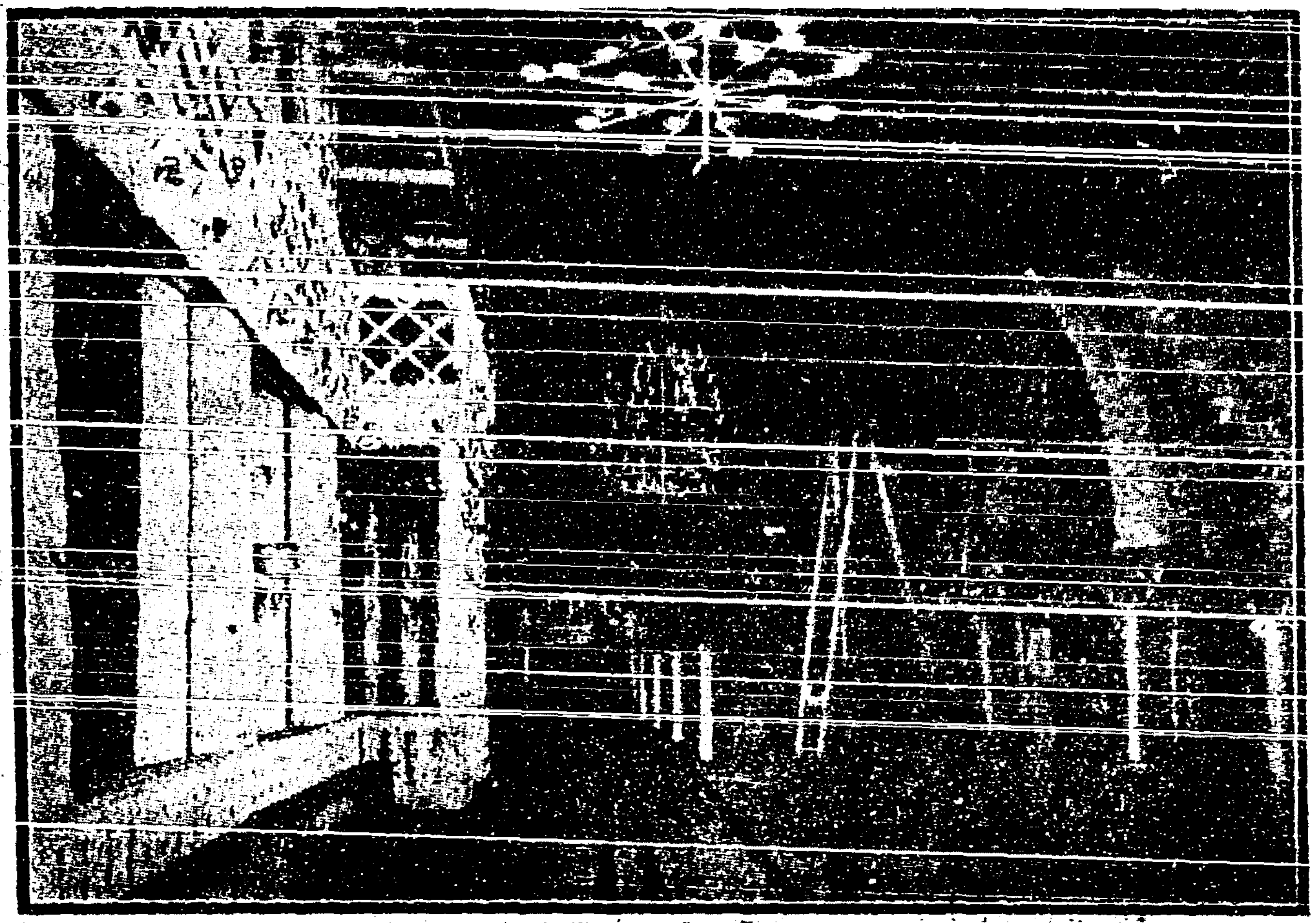

মাটির সাত শত ফিট নীচে একটা লোণা হ্রদ আছে, এমন লোণা জল বোধ হয় আর কোথাও নাই। অন্ধকার গুহা, তার মধ্যে ঠাণ্ডা কালো জল—কোথাও একটু কিছু শব্দ হইলে চারি দিকে গম্‌গম্ করিয়া প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। সেই জলের উপর লোকে যখন নৌকা চালায় তখন জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ চারি দিক হইতে অন্ধকারে ফিস্ ফিস্ করিতে থাকে—যেন পাতালপুরীর হাজার ভূতে কাণে কাণে কথা বলে।

সুরেশের জুতা।

পূজার সময় ছেলেদের সকলের জন্যই সুন্দর সুন্দর জুতা এসেছে। নরেশের জুতা এসেছে বাদামী রঙ্গের, সুরেশের জুতা এসেছে কালো।

সুরেশ বল্ল, "নরেশ দাদা, তোমার জুতা কি করে শাদা হল ?"

নরেশ তামাসা করে বল্ল, "তাও জান না ? আমার জুতা দুধে সিদ্ধ করে দিয়েছিলাম, তাতেই শাদা হয়ে গেছে !"

একথা শুনে সুরেশ কি যেন ভাব্‌ল, কিন্তু কিছু বল্ল না। তার পরদিন বামন ঠাকুর দুধের কড়া থেকে দুধ ঢাল্‌তে গিয়েছে, এমন সময় ঝপাস্‌ ঝপাস্‌ করে দুখানি ছোট ছোট কালো জুতা দুধের সঙ্গে বাটিতে পড়্‌ল !

তা দেখে সকলেই ত ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেছে, দুধের ভিতর কি করে জুতা এল, কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারুছে না। সুরেশ তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বল্ল, "দেখি, দেখি, আমার জুতা শাদা হয়েছে কি না ?"

বনের খবর।

গ্রাম থেকে দেড় দিন দু দিনের পথ দূরে ঘোর জঙ্গলে দু জন সার্ভেয়ার কাজ করছে; তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ৯।১০ জন করে লোক। কুলী বেচারীরা বনে থাকে, নূণ লঙ্কা আর ভাত ছাড়া অন্য খাবার তাদের প্রায়ই যোটে না, তাও আবার দু দিনের পথ থেকে ১৫ দিনের মতন এনে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে নূণ অধিক ফুরিয়ে যায় তখন শুধু ভাত খায়।

আজ বড় ভারী শীকার জুটেছে। কাজ শেষ করে সার্ভেয়ার তাঁবুতে ফিরে আসছে, আর চোখের সামনেই শীকার,—প্রকাণ্ড হরিণ, তাকে মারতেও হবে না, এর আগেই বাঘে তাকে মেরে নিয়ে খেতে বসেছে। মেরেছে যে অনেক আগে, তাও বোধ হচ্ছে না,—জোর ঘণ্টা দেড়েক হবে।

সকলে মিলে প্রাণপণে চ্যাচামেচি করে ত বাঘটাকে তাড়ান হল, তারপর তারা আনন্দে নাচতে নাচতে হরিণটাকে নিয়ে চল্ল। বাঘ তার অতি অল্পই খেয়েছিল, সে দিকের খানিকটা তারা কেটে ফেলে দিল। কিন্তু এত বড় হরিণ কি সহজে বয়ে নেওয়া যায় ? তার উপর আবার অনেকখানি পাহাড় উঠতে হবে, এদিকে সারাদিন খেটে সকলে কাহীল হয়ে পড়েছে।

তখন তারা বুদ্ধি করে, উপস্থিত কাজ চালাবার মতন শুধু একটা ঠ্যাং কেটে নিয়ে, বাকি হরিণটা একটা গাছের উপর, দুটো ডালের মাঝখানে, মাটি থেকে ১০।১২ হাত উঁচুতে টাঙ্গিয়ে রেখে গেল।

সে রাত্রে আহারটি হয়েছিল বেশ ভাল রকমই। পরদিন সকালেও সে মাংসে কাজ চলেছিল। তার পরদিন কাজে যাবার সময় সার্ভেয়ার বল্ল, "দু দিনের চাল ডাল বেঁধে নিয়ে চল, কাজ করতে করতে অনেক দূর যেতে হবে, ফিরবার সুবিধা হবে না।" খালাসিদের খুবই স্ফুর্ত্তি, তারা শুধু চাল আর নুণ লঙ্কা সঙ্গে নিয়েছে—মাংস ত রাস্তায়ই টাঙ্গান রয়েছে, তাই দিয়ে বেশ জমাট রকমের ভোজন হবে।

জিনিস পত্র বয়ে নিয়েই হাসতে হাসতে সেই গাছ তলায় এল, কিন্তু হায় হায়! একি সর্ব্বনাশ; —মাংস যে নাই,—একটুও নাই! আছে খালি গাছের গায় বাঘের নখের আঁচড়। বাঘের মত জন্তু, সে নিজের ধরা শীকারটা এত সহজে ছেড়ে দিবে, তাও কি হয়ে থাকে? সে চুপি চুপি তাদের সঙ্গে এসে সবই দেখে গিয়েছিল; তারপর সুবিধা বুঝে লাফিয়ে লাফিয়ে থাবা মেরে গাছ থেকে হরিণটিকে নামিয়ে নিয়েছে। মাটিতে যে রক্ত পড়েছিল, তা অবধি চেটে চেটে খেয়ে যেতে ভোলনি।

আহা! বেচারাদের যে কষ্ট, সেই কষ্ট; আবার নূন লঙ্কা দিয়েই ভাত খেতে হল।

নূতন ধাঁধা।

শ্বেত পাথরের তৈরি যেন ধব্‌ধবে সে পুরী,
সাদা বরণ সাদা গড়ন নেইক কারিকুরি।
দরজা নাই জানালা নাই কোথাও নাই খোলা,
বদ্ধঘরে পুকুর পরে ভাসে সোনার গোলা।
অবাক্ দেখি দুদিন বাদে প্রাসাদখানি টুটে,
বন্দী গোলা শব্দ ক'রে, বাইরে পালায় ছুটে।

শ্রাবণের ধাঁধার উত্তরে একটি ভুল ছিল।
'ঘী আক আর আতা'র জায়গায়
'ঘী আক আম আর আতা' হইবে।

[illegible]

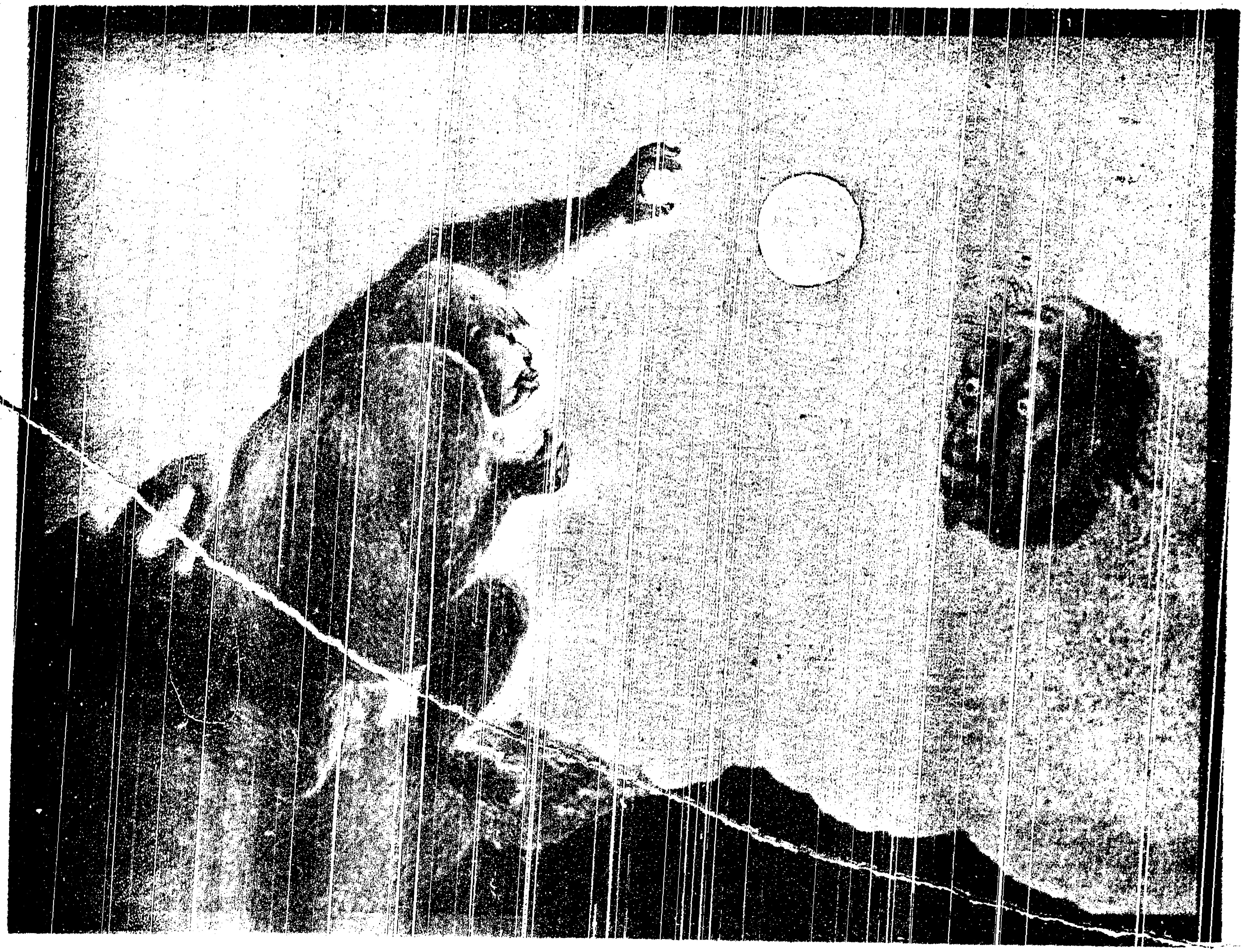

হনূমান সূর্য্যকে ধরিতে যাইতেছে।

U. RAY & SONS,
100, Gurpar Road, Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ কার্ত্তিক, ১৩২১ সপ্তম সংখ্যা

রাঙা চুড়ি।

জনক আসিল বাড়ী, এনে দিল রাঙা চুড়ি
পূজাদিনে মেয়েটিরে তার,
পরি'তাই চুড়ি হাতে সে আজ পুলকে মাতে
দেখায়ে বেড়ায় দ্বার দ্বার।
সানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ পানে,
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায়,
আঘাতে কাঁচের চুড়ি একেবারে হল গুঁড়ি,
চেয়ে দেখে একি হায় হায়।
উঠিবেনা ধূলা ছাড়ি, ফিরিবেনা আর বাড়ী,
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি' দিয়া ;
ভাঙা চুড়ি বার বার জোড়া দেয় কাঁদে আর,
চুল ছিঁড়ে লুটিয়া লুটিয়া।
পিতা আসি তুলে বুকে, চুমা দিয়া বলে মুখে
'এতে আর কিসের কাঁদন ?'
ভয়ে খুকী মুদে আঁখি, মা তাহার বলিবে কি ?
নষ্ট হ'ল বহুমূল্য ধন।

পিতা কহে 'মা আমার কেন মিছে কাঁদ আর
এনে দিব ভারি এর দাম!'
থামিবে না কোনরূপে তবু খুকী ফুঁপে ফুঁপে
কাঁদিয়া চলিবে অবিরাম।
কে বুঝিবে তার ব্যথা? কহে সবে বাজে কথা,
মূল্য শুধু ভাবে পয়সায়;
আকুল বাঞ্ছার যাহা যত ক্ষুদ্র হোক তাহা,
মিলিবে কি হাজার টাকায়?
সমগ্র বালিকা প্রাণ চুড়ি সনে খান খান!
দাম দিবে কেবা বল তার?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে গো সকলি আঁধার!

শ্রীকালিদাস রায়।

হনূমানের বাল্যকাল।

হনূমানের মায়ের নাম ছিল অঞ্জনা। বানরের স্বভাব যেমন হইয়া থাকে, অঞ্জনার স্বভাবও ছিল অবশ্য তেমনিই। হনূমান্ কচি খোকা, তাহাকে ফেলিয়া অঞ্জনা বনের ভিতরে গেল, ফল খাইতে। বনে গিয়া সে মনের সুখে গাছে গাছে ফল খাইয়া বেড়াইতে লাগিল, এদিকে খোকা বেচারা যে ক্ষুধায় চ্যাঁচাইতেছে, সেকথা তাহার মনেই হইল না।

হনূমান বেচারা তখন আর কি করে? চ্যাঁচাইয়া সারা হইল, তবু মার দেখা নাই, কাজেই তাহার নিজেকেই কিছু খাবারের চেষ্টা দেখিতে হইল। সেটা ছিল ভোরের বেলা; টুকটুকে লাল সূর্য্যটি তখন সবে বনের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে। সেই টুকটুকে সূর্য্য দেখিয়াই হনূমান্ ভাবিল ওটা একটা ফল। অমনি আর কথাবার্ত্তা নাই, সে এক লাফে আকাশে উঠিয়া, ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দে সেই ফল পাড়িয়া খাইতে ছুটিল।

তোমরা আশ্চর্য্য হইও না। হনূমান তখন কচি খোকা বটে, কিন্তু সে যে যেসে খোকা ছিল না সে কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সেই শিশুকালেই তাহার বিশাল দেহ ছিল, আর গায়ের রংটি ছিল সেই ভোরবেলার সূর্য্যের মতই ঝক্‌ঝকে লাল।

দেব দানব যক্ষ সকলেই তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অবাক না হইবেই বা কেন? সেই খোকাই এমন ভয়ঙ্কর ছুটিয়া চলিয়াছে যে, তেমন গরুড়েও পারে না, ঝড়েও পারে না। সকলে বলিল, "শিশুকালেই এমন, বড় হইলে না জানি এ কেমন হইবে!"

এদিকে হনূমান গিয়া ত সূর্য্যের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আর এক ব্যাপার উপস্থিত। সে দিন ছিল গ্রহণের দিন, রাহু বেচারা অনেক দিনের উপবাসের পর সেই দিন সূর্য্যকে খানিক সময়ের জন্য গিলিয়া একটু শান্ত হইতে পাইবে। সে অনেক আশা করিয়া সূর্য্যকে গিলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে হনূমান্‌কে দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে অমনি 'বাবা গো!' বলিয়া যে প্রাণপণে ছুট,—ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ইন্দ্রের সভায় গিয়া উপস্থিত।

ইন্দ্রের কাছে গিয়া সে নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিল, "আপনারই হুকুমে আমি সূর্য্যটাকে গিলিয়া ক্ষুধা দূর করি; এখন আবার সেই সূর্য্য কাহাকে দিয়া ফেলিয়াছেন? আজ ত দেখিতেছি আর একটা রাহু তাহাকে গিলিতে আসিয়াছে!"

এ কথায় ইন্দ্র যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া তখনই ঐরাবতে চড়িয়া দেখিতে চলিলেন, ব্যাপারটা কি। রাহু তাহার আগেই ছুটিয়া আবার সূর্য্যের নিকট গিয়াছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে টিকিতে পারে নাই। রাহুর কিনা দেহ নাই, শুধুই একটি গোল মাথা, কাজেই হনূমান্ তাহাকে দেখিবা মাত্র ফল মনে করিয়া ধরিতে আসিল। রাহু তখন 'ইন্দ্র!' 'ইন্দ্র!' বলিয়া চ্যাঁচাইয়া অস্থির। ইন্দ্র বলিলেন, "ভয় নাই! আমি এটাকে এখনই মারিয়া ফেলিতেছি।"

তখন হনূমান্ তাড়াতাড়ি ইন্দ্রের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই, ঐরাবতের প্রকাণ্ড শাদা মাথাটা তাহার চোখে পড়িল। সে ভাবিল, এটাও বুঝি একটা ফল। এই ভাবিয়া যেই হনূমান্ সেটাকে ধরিতে গিয়াছে, অমনি ইন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার উপরে বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন।

সেই বজ্রের ঘায় একটা পাহাড়ের উপর পড়িয়া 'হনূ' অর্থাৎ দাড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই তাহার 'হনূমান্' এই নামটি হইয়াছিল। পাহাড়ের উপরে পড়িয়া সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, এমন সময় তাহার পিতা পবন আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া একটা পর্ব্বতের গুহায় লইয়া গেলেন। তার পর তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, ইহার শোধ ভাল মতেই লইব।"

পবন, অর্থাৎ বায়ু, হইতেছেন সংসারের প্রাণ; সেই বায়ু রাগিয়া বসিলে কি বিপদই না ঘটিতে পারে। সেই রাগের চোটে বাহিরের বায়ু কোথায় চলিয়া গেল; দেহের ভিতরের বায়ু উৎকট হইয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া জীব জন্তুর প্রাণ বায় যায়। বায়ুর উৎপাতে সকলের মাথা খারাপ হইয়া গেল, তাহারা এক করিতে আর করিয়া বসে। দেবতাদের অবধি পেট ফাঁপিয়া ফানুষের মত হইয়া গেল, ঠিক যেন উদরীর বেয়ারাম।

সেই অবস্থায় সকল দেবতা কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, "প্রভু! আমাদের দশা দেখুন। ইহার উপায় কি হইবে?" ব্রহ্মা বলিলেন, "উপায় আর কি? চল বায়ুর নিকট গিয়া তাঁহাকে খুসী করি। ইহা ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই।"

পবন অচেতন হনূমানকে কোলে করিয়া গুহায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মাকে লইয়া দেবতাগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মা আসিয়া হনূমানের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেই সে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল, যেন তাহার কখনও কোন অসুখ হয় নাই। ইহাতে পবন কত দূর খুসী হইলেন, বুঝিতেই পার। পবনের রাগ চলিয়া যাওয়াতে কাজেই সংসারের সকল জীবের বিপদও কাটিয়া গেল।

তখন ব্রহ্মা দেবতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এই খোকা বড় হইলে তোমাদের অনেক কাজ করিয়া দিবে। সুতরাং তোমরা সকলে ইহাকে বর দিয়া খুসী কর।" এ কথায় দেবতারা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া হনূমানকে বর দিতে লাগিলেন। সেই সকল বরের জোরে হনূমান্ চিরজীবী হইয়া গেল। কোন দেবতা বা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা মানুষের কোন অস্ত্রে তাহার মরণের ভয় রহিল না। কেহ শাপ দিয়া তাহার প্রাণনাশ করার পথ অবধি বন্ধ হইল। তাহা ছাড়া ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে, আর যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি রূপ ধরিতে পারিবে।" সূর্য্য বলিলেন, "আমার তেজের শত ভাগের এক ভাগ তোমাকে দিলাম। আর একটু বয়স হইলে আমি তোমাকে লেখা পড়া শিখাইব; তাহা হইলে তুমি খুব বলিতে কহিতে পারিবে।"

বর পাইয়া হনূমান্ বড় লোক হইয়া গেল। তবে অবশ্য, ইহার সকল ফল ফলিতে সময় লাগিয়াছিল। শিশুকালে তাহার স্বভাব অন্যান্য বানর ছানার চেয়ে বেশী উঁচুদরের ছিল না। মুনিদের আশ্রমে গিয়া সে দৌরাত্ম্যটা যে করিত, সে আর বলিবার নয়। তাহার পিতা মাতা কত নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে কি নিষেধ শুনিবার

পাত্র? তাহার উৎপাতে মুনিদের কোশা কুশী, ঘটি বাটী, কাপড় চোপড় কিছুই আগলাইয়া রাখিবার যো ছিল না। এ দিকে আবার তাহাকে শাপ দিয়াও ফল নাই, কারণ, ব্রহ্মার বরে শাপে মরিবার ভয় তাহার কাটিয়া গিয়াছে,—আর তাহাকে দেখিয়া তাঁহাদের কতকটা মায়াও হইত। কাজেই তাঁহারা নিরুপায় হইয়া তাহার অত্যাচার সহ্য করিতেন, আর ভাবিতেন, উহাকে বেশী ক্লেশ না দিয়া কি উপায়ে একটু জব্দ করা যায়। শেষে অনেক বুদ্ধি করিয়া তাঁহারা তাহাকে এই শাপ দিলেন যে, "যা বেটা, তোর যত ক্ষমতা, তাহার কথা তুই একেবারে ভুলিয়া যা। বড় হইলে কেহ সেই ক্ষমতার কথা তোকে মনে করাইয়া দিবে, তখন তুই অনেক অদ্ভুত কাজ করিবি।"

তখন হইতে হনূমান্ সামান্য বানর ছানার ন্যায় নিতান্ত ভয়ে ভয়ে চলে, আর দূর হইতে কাহাকেও দেখিলেই প্রাণপণে ছুটিয়া পলায়। কাজেই মুনিদেরও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হয় না। যাহাহউক, সে এর মধ্যে সূর্য্যের নিকটে ঢের লেখাপড়া শিখিয়া ফেলিল। মুনিদের বাড়ী গিয়া সে যাহাই করুক, লেখাপড়ায় যে সে খুব লক্ষ্মী ছেলে ছিল, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কি পরিশ্রম করিয়াই না সে লেখাপড়া শিখিয়াছিল! সূর্য্য ত আর এক জায়গায় বসিয়া থাকেন না, যে, পুথি লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিলেই কাজ হইবে। হনূমানকে উদয় হইতে অস্ত পর্ব্বত পর্য্যন্ত রোজ তাঁহার পিছু পিছু ছুটাছুটি করিয়া পড়া বুঝিয়া লইতে হইত। তাহার ফলে সে বিদ্বানও হইয়াছিল বড়ই ভারী রকমের। এমন পণ্ডিত অতি অল্পই জন্মাইয়াছে।

সেকালের ভূগোল।

আংটির ভিতরে আংটি, তাহার ভিতর আবার যেন আংটি,—আমাদের 'পুরাণে' লেখা আছে যে, ঠিক এমনি ভাবে সাতটি দ্বীপ আর সাতটি সাগর আমাদের এই পৃথিবীতে সাজান রহিয়াছে।

সকলের মাঝখানে 'জম্বুদ্বীপ', সে অবশ্য আংটির মত নয়, সে কতকটা পদ্ম ফুলের মত। জম্বুদ্বীপের চারিদিকে 'লবণ'—অর্থাৎ লোণাজলের সমুদ্র,—দুর্গের চারিদিকে যেমন খাল। এই লোণা সমুদ্রের চারিদিকে 'প্লক্ষদ্বীপ', তাহার চারিদিকে 'ইক্ষু' অর্থাৎ আঁখের রসের সমুদ্র; তাহার চারিদিকে 'শাল্মলীদ্বীপ', তাহার চারিদিকে 'সুরা' অর্থাৎ

মদের সমুদ্র ; তাহার চারিদিকে 'কুশদ্বীপ', তাহার চারিদিকে 'সর্পি' অর্থাৎ ঘৃতের সমুদ্র ; তাহার চারিদিকে 'ক্রৌঞ্চদ্বীপ', তাহার চারিদিকে দধির সমুদ্র ও তাহার চারিদিকে 'শাকদ্বীপ', তাহার চারিদিকে দুগ্ধের সমুদ্র ; তাহার চারিদিকে 'পুষ্করদ্বীপ', তাহার চারিদিকে 'জল' অর্থাৎ ভাল জলের (লোণা নয়) সমুদ্র।

কোন কোন পুরাণের মতে এই 'জল সমুদ্রের' পরপারে আবার একটি সোনার দেশ, আর সেই সোনার দেশ (কাজেই সকল জল স্থল) ঘিরিয়া এক বিশাল পর্ব্বত আছে। সে পর্ব্বতের খানিকটায় আলো, খানিকটায় অন্ধকার, তাই উহার নাম লোকালোক পর্ব্বত।

দুধের সাগর, দইয়ের সাগর, ক্ষীরের সাগর ; শুনিলেই জিভে জল আসে। পুষ্কর দ্বীপে নাকি আবার খাবার জিনিস খুঁজিবারও দরকার হয় না ; ক্ষুধার সময় তাহা আপনি আসিয়া মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু এ সকল সুখের স্থানের কথা বলিয়া আর কি হইবে ? আজকাল লবণসমুদ্র ছাড়া আর কোন সাগর খুঁজিয়া পাওয়ার উপায় নাই, আর তাহার পরপারে শুধু বরফের দেশ ছাড়া আর কোন দেশও নাই। এই লবণসমুদ্রে যে দেশ ঘেরা, তাহাই জম্বুদ্বীপ, উহার কথাই আমাদের জানিবার বিষয়।

জম্বুদ্বীপের যিনি রাজা, তাঁহারই ছয়টি ভাই অপর ছয়টি দ্বীপের রাজা ছিলেন। ইঁহারা সকলে প্রিয়ব্রতের পুত্র। প্রিয়ব্রতের ভাই উত্তানপাদের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে ; তিনিই ছিলেন ধ্রুবের পিতা। প্রিয়ব্রতের পিতার নাম মনু, তাঁহার পিতা ব্রহ্মা।

প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আগ্নীধ্র, তিনিই ছিলের জম্বুদ্বীপের রাজা। আগ্নীধ্রের পরে সেই জম্বুদ্বীপ তাঁহার নয় পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় ; সেই নয় ভাগের এক একটির নাম এক একটি 'বর্ষ'। এই নয় জনের নাম, নাভি, কিম্‌পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্বান্, কুরু, ভদ্রাশ্ব আর কেতুমাল। নাভির নাতি ভরত অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তাঁহারই নামে আমাদের এই দেশের নাম হইয়াছে 'ভারতবর্ষ', কি না, ভরতের বর্ষ।

বর্ষগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ সকলের দক্ষিণে, তাহার উত্তরে কিম্‌পুরুষবর্ষ, তাহার উত্তরে হরিবর্ষ, তাহার উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ, তাহার উত্তরে রম্যকবর্ষ, তাহার উত্তরে হিরণ্বান্‌বর্ষ, তাহার উত্তরে কুরুবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ। কিম্‌পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্বান্‌বর্ষ, এই চারিটির ঠিকানা সকল

পুরাণে এক রকম দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, এটুকু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ যে ভারতবর্ষ ছাড়া অপর আটটি বর্ষের নাম আগ্নীধ্রের আটটি পুত্রের নামেই হইয়াছে।

জম্বুদ্বীপের মাঝখানে ইলাবৃতবর্ষ, তাহার মাঝখানে 'মেরু' নামক সোনার পর্ব্বত; সেই পর্ব্বতের উপরে, আর তাহার আশে পাশে দেবতারা বাস করেন।

মেরুর পূর্ব্বদিকে মন্দর পর্ব্বত, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল, আর উত্তরে সুপার্শ্ব। এই সকল পর্ব্বতের উপরে এগার শত যোজন উঁচু এক একটি গাছ আছে। মন্দরের উপরের গাছটি কদম্ব, গন্ধমাদনেরটি জম্বু অর্থাৎ জাম, বিপুলে পিপ্পল, সুপার্শ্বে বট।

গন্ধমাদন পর্ব্বতের ঐ যে 'জম্বু' গাছটি, উহারই নামে 'জম্বুদ্বীপের' নাম হইয়াছে। গাছটি যে কত উঁচু, একথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ; ইহার ফলগুলিও তাহার উপযুক্ত, তাহাতে ভুল নাই। এক একটি ফল প্রকাণ্ড এক একটি হাতীর মত বড়, মাখনের মত নরম, আর অমৃতের মত মিষ্ট রসে টস্ টস্ করে। সে সকল ফল গাছ হইতে পড়িবা মাত্র ফাটিয়া যায়, আর তাহা হইতে এত রস বাহির হয় যে, তাহাতেই একটি প্রকাণ্ড নদীর জন্ম হইয়াছে। সেই নদীর নাম "জাম্বুনদী"। উহার দুধারের লোকেরা মনের আনন্দে উহা হইতে সেই সুমিষ্ট সোনালী রঙ্গের জামের রস তুলিয়া পান করে। তাহাতে তাহাদের জিহ্বার আরাম ত হয়ই, শরীরের সকল অসুখও সারিয়া যায়। সেই আশ্চর্য্য জামের রসে ভিজিয়া নদীর দু ধারের মাটি সোনা হইয়া যায়। তেমন চমৎকার সোনা আর কোথাও জন্মায় না। এই সোনার নাম 'জাম্বুনদ'। দেবতারা যে সব অলঙ্কার পরেন, তাহা এই সোনার তৈরী। অন্য যে তিনটি প্রকাণ্ড গাছের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের ফল এত বড় না হইলেও, নিতান্ত ছোট নয়। সেও এক একটা কলসীর মত বড়।

সে সব দেশের মানুষ কত বড়, তাহা আমি জানি না, তবে তাহারা কি খায়, কত দিন বাঁচে, আর দেখিতে কেমন, তাহার কিছু কিছু খবর পাইয়াছি। কেতুমাল বর্ষের পুরুষেরা দেখিতে কালো; সে দেশের মেয়েদের রঙ্ পদ্মপত্রের ন্যায়। তাহারা কাঁঠাল খায়, আর দশ হাজার বৎসর বাঁচে। ভদ্রাশ্ববর্ষের পুরুষদের রঙ্ শাদা, আর মেয়েদের রঙ্ চাঁদের মত। তাহারাও দশ হাজার বৎসর বাঁচে; খায় আম। রম্যকবর্ষের লোকের রঙ্ রূপার মত; তাহারা বটের ফল খাইয়া সাড়ে এগার হাজার বৎসর বাঁচে। হিরণ্ময়-বর্ষে সোনালী রঙের মানুষ থাকে। তাহারা খায় বেল আর বাঁচে সাড়েবারো হাজার

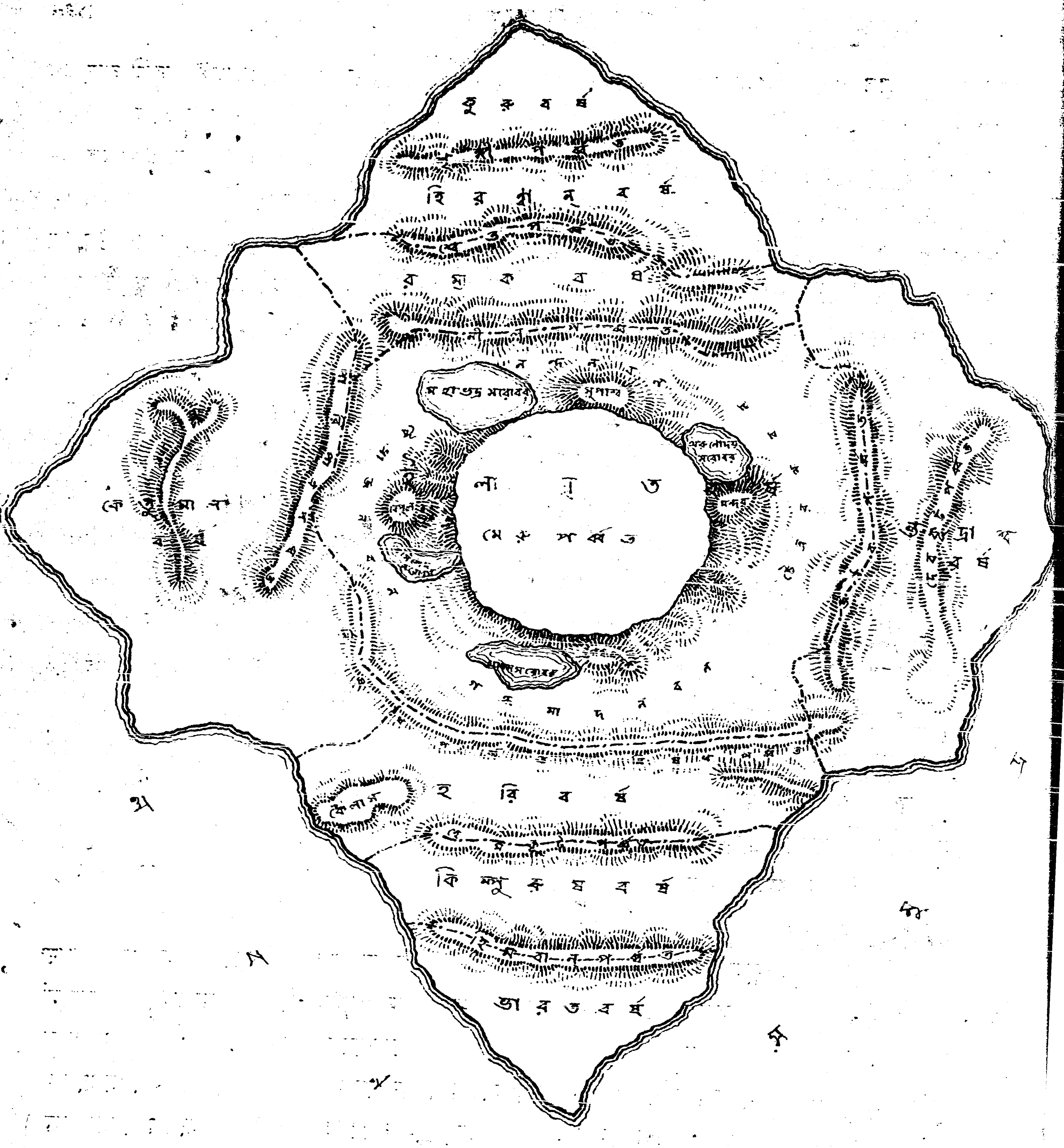
কুরুবর্ষ
হিরণ্ময় বর্ষ
রম্যক বর্ষ
মহাভদ্র সরোবর
সুপার্শ্ব
ইলাবৃত
মেরু পর্বত
হরিবর্ষ
কৈলাস
কিম্পুরুষ বর্ষ
ভারতবর্ষ

জম্বুদ্বীপ।

বৎসর। কুরুবর্ষের লোক শ্যামবর্ণ। উহাদের আহার দুধ, আয়ু সাড়ে চৌদ্দ হাজার বৎসর। কিম্‌পুরুষবর্ষের লোক সোনালী রঙের। তাহারা বটের ফল খায়, আর দশ হাজার বৎসর বাঁচে। হরিবর্ষের লোকেরও ঐরূপ আয়ু। তাহারা দেখিতে রূপার মত, খায় আঁখের রস। ইলাবৃত্তবর্ষের লোক পদ্মবর্ণ। উহারা সেই 'জম্বু' ফলের রস খায়, আর তের হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকে। আর ভারতবর্ষের কথা ত তোমরা সকলেই জান। নানা রঙের মানুষ, নানান্ রকমের আহার। আয়ু হওয়া উচিত এক শত বৎসর, কিন্তু মরে প্রায়ই তাহার ঢের আগে।

আরো ঢের নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, বন উপবনের কথা পুরাণে আছে, কিন্তু তাহার কথা বলিবার জায়গা নাই। তবে, একটা কথা না বলিলে অন্যায় হইবে। পুরাণে পৃথিবীর যেমন বর্ণনা আছে, আমাদের দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রে কিন্তু তাহা নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী গোল, তাহা শূন্যে রহিয়াছে, আর তাহার আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া জীব জন্তু সকল তাহাতে বাস করে।

শিউলী ফুল।

তোমরা শিউলী ফুল ফুটতে দেখেছ? সাঁঝের বেলায় যখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে সেই সময় শিউলীর ফুলটি ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায়। অমনি তার মিষ্ট গন্ধ হাওয়ায় ছড়িয়ে যেতে থাকে; তখন সে পথে কেউ এলে, একটি বার 'আহা!' না বলে আর যেতে পারে না।

যতক্ষণ মানুষের চলা ফেরা থাকে, ততক্ষণ গাছের কোলটি আলো করে শিউলী ফুলেরা হাসে। ভোর রাত্রে তারা গাছের কোলে থেকে ঝরে পড়ে, কিন্তু তাদের হাসিটি তখনও চলে যায় না। সকালে এসে তাদের দেখতে পেয়ে ছেলেদের কত আনন্দ হয়।

শিউলীর মালা, শিউলীর বালা, শিউলীর টিপ, তোমরা পরেছ কি? শিউলীর বাঁশী কেমন করে বাজাতে হয়, কে জান?

শিউলীর মালা না পরে থাকলেও, এক আধবার অনেকেই হয়ত গেঁথেছ। শাদা পাপড়িগুলো ফেলে দিলে, লাল বোঁটাগুলি থাকে। সেই

বোঁটার মালা দেখতে পলা কাঠির মালার মত দেখায়, তাতেই শিউলীর বালা তয়ের করতে হয়।

আর শিউলীর টিপ ? তার কথা বলবার আগে বাঁশীটার কথা বলে নিই। কিন্তু, তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, এ বাঁশী বাজান একটু শক্ত। বোঁটার গোড়ার দিকটা চেপে চ্যাপ্টা করে নেও। আগার দিকে, অর্থাৎ পাপড়ির কাছে, ছোট ছোট গুটলির মতন যে জিনিসগুলিতে বোঁটার মুখ বন্ধ করে রেখেছে, খড়কে দিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলো সাফ করে দাও। বাস্, এইত বাঁশী প্রস্তুত, এখন গোড়ায় ফু দিয়ে বাজালেই হল। যদি এক চোটেই ওকে বাজিয়ে ফেলতে না পার, তবে কিন্তু আমার দোষ দিও না। আমি আগেই বলেছি, এ কাজটি একটু শক্ত। আর কিছু নয়, ফু দিবার সময় একটু আলগোছে দিতে হয়, যাতে চোঙ্গাটি ঠোঁটের চাপে বন্ধ হয়ে না যায়। দু একবার চেষ্টা করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

এখন টিপের কথা। সে কিন্তু এখনো পরবার মত হয় নি। শিউলী ফুল তাকে বাসায় রেখে এসেছে। সেখানে সে বড় হচ্ছে; পরবার মত হতে তার এখনো কিছু কিছু দিন লাগবে। ফুলটি খুব ছোট্ট কুঁড়ি থাকতে একটা সবুজ খোসার ভিতরে ছিল; সেই তার বাসা। ক্রমে কুঁড়িটি বড় হয়ে একটু একটু করে সেই বাসার ভিতর থেকে উঁকি মেরেছিল। ফুটবার পরেও, গাছে থাকবার সমস সে সেই বাসাটিতেই বসে ছিল। তারপর যখন সে ঝরে পড়েছে, তখন ত সে বাসী হয়ে গিয়েছে,—অর্থাৎ যে কাজের জন্য তার এই পৃথিবীতে আসা, তা শেষ হয়েছে, এখন আর তাকে দিয়ে কোন দরকার নাই।

সে কি কাজ ? সে কাজ হচ্ছে, গাছের ফলটিতে প্রাণ দিয়ে দেওয়া। গাছ থেকে ঝরে পড়বার আগে ফুলটিতে ধরে টান দিলেই সে বাসা থেকে উঠে আসে। তখন দেখবে, বাসার ভিতরে গাছের ফলটি বসে রয়েছে; এখন সে দেখতে একটি গুট্লির মত, তার একটি শুঁড় আছে। এই ফলটিকে প্রাণ দিবার জিনিস পাবে ঐ ফুলটির নিকট। বাঁশী তয়ের করবার সময় খড়কে দিয়ে ফুলের ভিতর থেকে যে গুটলির মত জিনিসগুলি ফেলে দিয়েছিলে, তাতে এক রকম গুঁড়ো থাকে, সেই গুঁড়োর ভিতরে ফলের প্রাণ। শিশু ফুলটি তার শুঁড়খানি বাড়িয়ে দিয়ে ঐ গুটলিগুলির কাছ থেকে সেই গুঁড়ো চেয়ে নেয়। সে গুঁড়ো নইলে তার দেহে প্রাণ আসতে পারে না। অর্থাৎ ঐ গুঁড়ো না পেলে তার ফলই হওয়া হবে না, সে শুকিয়ে মরে যাবে। গুঁড়ো

পেলে সে ক্রমে বড় হয়ে ডাঁসা হবে; তখন তার ভিতর থেকে তার ধবধবে শাদা গোল চ্যাপ্টা বীচি দুটি বার করে নিয়ে ছেলেরা তা দিয়ে টিপ পরবে।

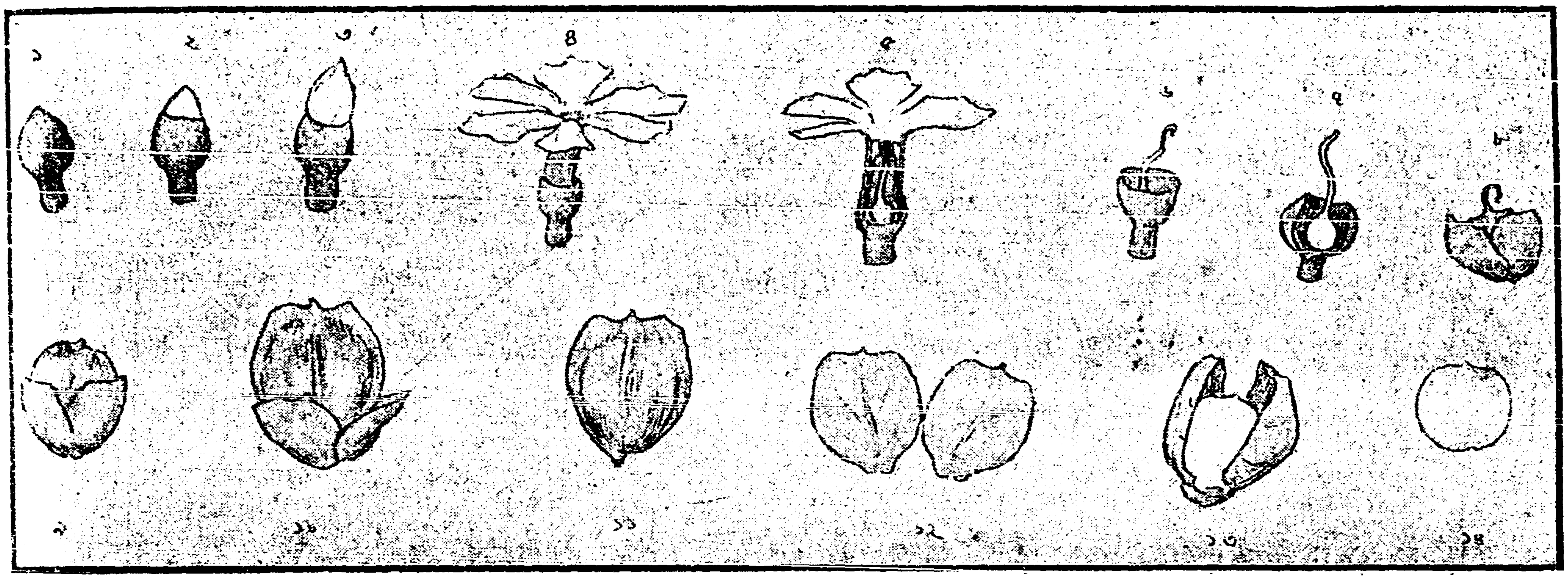

(১) খোসার ('বাসার') ভিতরে কুঁড়ি। (২, ৩) কুঁড়ি মুখ বাহির করিয়াছে। (৪) ফোটা ফুল বাসায় বসিয়া আছে। (৫) শিশু বীজ শুঁড় দিয়া গুট্‌লীর নিকট হইতে গুঁড়া লইতেছে। (৬, ৭) ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে; ফল বাসায় আছে। (৮, ৯, ১০) ফল বড় হইতেছে। (১১) ফল পাড়া হইয়াছে। (১২) ফলে দুই ভাগ। (১৩) এক এক ভাগের ভিতরে এক একটি বীচি। (১৪) শিউলীর টিপ।

সকল ফুলই কিছু আর দেখতে শিউলী ফুলের মত নয়। কিন্তু সকল ফলই জন্মাবধি ফুলের ভিতর থাকে, আর তাদেরও ঐ রকম গুঁড়োর দরকার হয়, নইলে তাদের কেউ বাঁচতে পারে না। অনেক গাছের দু রকম ফুল হয়; এক রকম ফুলের ভিতরে থাকে ফল, আর এক রকমের ভিতরে গুঁড়ো। মৌমাছি আর প্রজাপতিরা মধু খেতে এসে গায় লাগিয়ে, কিম্বা হাওয়ায় উড়িয়ে এক ফুলের গুঁড়ো আরেক ফুলের ভিতরে পৌঁছে দেয়, নইলে সে গাছে ফল হয় না। অনেক সময় আবার এই দু রকম ফুলের আলাধা গাছই থাকে। আবার এমন মজাও হয়েছে যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে লোকেরা শুধু এক রকমের গাছই নিয়ে গেছে, আরেক রকমের গাছ নেয় নি। সে সব গাছে এখন কেবল ফুলই হচ্ছে; তাদের ফল হয় না।

গোলা গুলির কথা।

আমাদের সমুদ্রে জর্ম্মানদের একটা যুদ্ধের জাহাজ এসে ভারী উৎপাত আরম্ভ করেছে। রান্না ঘর খালি পেলে যেমন কুকুর এসে ভাত খেয়ে যায়, এও হয়েছে যেন ঠিক তেমনি। কুকুর ভাবছে খুব মজা হল, কিন্তু বামুনঠাকুর তাকে একবার পেলে লাঠি দিয়ে মজা দেখিয়ে দিবে।

এই যুদ্ধের জাহাজগুলোর একেকটা ভয়ঙ্কর ছুটতে পারে। ভারী ভারী কামান তাদের সঙ্গে থাকে দশ বারো মাইল দূরের জিনিসকে গুলি মেরে উড়িয়ে দেওয়া এসব কামানের পক্ষে খুবই সহজ কাজ।

অনেক সময় এই সব গোলা কোথাও গিয়ে পড়বা মাত্রই ভয়ানক শব্দে ফেটে যায়। তখন তার ভিতর থেকে আগুন বেরিয়ে বিষম কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে। এই জন্য, যুদ্ধের সময় এলেই সকলের আগে জাহাজ খানিকে পরিস্কার করে নিতে হয়। পরিস্কার করার মানে হচ্ছে, যাতে আগুন ধরতে পারে, এমন সব জিনিস জাহাজ থেকে সরিয়ে ফেলা। ডাঙ্গার কাছে থাকলে সেগুলোকে জাহাজ থেকে ডাঙ্গায় পাঠিয়ে দিলেই চলে; কিন্তু সমুদ্রের মাঝখানে তা হবার যো নাই, তখন সে সব জলে ফেলে দিতে হয়।

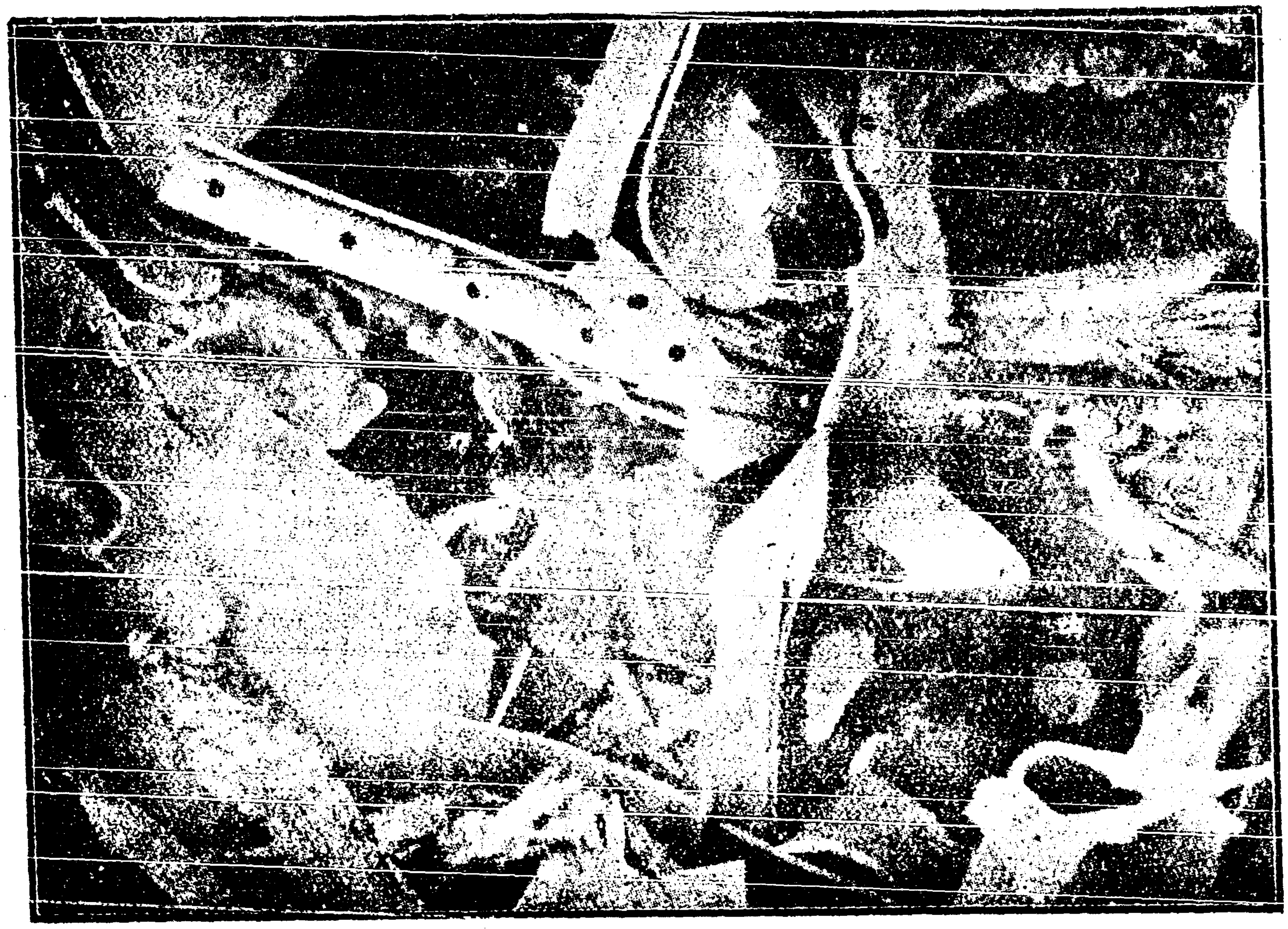

যুদ্ধজাহাজের দফা শেষ।
১২ ইঞ্চি পুরু লোহায় মস্ত গোলা লেগে তার কি দুর্দ্দশা হয়েছে দেখ।

চেয়ার, টেবিল, কার্পেট, পর্দ্দা, পিয়ানো, অর্গ্যান, কোন জিনিসেরই তখন মায়া করবার সময় থাকে না। বড় বড় একেকটা জাহাজে দশ পোনের হাজার টাকার জিনিস এমনি ফেলা যায়।

দশ মিনিটের ভিতরে এসব কাজ সেরে নিয়ে জাহাজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। জাহাজের সামনের দিকে খুব বড় বড় কামান থাকে; তার এক একটা গোলার ওজন ১৭।১৮ মণ। এক একবার কামান ছুড়তে গোলায় বারুদে নাকি ৩।৪ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। তার আওয়াজ এমনি ভয়ঙ্কর, যে, তাতে অনেক সময় কাণ ফেটে রক্ত বেরয়।

সেই ভয়ঙ্কর গোলা ছুটে গিয়ে না জানি কোথায় কি সর্ব্বনাশ করে। এ সব গোলার পাঁচটার মধ্যে একটার বেশী প্রায় বৃথা যায় না। তার উপর, তাকে যে কাজ করতে পাঠান হয়, অনেক সময় সে তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করে বসে।

একবার একটা ১২৷৷০ মণ ওজনের গোলা একটা চিমনির গায় ঠেকে ঘুরে গেল। তার পর ক্রমে তিন খানা বাড়ী চূরমার করে, আর একটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে, দেয়ালের ঘষায় আবার ঘুরে গিয়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

আর একটা গোলা শত্রুদের একটা কামানের মুখের ভিতরে ঢুকে গিয়ে, তার লোকজন শুদ্ধ তাকে চূরমার করে দিয়ে ছিল। সে জায়গাটা ছিল দোতলা; উপরের তলায়ও কামান, নীচের তলায়ও কামান। গোলাটা নীচের তলার কামানটাকে অমনিভাবে চূরমার করে তারপর ছাত ভেঙ্গে উপরের তলায় গিয়ে, উপস্থিত হল। সেখানেও লোকজন শুদ্ধ আর একটি কামান গুঁড়ো করে, শেষে সে ঘরের পানে ফিরে চল্ল!

এ সব কথা শুনতে বড়ই অদ্ভুত লাগে। আসল বিষয়টা হচ্ছে এই যে, যদিও আমরা বলি 'গোলা', কিন্তু সেটা আদপেই গোল জিনিস নয়, সেটা হচ্ছে বোতলের মত লম্বা। যদি সে সোজাসুজি একটা কিছুতে পড়তে পায়, তবে তার ভিতরে পরিস্কার ঢুকে যাবে। কিন্তু যদি কিছুমাত্র ট্যারচা হয়ে পড়ে, তবে অমনি সেখানে ঘূরপাক খেয়ে, সয়তানের নাচ নাচতে থাকবে। তখন যে সে কি করবে বা না করবে, তা কারুর বলবার সাধ্য নাই।

রাইফলের গুলির স্বভাবও ঠিক এই রকমের। একজন সৈন্যের কপালে এসে একটা গুলি পড়ল। এ অবস্থায় তখনই সেই লোকটির মাথা ফুটো হয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু বড় ভাগ্য যে, তার কপালে ঠেকবার আগে গুলিটা তার টুপীর শিকলের একটু ঘষা খেয়ে ঘুরে যায়। তার ফলে সেটা আর তার হাড় ফুটো করতে না পেরে,

শুধু চামড়ার নীচ দিয়ে লোকটির ঘাড়ের দিকে চলে এল। সেখানে এসে সেটা আবার খেল টুপীর একটা হুকের ধাক্কা। সেই ধাক্কায় আবার চামড়া ফুটো করে তাকে বেরিয়ে আসতে হল। মোটের উপরে লোকটির এতে বড্ড লেগে ছিল বটে, আর তখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়েও গিয়েছিল; কিন্তু পরদিনই দেখা গেল, সে মাথায় এই বড় এক পট্টি বেঁধে দিব্যি আর দশ জনের মত বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

আরেকটি সৈন্যের পেটে রাইফলের গুলি লাগায়, সে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "তোমার কি হয়েছে?" তখন সে বল্ল, "গুলিতে ফুটো হয়ে গেছি।" যা হোক, শেষে তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, গুলি তার পেটের দিক দিয়ে ঢুকেছে, আর পিঠের দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে, একথা সত্যি বটে, কিন্তু তথাপি সে ফুটো হয়ে যায়নি। গুলিটা এসে তার পেটে বোধ হয় ট্যারচাভাবে পড়েছিল, তাই ভিতরে ঢুকতে না পেরে চামড়া চষে পিঠের দিকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তার পর আবার শিরদাঁড়ার হাড়ে ঠেকে বেরিয়ে চলে গেছে।

দৈত্যের রাজা।

এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর মতন রাজা আর কেউ ছিল না। তাঁর মুলুকের এধার থেকে জোয়ান মানুষ রওয়ানা হলে, ওধারে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সে বুড়ো হয়ে যেত।

রাজা মশায়ের ভারী শীকারের সখ ছিল। একদিন তিনি ঢের লোক জন নিয়ে বনে শীকার করতে গিয়েছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি যারপর নাই সুন্দর মেয়ে গাছ তলায় বসে কাঁদছে। যেমন সুন্দর, তেমনি চমৎকার তার পোষাক; নিশ্চয় কোন রাজার মেয়ে হবে।

রাজা মশাই তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে সেই মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আহা! তোমার কিসের দুঃখ? তুমি কার মেয়ে? বনের ভিতরে কি করে এলে?" মেয়েটি বল্ল, "আমি রাজার মেয়ে। বাবার সঙ্গে মামার বাড়ী যাচ্ছিলাম; এই বনের ভিতরে তাঁকে আর সঙ্গের সব লোক জনকে রাক্ষসে খেয়ে গেছে!" বলে সে আরো বেশী করে কাঁদতে লাগল। রাজা কত জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোন্ দেশের রাজার মেয়ে? তোমার মামার বাড়ী কোথায়?" কোন কথারই সে উত্তর দিতে পারল না।

তখন রাজা আর কি করেন? ঘোড়ায় করে সেই মেয়েটিকে তিনি ঘরে নিয়ে এলেন। তখন থেকে মেয়েটি তাঁর বাড়ীতেই থাকে, আর তাঁর সঙ্গে এমনি মিষ্টি করে কথা কয় যে, এক মাস না যেতে যেতেই তিনি ঠিক করলেন যে, "একে আমার রাণী করতেই হবে।"

এর আগে রাজা মশায়ের আর এক রাণী ছিলেন, তিনি, দুটি ছেলে রেখে, কিছু দিন আগে মারা যান। রাজা মাসেকের ভিতরেই ঘোর ঘটায় সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে, তাঁর সেই ছেলে দুটিকে ডেকে বল্লেন, "এই দেখ, তোমাদের নূতন মা এসেছেন। তোমরা সব সময় এঁর কথা মেনে চলবে।"

তার পর দিন যায়। রাজা নূতন রাণীকে নিয়ে বেশ সুখেই আছেন, কিন্তু তাঁর দেশে যে মস্ত এক বিপদ দেখা দিয়েছে, তার জন্য তাঁর বড়ই ভাবনা। দেশে অসুখ বিসুখ কিছু নাই, তবু কেন জানি দেশের লোক জন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। খালি লোক জন নয়, গরু বাছুর হাতী ঘোড়ারও সেই দশা। যে বাড়ীতে দশ জন লোক, রাত পোহালে দেখা যায় যে তার মধ্যে দুজন নাই। গরু বাছুরগুলোকেও যে কোনখান দিয়ে কে এসে রাত্রে চুরী করে নিয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না। রাত জেগে পাহারা দিতে গেলে সেই পাহারাওয়ালা অবধি কোথায় চলে যায়। দেশ শুদ্ধ লোক ভয়ে অস্থির।

রাজার নিজের বাড়ীর খবরও যে এর চেয়ে বেশী ভাল, তা নয়। বরং সেখানেই সব চেয়ে বেশী বিপদ। হাতী শালে হাতী, ঘোড়া শালে ঘোড়া, কেল্লায় সিপাই সান্ত্রী, ঘরে চাকর বাকর, সবই দিন দিন কমে যাচ্ছে। শেষে এক দিন সকালে উঠে নূতন রাণীটিকেও আর দেখতে পাওয়া গেল না।

রাজার ছেলে দুটি এর সবই দেখছে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছে না, কেন এমন হয়। হাতী ঘোড়া তারা বড্ড ভালবাসে; দিনের মধ্যে অনেকবার এসে সেগুলোকে দেখে যায়। ঢের হাতী ঘোড়াই নাই, অল্প যে কয়টি রয়েছে, তারাও হয় ত আর বেশী দিন থাকবে না, এই ভেবে ছেলে দুটি যারপর নাই দুঃখিত থাকে। এক দিন ঘোড়াশালে এসে তারা দেখল যে একটা ঘোড়ার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তাতে তারা আশ্চর্য্য হয়ে সেখানে একটু দাঁড়াবা মাত্রই ঘোড়াটা তাদের বল্ল, "পালাও! পালাও! শীগ্গির পালাও, নৈলে আজ রাত্রেই তোমাদের খেয়ে ফেলবে।"

রাজপুত্রেরা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিসে খেয়ে ফেলবে?" ঘোড়াটা বল্ল, "সেই যে তোমাদের নূতন মা হয়েছে, সে খেয়ে ফেলবে।" রাজপুত্রেরা বল্ল, "সে ত

নাই; সে কি করে খাবে?” ঘোড়া বল্ল, “তোমরা দেখছ সে নাই, কিন্তু আসলে সে তোমাদের বাবাকে খেয়ে, এখন নিজে রাজা সেজে বসে আছে। এটা বড় ভয়ঙ্কর রাক্ষস। বনের ভিতরে সুন্দর মেয়েটি সেজে বসে কাঁদছিল, তাইতে তোমার বাবা দয়া করে এনে তাকে রাণী করেন; তার ফল শেষে এই হল। দেশের লোক জন, গরু বাছুর, এসব এমন করে কোথায় যায়, তাই দেখবার জন্য রাজা মশায় সেদিন রাত্রে পাহারা দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে দুষ্ট রাক্ষস তাঁকে মেরে খেয়ে, তাঁর বেশ ধরে আছে। পালাও! পালাও! নইলে আজই তোমাদের খেয়ে ফেলবে।”

একথায় রাজপুত্রেরা ‘বাবা!’ ‘বাবা!’ বলে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। তা দেখে ঘোড়াটা বল্ল, “এখন কাঁদবার সময় নয়। যা হবার তা ত হয়ে গেছে। এখন আগে তোমাদের নিজের প্রাণ বাঁচাও। তোমরা বেঁচে থাকলে হয় ত আবার তোমাদের বাবাকে ফিরেও পেতে পার।”

তখন রাজপুত্রেরা একটু শান্ত হয়ে বল্ল, “বাবাকে যদি রাক্ষসেই খেয়ে থাকে, তা হলে আর তাঁকে কি করে ফিরে পাব?” ঘোড়া বল্ল, “তার উপায় আছে। আমার কথা শুনে চল।” রাজপুত্রেরা বল্ল, “রাক্ষসের কাছ থেকে পালিয়ে আমরা কোথায় যাব? যত দূরেই যাই, সে গিয়ে আমাদের ধরে ফেলবে।” ঘোড়া বল্ল, “আমি তোমাদের পিঠে করে নিয়ে যাব। আমি যে এত কথা তোমাদের বলতে পেরেছি, এতেই বুঝে নাও যে আমি যে সে ঘোড়া নই। আমাদের নাম পক্ষীরাজ। আমরা পাখীর মত শূন্যে উড়ে যেতে পারি, মানুষের মত কথা কইতে পারি, কোথায় কি হচ্ছে সব জানতে পারি। যদি কোন মতে দৈত্যদের দেশে তোমাদের পৌঁছে দিতে পারি, তবে আর তোমাদের রাক্ষসের ভয় থাকবে না। এমন রাক্ষস নাই যে আমাকে ছুটে ধরতে পারে। তোমরা আর দেরী ক’রো না। শীগ্গির যা পার টাকা কড়ি আর খাবার নিয়ে এসে আমার পিঠে ওঠ।”

ছেলে দুটি তখনই কিছু টাকা, কয়েকটা দামী দামী মাণিক আর কয়েক দিনের মতন খাবার নিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, আর ঘোড়াও অমনি তাদের নিয়ে শোঁ শোঁ করে শূন্যে ছুটে চল্ল। তেমন করে আর কোন জন্তু কখনো ছুটতে পারে নি। রাজপুত্রেরা উপুড় হয়ে, প্রাণপণে তার গলা আর চুল আঁকড়ে ধরেছে, তার উপর আবার নিজেদের তার সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধেও নিয়েছে, তবু এক একবার পড়ে যায় যায় হচ্ছে।

রাজা দেখ্‌লেন একটি সুন্দর মেয়ে গাছতলায় ব'সে কাঁদ্‌ছে।

U. RAY & SONS,
100, Gurpar Road, Calcutta

এত ছুটবার দরকারও ছিল। রাজপুত্রেরা জানে না, কিন্তু ঘোড়া বেশ বুঝতে পেরেছে যে রাক্ষসটা তাদের পালাবার কথা টের পেয়ে, ঝড়ের মতন ছুটে ধরতে আস্‌ছে। যা হোক, পক্ষীরাজকে ধরা কি রাক্ষসের কাজ? সেটা অনেকক্ষণ ছুটে নাকাল হয়ে শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে গেল। এ সব হতে দু ঘণ্টাও লাগে নি, কিন্তু এরি মধ্যে পক্ষীরাজ মানুষের মুল্লুক, রাক্ষসের মুল্লুক, পরীর মুল্লুক, ভূতের মুল্লুক সব ছাড়িয়ে দৈত্যের মুল্লুকের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু হায়! এর মধ্যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঘোড়াটা এতক্ষণ এমনি ভয়ানক ছুটেছে যে দম ফেলবার অবসর পায় নি। তাই দানবের দেশের কাছে এসেই বেচারা বুক ফেটে মরে গেল। আর, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সে মরে যেতেই তার পেটের ভিতর থেকে দুটা পাখাওয়ালা সিংহ বেরিয়ে এল।

কায়দা দোরস্ত নাপিত।

ঠান্‌দিদিকে পাড়ার ছেলে মেয়ে বুড়া বুড়ি সকলেই ভয় কর্‌ত, তাই আমিও ভয় করতাম, কিন্তু কেন যে ভয় করতাম এবং ঠানদিদির যে কি দোষ তা আমি তখনও ভেবে পাই নাই, এখনও ভেবে পাই না। ঠানদিদির বাড়ীতে নানা রকম ফলের গাছ ছিল, কিন্তু এই গাছে কেউ হাত দিতে পারত না, ছেলেরা যে ডাল পালা ভেঙ্গে ফল না পাকতেই সমস্ত সাবাড় করবে তার যো ছিল না। পেয়ারা, কুল, জামরুল পাকলে, ঠানদিদি নিজের হাতে এইগুলি পাড়তেন এবং পাড়ার ছেলে মেয়েদের ডেকে ভাগ করে দিতেন তাছাড়া পাড়ার ছোট ছোট বৌদের, তাদের বাড়ীতে গিয়ে নিজে খাইয়ে আসতেন; কোন কোন বৌয়ের শাশুড়ী ননদ ও রকম করে বৌদের জিভ বাড়ান ভাল মনে করত না, কিন্তু ঠানদিদির ভয়ে কিছু বলতেও সাহস করত না।

এ ছাড়া ঠানদিদির একটি কাঁঠাল গাছ ছিল, তাতে যে কাঁঠাল ফল্‌ত, আমি নিজে এখন ঠাকুর দাদা হয়েছি, তবু সেই কাঁঠালের কথা মনে হলে এখনও আমার জিভে জল আসে। গাছটার নাম ছিল হাজারি, তাতে এক হাজার কাঁঠাল না ফলুক অনেক কাঁঠাল ফলত, সেই জন্যেই তাকে হাজারি বলা হত! আমরা প্রতি বৎসর ঠানদিদির বাড়ীতে একাই এক একটা কাঁঠাল খেতাম।

আমাদের পাড়ায় কালা নাপিত বলে একটি ছেলে ছিল, তার বাপের নাম নদেরচাঁদ, লোকে কিন্তু তাকে নদে নাপিত বলে ডাক্‌ত। কালার ঠাকুরমা নদেরচাঁদের সঙ্গে মিলিয়ে, তার কালাচাঁদ নাম রেখেছিলে। কালাচাঁদ নামের মতই বেশ কাল ও মোটা সোটা গোলগাল ছিল। কালাকে কালো বল্লে ভারী চট্‌ত, বল্‌ত "কালো জগতের আলো" "ধলা পায়ের তলা"। আমার দিদি বরিশালে থাকতেন অনেক দিন পরে তিনি দেশে এসে এক দিন কালাকে দেখে বল্লেন—কালাতো বেশ সুন্দর! কালা অমনি গম্ভীর ভাবে বল্লে "এখনও আমি তেল মাখিনি"। কালাকে কেউ নাম জিজ্ঞাসা কল্লে বল্‌ত "আমার নাম কালাচাঁদ কায়দা দোরস্ত পরামাণিক, বাপের নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত নদেরচাঁদ নরসুন্দর, নিবাস গোয়ালপাড়া, পরগণে ঈশফপুর জেলা যশোহর"। এই জন্য আমরা কালাকে কালা না বলে অনেক সময় কায়দা দোরস্ত বলে ডাকতুম।

কালা আমাদের চাইতে ২।৩ বৎসরের বড় ছিল, আমাদের স্কুলেই পড়ত। সে বাপের একমাত্র ছেলে, তার বাপের বেশ পয়সা ছিল, তাই কালার যখন ১৪।১৫ বৎসর বয়স তখন তার বাপ তাকে বিয়ে দিলে। ঠানদিদি মহা চটে গেলেন। ১৫ বৎসরের ছেলে লেখা পড়া করবে, না হয় ব্যবসা শিখবে, আর খেলা ধুলো করে বেড়াবে, তার আবার বিয়ে কি? সে সেই বছর হতেই কালাচাঁদ ঠানদিদির কাঁঠাল হতে বঞ্চিত হল। রোজই কালা ঠানদিদির বাড়ীর পাশ দিয়ে আনাগোনা করত; মনে মনে ভাবত, হয়ত ঠানদিদি তাকে ডেকে কাঁঠাল খেতে দেবেন, ঠানদিদি কিন্তু সে দিকে ভ্রুক্ষেপও কল্লেন না, তবে ঠানদিদির একজন গ্রাহক কমিলেও একজন গ্রাহিকা বাড়ল, সে কালাচাঁদের বৌ। বৌয়ের বয়স ৮।৯ বৎসর, সে তার বয়সের উপযুক্ত একটি কাঁঠাল পেল। আমরা গোপনে সন্ধান নিয়ে জানলাম কাঠালটী কালা চাঁদের পেটেই গিয়াছে, তবে ঠানদিদি তা টের পান নাই। তোমরা হয়ত বলছ কাঠালটা এমন কি জিনিষ যা পাওয়ার জন্যে এত আগ্রহ? কিন্তু তোমরাত সে কাঁঠাল খাওনি! ছেলেরা আস্ত একটী কাঁঠাল দিয়ে এক বেলার জলযোগ সারত।

সে বৎসর ত কায়দা দোরস্ত ফাঁকি দিয়ে কাঁঠাল খেল, পরের বৎসর তার বৌ তার বাপের বাড়ী ছিল, কাজেই ঠানদিদি আর তাদের বাড়ী কাঁঠাল দিলেন না। কালা কিন্তু আমাদের বল্ল (কালা একটু তোতলা ছিল) "তো-তো-তোরা জানিস তো, না-না-নাপিতের ষোল চুক্কো বুদ্ধি, এবার তার এক চুক্কো খ-খ-খ-খরচ করে ঠানদিদির কাঁঠাল খাব"। আমরা উৎসুক হয়ে রইলাম যে কালা কি বুদ্ধি

খরচ করে! একদিন ঠানদিদি পশ্চিম পাড়ায় বেড়াতে গিয়েছেন, ঠাকুরদাদাও পাশা খেলতে গিয়েছেন, বাড়ীতে কেউ নাই। কালা সন্ধান পেয়ে, একেবারে গিয়ে

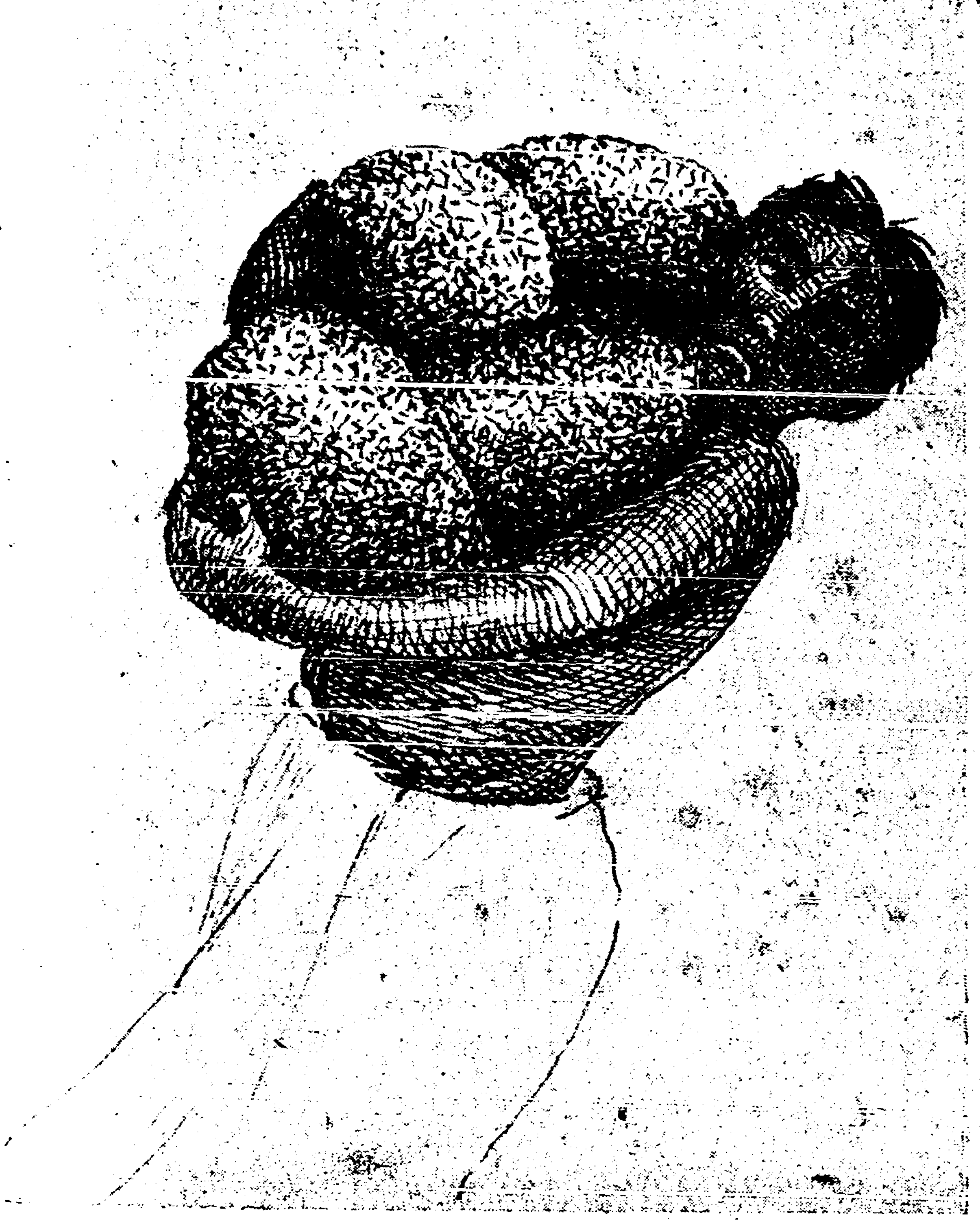

কাঁঠাল গাছে উঠেছে। কিন্তু যেই গাছে ওঠা আর ঠানদিদি ঠিক সেই সময়ে এসে হাজির, "কিরে—কায়দা দোরস্ত কাঁঠাল গাছে উঠেছিস যে" ? "ঠা-ঠা-ঠানদিদি আ-আ-আমি যেতে যেতে প-প-পথ ভুলে এসে পড়েছি।" ঠানদিদি দেখলেন কালা ঠক ঠক করে কাঁপছে ভয়ে বুঝিবা পড়ে যায়। ঠানদিদি বল্লেন "তা বেশ! পথ ভুলে যখন গাছে উঠেছিস তখন এক কাজ কর্, পাকা পাকা দেখে গোটা কএক কাঁঠাল পাড়্। কায়দা দোরস্ত যেন কায়দায় পড়ে কতক ভয়ে কতক সাহসে দশ বারটা কাঁঠাল পাড়ল, তার পরে গাছ থেকে নেমে এল। নেমে এসে একবার ভাবল এইবার পালাই, কিন্তু কাঁঠালের ও লোভ সামলাইতে পারে না, আবার ভাবল ঠানদিদি বেশী আর কি করবে, যদি মারতে আসেন তখন পালাব। ঠানদিদি বল্লেন "যা কাঁঠালগুলি আমার উঠানে নিয়ে যা।" কালা তখন কাঁঠালগুলি বয়ে উঠানে নিয়ে হাজির করল, তখন ঠানদিদি বল্লেন "কালা তোর পছন্দ মত তুই একটা বেছে নিয়ে যা।" কালা একটা বড় কাঁঠাল বেছে নিল। ঠানদিদি বল্লেন "দেখ্ এটা তোর পাড়ানি দিলুম, বুঝলি ? তোর বার্ষিক যা পাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।" তখন কায়দা দোরস্ত কাঁঠাল নিয়ে দৌড়! সে কাঁঠাল পেল বটে, কিন্তু ঠান্‌দিদির কাছে তার নাপিতে বুদ্ধি খাটল না।

গরিলা।

গরিলা থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে। গাছের ডালপালার ছায়ায় সে জঙ্গল দিনদুপুরেও অন্ধকার হ'য়ে থাকে; সেখানে ভাল ক'রে বাতাস চলে না, জীবজন্তুর সাড়া শব্দ নাই। পাখীর গান হয়ত ক্বচিৎ কখন শোনা যায়। তারই মধ্যে গাছের ডালে বা গাছের তলায় লতাপাতার মাচা বেঁধে গরিলা ফল মূল খেয়ে দিন কাটায়। সে দেশের লোক পারত পক্ষে সে জঙ্গলে ঢোকে না—কারণ গরিলার মেজাজের ত ঠিক নেই, সে যদি একবার ক্ষেপে দাঁড়ায়, তবে বাঘ ভালুক হাতী তার কাছে কেউই লাগে না। বড় বড় শিকারী, সিংহ বা গণ্ডার ধরা যাদের ব্যবসা, তারা পর্য্যন্ত গরিলার নাম শুনলে এগুতে চায় না।

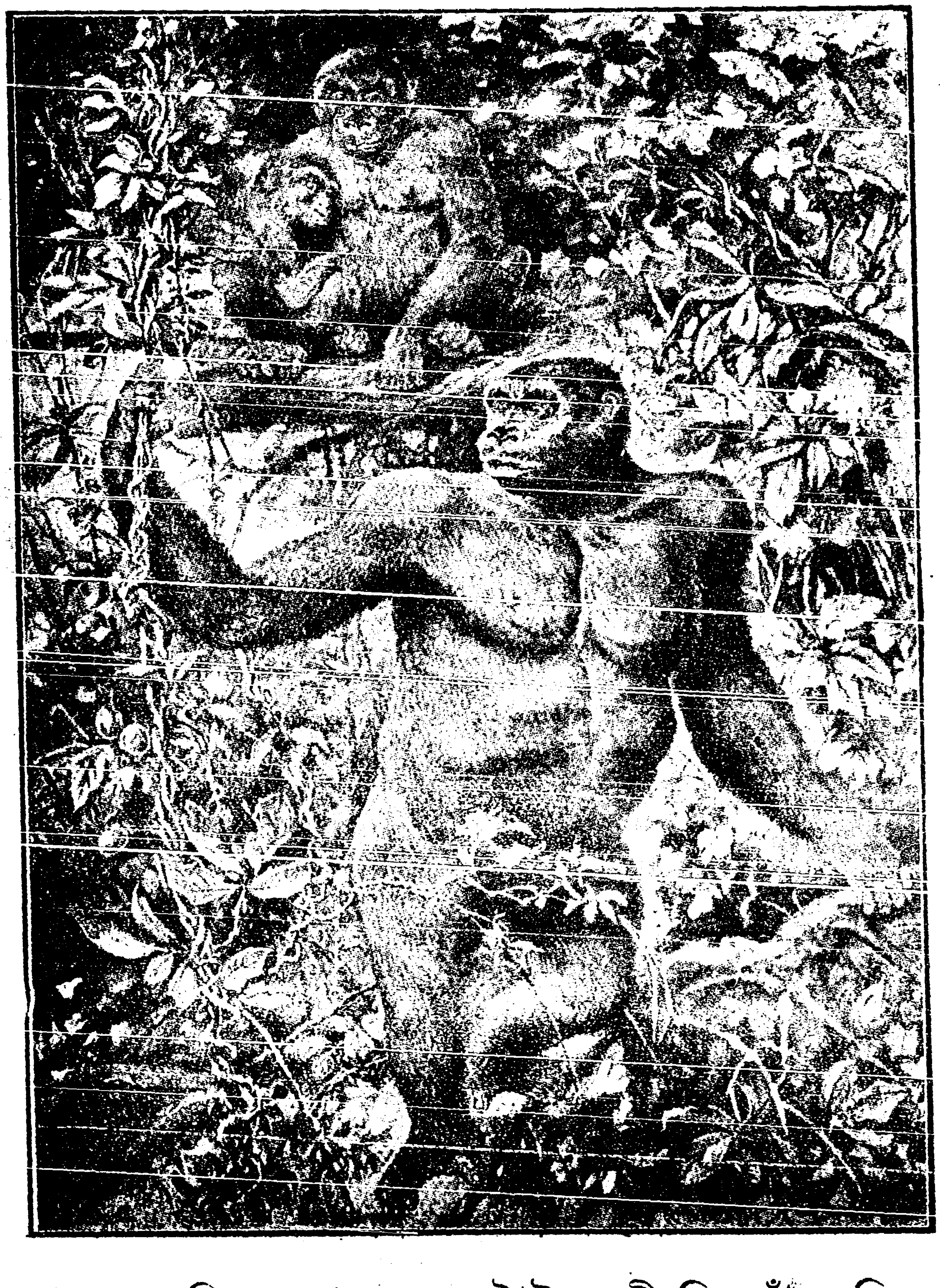

পৃথিবীর প্রায় সব রকম জানোয়ারকেই মানুষে ধ'রে খাঁচায় পুরে চিড়িয়াখানা আট্‌কাতে পেরেছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন বড় গরিলাকে মানুষে ধর্‌তে পারে নি। মাঝে মাঝে দুটো একটা গরিলার ছানা ধরা প'ড়েছে কিন্তু তার কোনটাই বেশী দিন বাঁচে নি।

একবার এক সাহেব একটা গরিলার ছানা পুষবার চেষ্টা ক'রেছিলেন সেটার বয়স ছিল দু তিন বৎসর মাত্র। তিনি বলেন, তার চাল চলন, মেজাজ, দুষ্টুমি বুদ্ধি, ঠিক

মানুষের খোকার মত। তাকে যখন ধরে খাঁচায় বন্ধ ক'রে রাখা হ'ত, তখন সে মুখ বেজার ক'রে পিছন ফিরে ব'সে থাক্‌ত। যে জিনিষ সে খেতে চায় না, সেই জিনিষ

যদি তাকে খাওয়াতে যাও, তবে সে চীৎকার ক'রে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাত পা ছুঁড়ে অনর্থ বাধিয়ে বস্‌বে। একদিন তাকে জোর ক'রে ওষুধ খাওয়াবার জন্য চারজন লোকের দরকার হ'য়েছিল। তাকে যখন জাহাজে ক'রে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আনান হয়, তখন তাকে প্রায়ই জাহাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ত কিন্তু সে কোন দিন কা'রো অনিষ্ট করে নি। তবে জাহাজের খাবার ঘরের পাশে যে একটা আলমারি ছিল, যার মধ্যে চিনি থাক্‌ত আর নানারকম মিষ্টি আচার ইত্যাদি রাখা হ'ত, সেই আলমারিটার উপর তার ভারি লোভ ছিল। কিন্তু সে জান্‌ত যে ওটাতে হাত দেওয়া তার নিষেধ, কারণ দু একবার ধরা প'ড়ে সে বেশ শাস্তি পেয়েছিল। তার পর থেকে যখন তার মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হ'ত তখন সে কখনও সোজাসুজি আলমারির দিকে যেত না; প্রথমটা যেত ঠিক তার উল্টো দিকে, যেন কেউ কোন রকম সন্দেহ না করে! তারপর একটু আড়ালে গিয়েই এক দৌড়ে বারান্দা ঘুরে একেবারে আলমারির কাছে উপস্থিত!

একবার একটা গরিলার ছানাকে চিড়িয়াখানায় রাখা হ'য়েছিল। চিড়িয়াখানায় নানা-রকম অদ্ভুত জন্তু দেখ্‌তে তার খুব মজা লাগ্‌ত—কোন কোনটার খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে সে খুব মন দিয়ে তাদের চালচলন দেখ্‌ত। একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা ছিল, সে নানা-

রকম কস্‌রৎ জান্‌ত—সে যখন ডিগ্‌বাজি খেয়ে বা হুটোপাটি ক'রে নানারকম তামাসা দেখাত, গরিলাটা ভারি খুসী হ'য়ে তার কাছে এসে বস্‌ত।

গরিলার চেহারাটা মোটেও শান্তশিষ্ট গোছের নয়—মানুষের মত লম্বা, চওড়ায় তার দ্বিগুণ, গায়ের জোর তার দশটার মত—তার উপর সে যখন রাগের চোটে চীৎকার

ক'রে নিজের বুকে কীল মার্‌তে মার্‌তে এগুতে থাকে তখন তার সেই শব্দ আর মুখভঙ্গী আর রকম সকম দেখে খুব সাহসী লোক পর্য্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু মানুষ দেখ্‌লেই গরিলা তেড়ে মার্‌তে আসে না—বরং সে অনেক সময়ে মানুষকে এড়িয়েই চল্‌তে চায়। কিন্তু তুমি যদি একেবারে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হও সে

কি ক'রে বুঝ্‌তে পারে যে তোমার কোন দুষ্ট মৎলব নাই? বিশেষত লোকে যখন লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে জঙ্গলে হাজির হয়, তাতে যদি গরিলা খুসী না হয়, তবেই কি তাকে "হিংস্র" বল্‌তে হবে?

আগের পৃষ্ঠায় যে গরিলার ছবি দেখ্‌ছ বিশপঁচিশজন লোকে একে বল্লম দিয়ে মেরে এনেছে কিন্তু তার মধ্যে সেও একটা মানুষ মেরেছে আর দু চারটাকে রীতিমত জখম ক'রেছে। এখন এদের ফূর্ত্তি দেখ না! গরিলার গায়ে যে কি রকম সাংঘাতিক জোর তা ছবিতেই কতকটা আন্দাজ করা যায়। বড় বড় গাছের ডাল অনায়াসে ভেঙ্গে দিতে পারে—লোহার বন্দুককে মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে দাঁতে দিয়ে চ্যাপ্টা ক'রে ফেলে। একটা মানুষকে মারবার জন্য তার এক আদটা বড় চাপড়ের বেশী আবশ্যক হয় না।

বুড়ো বাঁদর।

এক রাজার বাড়ীতে অনেকগুলি বাঁদর থাকে। রাজার আদরের বাঁদর, তারা রোজ দৈ ছানা মাখন খায়। রাজবাড়ীর রান্নাঘরের পাশেই ঘোড়ার আস্তাবল, আর তার পাশেই ভেড়ার খোঁয়াড়। ভেড়াগুলি রোজ রান্নাঘরে ঢুকে চাল, ডাল, তরকারি যা সামনে পায়, সব খেয়ে ফেলে। বামুন ঠাকুররাও হাতের কাছে যখন যা পায় তাই দিয়ে সেগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। তা দেখে বাঁদরের দলের সর্দ্দার যে বুড়ো বাঁদর সে ভাবল—"তাইত! ভেড়াগুলো যে রোজ রান্নাঘরে ঢুকে উৎপাত করে, একদিন যদি বামুন ঠাকুর উনান্ থেকে কাঠ নিয়েই সেগুলোকে মারে, আর তাদের লোমে আগুন ধরে যায়, সেগুলো তখন আস্তাবলের পাশে খড়ের গাদায় গিয়ে গড়াবে আর খড়েও যাবে আগুন ধরে। তাহলেই ঘোড়াগুলোও পুড়ে মরবে। পুঁথিতে নাকি লেখে, বাঁদরের চর্ব্বিতে ঘোড়ার পোড়া-ঘা সারে। কাজে রাজা মশাই তখনি সব বাঁদর কেটে চর্ব্বি বার করে ঘোড়ার ঘায় মাখাবেন। যখন এতগুলো দামি ঘোড়া মারা যায়, তখন কি আর বাঁদরের মায়া থাক্‌বে?" এই ভেবে বুড়ো অন্য বাঁদরদের ডেকে বল্ল, "ভাই সকল! এই যে ভেড়ার দল রসুই ঘরে ঢোকে, এ থেকে ত এমনি ভয়ানক বিপদ হতে পারে! চল, সময় থাকতে এই বেলা আমরা এখান থেকে সরে পড়ি, নইলে সকলকেই মরতে হবে।"

সে কথা শুনে অন্য বাঁদরেরা ত হেসেই খুন! তারা বল্ল—"বুড়ো হয়ে তোমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে—তোমার যদি এতই ভয় হয়ে থাকে তাহলে তুমি চলে গেলেই পার। আমরা বেশ সুখে আছি, রাজবাড়ী ছেড়ে আমরা কোথাও যাবনা।" কাজেই তখন মনের দুঃখে বুড়ো বাঁদর বনে চলে গেল।

কিছু দিন পরে সত্যি সত্যি একদিন বামন ঠাকুরেরা জ্বলন্ত কাঠ দিয়েই ভেড়াগুলিকে মারল, আর তাতে সেগুলো ছুটে গিয়ে দিল খড়ের গাদায় গড়াগড়ি,—খড় উঠল জ্বলে, তার আগুন গিয়ে লাগল আস্তাবলে। এতগুলো ঘোড়া, তাদের বাঁধন খুল্‌তেও ত সময় লাগে! ততক্ষণে অনেকগুলো ঘোড়ার গা ঝল্‌সে গেল। খবর পেয়ে রাজা মশায় কি ব্যস্তই হলেন! দেখ্‌তে দেখ্‌তে যত বড় বড় ঘোড়ার ডাক্তার, সব এসে রাজবাড়ীতে হাজির। তারা সবাই মিলে পুঁথি খুলে বল্ল, "বাঁদরের চর্ব্বি মালিস্ কর্‌লে ঘোড়ার পোড়া-ঘা সেরে যাবে।" তখন রাজার হুকুমে দলশুদ্ধ বাঁদর কেটে তাদের চর্ব্বি ঘোড়ার ঘায় মালিস্ করা হলো। ঘোড়াগুলি অবশ্য তাতে ভাল হয়ে গেল কিন্তু রাজবাড়ীতে একটি বাঁদরও আর বেঁচে রইল না।

বনে থেকে বুড়ো বাঁদর এর খবর শুন্‌তে পেল। কি আর করবে! বেচারি মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, ফল মূল খায়, আর কেবলি ভাবে কি করে রাজার উপর এর শোধ নিবে। একদিন দুপুর বেলায় রোদে ঘুরে ঘুরে বুড়োর ভয়ানক পিপাসা হয়েছে, এমন সময় জল খুঁজে খুঁজে সে একটা পুকুরের ধারে এসে উপস্থিত হল। সেই পুকুরে জল খাবার জন্য নামতে গিয়ে হঠাৎ মাটির দিকে বুড়োর চোখ গিয়েছে, অমনি সে দেখে, সেই মাটিতে নানা রকমের জন্তুর পায়ের দাগ। আশ্চর্য্যের কথা এই যে দাগগুলি সব জলের দিকে, জল খেয়ে কোন জন্তু যে উঠে এসেছে তেমন দাগ একটিও নাই। বাঁদরের বুদ্ধি বড্ড চোঁখা; সে অমনি থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভাবল,—"নিশ্চয় পুকুরের জলে নাবলে কোন বিপদ হয় ওতে একবার নামলে আর কেউ উঠে আসতে পারে না।" তখন সে আর জলে না নেমে, ডাঙ্গায় থেকেই হাত বাড়িয়ে লম্বা বোঁটা সমেত একটা পদ্মফুল তুলে নিল, তারপর সেই বোঁটাটি জলে ডুবিয়ে তার ভিতর দিয়ে চুষে জল খেল। তার জল খাওয়া শেষ হতে না হতেই একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস জলের ভিতর থেকে উঠে এসে তাকে বল্ল,—"ভাই, তোমার মতন বুদ্ধিমান লোক ত আমি আর কখনও দেখিনি। এই পুকুরের জলে আমি মন্ত্র পড়ে রেখেছি,—তাতে যে জলে নামে সেই আমার পেটে যায়। কত লাখ লাখ জন্তু এমনি করে

আমার পেটে গেল, কেউ পালাতে পারল না। আর তুমি জলে না নেমেই পদ্মের বোঁটা দিয়ে কাজ সেরে নিলে! এসো ভাই! আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু।” এই বলে রাক্ষস নিজের গলা থেকে মুক্তার মালা খুলে বুড়ো বাঁদরের গলায় পরিয়ে দিল।

এর পর দিন সেই রাজা মশায় ভোরবেলায় উঠে দেখেন, তাঁর পাঁচিলের উপর একটা বুড়ো বাঁদর বসে রয়েছে! অমনি তিনি সেটাকে চিনতে পেরে বল্লেন,—“আরে, এ যে আমাদের সেই বুড়ো বাঁদর! কি রে এত দিন তুই কোথায় ছিলি?” বাঁদর বল্ল,—“মহারাজ! এত দিন মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি,—রাজবাড়ীতে কত সুখে ছিলাম! মহারাজ আমাকে ভালবাসতেন, তাই আজ একবার চরণ দর্শন করতে এসেছি।” সে কথা শুনে রাজা মশায় খুবই খুসী হলেন। তার পরক্ষণেই বাঁদরের গলার সেই মহামূল্য মুক্তার মালাটীর দিকে তাঁর চোখ পড়েছে। তখন তিনি ভারী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—“আরে, এমন চমৎকার মালা তুই কোত্থেকে পেলি বুড়ো? এমন সুন্দর মালা ত আমিও কখনও দেখি নি?”

বাঁদর বল্ল,—“মহারাজ! এ আর বেশী সুন্দর মালা কি, আমি যে বনে থাকি সে বনে এর চেয়েও কত সুন্দর মালা ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায়।”

রাজা বল্লেন,—“বনে এমন সুন্দর মালা পাওয়া যায়?”

বাঁদর বল্ল—“হাঁ মহারাজ! সেখানে একটা পুকুর আছে তার জলে যে ডুব দেয় তার গলায়ই এমনি একটি মালা হয়।”

বাঁদরের কথা শুনে রাজা ত একেবারে অবাক্! তিনি বল্লেন,—“আচ্ছা, আমি যদি ডুব দেই আমার গলায়ও এমন সুন্দর মালা হবে?” বাঁদর বল্ল—“মহারাজ! আমি ডুব দিয়ে মালা পেলাম আর আপনি ডুব দিয়ে পাবেন না? শুধু আপনি কেন? রাজবাড়ীর সমস্ত লোক এক সঙ্গে সেই জলে ডুব দিলে তাদেরও প্রত্যেকের গলায় একটী করে মালা হবে।”

অমনি রাজবাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে গেল আর কি!—রাজা, রাণী, রাজকুমার, রাজকুমারী, উজির, নাজির সকলেই সেজে তয়ের হলেন—সেই পুকুরে ডুব দিয়ে মালা আনতে যাবেন। রাজবাড়ী খালি করে সকলে রওয়ানা হলো—বুড়ো বাঁদর আগে আগে পথ দেখিয়ে চল্ল।

পুকুরের ধারে গিয়ে বুড়ো বাঁদর রাজাকে বল্ল,—“মহারাজ! কোনখানটায় ডুব

দিলে সকলের চেয়ে সুন্দর মালা পাওয়া যায় সে আমি জানি। আগে ওঁরা সকলে ডুব দিয়ে উঠুন, তারপর আপনাতে আমাতে সেইখানটায় ডুব দেওয়া যাবে।"

বুড়ো বাঁদর রাজাকে নিয়ে পুকুরে দাঁড়িয়ে রইল, আর সকলে এক সঙ্গে জলে নেমে ডুব দিল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা, ক্রমে এক ঘণ্টা হয়ে গেল কিন্তু তবু জল থেকে কেউ উঠে না। রাজা বাঁদরকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কৈ ওরা কেউ উঠ্‌ছে না কেন?" বুড়ো বাঁদর তখন এক লাফে প্রকাণ্ড একটা গাছে চড়ে রাজাকে বল্ল,—"মহারাজ! দেখছেন কি, আপনার লোকজন সব রাক্ষসের পেটে গিয়েছে। পুকুরের জলে ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষস থাকে, এ জলে ডুব দিলেই সে রাক্ষসের পেটে যেতে হয়। ভাল চান ত আপনি শীগ্গির এখান থেকে সরে পড়ুন আমার স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব সকলকে কেটে আপনি আমার মনে যে কষ্ট দিয়েছিলে আজ তার শোধ নিলাম"—এই বলে বুড়ো বাঁদর গভীর বনে ঢুকে পড়ল। রাজা মশায় পাগলের মত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীতে ফিরে এলেন।

ঘড়ী।

তোমরা এখন যাকে 'ক্লক্' বল, আমরা ছেলে বেলায় তাকে বলতাম 'ধর্ম্ম ঘড়ী'। আমাদের ইস্কুলে যে দিন একটা নূতন ধর্ম্ম ঘড়ী এসেছিল, সে দিনকার কথা আমার এখনো মনে আছে। একটা খুব বড় আটচালা ঘরে আমাদের ইস্কুল হত। প্রথম বেলায় মিস্ত্রী এসে ঘরের মাঝখানে একটা শালের থামের গায় একটা বাক্স ঝুলিয়ে রেখে গেল। আমরা বল্লাম, 'এটা কি?' মাষ্টার মশাই বল্লেন, 'ধর্ম্ম ঘড়ী রাখা হবে।'

আমরা ভাবলাম, না জানি সে কি রকম জিনিস। আমাদের ইস্কুলের কাছেই ডেপুটি বাবুর কাছারী ছিল। শুনতাম, সেইখানে না কি একটা জল ঘড়ী আছে, তাই দেখে কাছারীর চাপরাসী সেখানকার ঘণ্টা বাজায়, আর সেই ঘণ্টা শুনে আমাদের ইস্কুলের হরদয়াল সিংও তার ঘণ্টাটা বাজায়।

একটা বাটির তলায় ফুটো করে তাকে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। ফুটো দিয়ে জল ঢুকে ঢুকে যতক্ষণে বাটিটি ডুবে যায়, সেই হচ্ছে এক ঘণ্টা। চাপরাসী কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, বাটিটি ডুবতে মাত্রই তার জল ঢেলে ফেলে আবার তাকে ভাসিয়ে দেয়, আর তখনি টং টং করে ঘণ্টা বাজায়—এর নাম জল ঘড়ী।

জল ঘড়ীর মত আবার বালু ঘড়ী ও হত। সে জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, কেন না, সে এখনো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। খানসামারা অনেক সময় তা দেখে তা তৈয়ারী করে।

মোমবাতী কতক্ষণে কতখানি জ্বলে, তাই থেকে ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড্ সময়ের হিসাব রাখতেন। কিন্তু সে রকম ঘড়ী সচারচর ব্যবহার হত বলে শোনা যায় না।

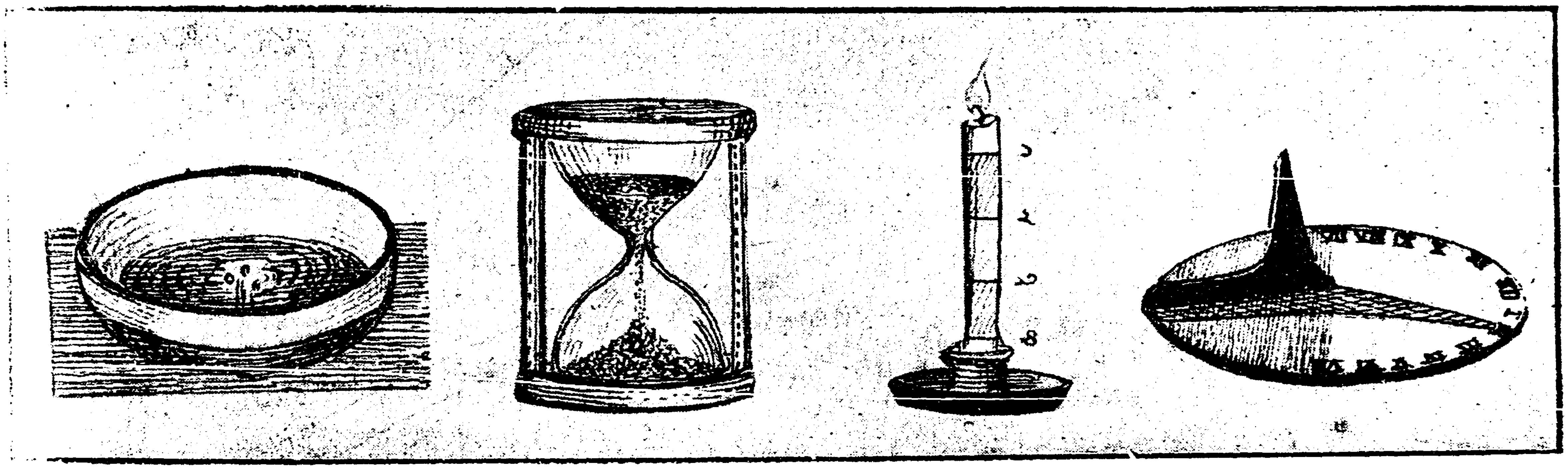

জল ঘড়ী। বালু ঘড়ী। বাতি ঘড়ী। সূর্য্য ঘড়ী।

যা'ক যে কথা বলছিলাম। বিকালে সেই ধর্ম্ম ঘড়ী আমাদের ইস্কুলে এল, আর একটা হৈ চৈ যে পড়ল। পড়া শোনা গেল চুলোয়; মাষ্টার মশায়রা অবধি ছুটে এসে ঘড়ীর চারধারে জড় হলেন। এমন আশ্চর্য্য জিনিস আর আমরা কেউ কখনো দেখিনি। ঘড়ীর ভিতরে সেই জিনিসটা যে টকা টক্, টকা টক্, খালি দোলই খাচ্ছে, খালি দোলই খাচ্ছে, সেটা কেন থেমে যায় না? এতেই আমরা সকলের চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

তোমরা হয় ত হাসছ, কিন্তু আমাদের কাছে তখন এটা বাস্তবিকই ভারী আশ্চর্য্য ঠেকেছিল। আমরা তখন ছেলে মানুষ ছিলাম বলে নয়, বুড়োদের কাছে ও তেমনি ঠেকত। শুনেছি, এক জমীদার বাবুর শোবার ঘরে নাকি একটা ধর্ম্ম ঘড়ী এসেছিল। বাবু তখন কোথায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন, অনেক রাত্রে ফিরে এলেন। ঘড়ী আসবে, সে কথা জানেন, আর তার কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছেন। এসেই ত তিনি তাড়াতাড়ি গিয়েছেন ঘড়ী দেখতে; গিয়েই দেখেন সেটার ভিতরে কিসের টক্ টক্ শব্দ হচ্ছে। বাবু ভাবলেন, নিশ্চয় ইঁদুর ঢুকেছে,—তবে ত এখনি সব কেটে মাটি

করবে। কাজেই তখন তিনি যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে, আর কি করেন,—লাঠি হাতে ছিল, তাই দিয়ে প্রাণপণে লাগালেন ধাঁই করে ঘড়ীতে এক ঘা! ঘড়ীর কাজ ত তাতেই হয়ে গেল, কিন্তু বাবু ভাবলেন, "বাঃ! আর টক্ টক্ করছে না; ইঁদুর মরেছে।"

বড় হয়ে শুনলাম, এই 'টক্ টকের' ভিতরেই না কি আসলে ঘড়ীর হিসাব। যে জিনিসটা দোল খায়, সে ভারি ঠিক ওজনে দোল খায়,—একবার তাড়াতাড়ি, একবার ধীরে ধীরে, এমন কখনো করে না। কাজেই তার খাতিরে ঘড়ীটিকে ও আগা গোড়া ঠিক সমান ভাবেই চলতে হয়, কেন না, ঠিক একটি দোলের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার পা বাড়িয়ে চলা ভিন্ন তার আর গতি নাই। ঐ টক্ টক্ আওয়াজগুলির এক একটি ঘড়ীর এক একবার পা বাড়াবারই শব্দ।

দোল খাবার কায়দা আবার দু রকমের। বড় বড় ঘড়ীতে একেকটা শিকের আগায় একেকটি ভার ঝোলান থাকে, তাই দোলে। আবার ট্যাঁক ঘড়ীতে আর ছোট ছোট টাইম্‌পীসে একটি অতি সরু স্প্রিংএর জোরে একটি চাকা দোলে। আসল কথা একই,—দোলের ওজনটি বড়ই ঠিক। যে মানুষ প্রথমে এই কথাটি জানতে পেরে ঘড়ীতে লাগিয়েছিল, তাকে একবার পেলে ঢের ঢের সন্দেশ খাওয়াতে রাজী আছি।

পাজি পিটার।

সহরের কোণে মাঠের ধারে এক পুরানো বাড়ীতে 'পিটার' থাক্‌ত। তার আর কেউ ছিল না, খালি এক বোন্ ছিল। পিটারকে সবাই বল্‌ত 'পাজি পিটার'—কারণ পিটার কোন কাজ কর্ম্ম করে না—কেবল একে ওকে ঠকিয়ে খায়। পিটার একদিন ভাব্‌ল ঢের লোক ঠকিয়েছি—একবার রাজাকে ঠকান যাক্। এই ভেবে সে রাজবাড়ী গেল।

রাজা বল্লেন, "তুমি কেহে, মৎলব খানা কি?"

পিটার বল্ল, "আজ্ঞে আমি পাজি পিটার—ঠকাবার জন্য লোক খুঁজ্‌ছি।"

রাজা বল্লেন, "তাই নাকি? লোক খুঁজবার দরকার কি, আমাকেই একবার ঠকিয়ে দেখাও না।" পিটার মাথা চুল্‌কাতে লাগ্‌ল—বল্ল "তাইত আমার সরঞ্জাম সব বাড়ীতে ফেলে এসেছি"। রাজা বল্লেন "বেশ ত, তোমার সরঞ্জাম সব নিয়ে এস"। পিটার

তাই শুনে ভয়ানক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁট্‌তে লাগ্‌ল, আর বল্ল "দোহাই মহারাজ অত হাঁটাহাঁটি কল্লে আমি মরেই যাব।" রাজা বল্লেন "তবে এই ঘোড়াটায় চ'ড়ে যা—দেরী করিস্‌নে"। পিটার চীৎকার করতে লাগ্‌ল "ও ঘোড়ায় আমি চড়্‌ব না—ঘোড়া আমায় ফেলে দিবে"। কিন্তু সে কথা কেউ শুন্‌ল না, তাকে জোর ক'রে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। পিটার ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে মোড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে—যেই একটু আড়াল পেয়েছে, অম্‌নি ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে সহরের বাইরে উপস্থিত! সেখানে সাজসরঞ্জাম শুদ্ধ ঘোড়াটাকে বিক্রী ক'রে সে পকেটভরা টাকা নিয়ে বাড়ী ফির্‌ল। এদিকে রাজা উজীর পাত্র মিত্র সভায় বসে—পিটার আসে না, আসে না—এলই না। রাজা মশাই বাইরে খুব হাস্‌লেন—বল্লেন "ছেলেটা বেজায় চালাক"—কিন্তু মনে মনে ভারি চট্‌লেন।

একদিন পিটার দেখ্‌তে পেল মাঠের উপর দিয়ে জম্‌কাল পোষাক প'রে ঘোড়ায় চ'ড়ে তরোয়াল হাতে কে যেন আস্‌ছে। পিটার বল্ল "এই মাটি ক'রেছে! রাজা আস্‌ছে।" পিটার দৌড়ে তার বোন্‌কে বল্ল—"ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়ে দাও—ফুট্‌তে থাকুক।" এই ব'লে সে একখানা ভাঙা শিলের উপর হিজিবিজি কি সব লিখ্‌তে বস্‌ল। তারপর যেই রাজা মশাই তার বাড়ীর সাম্‌নে এসেছেন, অম্‌নি সে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটাকে সেই শিলের উপর বসিয়ে বিড়্‌ বিড়্‌ করে কি সব বল্‌তে বল্‌তে ভাতটাকে কাঠি দিয়ে নাড়্‌তে লাগ্‌ল। রাজা মশাই বল্লেন—"এ আবার কি?" পিটার বল্ল "আজ্ঞে ভাত রাঁধ্‌ছি।" রাজা বল্লেন "সে কি রে? তোর আগুন কৈ?" পিটার জোড়হাতে বল্ল "মহারাজ আম্‌রা গরীব মানুষ, আগুন টাগুন কোথায় পাব? সন্ন্যাসি ঠাকুর এই পাথরখানা দিয়েছেন, আর দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই আমাদের রান্না চ'লে যায়"।

রাজা ব'ল্লেন "দে ওটা আমায় দে—তোকে আমি মাপ ক'রে দিচ্ছি"। পিটার কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, দেখাদেখি তার দুষ্টু বোন্‌টাও কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। রাজা ব'ল্লেন "অত কান্নাকাটির দরকার কি? আমিত কেড়ে নিচ্ছি না—দাম দিয়ে নিচ্ছি। এই নে"! ব'লে তিনি এক মুটো মোহর ফেলে দিলেন। তখন পিটার তাঁকে একটা যা' তা' মন্ত্র শিখিয়ে দিল।

রাজা মশাই সেই শিলখানা নিয়ে বাড়ী গেলেন। গিয়ে সকলকে বলে পাঠালেন "কাল সকালে তোমাদের এক আশ্চর্য্য ভোজ খাওয়াব। সকাল না হ'তেই মন্ত্রী

উজীর কোটাল সকলে আশ্চর্য্য ভোজ খাবার জন্য রাজবাড়ীতে হাজির। রাজামশাই সেই পাথরটিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে তার উপর প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি চাপালেন, আর

পাজি পিটারের ভাত রান্না।

পোলাওয়ের চাল ঘি, মাংস, মসলা, সব তার মধ্যে দিয়ে গম্ভীর ভাবে মন্ত্র পড়্তে লাগ্লেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, পোলাউ আর হ'ল না! সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্তে লাগ্ল। রাজা মশাই রেগে মেগে লাল হ'য়ে উঠ্লেন। শেষটায় তিনি লাফিয়ে উঠে কাউকে কিছু না বলে এক তলোয়ার হাতে আবার ঘোড়ায় চ'ড়ে পিটারের বাড়ী ছুট্লেন। মনে মনে বল্লেন "এবারে আর পাজি পিটারকে আস্ত রাখ্ছি নে।"

(ক্রমশঃ)

গল্প স্বল্প।

এখন মাসে দশটি টাকার কমে একটি ইস্কুলের ছেলের খাওয়ার খরচ চলে না। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা চাকরকে দু পয়সা করে দিয়েছি, তাইতে সে আমাদের দু বেলা খেতে দিয়েছে। আমি কিন্তু হিসাব কিতাবের কথা বলতে যাচ্ছি না, আমি সেই চাকর বেটার কথা বল্‌ছি। তার নাম আমরা তার সাক্ষাতে বল্‌তাম 'কালী', অসাক্ষাতে বল্‌তাম 'কেলে'। দু পয়সায় দু বেলা মাছ, তরকারী, ডাল ভাত পেটভরে খেতে দিতে হবে। কেলে তা ত দিতই, আবার তার উপরে ঢের লাভ করে নিতে ও ছাড়ত না। তার লাভের চোটে আমাদের পেট চোঁ চোঁ কর্‌ত।

বাজারে যত রকমের মাছই উঠুক্, কেলে আনে শুধু বাটা। ছ আঙ্গুল লম্বা এককটি মাছ, তাকেই দু ভাগ করে এক জনকে দেয় ল্যাজা, আরেক জনকে দেয় মুড়া। যে ল্যাজা পায়, তার তবু দু গ্রাস খাওয়া চলে, কিন্তু যে মুড়ো পায় সে চোরার খালি চোষাই সার।

মাছ পাতে পড়তেই ছেলেরা একজন আরেক জনকে ডেকে খবর নেয়, কার ভাগ্যে কি জুটেছে। কিন্তু সে কথা কেউ বাংলায় বলতে ভরসা পায় না। কেলের মেজাজটা বেজায় বেয়াড়া আর মুখটা অতি অসভ্য। ছেলেরা তাই ইংরাজীতে বলে, "কিহে 'হেড্' না 'টেইল' ?" এক দিন একজনের পাতে পড়েছে 'ল্যাজা', সে ভুলে বলে ফেলেছে 'হেড্'। অমনি কেলে বিষম দাঁত খিঁচিয়ে বল্ল, "কি ? তোমাকে দিলাম 'টেইল', আর তুমি যে বল্লে 'হেড্' ?"

সে দিন খাওয়া দাওয়ার পরে ছেলেরা শোবার ঘরে এসে বলতে লাগল যে, "নাঃ এবেটাকে জব্দ করতে না পারলে আর চলছে না। ইংরাজীতে কথা বলব, তাও বেটা দু দিন শুনেই বুঝে নিবে, এ কি সহ্য হয় ?" তখন এই যুক্তি হল যে, তরকারী যতই কম হোক, সবাই মিলে কসে ভাত খেয়ে কেলেকে নাকাল করবে।

বারো জনের রান্না হয়, সে দিন রাত্রে পাঁচ জনেই তার সব চেঁছে পুঁছে খেয়ে বসে আছে, আবার বলছে "আরো দাও!" হাঁড়ির পানে চেয়ে কেলের মুখ শুখিয়ে গেছে, কিন্তু আর উপায় কি ? পেট ভরে খেতে দিতেই হবে। সে বেলার কাজ শেষে দৈ চিঁড়ে এনে চালাতে হয়েছিল ; কাজেই লাভ যা হয়েছিল, তা উল্টো বাগে।

তার পর দিন কেলে আগে ভাগেই সাবধান হয়ে ঢের বেশী ভাত রেঁধে ছিল; কিন্তু সে দিন সবাই বল্লে, "আজ আমাদের ক্ষিদে নাই।" কাজেই কেলের অনেক ভাত লোকসান হল। এমনি ভাবে দিন তিনেক যেতেই কেলে বেশ বুঝতে পারল যে ছেলেদের খুসী না রাখতে পারলে লাভের আশা খুবই কম। তার পর থেকেই দেখা গেল যে কেলের মেজাজটি ও একটু নরম, কথা বার্ত্তা ও কতকটা ভাল।

চিনাখালী ইস্কুলের মাষ্টার—রায় মশায় বড় কড়া লোক ছিলেন। ছেলেরা তাঁর ভয়ে অস্থির থাক্‌ত, আর ভাব্‌ত কখন জানি তাঁর ঐ লক্‌লকে বেতখানি এসে সপাং করে কার ঘাড়ে পড়ে। এর মধ্যে একদিন চিনাখালীর দেওয়ানজী মশায় ইস্কুল দেখতে এসেছেন, আর রায় মশায় শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে দেখাচ্ছেন। দেওয়ানজী মশায় দু ক্লাস দেখেছেন, কাউকে কিছু বলেন নি। তারপর আরেক ক্লাসে এসে ম'তে বলে একটি পাতলা ছিপছিপে ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "শশী" মানে কি? সে ছেলেটা ছিল দুরন্ত পনার সর্দ্দার, কিন্তু পড়া শুনায় আস্ত গাধা। সে তখন আনমনে আর কিসের কথা ভাবছিল; দেওয়ানজীর কথায় থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বল্ল, "আজ্ঞে, তিনি আমার মেসো মশাই হন।" সে কথা শেষ না হতেই সাঁই করে একটা শব্দ হল। ম'তে তার আগেই, রায় মশায়ের হাত উঠতে দেখে, বন্দুকের গুলির মত ছুটে পালিয়েছিল। রায় মশায়ের বেতখানা সাঁই করে এসে তাকে না পেয়ে, 'চটাস্‌!' করে গিয়ে পড়ল, দেওয়ানজী মশায়ের জালার মত ভুঁড়িটিতে! ছেলেরা তা দেখে ভয়ে হাসবার কথা ভুলে গেল; রায় মশায়ের হাত থেকে বেত পড়ে গেল, তাঁর মুখ হাঁ করে গেল, চোখ গিয়ে কপালে উঠল। দেওয়ানজী মশায়ের কথা আর কি বল্‌ব? বেচারা চট্‌তেও পার্‌ছেন না, কাঁদ্‌তেও পার্‌ছেন না, জ্বালায় টিকতেও পার্‌ছেন না, লজ্জায় হাত বুলাতেও পার্‌ছেন না। তিনি যতটা পারেন গম্ভীর হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

আশ্বিনের ধাঁধার উত্তর।

ডিম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ক্ষত্রিয় যোদ্ধার বেশে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ্।

U. RAY & SONS.

তীয় বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩২১ | অষ্টম সংখ্যা

নদী।

আমি আসি সেই পর্ব্বত হইতে
যেথা বিভীষিকা ঘোর,
যেথায় কাঁপিয়ে উঠেগো তরাসে
ক্ষুদ্র পরাণ মোর!
তারপর ধীরে নীচে যাই নেমে
ধাই সে বারিধি পানে,
ক্রমে হ'য়ে আসি প্রশান্ত, গভীর
সাগর সন্নিধানে!
ক্ষুদ্র আমার জীবন তখন
অনন্তে মিলা'তে চায়,
আমার হৃদয় মহাসাগরের
আলিঙ্গন আশে ধায়!
অসীম, উদার জলধির পানে
ধাই আমি নিজ মনে,
হারাইয়া ফেলি আপনারে আমি
বিরাট সাগর সনে।

শ্রীগণেশচন্দ্র রায়।

সূর্য্যের গৃহিণী।

বিশ্বকর্ম্মার নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের কারিগর, আর, কারিগরদের দেবতা। এই দেবতার একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম সংজ্ঞা; কেহ কেহ তাহাকে ঊষা আর সুরেণু বলিয়াও ডাকিত।

বাপের ঘরে সংজ্ঞা সুখেই ছিলেন। কিন্তু, শেষে তাঁহার পিতা যখন সূর্য্যদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, তখন হইতেই বেচারীর দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। সূর্য্যের যে কি ভয়ানক তেজ, তাহা তোমরা সকলেই দেখিতেছ। দূরে থাকিয়াই এত তেজ, কাছে গেলে যে কি রকম হইবে, তাহা ত আমরা ভাবিযাই উঠিতে পারি না। এর উপর আবার সেকালে নাকি সূর্য্যের তেজ এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। তখন সূর্য্যের দেহ এমন সুন্দর গোল ছিল না; কদম ফুলের কেশরের মত, তাহার চারি দিকে কিরণের ছটা বাহির হইত, তাহার যে কি ভয়ঙ্কর তেজ, তাহা বেচারী সংজ্ঞাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তবু সে তেজ সহিয়া সহিয়া থাকিতে সংজ্ঞা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ঝলসিয়া পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া, তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইল, তবু তিনি অনেক দিন ধরিয়া সূর্য্যের সেবা করিলেন। ক্রমে, মনু, যম, আর যমুনা বলিয়া তাঁহার তিনটি খোকা খুকী হইল। খোকা খুকীরা দূরে দূরে খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের কোন কষ্ট নাই। যত কষ্ট সংজ্ঞার, কেন না, তাঁহাকে সূর্য্যের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়। এত দিন সে কষ্ট সহিয়া সহিয়া তাঁহার শরীর মাটি হইয়া গেল, আর সহিতে পারেন না।

তখন সংজ্ঞা অনেক ভাবিয়া এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। বিশ্বকর্ম্মার মেয়ে, কাজেই অনেক রকম কারিকুরী তাঁহার জানা ছিল, আর সেই কারিকুরীতে এখন তাঁহার বড়ই কাজ হইল। তিনি, সকলের অসাক্ষাতে এমন একটি মেয়ে তয়ের করিলেন যে, সে দেখিতে অবিকল তাঁহার নিজেরই মতন, কিন্তু, সূর্য্যের তেজে তাহার কিছুই হয় না। মেয়েটির নাম রাখিলেন ছায়া।

ছায়া তয়ের হওয়া মাত্র হাত যোড় করিয়া সংজ্ঞাকে বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে?" সংজ্ঞা বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ী যাইতেছি। তুমি এখানে থাকিয়া ঘরকন্না কর। আমার খোকা খুকীদের যত্ন করিয়া খাইতে পরিতে দিয়ো। আর, আমি যে চলিয়া গেলাম, একথা কাহাকেও বলিয়ো না।"

ছায়া বলিল, "আমি সবই করিব, কিন্তু, যদি আমার চুলে ধরিতে আসে, বা শাপ দিতে চায়, তবে আমি চুপ থাকিতে পারিব না।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর সংজ্ঞা ছায়াকে সেখানে রাখিয়া, ভয়ে ভয়ে তাঁহার পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা কিন্তু কন্যার দুঃখ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সংজ্ঞাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য ত হইলেনই, বিরক্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশী। তিনি বলিলেন, "তুমি ভারী অন্যায় করিয়াছ, এখনি ফিরিয়া যাও!"

বাপের বাড়ীতে আসিয়াও সংজ্ঞার দুঃখ ঘুচিল না। বকুনির জ্বালায় সেখানে টিকিয়া থাকাই তাঁহার দায় হইল। কাজেই তখন আর কি করা যায়? সংজ্ঞা একটি ঘোটকী সাজিয়া সেখান হইতে উত্তর মুখে ছুটিয়া পলাইলেন। সকল দেশের উত্তরে কুরুবর্ষ বা উত্তর কুরু। সেখানকার সুন্দর সবুজ মাঠের কচি কচি ঘাসগুলি খাইতে বড়ই মিষ্ট। সংজ্ঞা ছুটিতে ছুটিতে সেই দেশে গিয়া, সেখানকার সুন্দর মাঠের মিষ্ট ঘাস খাইয়া মনের আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সেখানে পুড়িয়াও মরিতে হয় না, বকুনিও খাইতে হয় না।

এদিকে সূর্য্যদেবের ঘরে কাজ কর্ম্ম সুন্দর মতেই চলিতেছে। ছায়া দেখিতে ঠিক সংজ্ঞারই মত, আর কাজে কর্ম্মেও বেশ ভাল। সুতরাং সূর্য্যদেব টেরই পান নাই যে একটা কিছু হইয়াছে। খোকাখুকীরা কিন্তু ইহার মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের মা আর তাহাদিগকে ভাল বাসে না। তাহারা জানুক আর নাই জানুক, ছায়া ত আর তাহাদের মা নয়,—সে তাহাদিগকে মার মত ভালবাসিবে কি করিয়া? মনু শান্ত ছেলে, সে আদর না পাইয়াও চুপ করিয়া রহিল। যম রাগী, সে অভিমানের ভরে ছায়াকে পা দেখাইয়া বলিল, "তোমাকে লাথি মারিব!" ছায়াও তখন রাগে অস্থির হইয়া বলিল, "বটে? এত বড় আস্পর্দ্ধা? তোর ঐ পা খসিয়া পড়ুক!"

শাপের ভয়ে যম কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্য্যের নিকট গিয়া নালিশ করিল, "বাবা! মা আমাদের ভালবাসেন না বলিয়া আমি তাঁহাকে পা দেখাইয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, আমার পা পড়িয়া যাইবে। বাবা! আমি ত লাথি মারি নাই, তুমি আমার পা খসিয়া পড়িতে দিয়ো না। সূর্য্য বলিলেন, "বাবা! তোমার মা যখন শাপ দিয়াছেন, তখন ত আর তাহা আটকাইবার উপায় নাই। তবে, এইটুকু করা যাইতে পারে যে পোকায় তোমার পায়ের মাংস অল্পে অল্পে লইয়া যাইবে, আস্ত পা খসিয়া পড়ার দরকার হইবে না।"

তারপর সূর্য্যদেব ছায়ার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মা হইয়া ছেলেদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করিতেছ? ছায়া প্রথমে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তারপরই

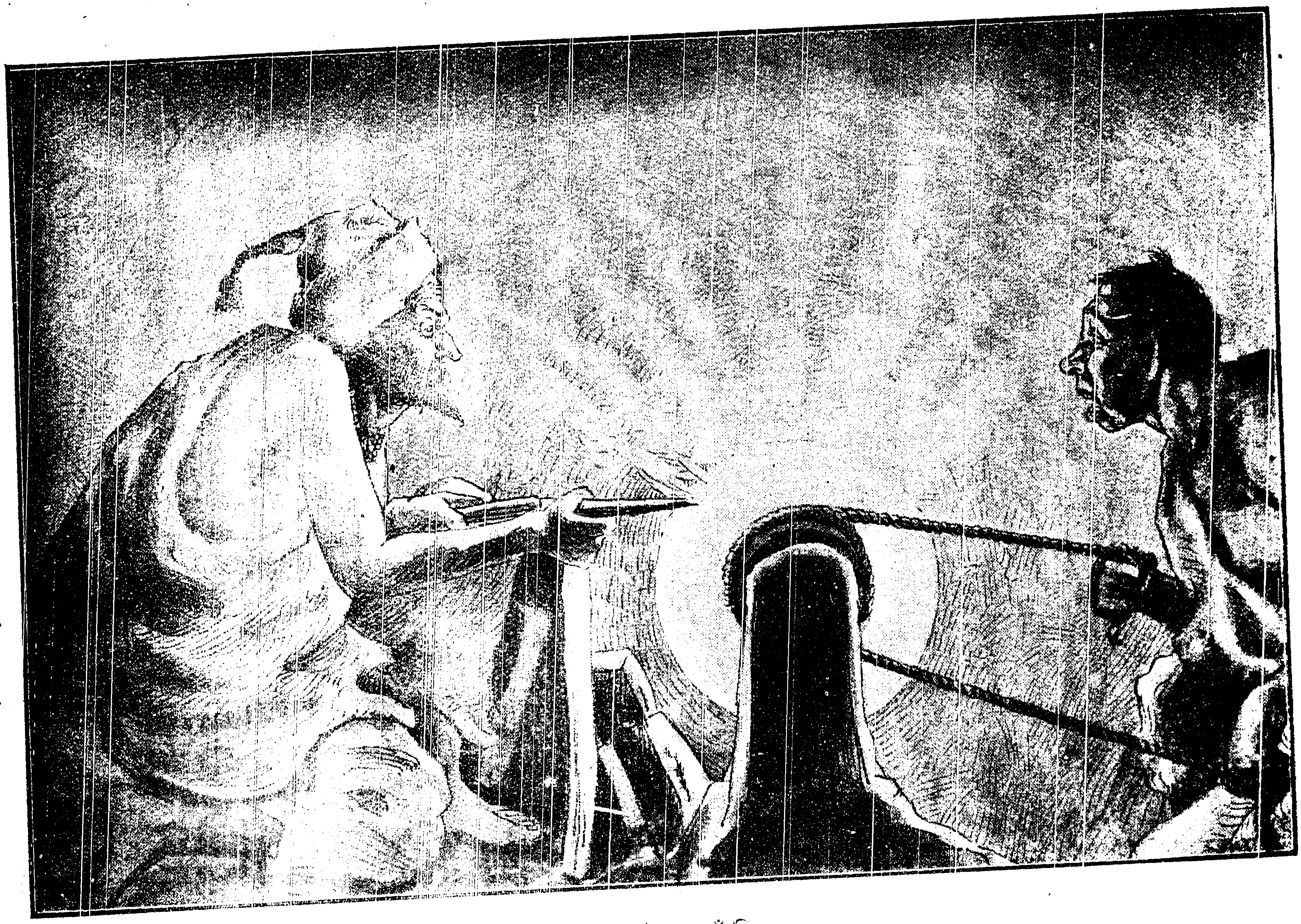

বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে কুঁদিতেছেন।

যখন সূর্য্য বিষম রাগের ভরে তাঁহার চুলে ধরিয়া শাপ দিবার আয়োজন করিলেন, তখন আর সে না বলিয়া যায় কোথায় ?

সে কথা শুনিয়া সূর্য্য যে কিরূপ ব্যস্তভাবে তাঁহার শ্বশুরের নিকট ছুটিয়া আসিলেন, তাহা কি বলিব ! বিশ্বকর্ম্মা দেখিলেন, ঠাকুর বড় বেজায় রকমের চটিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথাই বাহির হইতে পারিতেছে না। তখন তিনি তাঁহাকে অনেক মিষ্ট কথায় শান্ত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, জানেন ত, আপনার তেজ কি ভয়ঙ্কর। আমার মেয়ে সে তেজ কিছুতেই সহিতে না পারিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। তবে, আপনি যদি চাহেন ত আপনার এই তেজ আমি অনেকটা কমাইয়া দিতে পারি। তাহা হইলে সংজ্ঞারও আপনার নিকট থাকিতে কষ্ট হইবে না, আর আপনার চেহারাটিও অনেক মোলায়েম হইয়া যাইবে।"

সূর্য্য বাস্তবিকই সংজ্ঞাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মার কথায় রাজি হইলেন। বিশ্বকর্ম্মাও আর দেরী না করিয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে কুঁদে চড়াইয়া দিলেন। আগেই বলিয়াছি, সূর্য্য সে সময়ে তেমন গোল ছিলেন না। কুঁদে চড়াইয়া শোঁ শোঁ শব্দে কয়েক পাক দিতেই তাঁহার উস্ক খুস্ক কিরণগুলি বাটালীর মুখে উড়িয়া গেল, আর তাহার ভিতর হইতে তাঁহার ঐ সুন্দর গোল মুখখানি দেখা দিল। তখন সকলেই বলিল, "বাঃ ! বেশ হইয়াছে। এখন ঠাকুর যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি দেখিতেও ভাল।"

এ কথায় সূর্য্যদেব যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সংজ্ঞাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সংজ্ঞা ঘোটকী সাজিয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিয়াছেন। কাজেই, তাঁহাকে কোন দিকে যাইতে হইবে তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। সংজ্ঞা সাজিয়াছিলেন ঘোটকী, তিনি সাজিলেন ঘোড়া। তারপর সেই যে সেখান হইতে তিনি চিঁ-হিঁ-হীঁ-হীঁ শব্দে ছুট দিলেন, আর একেবারে সংজ্ঞার সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া থামিলেন না। কিন্তু, সংজ্ঞাকে তিনি সহজে ধরিতে পারেন নাই, কারণ, সে বেচারী কি করিয়া জানিবেন যে, ঐ যে চিঁ-হি-হীঁ-হী শব্দে ঘোড়াটা ছুটিয়া আসিতেছে সেই হইতেছে তাঁহার স্বামী ? কাজেই তিনি তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পালাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষে সকল গোলই চুকিয়া গেল, আর তখন ত সুখের সীমাই রহিল না।

দৈত্যের রাজা।

সিংহ দুটাকে দেখেই রাজপুত্রেরা ভারী থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে তাদের কাটতে গিয়েছে, এমন সময় সিংহ দুটা বল্ল, "তোমাদের ভয় নাই ; আমরা তোমাদের বন্ধু। আমাদের সঙ্গে রাখ, তোমাদের অনেক উপকার হবে।" একথায় রাজপুত্রেরা তলোয়ার রেখে দিয়ে সিংহ দুটার গায় হাত বুলাতে লাগল, সিংহ দুটাও তাদের গায় মাথা ঘষে ভালবাসা জানাল। তারপর সিংহেরা বল্ল, "তোমরা কোথায় যাবে ? চল, তোমাদের পিঠে করে নিয়ে যাই।" কিন্তু, কোথা যে যেতে হবে, রাজপুত্রেরা ত তার কিছুই জানে না। খালি এইটুকু তারা শুনেছে যে, দৈত্যের দেশে যেতে পার্‌লে তাদের রাক্ষসের ভয় দূর হবে। কিন্তু এরি মধ্যে যে তারা সেই দেশের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কি তারা জানে ? তারা খালি বল্ল, "এক দিক বলে চল্‌তে থাকি, তারপর যা হয় হবে।" বলে, তারা সিংহ দুটাকে নিয়ে হেঁটেই চল্ল।

তারপর তারা চার জন বেশী দূর যায় নি, এর মধ্যে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে এমনি ভয়ঙ্কর একটা শব্দ উঠল যে সে আর বল্‌বার কথা নয়। তাতে চার জনেই চম্‌কে উঠে বল্ল, "এটা কিসের শব্দ ? চল, দেখ্‌তে হবে।"

শব্দটা একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে আস্‌ছিল। সেখানে ছুটে গিয়ে তারা দেখল যে, হাত পা বাঁধা একটা প্রকাণ্ড দৈত্য মাটিতে পড়ে আছে, আর, দুটো রাক্ষস তাকে খেতে যাচ্ছে। তখন তারা চার জনেই এক সঙ্গে বলে উঠল, "যে বিপদে পড়ে, তার সাহায্য কর্‌তে হয়!" বল্‌তে বল্‌তেই সিংহ দুটো উড়ে গিয়ে রাক্ষস দুটোর ঘাড়ে পড়ল, আর রাজপুত্রেরা ছুটে গিয়ে দানবের বাঁধন কেটে দিল। বাঁধন কেটে দিতেই দৈত্য লাফিয়ে উঠে রাক্ষস দুটোকে এমনি দুই লাথি লাগাল যে, সেই লাথির চোটে রাক্ষস দুটো থেৎলো হয়ে, ডেলা পাকিয়ে, পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, কোথায় গিয়ে যে ঠিক্‌রে পড়ল তার ঠিকানাই নাই।

তারপর দুই রাজপুত্র আর দুই সিংহকে আঁজলায় করে তুলে নিয়ে, বুকে ধরে, সেই দৈত্য ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বল্ল, "লক্ষ্মী! ধন! সোনা! মণি! বাবা! তোমরা আজ আমাকে বাঁচালে! এই সুন্দর পাহাড়টির ছায়ায়, ফুরফুরে হাওয়ায়, ঘাসের উপর শুয়ে আমি একটু ঘুমচ্ছিলাম, এর মধ্যে দু বেটা রাক্ষস পাজি কোত্থেকে এসে, আমার হাত পা বেঁধে, আরেকটু হলে আমাকে খেয়েই ফেলেছিল আর কি!

লক্ষ্মী বাবা.! তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ ; বল, তোমাদের কি উপকার করব ? আমি হচ্ছি দৈত্যদের রাজা। চল, আমার বাড়ীতে গিয়ে দুদিন একটু বিশ্রাম করবে।"

সেই হাতের আঁজলায় করেই দৈত্য চারজনকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল, আর আদরটা যে করল। দু তিন কথায় একটু মুস্কিল না হলে সেখানে তাদের সুখের সীমাই থাক্‌ত না। দৈত্যদের ঘর বাড়ী সব পর্ব্বতের মত, তার একেকটা সিঁড়ির ধাপ হাত উঁচু, কাজেই একতলা থেকে দোতলায় উঠতে বেচারাদের প্রাণ বেরিয়ে যেতে যায়, দৈত্যেরা তা দেখে হাসে, আর খাবল্ মেরে তাদের উপরে তুলে দেয়। তারপর, সেই ঘরের ভিতরে দৈত্যেরা একটু চেঁচিয়ে কথা কইলেই কাণে তালা লেগে যায় আর গান ধর্‌লে ত মনে হয় কাণ বুঝি ফাটলই। এর চেয়েও অসুবিধার কথা হচ্ছে এই যে, নূতন কোন দৈত্য এলেই তাদের ক'জনকে আঁজলায় নিয়ে আদর না করে ছাড়ে না।

যা হোক, তবু তাদের সেখানে খুবই ভাল লাগল। দৈত্যরা ভারী খোলা লোক, আর তাদের মেয়েরা ঠিক আমাদের মেয়েদেরি মত লক্ষ্মী, তবে, অবশ্যি তাদের চেয়ে ঢের বড়। দৈত্যের রাণী যখন শুন্‌লেন যে রাজপুত্রদের বাপকে আর তাদের দেশের লোকজনকে রাক্ষসে খেয়ে ফেলেছে, অমনি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। দৈত্যের রাজা ত এর আগেই কোমর বেঁধে গদা নিয়ে রাক্ষস মারবার জন্য তয়ের হয়েছেন। রাণী কিন্তু তাঁর চেয়ে ঢের বুদ্ধিমতী। তিনি রাজাকে বুঝিয়ে বল্লেন, "ওগো, শুধু রাক্ষস মেরে কি হবে ? যাদের সে খেয়েছে, তাদের বাঁচাবারও ত একটা উপায় করা চাই। আমাদের যে গুরু আছেন, তাঁর কাছ থেকে একটা ওষুদ টষুদ নিয়ে গেলে হয় না ?" তা শুনে রাজা বল্লেন, "ঠিক বলেছ ! তাই ত, একটা ওষুদ না নিয়ে গেলে কেমন করে হবে ?"

দৈত্যদের গুরু হচ্ছেন একটি মুনি ঠাকুর, তিনি মরা মানুষ বাঁচাবার মন্ত্র জানেন। সে ঠাকুরটি যে কি ভয়ানক বুড়ো, তা কেউ ভেবেও ঠিক করতে পারে না। যতদিন থেকে দৈত্য আছে, ততদিন থেকেই তিনিও আছেন। বুড়ো হয়ে হয়ে এখন আর তিনি চোখেও দেখতে পান না, কানেও শুনতে পান না, কিন্তু কেউ যেতে মাত্রই তখনি তার মনের কথাটি বুঝে নেন।

সেই মুনি ঠাকুরের কাছে রাজপুত্রদের নিয়ে গিয়ে সকলে হাত যোড় করে দাঁড়াল। অমনি মুনিঠাকুর বল্লেন, "এসেছ বাছা সকল ? এই যে, আমি এখনি ওষুদ দিচ্ছি ; এক কলসী জল নিয়ে এসত।" জল আনা হলে, তিনি তাতে মন্ত্র পড়ে বল্লেন, "এই

জলের একেক ফোঁটা একেকটা কলসীর ভিতরে ঢালবে। তারপর সেই সব কলসীর জল দেশময় ছড়িয়ে দিলেই দেখবে, যত কিছু মরেছিল, সব বেঁচে উঠেছে।” তারপর রাজার ছেলেদের তিনি কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন, “এই সিংহ দুটিকে বিশেষ আদর যত্ন করে তোমাদের সঙ্গে রাখবে। এরা কাছে থাক্‌লে আর তোমাদের কোন বিপদ হতে পারবে না।”

তারপর সেই কলসী শুদ্ধ জল নিয়ে সকল দৈত্য মিলে রাক্ষসের দেশে রাক্ষস মার্‌তে চল্ল। একটা রাক্ষসও তাদের হাত এড়িয়ে পালাতে পার্‌ল না। পাখী সেজে, শেয়াল সেজে, গাছপালা সেজে,—কত রকমে তারা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেছিল। দৈত্যেরা তাদের ধর্‌তে পারে নি, কিন্তু সেই পাখাওয়ালা সিংহ দুটাকে ঠকান সহজ কথা নয়। গাছপালা, পাখী, শেয়াল, যাই সাজুক, তারা অমনি সেটাকে ধরে বলে, “এই যে একটা রাক্ষস!” আর অমনি দৈত্যেরা থাপ্পড় মেরে তার প্রাণ বার করে দেয়।

এমনিভাবে রাক্ষসের দেশের সব রাক্ষস মারা শেষ হলে দৈত্যদের রাজা তার সকল দৈত্যকে বল্লেন, “তোমরা এখন দেশে ফিরে যাও। আমি এই রাজপুত্রদের সঙ্গে তাদের দেশে গিয়ে সেই রাক্ষসটাকে মেরে আসি। তোমাদের একজন শুধু এই মন্ত্র পড়া জলের কলসীটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল।”

দৈত্যেরা সব বিদায় হয়ে গেল, এখন দেশে রওয়ানা হতে হবে, এমন সময় রাজপুত্রেরা মুখ চূণ করে বল্ল, “আমরা ত আমাদের দেশের পথ জানি না!” সে কথায় সিংহ দুটো বল্ল, “তার জন্য ভাবনা কি? আমাদের পিঠে চড়, আমরা তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।” রাজপুত্রেরা বল্ল, “না ভাই, তোমাদের কষ্ট দিব কেন? চল আমরা সবাই হেঁটে যাই।” সিংহেরা তাতে হো হো করে হেসে বল্ল, “হেঁটে গেলে তোমরা দেশে পৌঁছাবার আগেই বুড়ো হয়ে যাবে। সে যে তোমাদের চল্লিশ বছরের পথ!” রাজপুত্রেরা শুনেই ত অবাক! কাজেই তখন তারা আর কি করে? দু ভাই দুটি সিংহের পিঠে উঠে, বেশ করে চাদর দিয়ে নিজেদের তাদের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে নিল। তারপর খালি শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ! এমনি ভয়ানক জোরেই সেই দুই দৈত্য আর দুই সিংহ ছুটে চল্ল যে রাজপুত্রদের টিকে থাকতেই প্রাণান্ত।

এমনি করে যখন রাজপুত্রদের বাড়ীর কাছে একটা পাহাড়ের আড়ালে এসে তারা পৌঁছিয়েছে, তখন সিংহেরা দৈত্যদের বল্ল, “এই বেলা তোমরা চেহারা বদলিয়ে দুটি

মানুষ সেজে নেও, নইলে রাক্ষসটা তোমাদের দেখতে পেলেই পালাবে।" একথায় দৈত্যেরা তখনি দুটি মানুষ হয়ে গেল ; যেন তারা রাজপুত্রদের সঙ্গেরই লোক, তাদের জিনিস পত্র বয়ে নিচ্ছে।

তার পর যখন তারা এসে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, রাক্ষসটা তখন সভা ঘরেই বসে। লোকজন আর দেশে একটিও নাই, সব সে খেয়ে শেষ করেছে। এখন রাজা সেজে সভায় বসে থাকে, বিদেশী কোন লোক, কি কোন জানোয়ার না জেনে সেখানে এলে তাকে ধরে খায়। সে দিন কোন রকম খাবারই জোটে নি বলে সে পুরাণো একখানা হাড় নিয়ে তাই বসে চাটছে। এমন সময় দৈত্যদের রাজা, আর সকলকে পিছনে নিয়ে এসে সভা ঘরের দরজায় উঁকি মারলেন। মানুষের বেশে এসেছেন, কাজেই রাক্ষস তাঁকে চিনতে পারে নি, সে ভেবেছে 'বাঃ, আজ বেশ ভোজন হবে!' অমনি সে তাড়াতাড়ি হাড়খানা গদীর নীচে গুঁজে রেখে, জিবের জল ফেলতে ফেলতে দরজার কাছে ছুটে এল। আসতেই দৈত্যের রাজা বল্লেন, "আহা! আমার কি বড়ই অন্যায় হয়েছে—রাজা মশায়ের মূলো খাওয়া এসে মাটি করে দিয়েছি!" সে কথায় রাক্ষস ভারী চটে নিজের মূর্ত্তি ধরে মূলোর মত দাঁতগুলো খিঁচিয়ে বল্ল, "মূলো খাওয়ার আর দরকার কি? এখন ত তোদের মাংসই চিবিয়ে খাব! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!—"বলে সে সবে দৈত্যের রাজাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, অমনি দেখে, বাপরে! কি ভয়ঙ্কর বিশাল দৈত্য সামনে দাঁড়িয়ে! তখন ত আর পালাবার সময় ছিলই না ; দৈত্যের রাজা এমনি তাড়াতাড়ি তার ঘাড় টিপে ধরলেন যে, অভাগার চ্যাঁচাবারও অবসরটুকু অবধি হল না। সেই এক টিপেই তার ঘাড় ভেঙ্গে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তখন নিতান্ত ঘৃণার ভরে সেটাকে ওঠানে ফেলে রেখে, দৈত্যের রাজা বল্লেন, "শীগ্গির যত কলসী পাও নিয়ে এস।" রাজবাড়ীতে কলসীর অভাব কি? দেখতে দেখতে সেখানে হাজার কলসী জড় হয়ে গেল। সেই হাজার কলসীতে জল পূরিয়ে তাতে একেক ফোঁটা করে সেই মন্ত্র পরা জল দিয়ে, দৈত্যের রাজা বল্লেন, "যাও! বাড়ীময় ছড়িয়ে দাও গে।"

তার পর কি হল, তা আর না বল্লেও চলবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সমস্ত রাজবাড়ী আবার লোক জনের শব্দে গমগম করতে লাগল। যদি কারুর এক ফোঁটা রক্ত বা এক গাছি চূলও কোথাও পড়ে থাকে, সেই এক ফোঁটা রক্ত আর এক গাছি

চূলে ওষুধের জল পড়তেই সেই লোকটি উঠে দাঁড়ায় ; আর সেই লোক আবার তখনি ওষুধের জল চেয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় ছড়া দিবার জন্য ছুটে যায়।

হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, দেশের মানুষ গরু পশু পক্ষী এমনি করে আবার বেঁচে উঠতে লাগল। কিন্তু হায়! রাজা মশাইকে তার ভিতরে দেখতে পাওয়া গেল না। সকলেই হায় হায় করছে আর বলছে, "রাজা মশাই যদি না বাঁচলেন, তবে আর আমাদের বেঁচে কি লাভ হল?" তখন গণে দেখা গেল যে, শুধু রাজা মশায় নন, দেশের অর্দ্ধেক লোকই এখনো বাঁচতে বাকি আছে। এর যে কারণ কি, আর উপায়ই বা কি, তাই ভেবে এখন সকলে অস্থির, এমন সময় সিংহ দুটি বল্ল যে, "রাক্ষস যাদের আস্ত গিলে খেয়েছিল, তাদের রক্ত বা হাড় বা চুল কিছুই বাইরে পড়তে পায়নি, তাদের সবই রয়েছে ঐ বেটার পেটে। কাজেই বাইরে ওষুদের ছড়া দেওয়াতে তাদের কোন উপকার হয় নি।"

এ ত বড় মুস্কিলের কথা হল! রাক্ষসের পেট কেটে তাতে ওষুধের ছড়া দিলে সেই লোকগুলো বাঁচতে পারে, কিন্তু তা হলে যে রাক্ষস বেটাও আবার বেঁচে উঠবে। এর উপায় কি? আবার তখনি তাদের মনে হল যে, উপায় ত দৈত্যের রাজাই করবেন, তার জন্য আবার ভাবনা কেন?

তখনি সকলে খাঁড়া কুড়ুল কোদাল কাটারি, যে যা পেল তাই দিয়ে রাক্ষসের সেই বিশাল দেহটাকে টুকরো টুকরো করে কাটতে লাগল। তার পর সেই টুকরো গুলোতে ওষুধের ছড়া দিতেই দেশের বাকি লোকগুলোকে নিয়ে রাজা মশাই উঠে দাঁড়ালেন। রাক্ষসটাও তখন উঠে কেঁউ কেঁউ করে ছুটে পালাচ্ছিল, কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? সে দু পা না বাড়াতেই দৈত্যের রাজা এক থাপ্পড় মেরে তার পালাবার ল্যাঠা চুকিয়ে দিলেন।

তখন যে কি সুখের ব্যাপার হল, সে আর কি বলব। দেশের সকল লোক মিলে এ কথা ভেবে ঠিক করতে পারছে না যে দৈত্যের রাজাকে তারা কি দিয়ে পূজা করবে। দৈত্যের রাজা বল্লেন, "তোমাদের রাজ পুত্রেরা আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন, আমি আর তার চেয়ে বেশী কি করেছি? তোমাদের রাজা এখন থেকে আমার বন্ধু হলেন। আর তাঁর যে ছেলে দুটি,—"

এ কথা বলেই দৈত্যের রাজা আবার রাজপুত্রদের, আর তাদের সিংহ দুটিকে আঁজলায় করে তুলে, বুকে ধরে, ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন।

রোগ সারান।

একজন লোকের কোন অসুখ ছিল না—তবু সে "অসুখ হ'য়েছে" বলে তার ডাক্তারদের বিরক্ত করত। একদিন তার ডাক্তারকে সে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে রোগের কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। ডাক্তার বল্লেন—"বটে? আচ্ছা হাঁ কর ত!" সে হাঁ করল। "আচ্ছা এখন চোখ বুজে, জিব বার কর—আর আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেল; আমি কট্‌কটোমিটার দিয়ে তোমার ইম্পোটোকোটাম্ পরীক্ষা করি।" রোগী চোখ বুজে জিব বার ক'রে দাঁড়িয়ে রইল—ডাক্তার সেখান থেকে চম্পট! এক মিনিট পরে রোগী চোখ চেয়ে দেখে, রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। তারপর থেকে সে আর ডাক্তারকে অসুখের কথা বলে নি।

বুড়া বুড়ী।

এক ব্রাহ্মণের ছেলের নাক ছিল না। নাক না থাকলে ত মুখের চেহারাই মাটি হয়ে গেল। ছেলেটি সে কথা ভেবে বড়ই দুঃখিত থাকে। ছেলেটির মন বড়ই ভালো, স্বভাবটি তার চেয়েও মিষ্টি। কিন্তু তা হলে কি হয়?—তার যে নাক নাই! লজ্জায় বেচারা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে যায় না, গুরু মহাশয়ের কাছে গিয়ে পড়তে ভরসা পায় না। কাজেই তার লেখা পড়াও কিছু হল না।

কিন্তু ছেলেটি বড়ই ভাল ছিল। ধর্ম্ম কর্ম্ম যে টুকু সে করতে জানত, প্রাণ দিয়ে করত। দেবতা তাতেই তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তার শরীরের অসুখ টসুখ সব দূর হয়ে গেল; সে এত দিন বেঁচে রইল যে, তত দিন খুব কম লোককেই বাঁচতে দেখা যায়।

কিন্তু তা হলে কি হয়?—নাক যে নাই! লেখা পড়াও হল না, নাকও নাই, এমন লোকের কাছে কোন মা বাপ তাদের মেয়ের বিয়ে দেয়?

নাকও নাই, বিদ্যাও নাই, বিয়ে হওয়ারও কোন আশা নাই, এমন লোকের ঘর সংসার সবই মিছে। ব্রাহ্মণ তাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে মনের দুঃখে দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে আর মুনিদের আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন একটি সুন্দর গুহার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সে যে কি সুন্দর গুহা, তা কি বলব। গুহার ভিতরে গিয়ে ব্রাহ্মণ দেখলেন, সেখানে চাঁদের মত উজ্জ্বল এক তপস্বিনী বসে তপস্যা করছেন।

তিনি এমনি ভয়ানক বুড়ো যে, বুড়ো যাকে বলে। তাঁর বয়স যদি খুব কম হয়, তবু দশ হাজার বৎসর হবে!

এমন লোককে অবশ্যই মান্য দেখাতে হয়, কাজেই ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখবামাত্র যোড় হাতে নমস্কার করতে গেলেন। কিন্তু তপস্বিনী তাতে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে. জিভ্ কেটে বল্লেন, "করেন কি? করেন কি? আপনি হচ্ছেন আমার গুরুজন, আমাকে কি নমস্কার করতে হয়?"

ব্রাহ্মণ বল্লেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনি একে তপস্বিনী, তাতে বুড়ো মানুষ; আপনাকে নমস্কার করবনা ত কাকে করব? আপনার বয়স হবে দশ হাজার বৎসর, আমার হবে সবে এক হাজার বৎসর; আমার মত লোক আপনার গুরুজন কি করে হতে পারে?"

তপস্বিনী বল্লেন, "তা বল্লে কি হয়? আমার মা বলেছেন, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কাজেই আপনি আমার গুরুজন। মার কথা কি আমি অমান্য বা অবিশ্বাস করতে পারি? আমার মার নাম সুশ্যামা, তিনি গন্ধর্ব্বের রাজার মেয়ে। তিনি আমাকে এই গুহার ভিতরে রেখে বলে গিয়েছেন যে, প্রথমে যিনি এই গুহায় আসবেন, তাঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। সেই থেকে আমি এইখানে বসে কেবলই তপস্যা করছি।"

ব্রাহ্মণ তখন নিতান্ত মুস্কিলে পড়ে বল্লেন, "দেখুন, আমার নাক নাই, বিদ্যা নাই, ধন নাই, কোন গুণ নাই। এমন অভাগাকে কি বিয়ে করতে আছে? তবে, যদি কখনো সুন্দর আর বিদ্বান হতে পারি, তখন না হয় আমাদের বিয়ে হবে।"

তপস্বিনী বল্লেন, "তার জন্য ভাবনা কি? আমার তপস্যায় সরস্বতী আর অগ্নি তুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের দয়া হলে আপনার রূপও হবে, বিদ্যাও হবে, সবই হবে।"

সত্যি সত্যিই তপস্বিনীর খাতিরে অগ্নি ব্রাহ্মণকে তখনই সুন্দর নাক দিয়ে দিলেন, আর সরস্বতী তাঁকে মস্ত বড় পণ্ডিত করে ফেল্লেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, কিছুই আর তখন তাঁর জানতে বাকি রইল না। কাজেই তখন তাঁদের বিয়ে হতে আর বাধা কি?

বিয়ের পর বুড়ো বুড়ী মিলে সেই গুহায় বসে মনের সুখে ভগবানের নাম করতে লাগলেন। এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, কয়েক জন বড় বড় মুণি শিষ্যদের নিয়ে সেই পথে যাচ্ছেন, তীর্থ করতে। বুড়া বুড়ী পরম যত্নের সহিত তাঁদের সকলকে নিজের গুহায় ডেকে এনে বিশ্রাম করালেন। মুনিরা তখন তাঁদের সঙ্গে বসে অনেক ভাল ভাল কথা বল্লেন। কিন্তু তাঁদের চেলাগুলো কি না ছেলেমানুষ, তারা বুড়ার

চেয়ে বুড়ীর বয়স এত বেশী দেখে হাসতে লাগল, আর বল্ল, "ঠাকরুণ! এই ঠাকুরটি বুঝি আপনার ছেলে? না, নাতি?"

বুড়া বুড়ী তখন কিছু বল্লেন না বটে, কিন্তু ছোকরাদের কথায় তাঁদের ভারী লজ্জা হল, আর দুঃখও হল। সেই দুঃখে তাঁরা গৌতমী নদীর তীরে গিয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে গৌতমী নিজে এসে ব্রাহ্মণকে বল্লেন, "বাছা, তুমি দুঃখ ক'রো না। আমার এই জল এক কলসী নিয়ে তোমার ব্রাহ্মণীর গায় ঢেলে দাও, দেখবে, তাতেই তিনি লক্ষ্মীর মত সুন্দর হয়ে যাবেন। তার পর তিনি তোমার গায় আর এক কলসী জল ঢাল্‌লে তোমারও কার্ত্তিকের মত চেহারা হবে।"

সে কথায় ব্রাহ্মণ কি খুসী হয়েই কলসী আনতে ছুটলেন! গৌতমী ত আর যে সে দেবতা ছিলেন না; যিনি গঙ্গা, তিনিই গৌতমী। তাঁর কথা যে ঠিক, দুজনের গায় দুজনে জল ঢালতেই তা বুঝা গেল। তখন আর তাঁরা বুড়া বুড়ী রইলেন না। আর তাঁদের চেহারা হল দেবতার মত সুন্দর। তাঁদের স্নানের জলে সেখানে একটি নদী হয়ে গেল, লোকে তার নাম রাখল 'বৃদ্ধা'। আর সেই ব্রাহ্মণটি ছিলেন গৌতম মুনির ছেলে; তাঁর নাম সেই থেকে হল 'বৃদ্ধ গৌতম'।

লড়ায়ের বেলা।

একটা ষণ্ডা আর একটা রোগা লোকে ঝগড়া হচ্ছে। ষণ্ডাটা বল্লে, "মার্‌ব তোকে এক লাথী!" রোগাটা বল্লে, "আমার কি পা নেই?" ষণ্ডা বল্লে, "বটে? তোর পা দিয়ে তুই কি কর্‌বি?" রোগা বল্লে, "কেন? ছুটে পালাব!" তখন দুজনেরই খুব হাসি পেল, আর মিট মাট হয়ে গেল।

তবে দেখা যাচ্ছে, সকলের বেলায় যুদ্ধের কায়দা এক রকম হয় না। একটা রোগা কুকুর আঁস্তাকুড়ে দাঁড়িয়ে এঁটো পাত চাটছিল, এর মধ্যে একটা ষণ্ডা কুকুর এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তখন যে দু জনায় লড়াই হল, একটি ছেলে তার এই রকম বর্ণনা দিয়েছিল।—ষণ্ডাটা গলা ভার করে বল্ল, "কুছ্ হ্যা-া-া-া-া-য়?" রোগাটা খেঁকিয়ে বল্ল, "হে নাই!" অমনি ষণ্ডাটা আর কিছু না বলে রোগাটার ঘাড় টিপে ধর্‌ল, আর তখন রোগাটা "হ্যায়! হ্যায়! হ্যায়! হ্যায়!" বলে প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগল। তোমরা যদি কেউ এ রকম ঝগড়া স্বচক্ষে দেখে থাক, তবে বুঝতে পারবে, ছেলেটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে।

নিজেকে বাঁচিয়ে, দুষমনকে মার, এই হল যুদ্ধের উত্তম কায়দা। মারতে না পার, নিদেন নিজকে বাঁচিয়ে চল, একথাও মন্দ নয়। বেগতিক দেখলে ছুটে পালাবারও একটা দস্তুর আছে। অনেক জন্তু অনেক রকম কায়দা করে নিজকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচায়।

কচ্ছপের ক্ষমতা থাকলে সে তার শত্রুকে এমনি বিষম কামড়িয়ে ধরে যে, সে কামড় ছাড়ান বড়ই কঠিন হয়ে ওঠে। আর যখন তার ক্ষমতায় অতটা কুলায় না, তখন নিজের খোলার ভিতরে গলা হাত পা সব গুটিয়ে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। তখন অনেককেই সেই খোলার কাছে হার মান্‌তে হয়।

এ ফন্দিটি কচ্ছপ ছাড়া আরো কোন কোন জন্তুর জানা আছে। তাদের কারু গায় কাঁটা, কারু গায় শক্ত শক্ত আঁস। শত্রু এলে তারা হাত পা গুটিয়ে, লেজ মুখ

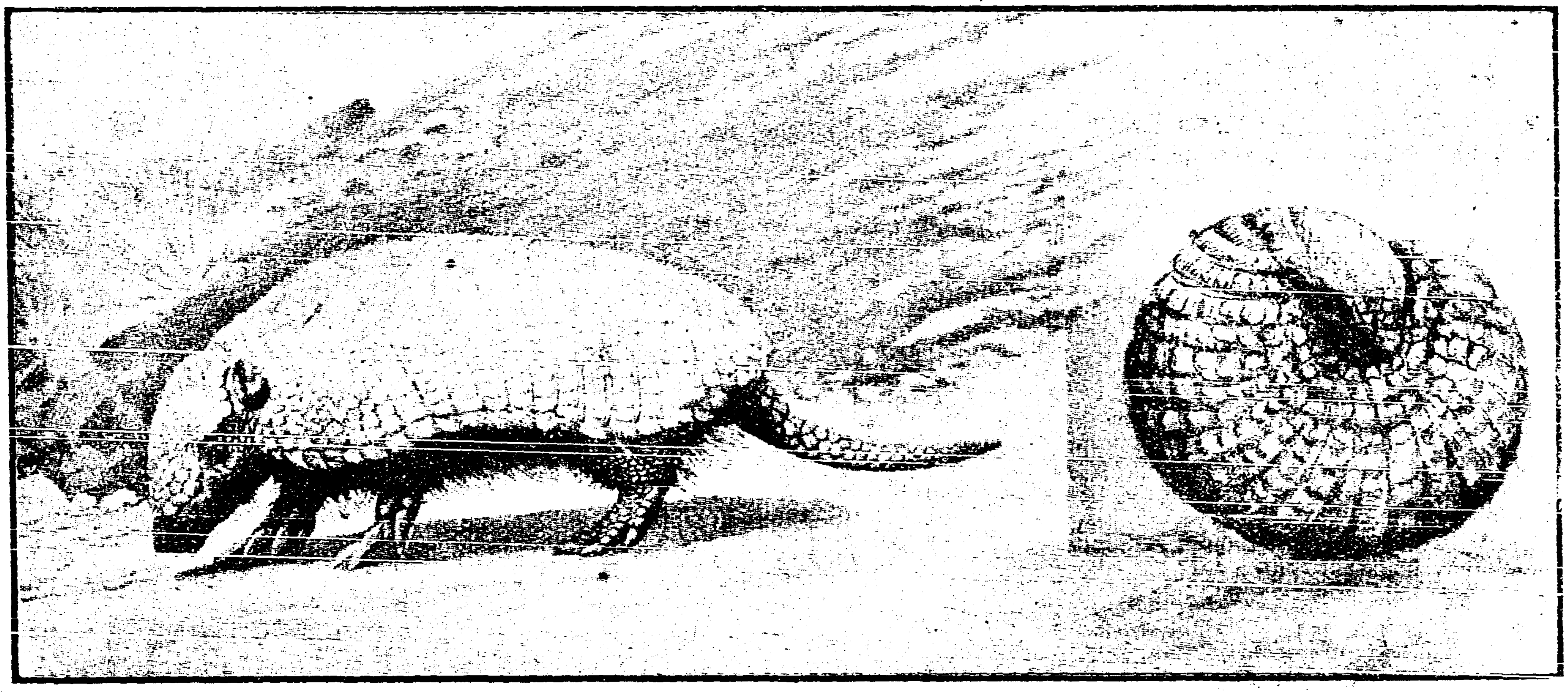

এই জন্তুর নাম আর্মেডিলো। শত্রু এলে এরা হাত পা গুটিয়ে গোলার মত হয়ে যায়।

গুঁজে একটি গোলার মত হয়ে যায়। তখন আর সহজে কেউ তাকে মারতে পারে না। কেন্নো যে টোকা দিলে টাকা হয়ে যায় তা তোমরা সকলেই দেখেছ।

কোন কোন জানোয়ার এমন আছে, তারা ভাল ক'রে না লুকিয়েই মনে করে "খুব লুকিয়েছি।" উটপাখী অনেক সময় লুকোতে হ'লে গাছের ঝোপে বা কোন গর্ত্তে মাথা ঢুকিয়ে থাকে—মনে করে কেউ বুঝি দেখ্‌তে পাচ্ছে না।

গাঁধি পোকা দেখেছ? তাকে যদি ধর্‌তে যাও তবে সে তার পিছন থেকে এমনি ঝাঁঝালো এক রকম রস ফুকে দিবে যে তার জ্বালায় তোমার চামড়ায় ফোস্কা পড়ে যায়।

এক রকম পোকা আছে তাকে বলে Bombardier Beetle অর্থাৎ কামানবাজ পোকা। বড় বড় পোকারা যখন তাকে তাড়া করে তখন সে এক রকম নীল রঙের ধোঁয়া ছাড়্‌তে থাকে তাতে শত্রুর দম আট্‌কে যায়।

স্কাঙ্ক্ (Skunk) বলে এক রকমের জন্তু আছে, তার কায়দাটাও অনেকটা এই রকমের। তার কাছেও এক রকমের রস থাকে। সে রসে ঝাঁজ নাই, কিন্তু তার এমনি বিদ্‌ঘুটে গন্ধ যে, সে গন্ধ নাকে গেলে ভূতকেও 'বাপ্পোইস্ রে!' বলে পালাতে হয়।

শিয়ালেরও এই গোছের একটা বদনাম আছে। আমাদের একজন বুড়ো চাকর বলেছিল, "কুকুর শিয়ালের কি কর্‌বে? গন্ধে তার কাছে ঘেঁষতে পার্‌লে ত? শিয়াল ভারী অসভ্য!"

কামানবাজ পোকা।

অনেক মাছ আছে, তারা প্রায়ই পুকুর বা নদীর তলার সঙ্গে মিশে থাকে। ধর্‌তে গেলে সেখানকার জল এমনি ঘোলা করে দেয় যে তখন তাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর সেই ফাকে সে সেখান থেকে চম্পট দেয়।

সমুদ্রের ভিতরে অক্টোপাস বলে এক রকম শামুকের জাতীয় জানোয়ার আছে। ভগবান তাদের প্রতেককে একটি করে কালীর থলে দিয়েছেন। বিপদের সময় সেই কালী ছড়িয়ে তারা জল ঘোলা করে দেয়। তখন আর তাদের পালাতে কোন মুস্কিল হয় না।

টিকটিকি নিতান্ত ফাঁপরে পড়লে তার লেজটি ফেলে রেখে ছুট দেয়। লেজটি পড়েই লাফাতে থাকে, আর শত্রু তা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে টিকটিকির কথা ভুলে যায়। তার কিছু দিন পরেই টিকটিকির আরেকটি নূতন লেজ বেরয়।

যাহোক, পালানই ত আর যুদ্ধের একমাত্র উপায় নয়, আর সে উপায় কিছু জন্তুরা পছন্দও করে না। যে সকল জন্তুর কথা বলা হল, তারাও নিজেদের ভিতরে খুবই তেজের সঙ্গে লড়াই করে থাকে। আর সে সময় তাদের অনেক রকম অদ্ভুত কায়দা খেলাতেও দেখা যায়।

ছাগলে ছাগলে যখন লড়াই হয় তখনকার কাণ্ডটা নিশ্চয় তোমরা সকলেই দেখেছ। কাজেই আর তার কথা বাড়িয়ে বলবার দরকার নাই। প্যাঁচার যুদ্ধের আয়োজনটি তার চেয়েও সরেশ। যুদ্ধের সময় কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াতে হয়, এই ত আমরা জানি। কিন্তু প্যাঁচা তা না করে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। ছেলেবেলায় একবার আমি একটা আম গাছে উঠতে গিয়ে হঠাৎ একটা প্যাঁচার বাসা দেখতে পেলাম। বাসায় তিনটা ছানা ছিল, তারা সকলেই আমাকে দেখে মস্ত মস্ত হাঁ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি ত তাতে হেসেই অস্থির। সেখানে একজন বুড়ো মানুষ ছিলেন, তিনি তখন আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ঐ হচ্ছে প্যাঁচার লড়াইয়ের কায়দা। ওদের গলা ছোট বলে ঠোঁট বাড়িয়ে ঠোকরাবার তেমন সুবিধা হয় না। কাজেই নখ দিয়ে লড়াই কর্‌তেই তারা বেশী ভালবাসে, আর সে কাজটা চিৎ হয়ে কর্‌তে পার্‌লেই যুদ্ধটি জমাট হয়।

মোরগের লড়াইও বেশ মজার। ঠিক ছোট কুস্তিওয়ালার মত দুটো মোরগ এসে এক পা বাড়িয়ে স্থির ভাবে সামনা সামনি হয়ে দাঁড়ায়, আর গলা নীচু করে প্রাণপণে চোখ রাঙ্গা রাঙ্গি কর্‌তে থাকে। হঠাৎ একবার দেখবে, দুজনেই উছলে উঠেছে, আর গলা ফুলিয়ে বিষম ঠোকরা ঠুকরী যুড়ে দিয়েছে। দুজনেরই চেষ্টা, কিসে শত্রুর ঘাড়ে কামড়ে ধরে তাকে জয় কর্‌বে। মোরগ দুটো বাচ্চা হলে, যুদ্ধ ততদূর গড়াবার আগেই হয় ত একটা বড় মোরগ ছুটে এসে তাদের ধমকিয়ে থামিয়ে দেয়।

আকাশ-যুদ্ধ।

U. RAY & SONS.

মাকড়ষার আটটি পা। যুদ্ধের সময় সে তার চারটিতে ভর দিয়ে আর চার পা শুদ্ধ মাথাটি উঁচু করে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে দাঁড়ায়। তার আসল হেতের হচ্ছে তার মুখের কাছের ঐ সাঁড়াশী দুটি। চারটি পা তুলে ধরার মতলব এই যে, তা দিয়ে শত্রুর চোট সামলাতে হবে। শত্রু যদি তার দু একটা ছিঁড়ে ফেলে, তাতেও ক্ষতি নাই, কেন না তার জায়গায় নূতন পা গজাতে বেশী দিন লাগবে না। গঙ্গা

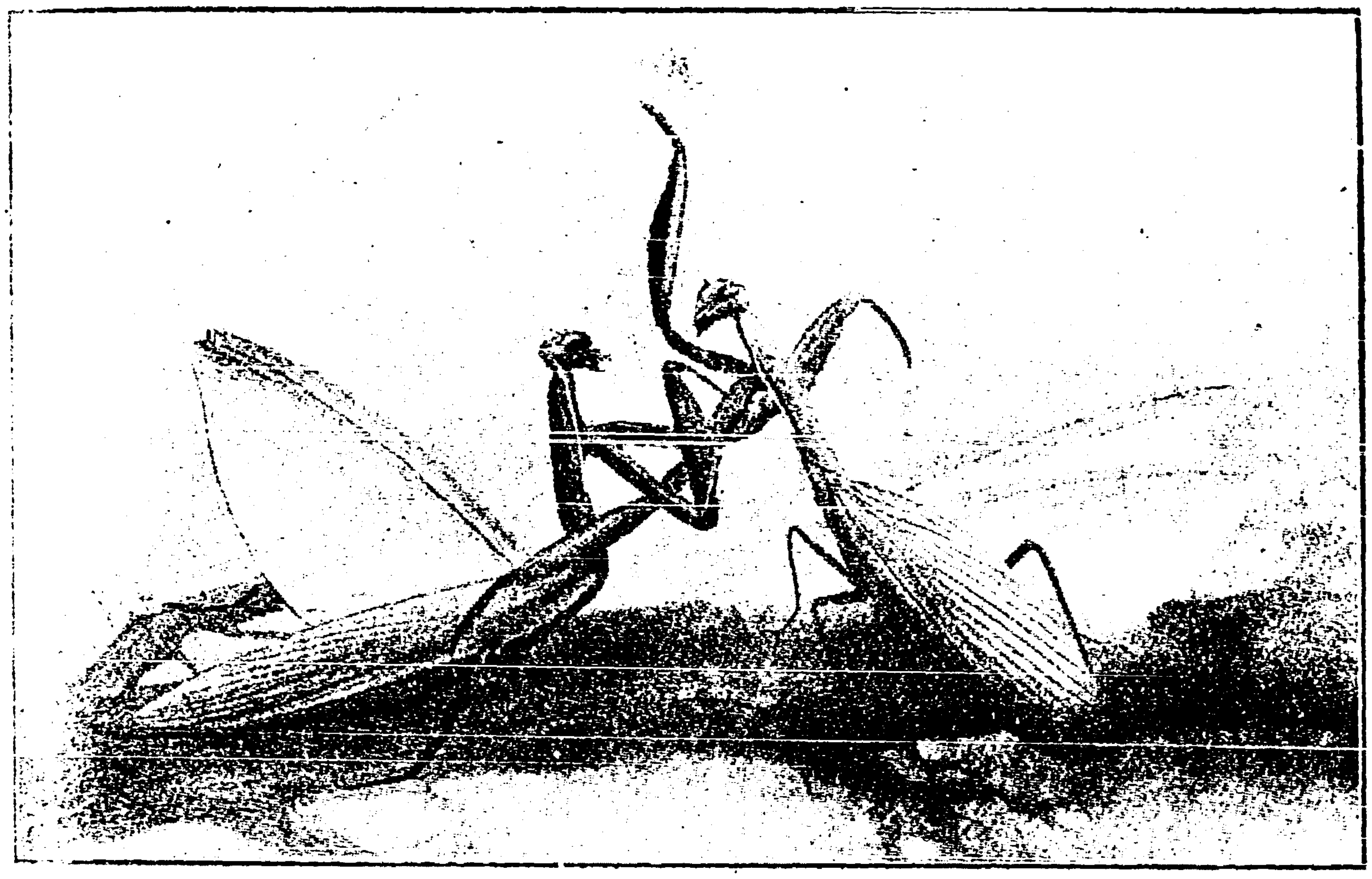

ফড়িংও যুদ্ধের সময় এমনি ভাবে সামনের পা উচু করে দাঁড়ায়।

জন্তুর পরিচয়।

লোকে বলে, বিড়াল নাকি বাঘের মাসী হয়; আর শেয়াল নাকি হয় তার ভাগ্নে। বিড়াল যে বাঘের মাসী, একথা মানতে আমি কতক রাজী আছি; কিন্তু শেয়াল যে তার ভাগ্নে, এটা ত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি যে, ভাগ্নের চেহারা তার মামার মত হয়। কিন্তু শেয়ালের চেহারা কি বাঘের মত? বাঘের মুখ হাঁড়ি পানা, শেয়ালের মুখ ছুঁচাল। বাঘের মত শেয়ালেরও বড় বড় ধারাল দাঁত আছে বটে, কিন্তু সে তেমন ধারালও নয়, তেমন বড়ও নয়। তার পর পায়ের নখগুলির দিকে চেয়ে দেখ। বাঘের বাঁকা বাঁকা নখগুলো কি ধারাল আর মজবুত, আর সেগুলোকে ইচ্ছামত কেমন খাপে ঢুকিয়ে রাখতে আর বার করতে পারা যায়।

বাঘের নখ পরীক্ষা করে দেখবার সুবিধা হবে না? আচ্ছা, না হয় বিড়ালের নখই দেখ। তোমাদের 'মেনী' যখন তোমাদের সঙ্গে খেলা করে, তখন তার পায়ের

দিকে চেয়ে দেখো ত। তখন সে যত্নের সহিত তার নখগুলিকে খাপে ঢুকিয়ে রাখে। তখন ত আর তার নখের দরকার নাই। সকল সময় নখ বার করে রাখলে সে ঘষায় ঘষায় ভোঁতা হয়ে যাবে যে; তা হলে ত তার একটা মস্ত হেতেরই মাটি হয়ে গেল। তাই কাজের সময় ছাড়া অন্য সময় মেনী তার নখ বার করে না। কিন্তু একটি ইঁদুর তার সামনে আসুক ত, তখন দেখবে সে কেমন নখ বার করে তাকে খাবল মেরে ধরবে। আমি কত বার দেখেছি।

অবশ্যি, তোমাদের মেনীটি পোষাকী হতে পারে। তার হয় ত ইঁদুর ধরার অভ্যাস নাই। আর অভ্যাস থাকলেও ত তোমাদের তামাসা দেখাবার খাতিরে এক্ষণি একটি ইঁদুর এসে তার সামনে হাজির হচ্ছে না। যা হোক এর আর একটা উপায় আছে। মেনীকে যদি এমন কোন জায়গায় তুলে দিতে পার যে, সেখান থেকে তাকে পিছলে পড়তে হয়, তাহলে দেখবে সে কেমন নখ বার করে আটকে থাকবার চেষ্টা করে।

মেনীটি যদি শান্ত হয়, আর তার আঁচড়াবার অভ্যাস না থাকে, তা হলে, সকলের চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, তাকে কোলে নিয়ে ধীরে সুস্থে তার থাবা পরীক্ষা করে দেখ। থাবার উপরে আর নীচে আঙুল দিয়ে টিপ দাও, অমনি নখগুলি বেরিয়ে আসবে। টিপ ছেড়ে দাও, আবার সেগুলো ভিতরে ঢুকে যাবে। বাঘের থাবায় ধরে দেখাবার সুবিধা নাই; আর, থাকলেও সেকাজ করতে তোমাদের কখনো বলি না,—যদি সেটা মরা বাঘ না হয়। কিন্তু দেখতে পারলে বুঝতে যে, বাঘ আর বিড়াল একই রকমের জানোয়ার, খালি ছোট বড়র তফাৎ। বাঘ, সিংহ এরা সব বিড়ালেরই কুটুম্ব। গরম দেশে এরকমের জন্তু ঢের আছে। কোনটা হলদে, কোনটা ছেয়ে, কোনটা কটা, কোনটা কালো; কোনটার গায় ডোরা, কোনটার গায় চক্র। কোনটা মস্ত বড়, তাকে বলি বাঘ; কোনটা ছোট, তাকে বলি বিড়াল। আসলে এরা সকলেই ভাই বেরাদর; এরা হচ্ছে বিড়াল বংশ।

তাই বলছিলাম, বিড়াল যে বাঘের মাসী, একথা আমি কতক মানি। কিন্তু শেয়াল যে বাঘের ভাগ্নে, এটা নিতান্ত বাজে কথা; শেয়াল বাঘের কেউ নয়। শেয়ালের দাঁত নখ ছোট ছোট আর সরু সরু। বাঘের নখ দাঁতের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। আর শেয়ালের এমন ক্ষমতা নাই যে ইচ্ছা মত তার নখ বার করে বা গুটিয়ে রাখে। তার সোজা সোজা নখগুলো খোঁটার মত তার আঙ্গুলের আগায় বসান থাকে।

ভেবে দেখতে গেলে, কুকুরের সঙ্গে শেয়ালের চেহারা খুব মিলে। কুকুরের নখ দাঁত শেয়ালেরই মত। নেকড়েরও তাই। এরা সব ভাই বেরাদর—এরা কুকুর বংশ।

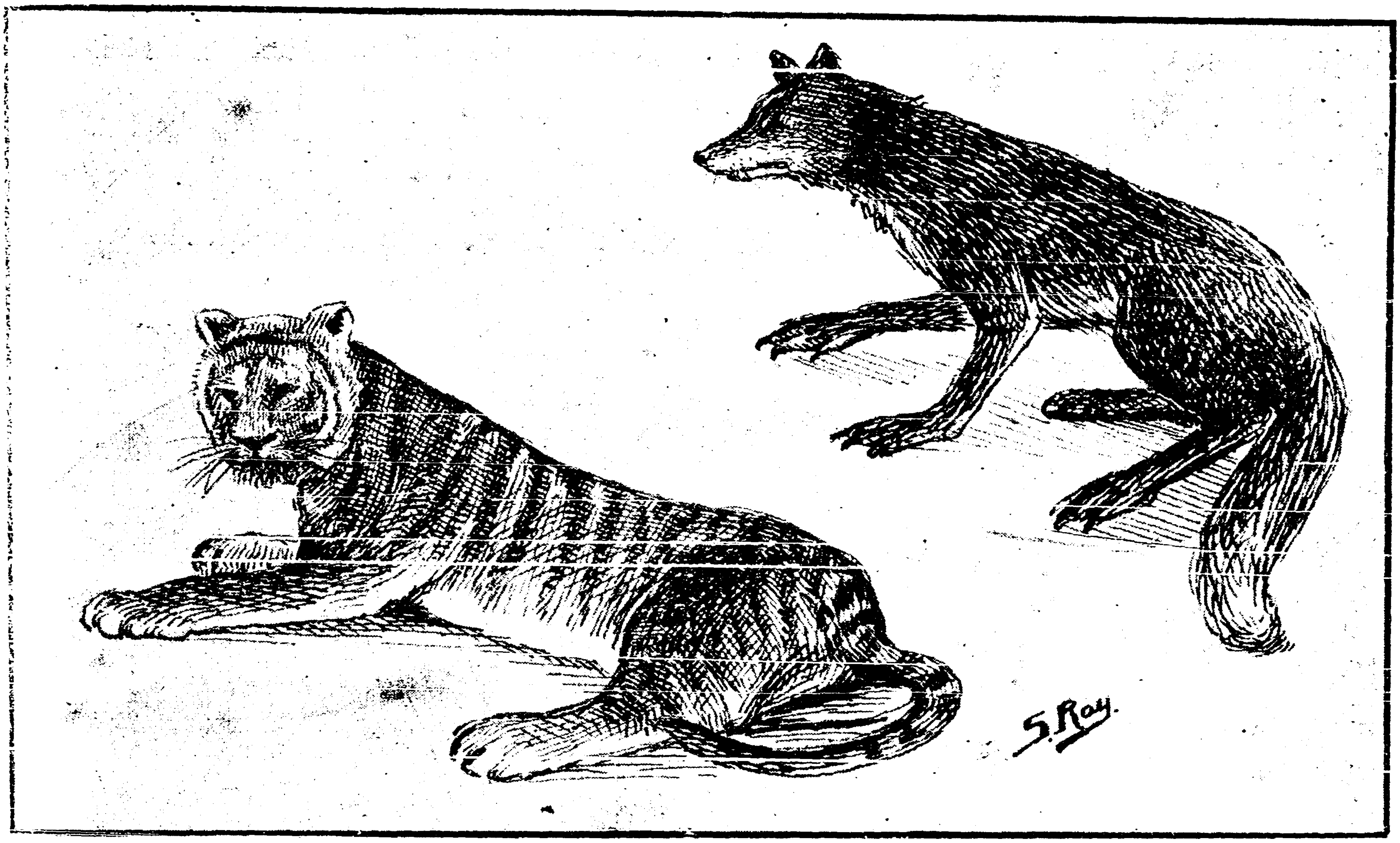

এক হিসাবে কিন্তু বাঘ বিড়াল আর শেয়াল কুকুর এক বংশ না হলেও এক দল বলা যেতে পারে। এরা সকলেই মাংস খায়। গরু ঘোড়া মাংস খায় না, তারা আরেক দল। এদের দাঁত আর নখও মাংস খেকো জানোয়ারের দাঁতের মত ধারাল নয়। যা হোক, এখন আমাদের অত খুঁটি নাটির খবর না নিলেও চল্‌বে। তার চেয়ে কাজের কথা এই হচ্ছে যে, এই যে বাঘ শেয়াল আর গরু ঘোড়ার দুটো দল হল, এদের মধ্যে আবার এক বিষয়ে মিল আছে—এরা সকলেই শিশুকালে মায়ের দুধ খায়। কাজেই এদের দুটো দল হলেও, ধর্ম্মটা একই দেখা যাচ্ছে। পাখীরা শিশুকালে মায়ের দুধ খায় না, মাছেরাও খায় না; তাদের ধর্ম্ম অন্য রকম। আবার, বাঘ, শিয়াল, গরু, ঘোড়া, পাখী, মাছ, এদের মধ্যেও একটা মস্ত কথায় এমন মিল আছে যে, তাতেই এদের সকলের এক জাত করে দিয়েছে। পিঠে একটি শির-দাঁড়া, আর গায় হাড় এদের সকলেরই আছে।

হাড় কি সকল জন্তুর থাকে ? ফড়িঙের হাড় নাই, কেঁচোর নাই, শামুকের নাই, আরো কত জন্তুর নাই। যাদের শিরদাঁড়া আছে, আর যাদের নাই, এই হল তবে প্রাণীদের দুই জাত। একটা জন্তুর পরিচয় জান্‌তে হলে, দেখ, কত কথার খবর নিতে হয়। আগে দেখব সে কোন্ জাতের, তারপর দেখব সে কোন্ ধর্ম্মের, তারপর দেখব সে কোন্ দলের, তারপর দেখব সে কোন্ বংশের। এত করে তবে তার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যাবে। ঠিক যেন চিঠির ঠিকানা,—অমুক সহরে, অমুক গলিতে, এত নম্বরের বাড়ীতে, পরমকল্যাণীয়, শ্রীমান্ অমুকের হাতে পঁহুছে। তাহলে ত শ্রীমান চিঠিখানি পাবেন, নইলে শুধু খাম মায়ের পয়সা খরচ।

ঝানু চোর চানু।

ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ, আশপাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড় গরিব ছিল, চানু ভাবল বিদেশে গিয়ে টাকা পয়সা রোজকার করে আন্‌বে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, একদিন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূর গিয়েই বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জ্জন রাস্তা—চানু সেই রাস্তা ধরে চল্ল। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় পথের ধারেই একটী কুঁড়ে ঘর ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত।

ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে একটী বুড়ি বসে ছিল, চানুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল,—"কি চাই বাপু তোমার ?"

চানু বল্ল, "চাইব আর কি, কিছু খাবার দাবার চাই, আর একটী বিছানা চাই।"

বুড়ি বল্ল, "সরে পড় বাপু! এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টী ছেলে, সারা দিন খেটে খুটে তারা এখনি বাড়ী ফির্‌চে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেল্‌বে।"

চানু। "সেটা আর বেশী কথা কি ? এই ঠাণ্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরার চাইতে গায়ের চামড়া তুলে ফেল্‌বে সেইটাই বরং ভাল।"

বুড়ি দেখল সে সহজ লোকের পাল্লায় পড়ে নি; কি আর করে, তখন চানুকে পেট ভরে খেতে দিল। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বল্ল, "দেখ বুড়ি! তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙ্গায় তা হলে কিন্তু বড্ড মুস্কিল হবে বল্‌ছি।"

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গলে পর চানু দেখল ছয় জন অতি বদ-চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—সে তাদের দেখে গ্রাহ্যও কর্‌ল না।

দলের সর্দ্দারটী তখন চানুকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তুমি কে হে বাপু? কি চাও এখানে?"

চানু। "আমার নাম সর্দ্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক চতুর হও তাহলে তোমাদের অনেক বিদ্যে শিখিয়ে দিব।"

সর্দ্দার বল্ল "আচ্ছা বেশ, তুমি তাহলে এখন উঠে একটু খাও দাও তারপর দেখা যাবে এখন কে সর্দ্দার।"

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেল। ঠিক তার পরই সকলে দেখল একটা সুন্দর ছাগল সঙ্গে নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশে যাচ্ছে। তখন চানু বল্ল, "আচ্ছা, তোমাদের কেউ কোন রকম জবরদস্তি না করে সুধু ফাঁকি দিয়ে ঐ লোকটার ছাগলটা নিয়ে আস্‌তে পার?" একজন একজন করে সকলেই বল্ল, "না ভাই, আমরা কেউ তা পার্‌ব না।"

চানু। "বাস্, তা হলেই দেখ আমি তোমাদের সর্দ্দার কি না—আমি এখনি ছাগলটা নিয়ে আস্‌ছি।" এই বলে সে তখনি বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে কিছু দূরে রাস্তার আর একটা মোড়ে বাঁ পায়ের জুতোটাও রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথম জুতোটা দেখে মনে করল, "খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটী দিয়ে কি হবে আর এক পাটীও থাক্‌লে বেশ হতো।"

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে কৃষক আর এক পাটী জুতো দেখে ভাবল, "আমি কি বোকা, ও পাটীটা যদি নিয়ে আস্‌তাম! যাই তাহলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে।" একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চল্ল জুতো আন্‌তে। এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই সেটা নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেল তখন চানুও বাঁ পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলটার বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুটীরে এসে উপস্থিত।

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটাও পেল না ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেল না, তার উপর আবার যখন দেখল যে ছাগলটীও সেখানে নাই, তখন সে ভাবল, এখন করি কি? গিন্নিকে যে বলে এসেছি বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্য একখানা গায়ের

চাদর কিনে নিয়ে যাব! যাই তাহলে চুপ্ চাপ্ গিয়ে আর একটা জন্তু নিয়ে আসি, তা নইলে যে ধরা পড়ে যাব—গিন্নি ভাব্‌বে আমি বোকার একশেষ।

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়ীতে যখন গেল তখন সেই চোরেরা ত একেবারে অবাক্—চানুকে কত করে জিজ্ঞাসা কর্‌ল কিন্তু কিছুতেই সে বল্ল না কি করে সে ছাগল আনল।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটা মোটা সোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বল্ল, "যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আন্‌তে পার।" ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার কর্‌ল। তখন চানু বল্ল, "আচ্ছা দেখি আমি পারি কিনা, আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।" দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতর ঢুকে পড়ল।

এদিকে কৃষকটী তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে,

মোড়ের কাছেই এসে দেখে গাছের ডালে একটা মরা ঝুল্‌ছে। মরা দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিল, "রক্ষা কর বাবা! খানিক আগেত এখানে মরা টরা কিছু দেখতে পাই নি!" সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখল আরেকটা মরা গাছের ডালে ঝুল্‌ছে। "রাম রাম

রাম—এ হলো কি ? আমার মাথাটা গুলিয়ে যাই নি ত ?” কৃষক তাড়াতাড়ি চল্ল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! রাস্তার আরেকটা মোড়ে গিয়ে দেখে সেখানেও একটা মরা ঝুল্‌তে। পর পর তিনটে তিনটে মরা এতটা কাছাকাছি ঝুল্‌ছে দেখে তার মনে সন্দেহ হলো—নাঃ, এ কখনই হতে পারে না, আমারই বোধ করি মাথা খারাপ হয়েছে, আচ্ছা, দেখে আসি আগের মরা দুটো এখনও গাছে ঝুল্‌ছে কিনা।” কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে তখন ডালের মরা চট্‌ করে নেমে এসে বাঁধন খুলে ঘোড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ী গিয়ে হাজির।

(ক্রমশঃ)

লেখার কথা।

আমি বসে বসে লিখছি, আর ভাবছি কি একটা মস্ত কাজই করছি! ছেলে বেলা থেকে একাজ করে করে আমাদের সয়ে গেছে, তাই এটাকে আর তেমন আশ্চর্য্য মনে হয় না। কিন্তু একাজের কথা যদি আমাদের কিছু জানা না থাকত, আর, হঠাৎ একদিন একজনকে লিখতে দেখতাম, তখন বুঝা যেত, কেমন লাগে।

অষ্ট্রেলিয়া দেশের লোকেরা অসভ্য, তারা লেখা পড়ার কথা কিছু জানে না। সেই অসভ্যদের কয়েকজনকে নিয়ে এক সাহেব কতগুলো কাঠের জিনিস তয়ের করছিলেন, এমন সময় তাঁর মনে হল যে, মাটাম খানা ঘরে ফেলে এসেছেন। মাটাম না হলে কাজ কি করে হবে ? তাই তিনি এক টুকরো কাঠের উপরে খড়ি দিয়ে 'মাটাম খানা চাই' এই কথাগুলো লিখে সেই অসভ্যদের সর্দ্দারকে দিয়ে কাঠ খানা মেম সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। মেম সাহেব সেই কথাগুলো পড়ে, তখনি মাটাম এনে বল্লেন, ‘এই নাও’। সর্দ্দার ত তাতে একেবারে অবাক হয়ে গেল। একখানা কাঠের টুকরো থেকে কি করে মেম সাহেব টের পেলেন যে, সাহেবের মাটামের দরকার হয়েছে ? সে মাটাম নিয়ে অনেক দূর চলে এসেছিল, কিন্তু ঐ কথাটা তার মাথায় ঢুকে এমনি তোলপাড় যুড়ে দিল যে, বেচারার আর যাওয়া হল না। সে মেম সাহেবের কাছে ফিরে গিয়ে বল্ল, “মা! একটা কথা!” মেম সাহেব বল্লেন, “কি কথা, সর্দ্দার ?” সর্দ্দার বল্ল, “তুমি কি করে জানলে যে আমি এই জিনিসটা নিতে এসেছিলাম ?” মেম সাহেব বল্লেন, “কেন ? তুমি এই যে কাঠখানা এনেছিলে,

তাতেই ত লেখা ছিল।” ‘লেখা ছিল’ বল্লে কি বুঝতে হয়, তা কি আর সেই অসভ্য লোকটি জানে? সে ভাবল, নিশ্চয় কাঠখানিতে যাদু আছে। তখন সেই কাঠখানার উপরে তার এমনি ভক্তি হয়ে গেল যে, সে তাকে দাড়ি দিয়ে বেঁধে গলায় পরে ভাবল ভারী একটা ওষুদ পেয়ে গেলাম! তার পর থেকে প্রায়ই দেখা যেত, সে তার দেশের লোকদের সেই আশ্চর্য্য ওষুদের কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে, আর তারা সকলে হাঁ করে তাই শুনছে।

বাস্তবিক, একখানা কাগজের টুকরোয় কালীর আঁচড় দিয়ে আমার মনের কথা অপরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, এটা কি কম আশ্চর্য্য ব্যাপার? এ বুদ্ধিটা না জানি কার মাথায় আগে এসেছিল! যার মাথায়ই এসে থাক্, সে আজকালকার মত এরকম ‘হরপ’ লিখতে শিখেছিল কি না, সেটি সন্দেহের বিষয়। একটা কোন জিনিসের উপরে এঁকে দেওয়া গেল, তাই দেখে আরেক জন লোক কাজের কথাটি বুঝে নিল। এমনি করেই হয় ত প্রথমে ‘লেখা’ আরম্ভ হয়েছিল।

আমি যে শুধু আন্দাজের উপরে এত কথা বলে যাচ্ছি, তা নয়। পুরাতন মিসর দেশের লোকেরা ঠিক এই রকম ছবি এঁকে এঁকে লেখার কাজ চালাত। সে সময়কার পুরাণো পুঁথি সব আজও আছে, তার লেখাগুলো আর কিছু নয়, খালি সা’র সা’র করে ছোট ছোট ছবি আঁকা,—মানুষ, পাখী, গরু, ভেড়া, আরো কত কিছু—অবশ্য, খুব ছোট ছোট সাদা সিদে রকমের ছবি। ধর্ম্মের বই, গল্পের বই, ওষুদের বই, সব এমনি করে ক্ষুদে ক্ষুদে ছবি দিয়ে লেখা। সে লেখা আজকালকার পণ্ডিতেরা পড়ে, তা থেকে কত কথাই জেনে নিয়েছেন।

চীন দেশের অক্ষর কি? সেও ছবি। তাদের ভাষায় যতগুলো কথা, তার প্রত্যেকটির জন্য এক একটি আলাধা ছবি। এমনিতর ত্রিশ হাজার ছবির মানে জানলে তবে তাদের দেশী লেখায় পণ্ডিত হওয়া যায়। ছবিগুলো অবশ্যি খুবই সাদা সিদে; যেমন, এই একটি ছবি, এর মানে ‘মেয়ে’। এই হল আর একটি ছবি। এর মানে হচ্ছে ‘এক ঘরে দুটি মেয়ে,’ তার মানে হচ্ছে,—‘ঝগড়া!’ আমি বানিয়ে বলছি না, বাস্তবিকই আমি একটা পুস্তকে এরকম দেখেছি। চীনদেশী মেয়েরা বড্ড ঝগড়াটী কি না সে কথা চীনেরাই বলতে পারে তাদের ঝগড়ার হরপটি কিন্তু ঐ রকমের।

পণ্ডিতেরা বলেন ইংরাজী হরপগুলোও নাকি গোড়ায় কতকটা ঐ রকম করে হয়েছিল। এ সব হরপ ইংলণ্ডে তয়ের হয়নি, এসিয়ার ওদিক থেকে এসেছে। ইংরাজী ভাষার অনেক আগে এদের সৃষ্টি হয়েছিল। A অক্ষরটি নাকি হয়েছিল ষাঁড়ের নাম থেকে; ঐ শব্দটার প্রথম অক্ষর A। এই হরপটিকে অমনি দেখতে ঘরের মত দেখায় বটে, কিন্তু একে উল্টালেই ষাঁড়ের মাথার মত হয়ে যাবে ∀। M যার প্রথম অক্ষর, সে কথার মানে হচ্ছে 'জল'। ᵐ এমনি লিখলে জলের ঢেউ অনায়াসেই আঁকা যায়; তা থেকেই সংক্ষেপে M হয়েছে।

আমাদের এই বাঙ্গলা অক্ষরগুলি কোত্থেকে এসেছিল সে কথার উত্তর কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি। বাঙ্গলা, নাগরী, কাইথী, উড়ে, এ সব মোটামুটি একই অক্ষরের ঘোর ফের। কিন্তু সেই অক্ষর আগে কোন জিনিসের ছবির মত ছিল কি না, সে আর এখন বলবার যো নাই।

দুষ্ট ভাই।

এক রাজার ছোট্ট দুটি ছেলে ছিল; একটির নাম গর, আরেকটির নাম নর। ছেলে দুটি এমনি সুন্দর যে, দেবতার ছেলেও তার চেয়ে সুন্দর নয়। দেবতার রাজা আর রাণী তাদের দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন, আর ভাবতেন, নিরিবিলি পেলে একদিন তাদের কোলে নিয়ে আদর করবেন।

সে দেশটা ছিল সমুদ্রের ধারে। সেইখানে বালির উপরে ছেলে দুটি খেলে বেড়াত, আর সাগরে ঢেউ না থাকলে তাদের ছোট্ট নৌকাখানিতে উঠে মাছ ধরতে যেত। একদিন সাগরের জল খুব স্থির হয়েছে, তা দেখে দুটি ভাই তাদের নৌকাখানি নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছে, এমন সময় ভয়ানক ঝড় এসে, নৌকা শুদ্ধ তাদের ঠেলে একেবারে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে উপস্থিত করল।

ভাগ্যিস্ সেখানে একটি ছোট্ট দ্বীপ ছিল, আর তাতে নৌকাখানি আটকে গেল, নইলে সেদিন আর বিপদের সীমাই ছিল না। দুটি ভাই তখন সেই দ্বীপটিতে নেমে এদিক ওদিক বেড়িয়ে দেখতে লাগল। দ্বীপটিতে একখানি ঘর ছাড়া আর কিচ্ছু নাই;

সেই ঘরটিতে একটি বুড়া আর একটি বুড়ী থাকে। বুড়া বুড়ী তাদের দেখেই তাড়াতাড়ি এসে কোলে করে তাদের সেই ঘরে নিয়ে গেল, আর কি সুন্দর মিঠাই মণ্ডা যে খেতে দিল, তা কি বল্‌ব।

সেই বুড়া বুড়ী কিন্তু আর কেউ নয়, তাঁরাই দেবতাদের রাজা আর রাণী। ছেলে দুটিকে ঝড়ে পড়তে দেখেই তাঁরা বুড়া বুড়ী সেজে ছুটে এসেছেন, আর সেই ফাঁকে তাদের কোলে করবার সাধও মিটিয়ে নিচ্ছেন। তখন থেকে সেই দ্বীপেই তাঁদের কাছে ছেলে দুটি থাকে, আর তাঁদের বড্ড ভালবাসে। এর মধ্যে গরের বেশী ভাব দেখা যাচ্ছে রাজার সঙ্গে, আর নরের রাণীর সঙ্গে। কাজে থেকে গর নানা রকম অস্ত্রের খেলা শিখেছে; নর রাণীর কাছে বসে বসে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনেছে। ছেলেটি বেশ আছে! মাঝে মাঝে তাদের মা বাপের কাছে যাওয়ার কথা মনে হয়, কিন্তু সে যে শীতকাল, বড্ড ঝড়ের দিন, কাজেই আর যাওয়ার উপায় নাই।

তারপর ক্রমে বসন্ত কাল এল, ঝড় থেমে গিয়ে নীল আকাশ দেখা দিল, সাগরও ঠাণ্ডা হল। তখন দেবতার রাজা তাদের দু জনকে নৌকায় তুলে দিয়ে বল্লেন, 'এখন তোমরা দেশে যাও।' দু ভাই নৌকায় উঠে বস্‌তেই, ফুরফুরে হাওয়ায় ঠেলে তাদের বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়ে দিল। কিন্তু, হায়! নরের তবু দেশে যাওয়া হল না। নৌকা ডাঙ্গায় ঠেকতে না ঠেকতেই গর তা থেকে লাফিয়ে পড়ে, আবার সেটাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিল; আর তক্ষণি শোঁ শোঁ শব্দে উল্টো হাওয়া বয়ে, বেচারা নরকে কোথায় যে কোন্ অজানা দেশে নিয়ে গেল, সে দেশের নাম কেউ কখনো শোনে নি। সেইখানে থেকে বড় হয়ে শেষে সে এক দৈত্যের মেয়ে বিয়ে করেছিল।

এদিকে গর বাড়ী এসে তার বাপকে বল্ল, "বাবা, আমরা দুজনে নৌকায় করে আস্‌ছিলাম; এর মধ্যে নর যে কখন জলে পড়ে গিয়েছে, তা দেখতে পাইনি।" যা হোক, বাপ মায়ের ত দুটি ছেলেই গিয়েছিল, কাজেই তার জায়গায় একটিকে পেয়েই তাঁদের সুখের সীমা রইল না। তারপর যখন অনেক দিন পরে রাজা মরে গেলেন, তখন তাঁর জায়গায় গরই রাজা হল।

সেই সময়ে একদিন দেবতার রাজা আর রাণী স্বর্গে বসে এদের দু ভাইয়ের কথা নিয়ে তর্ক কর্‌ছিলেন। রাজা বল্লেন, "দেখ ত, আমার গর এখন কত বড় রাজা হয়েছে, আর তোমার নর দৈত্যের মেয়ে বিয়ে করে তাকে পেট ভরে খেতেই দিতে পার্‌ছে না।" রাণী বল্লেন, "সে বরং ভাল। তোমার গরের মত দুষ্টু লোক হয়ে তার কাজ নেই। বড় রাজা হয়ে কি হবে? তার বাড়ীতে অতিথ গিয়ে জায়গা পায় না। জায়গা পেলেও নাকাল হয়ে আসে।" রাজা বল্লেন, "বটে, আচ্ছা, এই দেখ আমি দুঃখী পথিকের বেশে তার কাছে যাচ্ছি। তোমার কথা যে মিথ্যা, তা এখনি প্রমাণ করে দিব।" বলেই রাজা সেখান থেকে পথিকের বেশে বেরিয়ে গেলেন।

রাণীর মনে তখন ভয় হয়েছে। যদিই এবারে কোন রকম করে গরের মেজাজ ভাল হয়ে যায়, আর সে এই পথিকটিকে খুব আদর যত্ন করে? তা হলে ত বড়ই লজ্জার কথা হবে। রাণী তখনি একটা লোককে ছুটিয়ে গরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সে গিয়ে তাকে বল্ল, "রাজা মশায়, একটু সাবধান থাকবেন। একটা ঝোল্লা পরা টুপী ওয়ালা লোক যদি আসে, তাকে কিন্তু ঢুক্‌তে দিবেন না। সে বেটা ভারী দুষ্টু; নিশ্চয় যাদু টাদু করে আপনার একটা কিছু বিপদ ঘটাবে।

তারপর যখন দেবতার রাজা সন্ধ্যাবেলায় পথিকের বেশে এসে সেখানে দেখা দিয়েছেন, অমনি ত পিয়াদারা তাকে ধরে নিয়ে গরের কাছে উপস্থিত করেছে। গর তাঁর মুখের পানে কটমট করে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তোমার নাম কি হে?" তিনি বল্লেন, "আমার নাম গিরিমণি।" "তোমার বাড়ী কোথায়?" "বাড়ী আবার কোথায় হবে? পথে পথে ঘুরে বেড়াই।" "তুমি কি চাও?" "চাইব আবার কি? একটু জায়গা পেলেই ঢের।" এ সব কথা শুনে গরের মনে বড়ই সন্দেহ হল; সে ভাবল, নিশ্চয় এর মতলব ভাল নয়, নইলে কথার উত্তর এমন করে দেয় কেন? তখন সে দুই চোখ লাল করে হুকুম দিল, "দুটো আগুনের ধূনী করে, তার মাঝখানে এ বেটাকে নিয়ে বেঁধে রাখ্। পুড়তে যেন দিস্‌নে, খালি তাতিয়ে মার্‌বি।" আট দিন আট রাত

ধরে বেচারা দেবতার রাজাকে তারা এমনি করে বেঁধে রাখল, এক মুঠো চিঁড়েও খেতে দিল না'। ' দেবতার রাজার ত তাতে আর বিশেষ কিছু এসে যায় না ; তিনি চুপ করে বসে দেখছেন, এরপর কি করে।

এদিকে হয়েছে কি,—গরের ভাই সেই যে নর, সে এর অনেক দিন আগেই দেশে এসেছিল। এসে, গরের বাড়ীতেই সে চাকর হয়ে আছে, কেউ তাকে চিনতে পারেনি। এই বেচারা পথিককে এমন ভাবে দুই আগুনের মাঝখানে বাঁধা দেখে নরের বড় দয়া হয়েছে। তাই সে একদিন দুপুর রাতে চুপি চুপি তাকে এক গ্লাস সরবৎ এনে দিয়ে বল্ল, "আহা, না জানি তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ ; এই সরবৎটুকু খাও।" আসলে আগুনের জ্বালায় দেবতার রাজার খুবই তৃষ্ণা পেয়েছিল। এই সরবৎটুকু খেয়ে তিনি ভারী আরাম বোধ করলেন।

এই ভাবে আট দিন চলে গেল। নয় দিনের দিন দেবতার রাজা এক গান ধরে দিলেন তার মানে এই হচ্ছে যে, গর তার নিজের তলোয়ারের খোঁচায়ই প্রাণ হারাবে। গর সেইখানেই বসে তামাসা দেখছিল। সে সেই গান শুনে রাগে অস্থির হয়ে তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় দেখতে পেল যে পথিকের বাঁধন সব আপনি খুলে গেছে, আগুন আপনা হতেই নিবে গেছে, আর—সে ত পথিক নয়, তার জায়গায় যে নিজে দেবতার রাজা দাঁড়িয়ে! দেখেই ত সে ভয়ানক চমকে, গিয়েছে নিজের তলোয়ারের উপর পড়ে, আর সেই তলোয়ার গিয়েছে তার পেটের ভিতর ঢুকে। তারপর দেখতে দেখতে সকলের হৈচৈয়ের ভিতরে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল, দেবতার রাজার কথাও হাতে হাতে ফল্‌ল।

তখন দেবতার রাজা নরকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, "বাছা, তোমার দয়া দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। মনের সুখে রাজ্য কর ; তোমার কোন ভয় নাই।" এই বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন, আর নর তার স্ত্রী সেই দৈত্যের মেয়েকে আনিয়ে দুজনে পরম আনন্দে রাজ্য করতে লাগল।

পাজি পিটার।

দূর থেকে রাজাকে দেখেই পিটার একদৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল! তার বোন্‌কে সে আগে থেকেই সব শিখিয়ে রেখেছিল—সে কর্‌ল কি একটা খরগোস্‌ কেটে তার রক্ত দিয়ে একটা থলি ভ'রে সেই থলিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌ল।

রাজা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "পিটার কৈ? তাকে শীগ্গির্‌ ডাক"। পিটারের বোন্‌ বল্ল "দোহাই মহারাজ, পিটার এখন ঘুমুচ্ছে—সে ভয়ানক রাগী লোক এখন জাগাতে গেলে আমায় মার্‌বে"। রাজা বল্লেন "কিছু ভয় নেই—আমি আছি"।

পিটারের বোন্‌ পিটারকে ডাক্‌তে গেল। খানিক বাদেই একটা চীৎকার গর্জ্জনের মত শোনা গেল, রাজা দৌড়ে গিয়েই দেখেন পিটার একটা ছুরি নিয়ে তার বোন্‌কে মার্‌ল আর সে বেচারা ঠিক যেন মড়ার মত প'ড়ে গেল—রক্তে তার কাপড় লাল হ'য়ে গেল। রাজা বল্লেন "তবে রে পাজি পিটার—তোর বোন্‌টাকে শুধু শুধু মেরে ফেল্লি?" পিটার বল্ল "মহারাজ, এক মিনিট সবুর করুন!" এই বলে সে একটা ভাঙা শিঙের বাঁশী নিয়ে তার বোনের চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগ্‌ল। এক মিনিটের মধ্যে মেয়েটা চোখ মেলে বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বস্‌ল। রাজা ত অবাক! তিনি বল্লেন "এই শিঙেটা আমায় দিতে হবে"। পিটার কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—বল্ল "দোহাই মহারাজ ওটা না হ'লে আমাদের চল্‌বে কেমন ক'রে?" দেখাদেখি বোন্‌টাও কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—"এবার আমি মারা গেলে কি ক'রে বাঁচাবে? দোহাই মহারাজ, পিটারের মেজাজ বড় ভয়ানক"। রাজা বল্লেন "আমার মেজাজ তার চাইতেও ভয়ানক—তোদের যে মেরে ফেলি নাই এই ঢের—এই নে"—ব'লে এক মুটো মোহর ফেলে দিলেন।

রাজা বাড়ী ফির্‌তে ফির্‌তে ভাবলেন "এবার থেকে যার উপর রাগ কর্‌ব—একেবারে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দেব"। বাড়ী ফিরে দেখেন—নিমন্ত্রিত লোকেরা তখনও আশ্চর্য্য ভোজ খাবার আশায় ব'সে আছে! মন্ত্রী বল্লেন "মহারাজ আহারের অন্য বন্দোবস্ত কর্‌তে বল্‌ব কি?" রাজা ব'ল্লেন "কি! এতবড় কথা!—আমি কর্‌ছি একরকম বন্দোবস্ত তুমি কর্‌বে অন্যরকম?" ব'লেই মন্ত্রীর মাথায় এক কোপ বসিয়ে দিলেন। উজীর নাজীর কোটাল সব হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌তেই রাজা ঘ্যাঁচ্‌ ঘ্যাঁচ্‌ ক'রে তাদেরও মাথা কেটে দিলেন। চারিদিকে হুলস্থূল প'ড়ে গেল।

রাজা ব'ল্লেন "ভয় নাই" তোমরা এখন মজা দেখ।" ব'লে তিনি সেই শিঙেটা মন্ত্রীর মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগ্‌লেন! কিন্তু ফুঁ দিলে হবে কি—মড়া মানুষ কি আর বাঁচে?

তখন রাজার হুকুমে লোকজন পেয়াদা পুলিশ দৌড়ে গিয়ে পিটারকে ধরে আন্‌ল। একটা মজবুৎ বাক্সের মধ্যে তাকে বন্ধ ক'রে সেই বাক্স মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হ'ল। রাজা ব'ল্লেন "পাজি পিটার—তোমার শাস্তি শোন—এই বাক্সে ভ'রে তিন দিন তিন রাত্রি তোমাকে ঐ পাহাড়ের উপর রাখা হবে সেখানে রোদে পুড়ে হিমে ভিজে তুমি তোমার দুষ্টুমির কথা ভাব্‌বে—তারপর তোমাকে এই পাহাড় থেকে একেবারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে।" পিটার ব'ল্লে "আহা, মহারাজের দয়ার শরীর"—পাহাড়ের আগায় বাক্সের মধ্যে শুয়ে পিটার মনে মনে ভাব্‌ছে "এখন উপায়?"—আর মুখে চীৎকার ক'রে গান কর্‌ছে—

"ধিন্‌তাধিনা তা ধেই ধেই
স্বর্গে যাবার রাস্তা এই"—

এমনি ক'রে দু দিন গেল—তিন দিনের দিন এক বুড়ো বিদেশী সওদাগর সেখানে এল। সে বেচারা তীর্থ করতে বেরিয়েছে, পিটারের গান শুনে ব্যাপারটা কি দেখ্‌তে এল। সওদাগর বল্ল "তুমি কে ভাই? স্বর্গের রাস্তার কথা বল্‌ছিলে?" পিটার বল্ল "আরে চুপ—কাউকে ব'লোনা—তা হ'লে স্বর্গে যাবার জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে—মাঝে থেকে আমার স্বর্গে যাওয়া মাটি হবে।" সওদাগর বল্ল "ভাই তুমি একা যাবে কেন? আমায়ও একটু পথ বাৎলে দেও না!" পিটার বল্ল "সকলের কি তা সম্ভব হয়? এই বাক্সকে মন্ত্র প'ড়ে এখানে রাখা হ'য়েছে—যেমন তেমন বাক্স হ'লে হবে না: আজ রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত এসে আমায় নিয়ে যাবে। আবার যে সে দিন হবে না—এম্নি তিথি, এম্নি বার, এম্নি মাস, এম্নি নক্ষত্র সব মেলা চাই—এরকম সুযোগ হাজার বছরে একদিন হয়।" সওদাগর বল্ল "ভাই, আমি বুড়ো হ'য়েছি কবে ম'রে যাই তার ত ঠিক নেই—আমার টাকা কড়ি ঘর বাড়ী সব তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি আমায় ও বাক্সটা দাও—আমি স্বর্গে যাই।" পিটার বল্ল "খবরদার, আমি ছেলেমানুষ বলে আমায় টাকার লোভ দেখিও না।" বুড়ো কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল; অনেক মিনতি ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল "এই বুড়ো বয়সে তীর্থ ঘুরে কতটুকু আর পুণ্য হবে—এখন না হ'লে আর আমার স্বর্গে যাবার আশা নেই।" তখন পিটার রাজি হ'ল।

বাক্স খুলে বুড়ো তার মধ্যে ঢুক্‌ল পিটার তার কাছ থেকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বাক্সটা আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। যাবার সময় বলে গেল "রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত আস্‌বে—তখন কিন্তু টুঁ শব্দটি করবেন না। তা হ'লেই আর স্বর্গে যাওয়া হবে না।"

রাত্রে রাজা মশাই শান্ত্রী নিয়ে বাক্সটা নেড়ে চেড়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। রাজা ভাবলেন "আপদ গেল।" দুদিন বাদে রাজা বেড়াতে বেরিয়েছেন—এমন সময় পাজি পিটার জম্‌কালো পোষাক প'রে ধব্‌ধবে সাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে এসে সেলাম করে বল্ল "মহারাজ, আমায় সমুদ্রে ফেলে বড়ই উপকার ক'রেছেন। আহা! সমুদ্রের তলায় যে দেশ আছে—সে বড় চমৎকার জায়গা। আর লোকেরা যে কি ভাল, তা আর কি বল্‌ব—আমায় কি ছাড়্‌তে চায়? আসবার সময় থ'লে ভরা কেবল হীরে মণি মুক্তা সঙ্গে দিল।" এই ব'লেই সে চম্পট দিল।

রাজা মশাই হাঁ ক'রে রইলেন। রাজা মশাই জান্‌তে চান সমুদ্রের তলাটার কথা পাজি পিটার যা ব'লেছে তা সত্যি কি না—তা হ'লে তিনি একবার দেখে আসেন।

গল্প স্বল্প।

সেই যে চিনাখালী ইস্কুলের মাষ্টার রায় মহাশয়ের কথা তোমাদের বলেছিলাম তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তাঁর নাম মনে কর যেন যদু—

যদু যেমন ষণ্ডা ছিল, সে খেতেও পারত তেমনি। যখন সে খুব ছোট ছিল, তখন একদিন সে গেল এক বড়লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে। ভারী ভারী খাইয়ে সব সেখানে খেতে বসেছে, লুচী কোরমার ধূম লেগে গেছে। খাইয়েরা খুব খেতে পারাটাকে বড়ই বাহাদুরী মনে করে। তাই খাওয়া শেষ হবার সময় তারা বল্ল যে, "আচ্ছা, আজ কে সকলের চেয়ে বেশী খেয়েছে?" একথায় কেউ বলছে, "আমি!" আর কেউ বলছে, "না, আমি!" তা শুনে, যারা পরিবেষণ করেছিল, তাদের একজন বল্ল, "আজ্ঞে না; সকলের চেয়ে বেশী খেয়েছে এই ছেলেটি (মানে, যদু)। সে 'এত গুলো' লুচী আর 'এত টুকরো' কোরমা খেয়েছে।"

সকলে তাতে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যদুকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ রে, সত্যি না কি তুই এত খেয়েছিস?" যদু বল্ল, "খেয়েছি বৈ কি? আরো খেতে পারি!" তা শুনে

সবাই বল্ল, "বটে ? আচ্ছা, আন্ দেখি লুচী কোরমা, দেখি ও আর কত খেতে পারে।"

শুনেছি, তখন নাকি যতু আরো এক দিস্তা (২৪ খানা) লুচী আর আঠারো টুকরো কোরমা খেয়েছিল। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, আমার তখন জন্ম হয় নি। এত খেয়েও যে যতুর পেট ভার হয়ে ছিল তা মনে ক'রো না। সে তখন শুপারির ডালের ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ী এল, এসে, কালো জাম গাছে উঠে আরো অনেকগুলো কালো জাম খেল!

এ হল বহুকালের কথা। তখন 'খাইয়ে' বল্লে ভারী একটা গৌরবের কথা হত। সে সময়ে এক ব্রাহ্মণ এই বাহাদুরীর লোভে মারাই গিয়েছিলেন। কোন বড় লোকের বাড়ীতে তাঁকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে, তাঁর যা ইচ্ছা, যত খুসী খেতে দেওয়া হত। একদিন তিনি সেখানে খেতে এসে বল্লেন, 'আজ আমি শুধু ছানা আর চিনি খাব।' তাই তাঁকে এনে দেওয়া হল। তিনি তখন সাত সের ছানা চেঁছে পুছে শেষ করে, বিস্তর বাহাদুরী পেয়ে, বাড়ী এসে সেই রাত্রেই পেট ফেঁপে মারা গেলেন।

আর একটি ভট্‌চায্যি মশায়েরও এ বিষয়ে খুব নাম ছিল। সকলে যখন তাঁর খাওয়া দেখে আশ্চর্য্য হত, তখন তিনি নিজের কপালে টোকা দিয়ে বল্‌তেন, "দেখছ কি ? এইটুকু শুধু নীরেট, আর সব পেট !"

কাফ্রিদের সিংহ শিকার।

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

দ্বিতীয় বর্ষ | পৌষ, ১৩২১ | নবম সংখ্যা

তাতারসির গান।

(বাউলের সুর)।

রসের ভিয়ান্ চড়িয়েছে রে নতুন বা'নেতে ;
তাতারসির মাতানো বাস উঠেছে মেতে।
মাটির খুরি, পাথর বাটি
কি নার্‌কেলের আধ্-মালাটি,
বাঁশের চুঙি পাতার ঠুঙি আন্‌রে ধর্ পেতে ;
রসের ভিয়ান্ আজকে সুরু নতুন বা'নেতে।

জিরেন্ কাটে যে রসখানি জিরিয়ে কেটেছে,
টাট্‌কা রসের সঙ্গে সে ভাই কেমন খেটেছে ;
শুক্‌নো পাতার জ্বাল্ জ্বলেছে,
কাঁচা সোনার রঙ ফলেছে,
বোল্ বলেছে ফুটন্ত রস গন্ধ বেঁটেছে।
জিরেন্ কাটে রসের ধারা জিরিয়ে কেটেছে।

রসের খোলা খাপ্‌রা-রাঙা, ভাপ্‌রা লাগে গায়,
কেউ কি তবু সরবে ?—বরং এগিয়ে যেতেই চায়।

নড়বে না কেউ জায়গা ছেড়ে,
রসের ফেনা উঠ্‌ছে বেড়ে,
লম্বা তাড়ুর তাড়ার চোটে উপ্‌চে ফেটে যায়,
রসের ধোঁয়ায় ঘাম দিয়েছে লম্বা তাড়ুর গায়।

মিঠার মিঠা! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি!
বিধাতার এই সৃষ্টি-মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি!
প্রথম শীতের রোদের মত
তপ্ত যত মিষ্টি তত,
মিতা তুমি পদ্মমধুর,—অমৃত-বৃষ্টি।
লোভের জিনিস! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি।

রসের ভিয়ান্ বার ক'রে ভাই গুড় করেছে কে?
—গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ বনের গাছ থেকে;
গুড়ের জনম-ঠাঁই এ ব'লে
জগৎ এরে গৌড় বলে.
মিষ্টি রসের সৃষ্টি মানুষ এই দেশে শেখে;
রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা মন থেকে।

গুড় করেছে গৌড়-বঙ্গ—আদিম সভ্য দেশ,
গৌড়ী' গুড়ের ছিল রে ভাই আদরের একশেষ;
সেই গুড়েতেই মিশ্রী ক'রে
ধন্য হ'ল মিশর,—ওরে!
সেই গুড়েতেই করলে চীনি চীন সে অবশেষ,
মিষ্টি রসের সৃষ্টি প্রথম করেছে মোর দেশ।

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্, পাটালি।
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু,
মধুর রসের আমরা গুরু,

(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।

তাতারসির আমোদ নিয়ে আমরা এলাম, ভাই!
মৌমাছিদের চাক্ না ভেঙে আমরা মধু পাই।
বছর বছর নতুন বা'নে
নতুন তাতারসির গানে
আমরা গৌড়-বাংলাদেশের যশের গাথা গাই;
তাতারসির খবর নিয়ে আমরা এলাম ভাই।

বইছে হাওয়া তাতারসির সুগন্ধ মেখে,
ক্ষেতের যে ধান পায়স্-গন্ধ হ'ল তাই থেকে।
মৌমাছিরা ভুল ক'রে ভাই
গন্ধে মেতে ছুট্‌ল সবাই;
উঠ্‌ল মেতে দেশের ছেলে প্রথম রস চেখে,
মোণ্ডা-মিঠাই রুচ্‌ল না আজ রসের রূপ দেখে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পিপ্পলাদ।

দধীচি মুনির নাম হয় ত তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। তাঁহার মতন তপস্যা অতি অল্প লোকেই করিয়াছে। মহর্ষি দধীচি অতিশয় শান্ত আর পরম দয়ালু ছিলেন। গঙ্গার ধারে নিজের আশ্রমে থাকিয়া পত্নী প্রাতিথেয়ীকে লইয়া ভগবানের নাম করা, গাছপালার প্রতি যত্ন, সকল জীবে দয়া আর অতিথি আসিলে তাহার সেবা করা, এ সকল ছাড়া তাঁহার আর কাজ ছিল না। কিন্তু এই নিরীহ লোকটির তপস্যার এমনি তেজ ছিল যে, তাহার ভয়ে অসুরেরা তাঁহার আশ্রমের কাছে আসিতেই থর থর করিয়া কাঁপিত। অথচ দেবতাদিগকে সেই অসুরেরা জ্বালাতনের একশেষ করিত। কতকাল ধরিয়া যে ইঁহাদের যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার ঠিকানাই নাই। সেই যুদ্ধে কখনও দেবতারা জিতিতেন, কখনও বা অসুরদিগের নিকট হারিয়া বিধিমতে নাকাল হইতেন।

যাহা হউক, একবার দেবতারা নানা রকমের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অসুরদিগকে খুবই হারাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহাদের এই চিন্তা হইল যে, এ সকল অস্ত্রের কাজ ত ফুরাইল, এখন এগুলোকে কোথায় রাখা যায়? যুদ্ধ করিয়া শরীর নিতান্ত কাহিল হইয়াছে, এগুলোকে আর স্বর্গে বহিয়া নেওয়ার শক্তি নাই, সেখানে লইয়া গেলেও হয় ত আবার কোন্ দিন অসুরেরা আসিয়া কাড়িয়া নিবে।

শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা দধীচির নিকট আসিয়া বলিলেন, "মুনি ঠাকুর, আমাদের এই অস্ত্রগুলি যদি দয়া করিয়া আপনার নিকট রাখেন, তবে আমাদের বড় উপকার হয়। আপনার কাছে থাকিলে আর দৈত্যেরা এগুলি চুরী করিতে পারিবে না।" এ কথায় দধীচি সবে বলিয়াছেন, "যে আজ্ঞা!" অমনি প্রাতিথেয়ী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওগো, তুমি এই ফ্যাসাতের ভিতরে যাইয়ো না। দেবতামহাশয়েরা এখন মিষ্ট কথা কহিতেছেন, কিন্তু, আমাদের এখানে থাকিয়া যদি জিনিসগুলি নষ্ট হয় বা চুরী যায়, তখন ইঁহারা বড়ই চটিবেন।" দধীচি বলিলেন, "তাই ত এখন আর কি করা যায়? 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ফেলিয়াছি, এখন ত আর 'না' বলা যাইতে পারে না।"

কাজেই অস্ত্রগুলি দধীচির আশ্রমেই রহিল, আর দেবতারা তাহাতে যারপর নাই তুষ্ট হইয়া নিজের নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। তারপর এক বৎসর যায়, দু বৎসর যায়, ক্রমে সাড়ে তিন লাখ বৎসর কাটিয়া গেল, তবুও দেবতাদের আর কোন খোঁজ খবর নাই। ততদিনে অস্ত্রে মরিচা ত ধরিয়াছেই, তাহা ছাড়া অসুরদেরও আবার বেজায় তেজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দিন রাত কেবল এই অস্ত্রগুলির উপরে তাহাদের চোখ; না জানি কখন কোন ফাঁকে সেগুলিকে লইয়া যাইবে। তখন দধীচি ভাবিলেন যে, দেবতারা ত আসিলেনই না, এখন অস্ত্রগুলি যাহাতে অসুরদের হাতে না পড়ে, তাহার উপায় দেখিতে হয়।

সে বড় আশ্চর্য্য উপায়। জলে মন্ত্র পড়িয়া অস্ত্রগুলিকে তাহাদ্বারা ধুইবামাত্র, তাহাদের সকল তেজ সেই জলে গুলিয়া গেল। সে জল দধীচি তখনই খাইয়া ফেলিলেন, কাজেই আর কোন চিন্তার কথাই রহিল না। তারপর দেখিতে দেখিতে অস্ত্রগুলি আপনা হইতেই ক্ষয় হইয়া গেল, তখন অসুরেরা আর কি নিবে?

দধীচিও সবে এই কাজটি করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, আর ঠিক সেই সময়ে দেবতাদেরও অস্ত্রগুলির কথা মনে পড়িয়াছে। এত দিন বাদে, এত কাণ্ড কারখানার পরে, তাঁহারা আসিয়া দধীচিকে বলিলেন, "ঠাকুর, অসুরেরা ত আবার ভারী মুস্কিল

বাধাইয়াছে; শীঘ্র আমাদের অস্ত্রগুলি দিন।" দধীচি বলিলেন, "তাই ত, আপনারা এত দিন আসেন নাই, তাই আমি দৈত্যদের ভয়ে সেগুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। এখন কি করি বলুন।" তাহা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, "আমরা আর কি বলিব? আমরা বলি, আমাদের অস্ত্রগুলি দিন। অস্ত্র না পাইলে আর আমাদের বিপদের সীমাই থাকিবে না।" দধীচি বলিলেন, "সে সকল অস্ত্র ত এখন আমার হাড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে! আপনারা না হয় সেই হাড়গুলি নিন।" দেবতারা বলিলেন, "আমাদের অস্ত্রেরই দরকার। আপনার হাড় লইয়া আমরা কি করিব?" দধীচি বলিলেন, "আমার হাড় দিয়া অতি উত্তম অস্ত্র প্রস্তুত হইবে; আমি এখনি দেহত্যাগ করিতেছি।" কাজেই তখন দেবতারা আর কি করেন? তাঁহারা বলিলেন, "আচ্ছা, তবে একটু শীঘ্র শীঘ্র তাহাই করুন।"

দেবী প্রাথিতেয়ী তখন ঘরে ছিলেন না, স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দেবতারা সেই বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী মেয়েকে বড়ই ভয় করিতেন, তাই তাঁহারা ভাবিলেন যে, তিনি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই কাজ শেষ করিতে হইবে। দধীচি যোগাসনে বসিয়া এক মনে ভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার পবিত্র আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখন দেবতারা বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, "এখন তুমি ইঁহার হাড় দিয়া অস্ত্র শস্ত্র তয়ের কর।" বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আমি কি করিয়া অস্ত্র তয়ের করিব? ইঁহার দেহ কাটিলে ত তবে হাড় পাওয়া যাইবে। বাপরে! সে কাজ আমাদ্বারা হইবে না! হাড়গুলি পাইলে আমি এখনি তাহা দিয়া অস্ত্র গড়িয়া দিতে পারি।" তখন দেবতাদের কথায় গরুর দল আসিয়া গুঁতাইয়া মুনির দেহ হইতে হাড় বাহির করিয়া দিল, দেবতারাও মহানন্দে তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন। সেই হাড় দিয়া শেষে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র প্রভৃতি নানারূপ আশ্চর্য্য অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এদিকে প্রাতিথেয়ী স্নান আহ্নিকের পর কলসী হাতে আশ্রমে ফিরিয়া দেখেন, মহর্ষি নাই, তাঁহার মাংস লোম আর চামড়া মাত্র পড়িয়া আছে। ঘরে অগ্নি ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেবী সকল কথাই জানিতে পারিলেন। সে দারুণ সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার চেতন হরণ করিয়া লইল; তাঁহার দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। জ্ঞান হইলে পর অনেক কষ্টে শোক সম্বরণপূর্ব্বক তিনি দধীচির দেহের অবশিষ্টটুকু লইয়া আগুনে ঝাঁপ দিলেন। যাইবার সময় নিজের নিতান্ত শিশু পুত্রটিকে গঙ্গার নিকটে আর গাছ পালার নিকটে সঁপিয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, "এই পিতৃ মাতৃহীন শিশুটিকে তোমরা দয়া করিয়া দেখিবে।"

দধীচিও গেলেন, প্রাতিথেয়ীও গেলেন। আশ্রম অন্ধকার হইল। তপোবনের পশু পক্ষী আর বৃক্ষ লতারা তখন কাঁদিয়া বলিল, "হায়! যাঁহারা আমাদের পিতা মাতার মত ছিলেন, তাঁহাদের দু জনকেই হারাইলাম। আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আর ত আমরা তাঁহাদের সেই পবিত্র মুখ দেখিতে পাইব না, এখন তাঁহাদের এই শিশুটিকে দেখিয়াই আমাদের মন শান্ত থাকিবে।"

এখন হইতে এই শিশুটিকে পালন করাই হইল তাহাদের এক মাত্র কাজ। চন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত চাহিয়া আনিয়া তাহারা শিশুটিকে খাইতে দিল, সেই অমৃতের গুণে শিশু দেখিতে দেখিতে শুক্ল পক্ষের চাঁদের মত বাড়িয়া উঠিল। পিপুল (অশ্বত্থ) গাছেরা তাহার বড়ই যত্ন করিয়াছিল, তাই তাহার নাম হইল পিপ্পলাদ।

পিপ্পলাদ জানিত, সে সেই সকল গাছপালারই ছানা। তারপর যখন তাহার বুদ্ধি একটু বাড়িয়াছে, তখন সে একদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "গাছের ছানা ত গাছের মতই হয়, মানুষের ছানা মানুষের মত হয়, পাখীর ছানা হয় পাখীর মত, আর জন্তুর ছানা জন্তুর মত। কিন্তু আমি যে তোমাদের ছানা, আমার এমন হাত পা হইল কি করিয়া?" গাছেরা বলিল, "বাছা, তুমি ত আমাদের ছানা নও। তুমি মুনির পুত্র, তোমার পিতা মহর্ষি দধীচি, মাতা দেবী প্রাতিথেয়ী।" পিপ্পলাদ বলিল, "আমার বাবা আর মা তবে কোথায় গেলেন?" গাছেরা বলিল, "তোমার পিতা দেবতাদের উপকারের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তোমার মাতা সেই দুঃখে আগুনে ঝাঁপ দিয়াছেন।"

এমনি করিয়া গাছেরা সকল কথাই পিপ্পলাদকে বলিল। তাহা শুনিয়া সে আগে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিল, তারপর গাছদের মিষ্ট কথায় একটু শান্ত হইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে আমি মারিব!"

তখন গাছেরা সেই ছেলেটিকে চন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া সকল কথা বলিল। তাহা শুনিয়া চন্দ্র বলিলেন, "বৎস পিপ্পলাদ! বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, রূপ, গুণ, সুখ, মান, যশ, পুণ্য, সকলই আমি তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।" পিপ্পলাদ বলিল, "আমার পিতাকে যাহারা মারিয়াছে, তাহাদিগকে যদি না মারিতে পারিলাম, তবে এ সব লইয়া আমার কি হইবে? আগে বলুন, কোথায়, কোন্ দেশে, কোন্ তীর্থে গিয়া, কি মন্ত্র বলিয়া, কোন্ দেবতাকে ডাকিয়া আমি এ কাজ করিতে পারিব?" চন্দ্র বলিলেন, "শিবকে ডাক, তোমার কাজ হইবে।" পিপ্পলাদ বলিল, "আমি যে

ছেলেমানুষ, আমি ত কিছুই জানি শুনি না, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিব?” চন্দ্র বলিলেন, “তুমি চক্রেশ্বর তীর্থে গিয়া ভক্তিভরে তাঁহার কথা ভাব, আর তাঁহাকে ডাক, তবেই তিনি আসিবেন।”

পিপ্পলাদ তখনই সেই তীর্থে গিয়া প্রাণপণে শিবকে ডাকিতে লাগিল। সেই ডাকে শিব তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “পিপ্পলাদ! কি চাহ?” পিপ্পলাদ বলিল, “আমার দেবতুল্য ধার্ম্মিক পিতামাতাকে যাহারা মারিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মারিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমাকে দি’ন।” শিব কহিলেন, “আচ্ছা, তুমি যদি আমার তিনটা চোখই দেখিতে পার, তাহা হইলে দেবতাদিগকে মারিতে পারিবে।” কিন্তু পিপ্পলাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দুটা বই চোখ দেখিতে পাইল না। তখন শিব বলিলেন, “আর কিছু দিন তপস্যা কর, দেখিতে পাইবে।” এ কথায় পিপ্পলাদ এমনি ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিল যে, অল্প দিনের ভিতরেই সে দেখিল, শিবের কপালে আরেকটি চোখ আছে। তখন শিবের সেই চোখ হইতে আগুনের ঘোড়ার মতন একটা অতি ভয়ঙ্কর ‘কৃত্যা’ (ভূত) বাহির হইয়া ঘোরতর শব্দে পিপ্পলাদকে বলিল, “কি করিব?” পিপ্পলাদ বলিল, “দেবতাদিগকে ধরিয়া খাও!” বলিতে বলিতেই সেটা খপ্ করিয়া পিপ্পলাদকে ধরিয়া মুখে দিতে গিয়াছে! পিপ্পলাদ ভয়ানক থতমত খাইয়া চ্যাঁচাইয়া বলিল, “আরে, আরে, ও কি কর?” সেটা বলিল, “দেবতাদিগকে খাইতে হইলে, তাহারা যে তোমার শরীর গড়িয়াছে, তাহাও খাইব।” এ কথায় পিপ্পলাদ আবার শিবের স্তব করিলে, শিব সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে বলিলেন, “এ স্থানের এক যোজনের মধ্যে তুমি কাহাকেও খাইতে পারিবে না!” তখন সেই ভূতটা সেখান হইতে দূরে গিয়া এমনই সর্ব্বনেশে আগুন জ্বালাইয়া বসিল যে, আর একটু হইলেই সে দেবতার দলকে পোড়াইয়া শেষ করিত। দেবতারা প্রাণের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শিবের নিকট আসিয়া বলিলেন, “রক্ষা করুন, প্রভো! আপনার ভূত আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিল। আপনি রক্ষা না করিলে এ যাত্রা আর আমাদের উপায় নাই!”

শিব তাঁহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা এইখানে আসিয়া বাস কর। এখানে ওটা তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না।” দেবতারা বলিলেন “স্বর্গ আমাদের বাসস্থান, তাহা ছাড়িয়া এখানে কি করিয়া থাকি?” শিব কহিলেন, “তবে এক কাজ কর; সূর্য্যই হইতেছেন এই সংসারের পিতা। তিনি আসিয়া এখানে বাস করুন, তাহাতেই সকল দেবতার বাস করা হইবে।” এইরূপে তখনকার মত বিপদ কাটিয়া গেল।

তারপর শিবের উপদেশে পিপ্পলাদের রাগও দূর হইল। তখন শিব অনেকবার পিপ্পলাদকে বর লইতে বলিলেন। পিপ্পলাদ এমন সব বর প্রার্থনা করিল, যাহাতে জগতের উপকার হয়। নিজের জন্য সে কিছুই চাহিল না। ইহাতে দেবতাগণ যার পর নাই তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "বাছা, তুমি ত তোমার নিজের জন্য কিছুই চাহিলে না! আমরা তোমাকে বর দিব, তুমি তোমার নিজের জন্য কিছু চাহিয়া লও।"

তখন পিপ্পলাদ যোড় হাতে দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আমার পিতা মাতার পবিত্র নাম আমি কাণে শুনিয়াছি মাত্র, তাঁহাদিগকে দেখিবার সুখ এই অভাগার ভাগ্যে ঘটে নাই, ইহাতে আমার মন বড় অস্থির থাকে।" দেবতারা বলিলেন, "সে জন্য তুমি কিছু মাত্র দুঃখিত হইয়ো না, এখনই তোমার পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে।" এ কথা শেষ হইতে না হইতেই পিপ্পলাদের পিতামাতা দিব্য বেশ পরিয়া সোনার রথে চড়িয়া স্বর্গ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিপ্পলাদ অমনি তাঁহাদের পায় লুটাইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত চোখের জল ফেলা ভিন্ন আর একটিও কথা কহিতে পারিল না। দধীচি এবং প্রাতিথেয়ী তাহাকে অনেক আদর অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহার মনের সকল দুঃখ দূর করিয়া, আবার স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এইভাবে সকল দিকেই সুখ হইল, এখন পিপ্পলাদের সেই ভয়ঙ্কর ভূতটা থামিলেই আর কোন কথা ছিল না। দেবতারা বলিলেন, "পিপ্পলাদ, তোমার এটাকে থামাও।" পিপ্পলাদ বলিল, "সে সাধ্য ত আমার নাই। আপনারা গিয়া উহাকে থামিতে বলুন; আমাকে দেখিলে আবার কি না জানি করিতে চাহিবে।"

সে কথায় দেবতারা সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটার কাছে গিয়া তাহাকে থামিতে বলিলেন। সে তাহাতে খেঁকাইয়া বলিল, "তাহা হইবে না! সকলকে খাইব, তবে ত থামিব। তাহার আগে আমার এ আগুন কিছুতেই নিভিবার নয়।" বাস্তবিক, ইহাকে থামাইতে দেবতাদের বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে অনেক কথা, এখন আমার তাহা বলিবার অবসর নাই।

ফাঁদ।

"বলে নারি, কলে মারি।" অর্থাৎ যে জন্তুকে সোজাসুজি ধরতে বা মারতে না পারা যায়, ফাঁদ পেতে তাকে জব্দ কর্‌তে হয়। তা সে দড়ি দিয়েই বাঁধ, জাল দিয়েই ঘের, খাঁচার ভিতরেই পোর, আঠা দিয়েই আটকাও আর তীর বা বন্দুক পেতেই মার, সবই এক কথা।

ছেলে বেলা থেকে দেখছি, ফাঁদ পেতে ইঁদুর মারে। সে সব ফাঁদের কথা হয় ত তোমাদের সকলেরই জানা আছে। ইঁদুরেরা কলা খাবার লোভে এসে তাতে আটকা পড়ে। তার কোনটাতে বাক্সে পূরে দরজা এঁটে দেয়, কোনটার ভিতরে ঢুকবার পথ আছে, বেরোবার যো নাই; কোনটায় লোহার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে; কোনটায় তক্তা দিয়ে থাপ্পড় লাগায়; কোনটায় মূষলের গুঁতায় মাথা ফাটায়।

শেয়াল মারার ফাঁদ আমি দু রকম দেখেছি, এক হচ্ছে খোঁয়াড়। সে অনেকটা ইঁদুর ধরা কাঠের বাক্সেরই মত, তাতে ঢুকলে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আসল জিনিসটা অবশ্য বাক্স নয়, মাটিতে খোঁটা পুঁতে তৈরী করা খোঁয়াড়। আর, তাতে কলা দিবার দস্তুর নাই; তাতে দিতে হয় কুকুর ছানা।

অন্য রকম শেয়াল মারা ফাঁদ হচ্ছে যাঁতা। মজবুত মাচার উপরে আচ্ছা করে ভারী জিনিস চাপিয়ে, তাকে আলগোছা করে তুলে রাখতে হয়, তার নীচে খাবার থাকে। শেয়াল মশাই সেই খাবার খেতে এলেই মাচাটি তার ঘাড়ে পড়ে।

শেয়ালের ফাঁদে কিন্তু বেশীর ভাগই পড়ে কুকুর। সে বেচারা তখন যে চ্যাঁচানিটা চ্যাঁচায়! শেয়াল কখনো চ্যাঁচায় না, সে চুপচাপ থাকে। সে জানে যে, চ্যাঁচালেই লাঠি নিয়ে আসবে, আর দুই তিন ঘায় দফা শেষ করে দিবে। কুকুরের সে ভয় নাই; সে জানে যে চ্যাঁচালেই ছুটে এসে তাকে ছাড়িয়ে দিবে।

বাঘও এই দু রকমের ফাঁদ পেতেই মারা যায়, তবে খোঁয়াড়ের কায়দাটাই সকলে পছন্দ করে। এ খোঁয়াড় অবশ্য শেয়ালের খোঁয়াড়ের চেয়ে ঢের মজবুত, আর তার ভিতরে কুকুরের ছানার বদলে পাঁটা দিতে হয়। পাঁটাটি থাকে আলাদা একটা কামরায়; বাঘের তাকে খাবার যো থাকে না। তা না থাকলেও, বাঘের ভয়েই সে বেচারার অর্দ্ধেক প্রাণ বেরিয়ে যায়।

সেই যে কামড়ে ধরা ইঁদুরের কল, তাই খুব বড় করে বানিয়ে, তা দিয়ে বাঘ ধরবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বাঘ এমনি চট্‌পটে জানোয়ার যে, কামড় পড়বার আগেই সেল াফিয়ে পালায়।

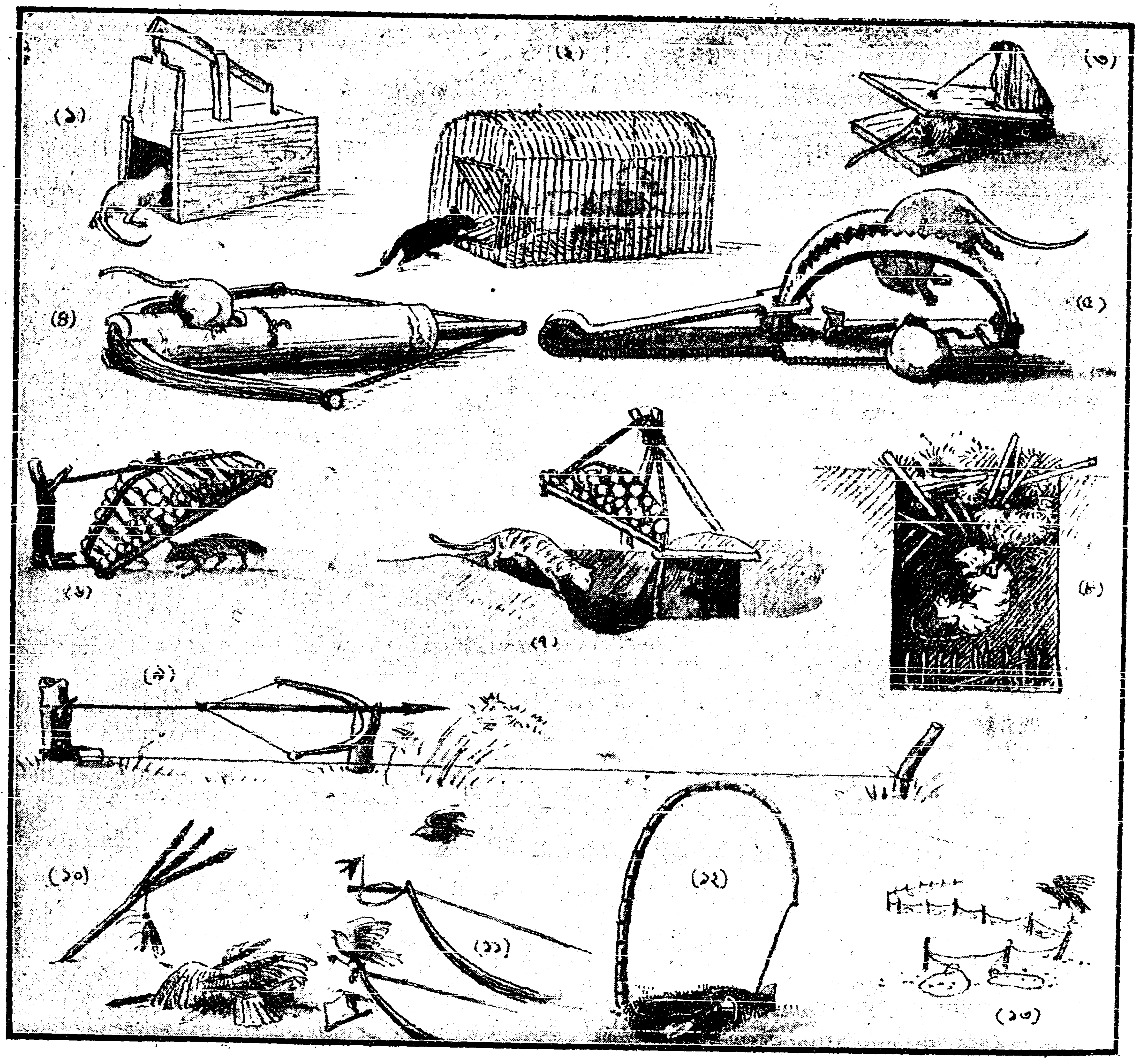

১,২,৩,৪,৫—ইঁদুরের ফাঁদ, ৬—শিয়ালের ফাঁদ, ৭,৮,৯—বাঘের ফাঁদ, ১০,১১,১৩—পাখীর-ফাঁদ, ১২—শিয়ালের আর বাঘের ফাঁদ।

যাঁতায় ফেলে বাঘ মারা যে লোকে পছন্দ করে না, তাও বোধ হয় সে লাফিয়ে

পালায় ব'লে। তবে যাঁতার ভিতর থেকে লাফিয়ে পালান একটু কঠিন, কেন না, তার নীচে গর্ত্ত থাকে বলে লাফাবার তেমন স্থবিধা হয় না।

গর্ত্তে ফেলে বাঘ মারতে বেশ স্থবিধা। খুব গভীর গর্ত্ত খুঁড়ে, তার মুখ হালকা বাঁকারী দিয়ে ছেয়ে, তার উপর মাটি ফেলে ঘাস বসিয়ে দিতে হয়। ছাউনীর মাঝখানে একটি কুকুর ছানা থাকে, আর গর্ত্তের তলায় থাকে বিষম খোঁচা বসান। বাঘ মশায় কুকুর ছানার লোভে ছাউনীর উপর লাফিয়ে পড়েন, আর অমনি খোঁচা খেয়ে তাঁর স্বর্গ লাভ হয়ে যায়।

গর্ত্তের তলায় খোঁচা বসান না থাকলে বাঘটা সেখানে প'ড়ে না মরে খালি দোহাই দস্তুর করতে থাকে। তখন তাকে কায়দা করে ধরতে পারলেও মজা মন্দ হয় না। এই রকম করে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ধরে একবার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠান হয়েছিল।

সেকালের লোকে তীর পেতে বাঘ মারত। বনের ভিতরে বাঘের চলা ফেরার পথ থাকে, সেই পথে তীর পেতে রাখতে হয়। তীর ধনুক ঝোপের আড়ালে লুকান থাকে, পথের উপরে থাকে খালি একগাছি সরু সূতা টানা। সেই সূতায় বাঘের পা ঠেকলেই অমনি বিষমাখান তীর ছুটে এসে তার পায় বিঁধে যায়।

আজকাল তীরের বদলে বন্দুক ব্যবহার হওয়ার কথা শোনা গিয়েছে। বাঘ ছাড়া আরো কোন কোন জন্তুও এমনি করে মারা হয়। তার মধ্যে দু একটা আছে এমনি সেয়ানা, যে, তারা আগে পিছন থেকে এসে দড়ি টেনে বন্দুকটি ছুটিয়ে দেয়, তারপর সামনে গিয়ে খাবারটি খেয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে চলে যায়।

পাখী ধরতে হলে ফাঁস লাগিয়ে বা আঠা মাখিয়ে স্থবিধা হয়। মাটিতে খাবার দিয়ে সেখানে ফাঁদ পেতে রাখে। সেই খাবারের লোভে পাখী এমন কি, বাঘ শেয়াল অবধি এসে ফাঁদে আটকা পড়ে। আঠা দিয়ে পাখী ধরতে হলে সেই আঠা একখানা চেরা বাঁকারিতে মাখিয়ে সেই বাঁকারিখানাকে কাৎ করে খুব আলগোছে বসিয়ে রাখতে হয়। একটি আরশুলা তার নীচের দিকে ঝুল্‌তে থাকে। দয়েল এসে সেই আরশুলায় ঠোকর দিলেই বাঁকারিখানা তার ঘাড়ে পড়ে যায়। তখন বেচারার পাখায় আঠা লেগে আর তার উড়ে পালাবার শক্তি থাকে না।

আঠা দিয়ে বাঘ মারার কথা আমি একটা পুস্তকে পড়েছি। সত্যি কি মিথ্যা বল্‌তে পারি না; আমার কাছে কিন্তু কথাটা ভারী অদ্ভুত ঠেকে। শুকনো পাতায় আঠা মাখিয়ে, বনের ভিতরে বাঘের পথের উপরে নিয়ে সেগুলো ছড়িয়ে রাখতে হয়। বাঘ সে পথে এলে অবশ্য সেই পাতা তার পায় লেগে যায়। বাঘ বড় বাবু. সে তার গায় যা-তা লাগা একেবারেই পছন্দ করে না। কাজেই সে যায় সেগুলোকে চেটে তুলতে, তাতে সেগুলো লাগে তার মুখে। তখন তাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে হলে আর একটু না বসলে চলে না, আর তাতে কি হয়, বুঝতেই পার। ততক্ষণে বাঘের যায় রাগ হয়ে। রাগের চোটে সে গড়াগড়ি দিয়ে চ্যাঁচাতে থাকে। তাতে তার নাকে মুখে চোখে বুকে পিঠে এমনি আঠা লাগে, আর সেগুলোকে আঁচড়িয়ে তুলতে গিয়ে তার এমনি দুর্দ্দশা হয় যে, তখন তুমি আমি গিয়েও নাকি তাকে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে মারতে পারি।

জাল পেতেও বাঘ ধরা যায়। পাখীও জাল দিয়ে ধরে, আর মাছ ত ধরেই। মাছ ধরার খাঁচা তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে,—সেই, যাতে ঢুকবার আজ্ঞা আছে, বেরোবার আজ্ঞা নাই।

খালি যে মানুষেই ফাদ পাততে জানে, তা নয়, জন্তুরাও অনেক সময় ফাঁদ পেতে থাকে। পারি ত আরেক দিন তার কথা বল্‌ব।

ঝানু চোর চানু।

এদিকে কৃষক গিয়ে দেখল মরা টরা কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখল তার ভেড়াটাও নাই, কে জানি দড়ি খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হলো তা বুঝতেই পার! বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগল—"হায়, হায়! কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম, এখন গিন্নি কি বলবে? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেল, ছাগল ভেড়া দুটোই গেল; এখন করি কি? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রী করে গিন্নির শাল না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, যাই সেটাই গিয়ে নিয়ে আসি—গিন্নিও দেখ্‌তে পাবে না।"

চানু যখন চোরদের বাড়ী ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত! তখন চোরেদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সর্দ্দার চোরটী বল্ল,—"আর একটা যদি এরকম চালাকি খেলতে পার তাহলে তোমাকেই আমাদের সর্দ্দার করব।"

ততক্ষণে কৃষকটীও ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বল্ল,—"যাও ত জবরদস্তি না করে কে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনতে পার?" কেউ যখন ভরসা পেল না তখন সে বল্ল "আচ্ছা, দেখি আমি পারি কি না।" চানু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কৃষকটী খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল। ঠিক তার পরেই একটা ভেড়াও ডেকে উঠল। আর তাকে রাখে কে। একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটল বনের ভিতর। কৃষক যত যায় ততই শুনে এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেল। তখন হঠাৎ সব চুপ চাপ, ভেড়া ছাগলের ডাক আর শুনতে পাওয়া গেল না। এদিক সেদিক খুঁজে খুঁজে কৃষক একেবারে হয়রাণ হয়ে গেল কোথা বা ছাগল আর কোথাই বা ভেড়া। বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! এসে দেখে ষাঁড়টীও সেখানে নাই। বন উলট পালট করে ফেল্ল কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেল না।

চানু যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত তখন আর কথাটী নাই! চোরেরা চানুকেই তাদের সর্দ্দার করল। তাদের আনন্দ দেখে কে, সমস্তটা দিন আমোদ করেই কাটিয়ে দিল। লুটপাট করে চোরেরা যা কিছু আনত একটা গহ্বরের মধ্যে সব লুকিয়ে রাখত, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকা কড়ি সব দেখিয়ে দিল—চানুই যে এখন তাদের সর্দ্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন!

দলের সর্দ্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বাড়ীর জিম্মায় রেখে চুরি করতে গেল। খালি বাড়ী পেয়ে চানু সেই সয়তান বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল,—"আচ্ছা, তুমি যে এদের ঘর সংসার দেখ এরা তোমাকে তার দরুণ কিছু বক্‌সিস্ টক্‌সিস্ দেয় না?"

বুড়ি "বক্‌সিস্ দেয় না! ওদের মাথা দেয়।"

চানু। "বটে, কিচ্ছু দেয় না! আচ্ছা এস আমার সঙ্গে আমি তোমাকে ঢের টাকা দিব।" বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেল। জন্মেও বুড়ি এত ধন কোন দিন

দেখেনি—মুখ হাঁ করে সেই রাশী রাশী টাকা মোহরের দিকে বুড়ি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরে না, হাঁটুগেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকা

গুলো ঘাঁটতে লাগল। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই ত করলই তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভর্ত্তী করে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিক থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল—বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইল।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোষাক পরল, তারপর সেই ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নিয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ীর দরজায়ই বসেছিল, তারপর সেই হারাণ জন্তু গুলিকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল।

চানু বল্ল,—"এ জন্তু গুলো কার বলতে পার কি।

"এগুলো যে আমাদের, আপনি কোথায় পেলেন মশায় ?"

"এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিল। আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলচে তাতে দশটা মোহর রয়েছে—ও গুলিও কি তোমাদের ?"

"না মশায়, আমরা গরীব দুঃখি লোক মোহর কোথা পাব ?"

আচ্ছা মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই।” মোহরগুলি নিয়ে দুই হাত তুলে কৃষক চানুকে আশীর্ব্বাদ করল।

সমস্ত দিন চলে চানু প্রায় সন্ধ্যার সময় তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখল তার মা বাবা বসে আছেন। চানু বল্ল,—“ভগবান আপনাদের ভাল করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়ী থাকতে পারি কি?”

“আপনার মত ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন? আমরা যে বড্ড গরীব।”

চানু আর চুপ থাকতে পারল না—“বাবা তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছ না?”

চানুর মা বাবা খানিক্ষণ অবাক হয়ে রইল তারপর চানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্ল,—“এমন সুন্দর পোষাক তুমি কোথা পেলে বাবা?”

চানু। পোষাক দেখেই অবাক্ হয়ে গেলে তাহলে এই টাকাগুলো দেখে কি করবে?” এই বলে চানু পকেট খালি করে সব মোহর টেবিলের উপর রাখল।

এতগুলো মোহর দেখে চানুর বাবার বড্ড ভয় হলো। চানু তখন সব কথা খুলে বল্ল—তার আশ্চর্য্য বুদ্ধির কথা শুনে চানুর মা বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চানু বাবাকে বল্ল, “বাবা, যাও জমিদার বাড়ী। বল গিয়ে আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।”

চানুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড় হয়ে গেল, “বলিস্ কিরে বেটা! তাহলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিবে।

“না! তুমি বলো যে আমি সর্দ্দার চোর, আমার মত ঝানু চোর দুনিয়ায় নাই, জবরদস্ত ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজকার করে এনেছি। দেখো বাবা! যখন দেখবে জমীদারের মেয়েও সেখানে আছে তখনই এসব কথা বলো।”

“আচ্ছা, এত করে যখন বলছ যাচ্ছি কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।”

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চানুর বাবা ফিরে এল। চানু বল্ল, “কি করে এলে বাবা?”

“নেহাৎ মন্দ নয়। মেয়েটি যে বড় অনিচ্ছুক তাত মনে হল না, বোধ করি বাবাজি তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটা করেছ—না? যাহোক্, জমীদার মশায় বল্লেন আস্‌ছে রবিবারে তাঁরা নাকি একটা হাঁস ভেজে খাবেন, তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বে-মালুম চুরি করতে পার তাহলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।”

“এ আর তেমন শক্ত কাজ কি? দেখা যাবে এখন।” ক্রমশঃ

সাগরের সাজা।

একটি ছোট্ট পাখী ছিল, তার নাম টিট্‌ঠী পাখী। সাগরের ধারে উঁচু পাথরের ডাঙ্গা, তারি ফাটলে টিট্‌ঠী পাখীর বাসা, সেই বাসাটির ভিতরে তার ছোট্ট ছোট্ট তিনটি ডিম। টিট্‌ঠী পাখী তার সেই ডিমগুলোতে বসে তা দেয়, আর ভাবে, "আর ন' দিন বাদে আমার এই ডিমগুলোর ভিতর থেকে আমার বাছারা বেরোবে। তেমন সুন্দর ছানা হাঁসদেরও নেই, বগদেরও নেই, চখা চখীরও নেই,—কারুর নেই। তারা আমার সঙ্গে জলের ধারে ধারে খুর খুর করে নেচে বেড়াবে; তেমন নাচ খঞ্জনেও নাচতে পারে না, কাদা খোঁচায়ও পারে না,—কেউ পারে না। আমি ঝক ঝকে রূপোলী মাছ ধরে ধরে তাদের খেতে দিব, ঢেউ এলে ছুটে পালাতে শেখাব, আর দুষ্ট বাজ পাখী এলে পাখা দিয়ে তাদের ঢেকে রাখব।"

টিট্‌ঠী পাখীর বাসার নীচেই সাগরের জল, সাগরের ঢেউগুলো এসে হুড়মুড় করে সেইখানে পড়ে তাকে ভিজিয়ে দেয়। তাই সে একদিন সাগরকে বল্ল, "হ্যাঁ গা! তোমার এই ছেলে পিলেগুলোকে একটু সামলে রাখ না! আমার ছানারা যখন বেরোবে, তখন তাদের এমনি করে ভিজালে যে তাদের অসুখ কর্‌বে।" সাগর তা শুনে খালি হাসল, ঢেউগুলিকে কিচ্ছু বল্ল না।

তারপর থেকে ঢেউগুলো আরো বেশী করে লাফায়, আরো বেশী করে জল ছড়ায়। টিট্‌ঠী পাখী বেচারার বাসায় বসে থাকাই ভার হল। কেঁদে বল্ল, "ওগো, তোমাদের পায় পড়ি, অমন করে ভিজিয়ো না, আমার বাছারা যে মরে যাবে!" ঢেউগুলি তা শুনে খালি হাসল; সাগর তাদের কিচ্ছু বল্ল না।

তারপর থেকে তারা এমনি বিষম লাফাতে আর এমন ভয়ানক জল ছড়াতে লাগল যে টিট্‌ঠী পাখীর ডিম শুদ্ধ তার বাসা তাতে ভেসে গেল। তখন আর সে বেচারা কি করে? সে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে আর পাখীদের বল্ল যে, "ও গো, তোমরা আমার দুঃখের কথা শোন! সাগরের ছেলেগুলো এসে বাসা শুদ্ধ আমার বাছাদের ভাসিয়ে নিয়েছে, সাগর তাতে কিচ্ছু বলে নি। আমি যত কাঁদলাম, সে ততই হাসল! তোমরা সব থাক্‌তে আমার এই দুঃখ!"

সকল পাখী মিলে অমনি বল্ল, "কি? এমন কথা? এস ত ভাই, কে কোথায় আছ! দেখি সাগর বেটার কত বড় বুকের পাটা! টিট্‌ঠী ভাইয়ের ডিম কেড়ে নিবে, আমরা থাকতে?" বলেই তখনি তারা সেজে চল্ল। উৎক্রোশ চল্ল, হাড়গিলা চল্ল,

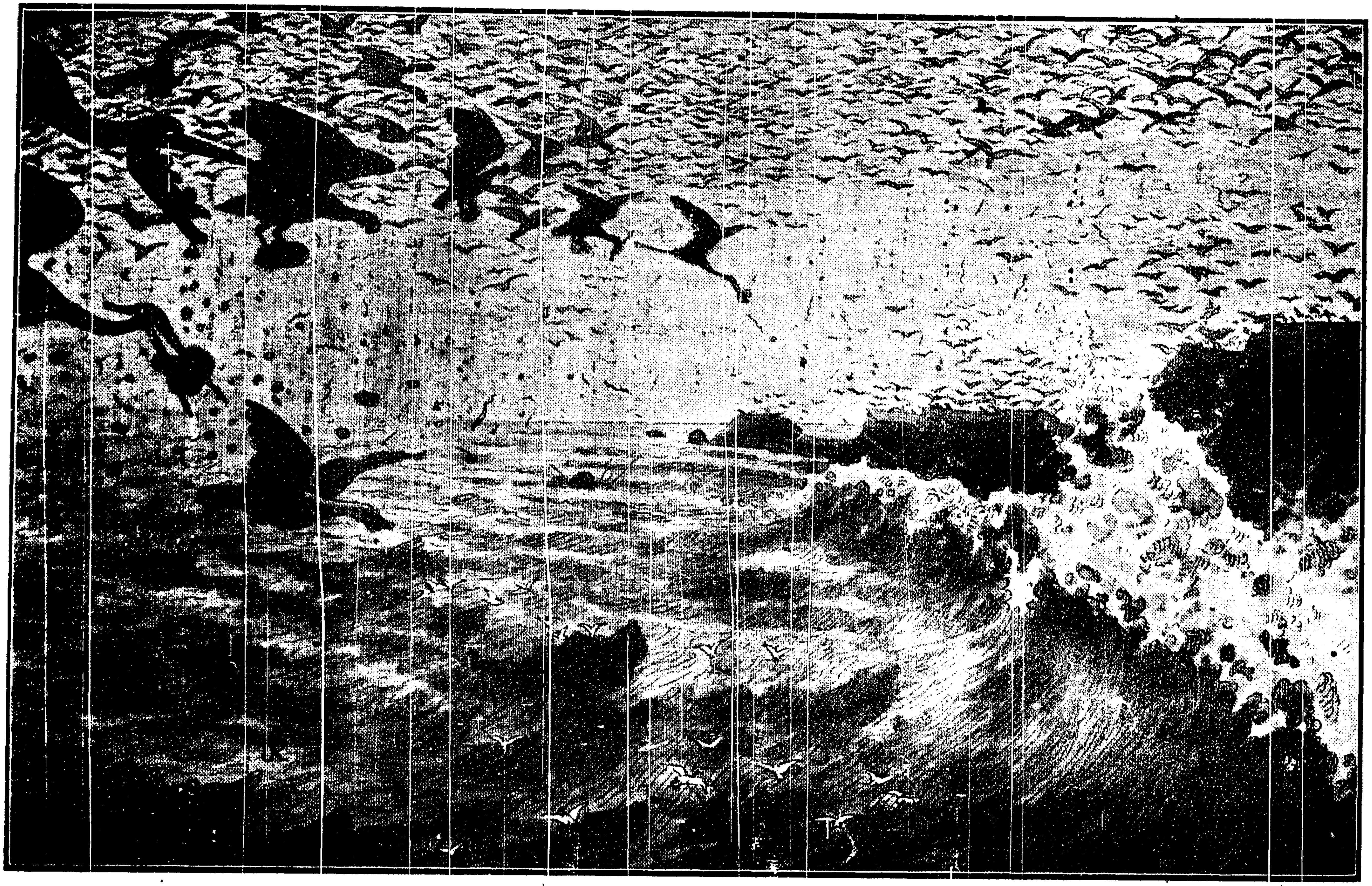

সাগরের সাজা।

U. RAY & SONS.

গগনবেড় চল্ল, গৃধিনী চল্ল, শকুন চল্ল, সাঁচান, শিকরী, চিল, বাজ, হাঁস, বক, ময়ূর, কাক, প্যাঁচা, ঘুঘু, পায়রা, ফিঙ্গা, শালিক, ময়না, চড়াই, বাবুই, দয়েল, শামা, বুলবুলী, টুনটুনী, মাছরাঙা, কাঠ ঠোক্‌রা, কাদাখোঁচা, হাঁড়ি চাঁচা, ল্যাজ নাচা,—কেউ বাকি রইল না। নুড়ি, পাথর, বালি, কাদা, খড়, কুটো,—যে যা পারল,—মুখে করে, নখে করে, পিঠে করে তাই নিয়ে, ঝড় বইয়ে, ধূলো উড়িয়ে, আকাশ ঘিরে আঁধার করে তারা চল্ল ;—দেখবে আজ, সাগর বেটার কত বড় বুকের পাটা!

সাগর বলছে, "ও কি রে? কিসের ধূলো? কিসের ডাক? কিসের আঁধার? আঁধি এল নাকি রে?" বলতে বলতেই টুপ্‌টাপ্‌ ঝুপ্‌ ঝাপ্‌, ধুপ্‌ ধাপ্‌, ঝড়াৎ ঝড়াৎ করে বালি পাথর কাদা সব তার ঘাড়ে পড়তে লাগল। সে কি যেমন তেমন কাণ্ড? সাত দিন সাত রাত ধরে সকল পাখী মিলে খালি নুড়ি পাথর কাদা বালিই ফেল্‌ছে, সাগর বেটাকে একবার দম ফেলতেও দিচ্ছে না। সে বেটা শেষে হাঁপাতে হাঁপাতে আর কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে বল্ল, "বাবা গো! শুষে ফেল্লে গো! বুজিয়ে ফেল্লে গো! মেরে ফেল্লে গো!"

পাখীরা তা শুনে বল্ল, "শুষেছি কি, আরো শুষব! বুঁজিয়েছি কি, আরো বোঁজাব! মেরেছি কি, আরো ভাল মতেই মারব!" সাগর তাতে হাত যোড় করে বল্ল, "দোহাই দাদা আর মের না, তা হলে মরেই যাব! বল আমার কি দোষ হয়েছে, আর কি করতে হবে, আমি এক্ষণি তা করছি!" পাখীরা বল্ল, "তুই টিট্‌ঠী ভায়ের বাসা ভাসিয়ে নিয়েছিস, ডিম চুরি করেছিস! দে শীগ্গির তার ডিম ফিরিয়ে দে, বাসা এনে দে!" সাগর বল্ল, "এই যে, এখনি দিচ্ছি দাদা! তার জন্যে কি আমাকে মেরে ফেলতে হয়? আর কখ্‌খনো আমি এমন কাজ কর্‌ব না।"

এই বলে সে কাঁপতে কাঁপতে টিট্‌ঠী পাখীর ডিমশুদ্ধ বাসা তখনি তাকে এনে দিল। পাখীরা তাকে বল্ল, "খবরদার! আর কখ্‌খনো টিট্‌ঠী ভাইয়ের বাসার কাছে আসবি না। যদি আসিস তবে দেখবি এখন।" সাগর বল্ল, "বাপ রে! আর কি আমি আসি? টিট্‌ঠী দাদা, আমাকে মাপ কর, আমার ঘাট হয়েছে!" বলে সে দু হাতে পাখীদের সেলাম করতে লাগল। পাখীরা তখন খুব খুসী হয়ে যে যার ঘরে চলে গেল, টিট্‌ঠী পাখীও আবার তার বাসায় বসে মনের সুখে ডিমে তা দিতে লাগল। সেই ডিমের ভিতর থেকে যে তিনটি ছানা বেরিয়েছিল, তারা যে কি সুন্দর, সে কি বলব! ডিমের খোসা তাদের পিছনে লেগে রয়েছে, তাই নিয়ে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে!

সুখের চাকুরী

মনিব মিলেছে মোর মনের মতন,
বছর তিনের সে যে রমণী রতন।
ননীর শরীরে তার লাঠিমের লীলা,
বদনে চাঁদের আলো, কণ্ঠে কোকিলা।

সে যে হাসে খল্ খল্
সে যে নাচে থই থই,
তার চোখে ছোটে বিজলী,
মুখে ফোটে খই।

জবর জুটিল যে রে নোকরী নূতন,
বেতনের নাহি নাম, না মিলে ভোজন।
'উপরী' আছয়ে চুমু, চলে শুধু তায়,
কৃপণার ধন তাও, না হয় আদায়!
সে যে দাড়ি দেখে চটে,
সে যে থাকে চোখ বুঁজে
পড়ে শয্যায়, লজ্জায়
মুখখানি গুঁজে।

কি করিতে হয় মোর, চাহ সে খবর?
সে বড় মাথার কাজ, ভার গুরুতর!
সুর অ-সুরের, তাল বে-তালের খেলা,
যে খেলেছে, সেই জন জানে তার ঠেলা!
আমি নাচি ধিন্ ধিন্,
আমি গাই তান ধ'রে,
সে যে শোনে সুখে বসি
মোর শিরো'পরে!

শ্রীদাদা মশাই।

টিয়াপাখীর বুদ্ধি।

এক ফরাসি ভদ্রলোকের একটা কুকুর আর একটা টিয়াপাখী ছিল। কুকুরটাকে তিনি নানরকম খেলা আর কাজ শিখিয়ে ছিলেন, "বাইরে যাও", "দোকানে যাও" "খাবার আন" ব'লে তিনি যখন যেমন হুকুম কর্‌তেন, কুকুরটা ঠিক মতন তাঁর হুকুম তামিল কর্‌ত। টিয়া পাখিটা কিন্তু কিছু কাজ কর্‌তে শেখেনি। সে কেবল সবসময় বকর্ বকর্ করে কথা বল্‌ত আর কুকুরটার উপর সর্দ্দারি কর্‌ত। কুকুর বেচারা হয়ত ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে হটাৎ টিয়াপাখীটা চোখ্ পাকিয়ে ধমক দিয়ে বল্‌ল "এইও, বাইরে যাও"—কুকুরেরও হুকুম শুনে অভ্যাস—সে ভয়ে ভয়ে লেজ গুটিয়ে দরজার দিকে রওনা হ'ত। তখন আবার টিয়াপাখীটা ঠিক তার মনিবের মত শিস্ দিয়ে তাকে ডেকে আন্‌ত।

সেই ভদ্রলোকটি কুকুরটাকে প্রায়ই রুটিওয়ালার দোকানে 'কেক্' আনবার জন্য পাঠাতেন। কুকুরটাকে সকলেই খুবই চিনত সুতরাং সে টুকরি মুখে নিয়ে দোকানে আস্‌লেই রুটিওয়ালা টুক্‌রির মধ্যে কেক্ পুরে দিত আর তার মনিবের নামে হিসাব লিখে রাখ্‌ত। একদিন ভদ্রলোকটি হিসাব করতে গিয়ে দেখেন যে তাঁর হিসাবের সঙ্গে দোকানের হিসাব মিল্‌ছে না! তিনি যতবার কুকুরটাকে পাঠিয়েছেন—দোকানীর হিসাবে তার চাইতেও বেশী লেখা হ'য়েছে! কয়েক দিন পর্য্যন্ত এর কারণ কিছু বোঝা গেল না। তারপর তিনি একদিন দেখেন

কি কুকুরটা শুয়ে আছে এমন সময় টিয়া পাখীটা হটাৎ ব'ল উঠ্‌ল "টুক্‌রি আন"। কুকুরটা একটু উঠে টুকরি নিয়ে এল। টিয়াপাখী বল্ল "দোকানে যাও" কুকুর বেচারা ইতস্তত করতে লাগল তাই দেখে সে আবার চীৎকার ক'রে বল্ল "এইও, দোকানে যাও।" কুকুর বেচারা আর কি করে? সে দোকানে গিয়ে দু মিনিটের মধ্যে খাবার এনে পাখীটার সামনে রেখে লেজ নাড়তে লাগ্‌ল, ইচ্ছাটা সে কিছু ভাগ পায় কিন্তু টিয়া পাখী "বাইরে যাও" ব'লে এক ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে, নিজেই সবটা খাবার খেতে লাগ্‌ল।

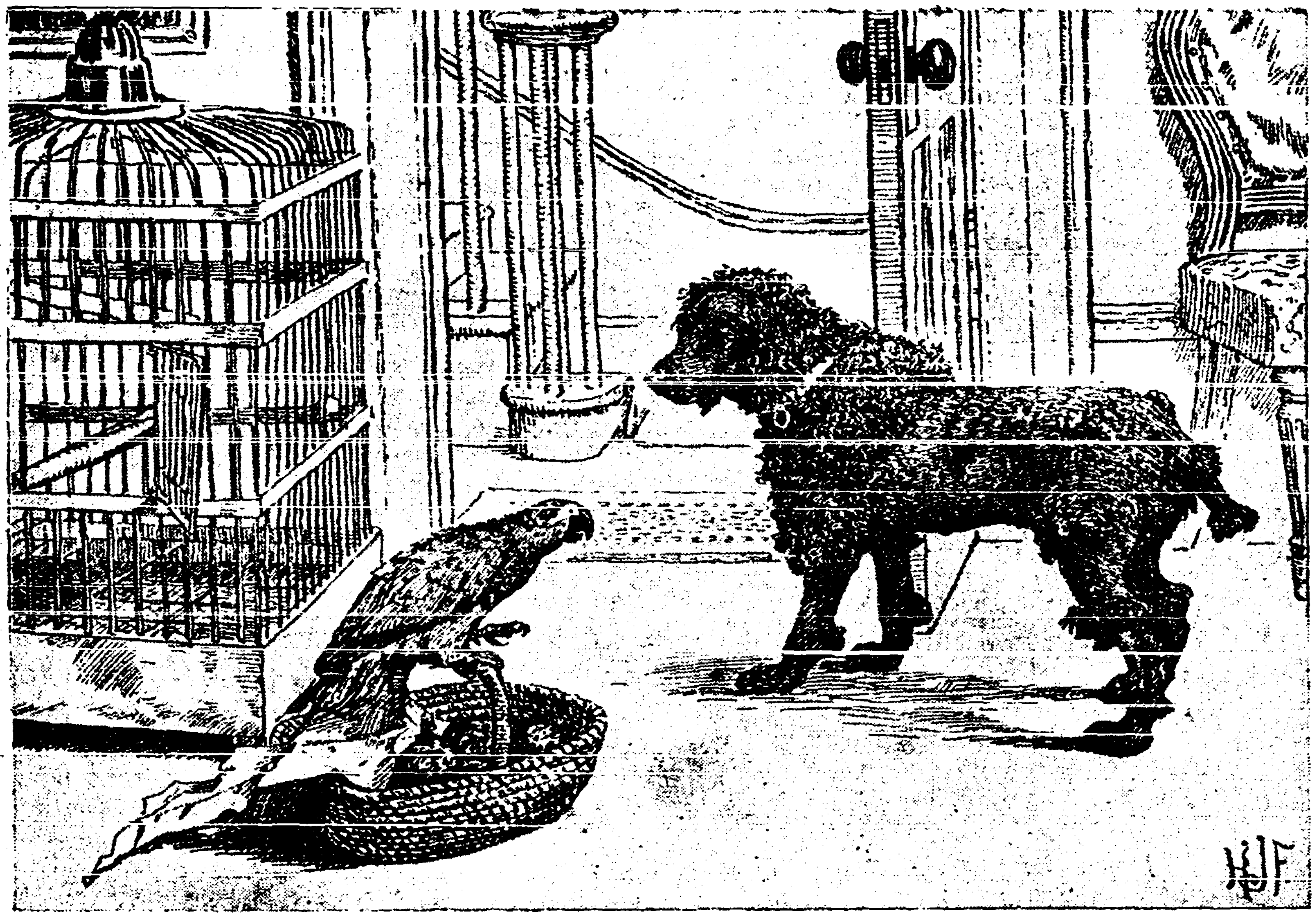

তখন ভদ্রলোকটি বুঝতে পারলেন যে দোকানীর হিসাবে কেন বেশী লেখা হয়।

মোহন মুন্সী।

ঠান দিদির এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম ললিত মুন্সি, ডাক নাম ছিল মোহন মুন্সী। তিনি বেশ মোটা সোটা ছিলেন। কেহ কেহ বলত মোহন মুন্সীর যেমন চেহারা খানি মোটা, বুদ্ধি খানিও তেমনি। আবার একদল লোক ছিল, তারা সর্ব্বদাই মোহনের সুখ্যাতি করত, তারা বলত মোহনের বুদ্ধি মোটা বটে কিন্তু এত মোটা যে বেড় পাওয়া যায় না। আজ মোহন মুন্সীর বুদ্ধির দুটী গল্প বলি।

মোহন রাত্রিতে শুয়ে আছেন। খোস পাঁচড়ার যাতনায় ঘুম হচ্ছে না, তাই কাত হয়ে শুয়ে বেড়ার ফাক দিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে রয়েছেন, দুপুর রাত্রে হঠাৎ মোহন

দেখতে পেলেন একখানা হাত দোরের কাছে বেড়ার পাশে নড়ছে। একটা লোক বেড়া কাটছে, বেড়া কেটে হাত গলিয়ে দোরের খিল খুলবার মতলব। তখন মোহন আস্তে আস্তে উঠে কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন, চোর যেমন তার কনুই পর্য্যন্ত গলিয়ে দোরের খিল ধরেছে, মোহন অমনি তার হাত ধরে 'চোর! চোর!' বলে চীৎকার আরম্ভ কল্লেন। চোর গ্রামেরই লোক, ধরা পড়লে সে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না, তার পরে জেলের ভয় ত আছেই, সে প্রাণপণে হাত ছাড়াবার চেষ্টা কত্তে লাগলো। মোহন খোস পাঁচড়ায় একটু কাতর হয়েছিলেন, তাঁর তো আর প্রাণের দায় না, তিনি যখন দেখলেন হাত ধরে আর রাখতে পারেন না, তখন চোরের বুড়া আঙ্গুলটা কামড়ে ধরলেন, চোর তার আঙ্গুলের মাথাটা মোহনের মুঁখে রেখেই পালাল। বাড়ীর অন্যান্য ঘরের ও পাড়ার লোক সব জেগে এসে দেখে চোরের বুড়া আঙ্গুলটা কেবল রয়েছে। চোরের নাম কালীকমল; বক্সীদের খানাবাড়ীর রাইয়ত বলে দিনের বেলায় তাঁদের কিছু কর্ম্ম কাজ করত, আর রাত্রিতে কি করত তাতো তোমরা বুঝতেই পাচ্ছো। পরদিন কালীকমল সকালে যখন বক্সীদের পূজার ফুল তোলে, সেই সময় বক্সীবাড়ীর এক বুড়া ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা কল্লেন "কিরে কালীকমল! তুই যে বাঁ হাত দিয়ে ফুল তুলছিস্?" সে বল্লে "ডান হাতে একটা বাঁশ পড়ে হাতটা বড় টাটিয়েছে।" হাতের যাতনায় সে আর বেশী ক্ষণ ফুল তুল্‌তে পারল না। সে বাড়ী গিয়েই শুন্‌ল লোকে বলাবলি কর্‌ছে—"মোহন মুন্সী রাত্রিতে এক চোরের বুড়া আঙ্গুল কামড়ে রেখেছে" তখন সে ধরা পড়বার ভয়ে, গ্রাম ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী পালাল। কিন্তু তার পরে বেচারা বেশী দিন বাঁচেনি—কিছুদিন ভুগে, দেশে এসে কয়েক মাসের মধ্যেই সে মারা গেল। তখন লোকে বলতে লাগল "মোহন মুন্সীর দাঁতের বিষে কালীকমল মলো।"

আর একবার মোহন রাত্রিতে শুয়ে আছেন, সে ঘরে কেবল তিনি আর তাঁর স্ত্রী, অধিক রাত্রে মুটমাট শব্দ শুনে মোহনের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি বিছানায় উঠে বস্‌লেন, একটী দিয়াসলাই জ্বেলে প্রদীপ ধরালেন। প্রদীপটী ধরিয়ে একটু তামাক সাজলেন, চোর মনে করল তিনি তামাক খেতেই উঠেছেন, সে মোহনকে প্রদীপ জ্বালতে দেখেই আস্তে আস্তে বেড়া বেয়ে আড় কাটার উপরে উঠে মটকা ধরে বাদুড় ঝোলার মত ঝুলে রইল। মোহন বেশ আরাম করে তামাক টান্‌তে লাগলেন এবং আড়ে আড়ে দেখতে লাগলেন, চোর মশাই কোথায় আছেন। তারপরে তামাক খাওয়া শেষ হলে তাঁর স্ত্রীকে ঠাঁ ঠাঁ করে গোটা কয়েক কিল চড় বসিয়ে দিলেন। স্ত্রী বেচারা ঘুমের ঘোরে কিল

চড় খেয়ে মনে কল্লেন, মোহনকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে, নইলে মোহনের মত ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক যে কারও গায়ে হাত তোলা দূরে থাকুক, কখনও বকাবকি পর্য্যন্ত করে না; সে হঠাৎ এ রকম করে কিল চড় মারবে কেন? এই ভেবে মোহনের স্ত্রী একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, কান্না শুনে অন্যান্য ঘরের সব জেগে উঠে দৌড়ে এল। চোর দোরের খিল খুলে রেখেছিল, সকলে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগল 'কি হয়েছে, কি হয়েছে?' মোহন তখন গম্ভীর ভাবে মটকার দিকে হাত দিয়ে বল্লেন "আমি ত কিছু জানি না, ঐ ভদ্রলোক জানেন।" তখন সকলেই মটকার দিকে চেয়ে দেখে একজন লোক বাদুড়ের মত ঝুলে রয়েছে, সকলে তো হেসে কুটপাট, কারুর বুঝতে বাকী রইল না যে সে চোর। তখন দুই তিন জন বেড়া বেয়ে আড় কাঠার উপরে উঠে তাকে টেনে মেঝেয় ফেলে দিল, তারপরে সকলে মিলে চাঁদা করে রীতিমত ঘা কয়েক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলে এখন মোহন মুন্সীর দলের লোকেরা বল্লে মোহন দাদা

কেমন চালাকী করে চোরটাকে ধরে ফেল্লে, যদি সে একা চোর ধত্তে যেত, তা হলে নিশ্চয়ই একটা খুনো খুনী ব্যাপার হত, কিম্বা যদি চোরটা হঠাৎ মটকা থেকে লাফিয়ে পড়ত তা হলে বৌদিদি নিশ্চয়ই ভূত মনে করে ভয়ে মরে যেতেন। আমরা কি সাধে বলি মোহনের বুদ্ধির বেড় পাওয়া যায় না! কিন্তু অন্যেরা বল্ল "সাধে বলি ব্যাটা বোকা? বাপু চোর ধরবি তা বৌটাকে মারা কেন? তুই নিজে চেঁচালেই পারতি।"

এখন তোমরা বিচার করে দেখ মোহন "বুদ্ধিমান না বোকা।"

গুরু শিষ্য।

এখন তোমরা বাড়ীতে থাক, ইস্কুলে গিয়া পড়। প্রাচীন কালে ছেলেরা গুরুর বাড়ীতেই থাকিত, সেখানেই পড়াশুনা করিত। এখন পড়া বলিতে পারিলেই মাষ্টারের হাত এড়ান যায়, তারপর মনের সুখে খেলা করিতে পার। সেকালে খাওয়া পরায়ও গুরুর হুকুম মানিয়া চলিতে হইত; খেলা ত ছিলই না। গুরুর গৃহে গিয়া ছেলেরা কি করিবে, কি না করিবে, পুরাণে তাহা পরিস্কার লেখা আছে।—

"খুব শুদ্ধ শান্ত হইয়া থাকিবে, মন দিয়া বেদ পাঠ করিবে। ব্রত পূজায় যত্ন রাখিবে, গুরুর সেবায় কদাচ অবহেলা করিবে না। দু বেলা সূর্য্যের আর অগ্নির উপাসনা করিবে, তারপর গুরুর পায়ের ধূলা লইবে। কখনও তাঁহার কথা অমান্য করিবে না, তিনি চলিলে চলিবে, বসিলে বসিবে। তিনি পড়িতে বলিলে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া এক মনে বেদ পাঠ করিবে। গুরুর অনুমতি হইলে ভিক্ষা করা চাউলের অন্ন আহার করিবে। আগে গুরু স্নান করিবেন, শিষ্য তাঁহার পরে স্নান করিবে। রোজ সকালে তাঁহার জন্য কুশ, জল, আর ফুল আনিয়া রাখিবে। এইরূপে সমস্ত লেখাপড়া শেষ হইলে, গুরুকে দক্ষিণা দিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহে ফিরিবে।"

বড় কঠিন নিয়ম,—না? কঠিন নিয়ম ছিল, তাই মুনি ঋষিরা এত বড় লোক হইতে পারিতেন। ফাঁকি দিয়া কি মানুষ হওয়া যায়? আজকালকার স্কুল কলেজে এমন নিয়ম হইলে হয় ত অনেকেই ভারী চটিত। তবু ত ইহাতে সকল কথা বলা হয় নাই। সেকালের শিষ্যদিগকে গরুও চরাইতে হইত, ক্ষেতের আলও বাঁধিতে হইত; আর কোন মতে বাঁধিতে না পারিলে, সেখানে পড়িয়া থাকার কথাও শোনা গিয়াছে। গুরুরা

যে শিষ্যদিগকে কি রকম শাসনে রাখিতেন, ইহাতে তাহাই বুঝা যায়। সকল সময় যে তাহাদিগকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন, এমনও মনে হয় না। এক গুরু তাঁহার শিষ্যকে কঠিন কাজ দিয়াছেন, জানেন, সে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তবু দেখিলেন শিষ্য দিন দিন মোটা হইতেছে। গুরু তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি খাইতে পাও না, তবু কি করিয়া মোটা হইতেছ?" শিষ্য বলিল, "বাছুরেরা খাইয়া যে দুধটুকু থাকে, আমি তাই খাই।" গুরু বলিলেন, "সে হইবে না, তোমার খাতিরে বাছুরেরা কম খাইয়া তোমার জন্য বেশী রাখিবে।" দুধ খাওয়া বন্ধ হইল, শিষ্য বাছুরের মুখের ফেণ খাইয়া দিন কাটায়। গুরু টের পাইয়া তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন শিষ্যের আর আকন্দের পাতা খাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। সেই পাতা খাইয়া তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাওয়ায়, বেচারা কূয়ায় পড়িয়া গেল। তখন গুরুদেব আসিয়া যারপর নাই স্নেহ দেখাইয়া তাহাকে এক বরে সকল বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়া দিলেন।

এখন আর বর দিয়া পণ্ডিত করিয়া দিবার দস্তুর নাই। আজ কাল মন দিয়া পড়া শুনা না করিলেই মূর্খ থাকিয়া যাইতে হয়। কাজেই সেইটার উপরে খুব কড়া নজর না রাখিলে চলে না। আমাদের ছেলে বেলায় পড়ায় অমনোযোগ বা দুষ্টুমি করিলে গাধার টুপী পরিতে বা বেত খাইতে হইত; নিতান্ত পাড়াগাঁয় বিছুটিও লাগাইয়া দিত। তারপর দেখিলাম, শাসন করিলে ছেলেরা চটে; প্রমোশন না দিলে তাহাদের বাবারা অবধি চটেন—মাষ্টার বেচারার উপরে!

এক মাষ্টার এক চাষার নিকট হইতে তাঁহার গরুর জন্য মাঝে মাঝে খড় কিনিতেন; সেই চাষার ছেলে তাঁহাদের ইস্কুলে পড়িত। ছেলেটির বুদ্ধি শুদ্ধি নিতান্তই কম, তাই বছরের শেষে সে প্রমোশন পাইল না। তখন চাষা আসিয়া ছেলের প্রমোশনের জন্য মাষ্টার মহাশয়কে বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় সে নিরাশভাবে বাড়ী ফিরিয়া চলিল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মাষ্টারের পো! খড়টা খাওয়াব!"

আজকাল কি রকম হয় তাহা তোমরাই বলিতে পার। সেকালের মতন এখনও পড়া বলিতে না পারিলে কিছু খাইতে পরিতে মিলে কি না, তাহা বাহিরের লোকের জানিবার যো নাই। তবে, মাঝে মাঝে যে কোন কোন ছেলেকে দিন রাত বসিয়া খালি আঁকই কষিতে দেখা যায়, শুনিয়াছি সে নাকি তোমাদের আমলের নূতন ধরণের সাজা।

মুনি ঠাকুরদের সময়ে বেত মারার বা বিছুটি লাগাইবার রীতি ছিল না। পড়ায় অমনোযোগ করিলে তাঁহারা কোন সাজা দিতেন কি না সে খবর আমি পাই নাই। অন্য কোন কারণে চটিলে শাপ দিতেন বা সেই ধরণেরই আর কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন, আর, তাহাতে সময় সময় ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া যাইত। বৈশম্পায়ন বড়ই বিখ্যাত ঋষি ছিলেন, তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যও নিতান্ত কম ছিলেন না। অনেক দিন ধরিয়া তিনি তাঁহার নিকট বেদ শিক্ষা করেন। তারপর একদিন কোন কারণে বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "আমার নিকট যাহা শিখিয়াছ, এখনি তাহা ফিরাইয়া দাও।" যাজ্ঞবল্ক্যও তখনই 'এই নি'ন' বলিয়া হড়হড় শব্দে এত দিনের পড়া সেই রক্ত মাখা বেদ বমি করিয়া ফেলিলেন। সেখানে বৈশম্পায়নের আরো অনেক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তখন করিলেন কি,—সেই রক্তমাখা বেদ মাটিতে পড়িতে না পড়িতেই তাড়াতাড়ি তিত্তির পাখী সাজিয়া তাহা ঠোকরাইয়া খাইতে লাগিলেন। এই জন্য আজও বেদের সেই সকল অংশকে 'তৈত্তিরীয়' বলে।

এত পরিশ্রমের ফল এমন ভাবে নষ্ট হইল! যাহা হউক, যাজ্ঞবল্ক্য সহজ লোক ছিলেন না। তিনি ইহাতে নিরাশ না হইয়া, তখনই গিয়া সূর্য্যের স্তব আরম্ভ করিলেন। এমনই সুন্দর স্তব তিনি করিলেন যে সূর্য্যের কি আর খুসী না হইবার যো আছে? তিনি চমৎকার একটি ঘোড়া সাজিয়া আসিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, "তোমার কি বর লইতে ইচ্ছা হয়?" যাজ্ঞবল্ক্য ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে বেদের এমন কিছু শিখাইয়া দিন যে, আমার গুরু বৈশম্পায়নও তাহা জানেন না। সূর্য্য "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে বেদের সম্পূর্ণ নূতন এক অংশ শিখাইয়া দিলেন। এখন বেদের সেই সকল অংশ যাহারা পড়ে, তাহাদিগকে বলে 'বাজি,' কেন না, সূর্য্য বাজি, অর্থাৎ ঘোড়ার বেশে উহা যাজ্ঞবল্ক্যকে শিখাইয়াছিলেন।

৪

সেকালের লড়াই।

সন্দেশে তোমরা নানারকম জানোয়ারের লড়াইয়ের কথা প'ড়েছ। তার কোন কোনটার ছবিও বেরিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক লড়াইয়ের মত লড়াই কাকে বলে যদি জান্‌তে চাও তবে সেকালের জানোয়ারদের খোঁজ নিতে হয়। যেকালের কথা বল্‌ছি সে সময়ে মানুষের জন্ম হয়নি—সে প্রায় লাখ লাখ বছরের কথা। সে সময়কার জন্তুরা ত এখন বেঁচে নেই, তাদের খোঁজ নিবে কি ক'রে? খোঁজ নেবার উপায় আছে।

যে সকল পণ্ডিতেরা নানারকম জানোয়ারের শরীর পরীক্ষা ক'রে থাকেন, তাঁরা এক একটা জানোয়ারের সামান্য দু একটা হাড়, দাঁত বা শরীরের কোন টুক্‌রা দেখে সেই জানোয়ার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা ব'লে দিতে পারেন যে শুন্‌লে অবাক হ'তে হয়। সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, জলে থাকে কি ডাঙায় থাকে, দু পায়ে চলে না চার পায়ে চলে, সে কোন জাতীয় জন্তু, এসব কথা শুধু খানিকটা কঙ্কাল পরীক্ষা ক'রে চট্ ক'রে বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পাহাড় কাট্‌তে বা মাটি খুঁড়্‌তে গিয়ে এমন সব হাড় পাওয়া যায় যেটা আমাদের জানা কোন জন্তুর হাড় হ'তেই পারে না। মনে কর একটা পায়ের টুকরা পাওয়া গেল প্রায় ৫ হাত লম্বা আর একটা হাতীর পায়ের চেয়েও মোটা। সে হাড় আর এখন হাড় নেই, সে কোন্ কালে পাথর হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু তার চেহারাটা সেই রকমই আছে। এই সব হাড় পরীক্ষা ক'রে সেকালের অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা জানা গিয়েছে।

মনে কর একটা পাথর কাট্‌তে গিয়ে তার মধ্যে একটা জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেল—সে পাথর এক সময়ে নরম মাটি ছিল—জানোয়ারটা তার মধ্যে মারা যায়। ক্রমে সেই নরম মাটি জ'মে সেই হাড়গোড় শুদ্ধ পাথর হ'য়ে গেছে। মাটি জমে পাথর হ'তে হয়ত কত লাখ বৎসর লেগেছে, তারপরে কত হাজার বৎসর কেউ তার কথা জান্‌তে পারে নি। এত দিন পরে মানুষ আবার সেই জানোয়ারের সন্ধান পেল! পণ্ডিতেরা সেই পাথর পরীক্ষা ক'রে হয় ত বল্‌বেন এটা অমুক যুগের পাথর। তার পর হাড় পরীক্ষা ক'রে জানোয়ারটার সম্বন্ধেও নানা কথা বল্‌বেন। যদি অনেকগুলা হাড় পাওয়া যায় তবে হয় ত জানোয়ারটার একটা মোটামুটি চেহারাও খাড়া কর্‌তে পার্‌বেন।

এই রকম ক'রে কত অদ্ভুত জানোয়ারের যে খবর পাওয়া গেছে সে কথা ভাব্‌তে গেলে অবাক হ'তে হয়। এখানে মাত্র কয়েক রকম জানোয়ারের ছবি দেওয়া হ'ল।

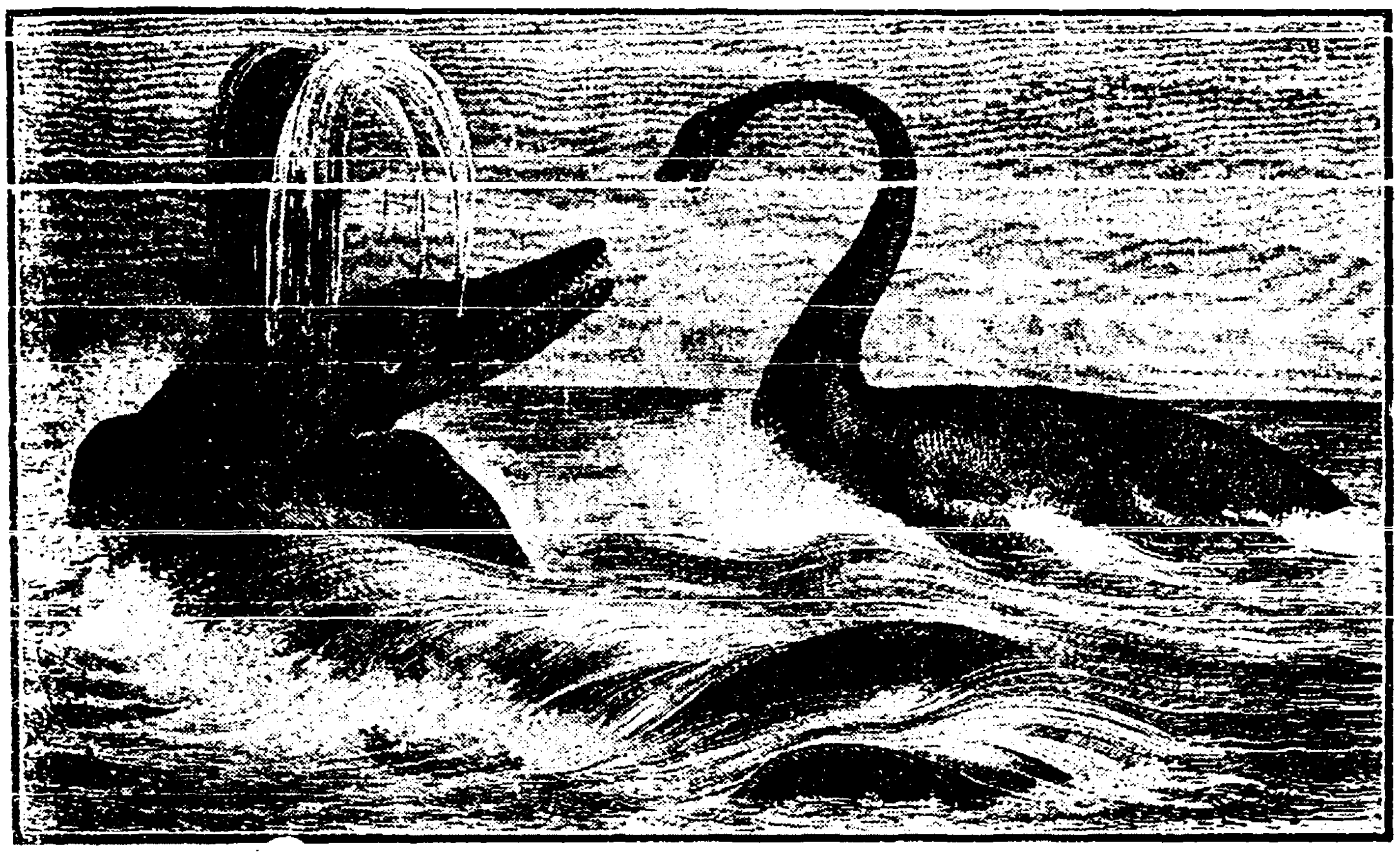

প্রথমটা দুটো জলজন্তুর লড়াই। যেটার গলা সরু আর লম্বা সেটার নাম প্লীসিও সরাস্—(অর্থাৎ "প্রায় কুমীর জাতীয়") এ জানোয়ারটি লম্বায় প্রায় ২৫।৩০ হাত হ'লেও মোটের উপর নিরীহ ছিল। আরেকটার নাম ইক্‌থিয়ো সরাস্ ("মাছ-কুমীর")। এর চেহারা আর মুখের ভঙ্গী দেখেই বুঝ্‌ছ যে এর মৎলব ভাল নয়।

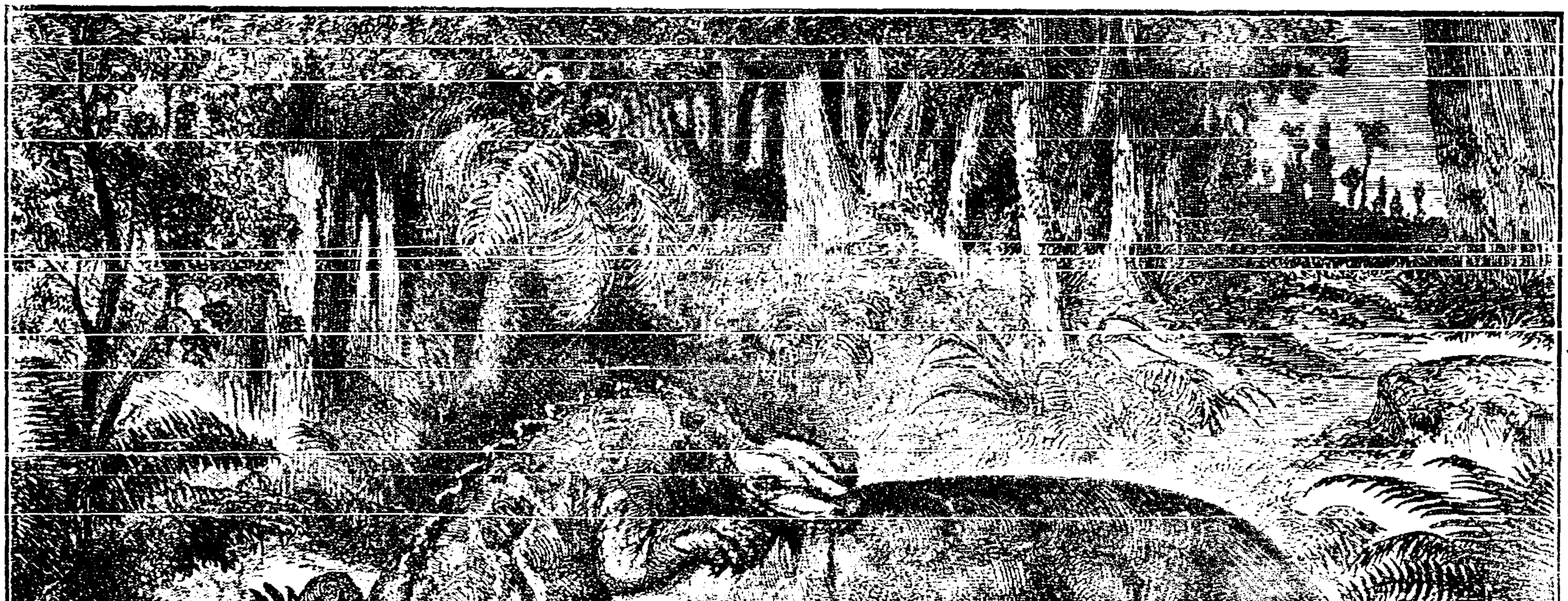

এই দেখ আর দুটো জানোয়ার। একটার নাম মেগালোসরাস্ আর একটি

ইগুয়ানোডন—যে ঘাড়ে কামড়িয়েছে সে ইগুয়ানোডন, আর যে পায়ে কামড়িয়েছে সে মেগালোসরস্। ইগুয়ানোডন দেখতে ভয়ানক বটে কিন্তু নিরামিষ ভোজী, মেগালোসরাস্ আমিষ ভোজী। এরা দুজনেই হাতীর চেয়ে বড় ছিল।

এই যে দুটো লড়্ছে দেখ্‌ছ, এরা সেকালের কুমীর—এদের পিছনের পা দুটার গড়ন সাংঘাতিক রকম মজবুৎ—লড়ায়ের সময় পিছনের পা দুটাই আক্রমণ কিম্বা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার কর্‌ত। এদের নাম টিরানোসরস—অর্থাৎ অত্যাচারী কুমীর। এরাও হাতীর চেয়ে বড় ছিল।

এরকম আরও কত জানোয়ার সেকালে ছিল ব'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা যদি তখন বেঁচে থাকতাম তা হ'লে কি মুস্কিল হ'তো বল দেখি? এতগুলো হাতীর চেয়ে বড় হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে আমাদের দশাটা কেমন হ'তো একবার ভেবে দেখ। কয়েক বৎসর আগে, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার জঙ্গলে সেকালের জন্তু এখনও আছে। একজন সাহেব অনেক লোক জন নিয়ে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের দেখা পেলেন না।

কে পার ?

একবার বায়স্কোপে একটা লোকের ভেংচি কাটার তামাসা দেখেছিলাম; তোমাদেরও অনেকেই হয় ত দেখে থাকবে। দেখে, তারপর তোমরা কে কি করেছিলে, তা তোমরাই বলতে পার। আমি অনেক দিন অপরের অসাক্ষাতে বসে সেই রকম ভেংচি কাটতে চেষ্টা করেছি। তাতে এই বুঝতে পেরেছি যে, একাজে সে লোকটি আমার চেয়ে ঢের বেশী ওস্তাদ, আমি কিছুতেই তার সঙ্গে পেরে উঠব না। এ ব্যক্তি যদি আমাদের সঙ্গে 'মুফ্‌তী' খেলতে আসে, তবে আমাদের নিতান্তই নাকাল হতে হবে।

মুফ্‌তী খেলা জান না ? তবে এই বেলা শীগ্গির তা শিখে নাও, নইলে কখন ঠকতে হয় তার ঠিক কি ? খেলাটি খুবই সহজ। একজন মুফ্‌তী সাজবে, আর সকলে হবে তার চেলা। তারপর এক জায়গায় খুব গম্ভীর হয়ে বসে, মুফ্‌তী মশায়, তাঁর যতদূর সাধ্য, বিদ্‌খুটে ভেংচি কাটতে থাকবেন, আর সকলে মিলে অবিকল তাঁর নকল করবে। কিন্তু খবরদার ! কেউ হাসতে পারবে না। যে হাসবে তার জরিমানা ; মুফ্‌তী হাসলে তিনি বরতরফ।

হাসির কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু হাসবার যো নাই, এ ভারী কঠিন কথা। কেউ কেউ তা পারে, অনেকেই পারে না। আমি আরেকটি এমনি কঠিন কাজের কথা বলতে পারি। হেট মুখে হাঁ করে জিব বার করে থাক। তখন তোমার মুখের সামনে তেঁতুল ধরলে তোমাকে জিবের জল রাখতে হবে !

এক একটা কাজ আছে, সে কারুর পক্ষে খুব সহজ, আবার কারুর পক্ষে ভারী শক্ত। মানে কারুর শরীরের গড়নই এমন যে, সে ইচ্ছা করলেই তা করতে পারে ; অন্য লোকের গড়ন তেমন নয়, কাজেই তারা সেটা পারে না। মনে কর যেমন, নিজের নাকের আগা জিব দিয়ে চাটা। চেষ্টা করে দেখ ত, কে কে পার। আমার ছেলেবেলায় আমি কিছুতেই এ কাজটি করতে পারতাম না, দাঁতে জিব আটকে যেত ! এখন দাঁতগুলো পড়তে আরম্ভ করেছে, বোধ হয় আর কিছু দিন পরেই পারব।

কুকুরের মত কান নাড়তে পারে, এমন লোকও নাকি মাঝে মাঝে থাকে শুনেছি। আমি একটি বাবুর কথা জানি, তিনি নিজের একটা চোখ স্থির রেখে আরেকটাকে নাড়তে পারেন। আমি শুধু চোখের পাতা নাড়ার কথা বলছি না, আসল চোখটাই তাঁকে নাড়তে দেখেছি। তখন যে তাঁর চেহারা, সে আর কি বলব !

কেউ কেউ খুব তাড়াতাড়ি চোখ মিটমিট করতে পারে, অনেকে তেমন পারে না। দুটি চোখ একসঙ্গে মিটমিট করা সহজ, কিন্তু অঁদল বদল করে মিটমিট করা একটু কঠিন। অদল বদলের মানে এই হচ্ছে যে, একবার ডান চোখ বুঁজে বাঁম চোখে তাকাবে, তখনি আবার বাম চোখ বুঁজে ডান চোখে তাকাবে। একাজটি খুব ঘন ঘন করতে গেলে অনেকেই তার সঙ্গে সঙ্গে বেজায় ভেংচি কাটতে থাকে।

হাতের আর সব আঙ্গুল গুটিয়ে নিয়ে, খালি মধ্যমা আর তর্জ্জনী আঙ্গুল দুটি মেলে, একখানা বই বা অপর হাতের তেলোর উপর রাখ। তারপর তাড়াতাড়ি তর্জ্জনীটি গুটিয়ে নিয়ে মধ্যমা আর অনামিকা ঐ বইয়ের উপর রাখ। তারপর আবার মধ্যমা আর তর্জ্জনী, আবার মধ্যমা আর অনামিকা,—এমনি কত তাড়াতাড়ি করতে পার, দেখ ত।

নিজের দুখানি হাত মেলে, পাশাপাশি চিৎ করে ধর। তারপর হঠাৎ বাঁ হাত মুঠো করে, ডান হাত তেমনি খোলা রেখেই তার আঙ্গুলের আগা এনে সেই মুঠোর গোড়ায় ঠেকাও। তারপর হঠাৎ ডান হাত মুঠো করে, বাঁ হাত খুলে তার আঙ্গুলের আগা এনে সেই ডান হাতের মুঠোর গোড়ায় ঠেকাও। এ কাজটি বার বার খুব তাড়াতাড়ি কর দেখি।

হাতের কাজের মধ্যে এসব হল খুব সোজা। কিন্তু এখন যে কাজটির কথা বলব, সেটি যদি ভাল করে করতে পার, তাহলে বাস্তবিকই বাহাদুরীর কথা হবে। হাত দুখানি সামনে এনে তর্জ্জনীর আগায় আগায় এমন ভাবে ঠেকাও, যেন এ হাতের কনুই থেকে তর্জ্জনীর উপর দিয়ে ও হাতের কনুই অবধি সোজা সুজি চলে যাওয়া যায়। এখন কনুই দুটি স্থির রেখে, দুটি তর্জ্জনীর আগা দিয়ে হাওয়ায় ঠিক গোল আঁচড় কেটে দেখিয়ে দাও, ঘুড়ি ওড়াবার সময় লাটাই কেমন করে ঘোরে। কনুই থেকে আঙ্গুলের আগা অবধি যেন সোজা থাকে; আঙ্গুল যেন বেঁকে না, কব্জি যেন খেলে না।

কথাগুলো বেশ করে বুঝে কাজটি কর। সূতা খুলবার সময় কোন বাগে লাটাই ঘোরে, এক হাতে তাই দেখাও; আরেক হাতে দেখাও, সূতা জড়াবার সময় কেমন করে লাটাই ঘোরে। একবার চেষ্টা করে দেখলেই বুঝতে পারবে, এ কাজটি কেমন কঠিন। দু হাত দু বাগে ঘুরতে কিছুতেই চায় না। তারা চায়, হয় দু জনেই সূতা জড়ান দেখাবে, না হয় দু জনেই সূতা খোলা দেখাবে।

নিজের ঘাড়ে পা তুলে দিতে কে পার? অনেকেই হয়ত বলবে, 'আমি!' 'বেশ' কথা; এখন ঐ পাখানি ঘাড়ে রেখেই উঠে দাঁড়াও ত! তারপর খানিক ঐ ভাবে

বেড়িয়ে এস। এবার বোধ হয় একটু মুস্কিলের কথা হল। আর, পাখানি হয় ত তোমরা হাতে ধরে ঠেলে ঘাড়ে তুলেছ। হাতে না ধরে অমনি তোল ত। তা যদি পার, তবে একবার চেষ্টা করে দেখ, দুখানি পা এক সঙ্গে ঘাড়ে তুলতে পার কিনা।

এর একটি কাজও অসম্ভব নয়। এর কোনটি করতে কুস্তীওয়ালারও দরকার হয় না। তবে আমি আগেই বলেছি, শরীরের গড়ন বুঝে এ সব কাজ কারুর কাছে সোজা, কারুর কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

গল্প স্বল্প।

সেই যে চিনাখালী ইস্কুলের রায় মশায়, তিনি কি রকমের মাষ্টার ছিলেন, তার কিছু কিছু শুনেছ। তিনি যে কি রকমের ছাত্র ছিলেন, তার কথা আর একটু শোন। তখন তিনি অবশ্য চিনাখালীতে ছিলেন না, তখন তিনি অন্য একটা পাড়া গেঁয়ে ইস্কুলে পড়তেন। তাঁর নাম ছিল মনে কর যেন যদু। যদুর স্বভাবটা চিরদিনই বেশী একটু পাগলাটে রকমের ছিল, আর সে যে ক্লাসে পড়ত, সে ক্লাসের মাষ্টার মশায়ের মেজাজটা ছিল তার চেয়েও আর একটু পাগলাটে আর বেজায় চটা। এর মধ্যে একদিন খবর এসেছে যে কোথাকার একজন ভারী বড়লোক সেই ইস্কুল দেখতে আসবেন। মাষ্টার মশায়েরা তাই সেদিন সকলেই খুব করে সেজে গুজে এসেছেন, আর যতদূর সম্ভব গম্ভীর দেখাতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের সকলের মাথায়ই টুপী, খালী সেই পাগলাটে মাষ্টার মশায়ের মাথায় ভারী মজার ধরণের একটা পাগড়ী। সেটার রং লাল, আর গড়নটা ঠিক যেন মন্দিরের চুড়ার মত। মাষ্টার মশায় আবার সেটাকে পিছন বাগে হেলিয়ে পরেছেন, কাজেই তাঁর চেহারাটি অবিকল কাঠঠোকরার মত হয়েছে। যদু বেচারার কি দুর্ম্মতি, সে আবার গিয়েছে সেই কথাটা পাশের ছেলেটির কানে কানে বলতে। যেই বলা, অমনি সেই ছেলেটা ছুটে গিয়ে মাষ্টার মশায়কে বলেছেন, "শুনেছেন সার্, যদু রায় আপনাকে কাটঠোকরা বলেছে !"

আগেই বলেছি, সে মাষ্টারটি ছিলেন বড্ড রাগী। তিনি সেই ছেলের কথা শুনেই ইস্কুলের ঘর কাঁপিয়ে গর্জ্জন করে উঠলেন, "কে যদু রায় ?" সে গর্জ্জন শুনে কি আর যদুনাথ সেখানে দাঁড়ায় ? সে বেগতিক বুঝে তখনই বাড়ীর পানে ছুট দিয়েছে। এদিকে মাষ্টার মশায় দুই চোখ লাল করে, বিশাল বেত হাতে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর

খালি বলছেন. "কে যদু রায় ?" "কে যদু রায় ?" "কে যদু রায় ?" ছেলেদের একজন বল্ল, "সার্, যদু রায়—মুন্সী মশায়ের ভাই।" অমনি মাষ্টার মশায় 'কে যদু রায় ?' 'কে যদু রায় ?' করে বেত হাতে—মুন্সী মশায়ের বাড়ীর দিকে ছুটলেন।

যদুনাথ ইস্কুল থেকে পালিয়ে এসে ভেবেছিল, এখন আর ভয় নাই, তাই সে ধীরে সুস্থে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই চলছিল। এমন সময় মোড়ের আড়াল থেকে মাষ্টার মশায়ের সেই ভীষণ গর্জ্জন এসে তার কানে পৌঁছাল। তখন তাড়াতাড়ি নর্দ্দমা পার হয়ে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে লুকান ছাড়া আর কি করা যেতে পারে ? লুকাতে কিন্তু বিপদ বরং বেড়েই গেল ; এখন ত মাষ্টার মশায় সটান গিয়ে—মুন্সী মশায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হবেন, আর তাহলেই ডবল মার খেতে হবে,—মাষ্টার মশায়ের হাতে, আবার বাড়ীর লোকের হাতে ! তার চেয়ে এখানেই এর শেষ হয়ে যাওয়া ভাল ছিল।

এত কথা যে তখন যদু ভেবেছিল, আমি তা বলছিনা, কিন্তু মাষ্টার মশায় সেখানে আসতেই যে সে গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে ছিল, একথা ঠিক। তবে সেই উপস্থিত হওয়ার ধরণটা ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। যদু তোমার আমার মত হেঁটে গিয়ে শান্ত ভাবে তাঁর সামনে দাঁড়ায়নি। সে বিষম পাগলাটে, আর বেজায় ষণ্ডা ছিল। মাষ্টার মশায় যেই সেখানে এসে বলেছেন "কে যদু রায় ?" অমনি যদু "আমি যদু রায়" বলে দিয়েছে সেই ঝোপের ভিতর থেকে এক লাফ, আর পড়েছে গিয়ে ঠিক তাঁর সামনে। এত বড় লাফ দিতে আর মাষ্টার মশায় তাঁর জন্মে কোন মানুষকে দেখেন নি ; আর সেই জায়গাটাও ছিল একটু জংলাটি গোছের। যদুকে তখন তিনি বাঘ না ভূত ভেবে ছিলেন, তা ঠিক বলতে পারি না ; কিন্তু তিনি তাকে লাফিয়ে পড়তে দেখে বেত ফেলে 'মা গো !' বলে যে সেখান থেকে ইস্কুলের পানে ছুট দিয়েছিলেন, তেমন ছুট নিতান্ত বাঘের ভয়ে ছাড়া খুব কম লোকেই দিতে পারে !

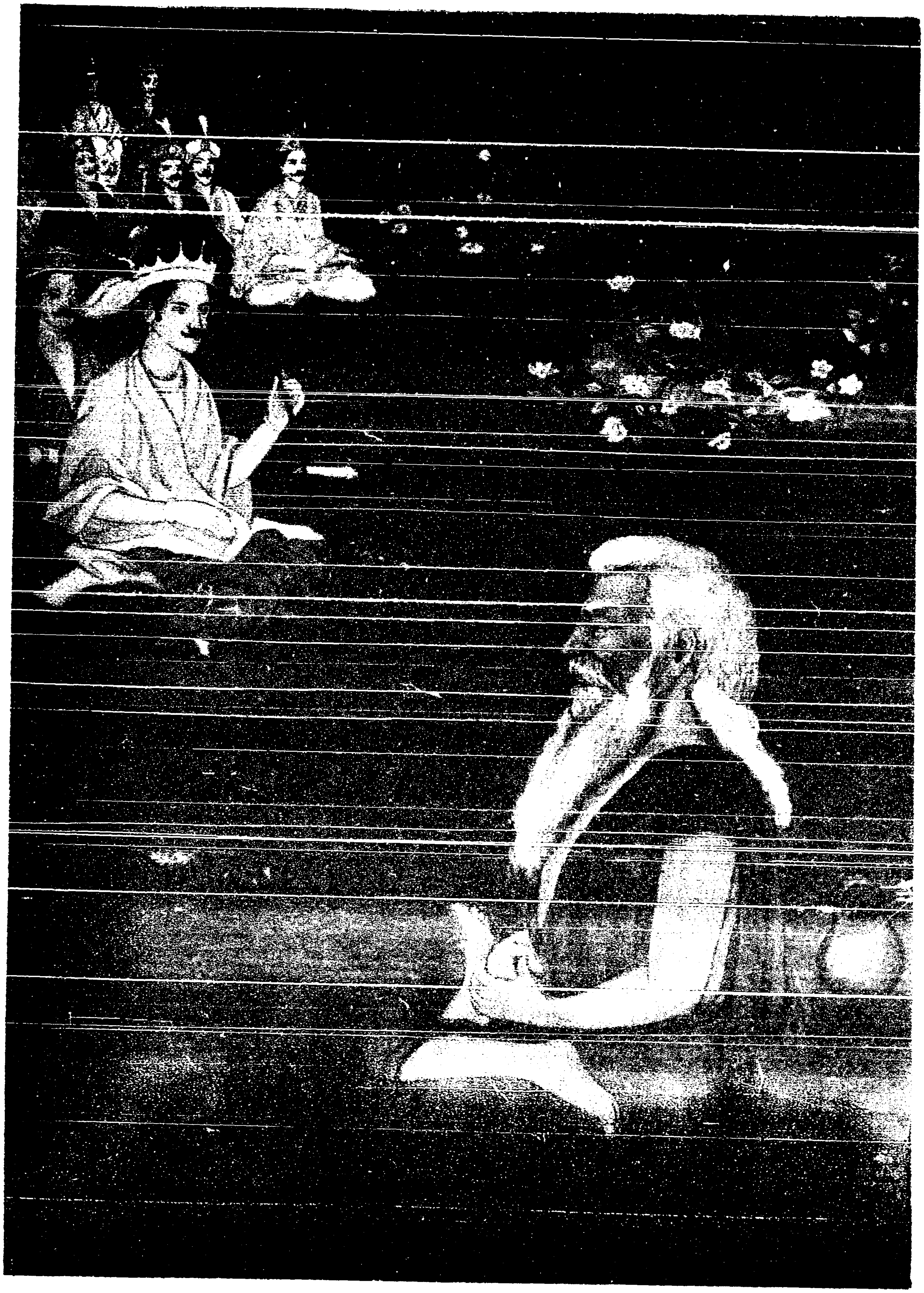

দধীচি দেহত্যাগের জন্য যোগাসনে বসিয়াছেন।

U. RAY & SONS.

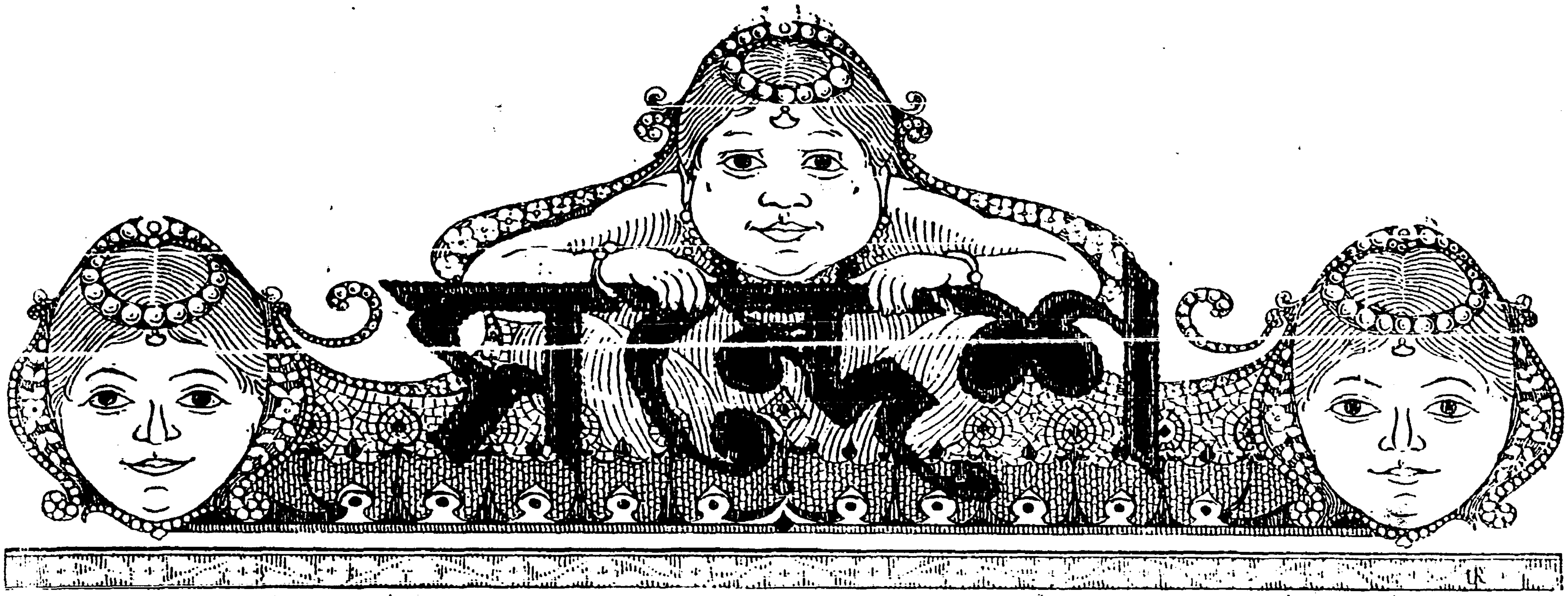

দ্বিতীয় বর্ষ মাঘ, ১৩২১ দশম সংখ্যা

মাতার মাতা রূপে,
পিতার পিতা রূপে,
যতনে পালিছ সবে,
তুমিই করুণাময়।

তোমারি স্নেহ-জ্যোতি
গগনে ভরি উঠে,
তোমার স্নেহের হাসি
প্রভাত কুসুমে ফুটে,
স্নেহের পরশ তব
বাতাস বহিয়া আনে,
তোমারি স্নেহ-গাথা
বিহগ গাহে বনে।

স্নেহের বাহু ডোরে,
ঘেরিয়া আছে মোরে,
তুমিই, তুমিই প্রভু,
তুমিই ত প্রেমময়।

আশীষ ধারা তব
সতত পড়ে ঝরি,
মোদের মাথার পরে
সতত পড়িছে ঝরি;
এ ক্ষুদ্র সন্তান নাথ,
নির্ভয় আনন্দ প্রাণ,
গাহিছে আজি তাই
তোমার জয় গান।

আমার এ জীবন,
সকল দেহ মন,
তোমারি, তোমারি প্রভু;
জয় হে তোমার জয়।

রেবতীর বিবাহ।

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল রৈবত ককুদ্মী। পশ্চিম সমুদ্রের ধারে, কুশস্থলী নামক নগরে তিনি বাস করিতেন। রৈবতের একটি কন্যা ছিল, তাহার নাম রেবতী। রেবতীর গুণের কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। মেয়েটি দেখিতে যেমন অপরূপ সুন্দরী, তেমনি সুশীলা আর মিষ্টভাষিণী, আর বুদ্ধিমতীও যতদূর হইতে হয়।

রেবতী যতই বাড়িয়া উঠিলেন, রাজার মনেও ততই ভাবনা হইল যে, "আহা! আমার এই স্নেহের মেয়েটিকে এখন কাহার হাতে সমর্পণ করি?" সংসারের যত ভাল ভাল রাজপুত্র, একে একে সকলের সংবাদই রাজা লইলেন, কিন্তু কাহাকেও তাঁহার পছন্দ হইল না। মন্ত্রী, পুরোহিত, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলকেই বলিলেন; কেহই তেমন ভাল একটি পাত্রের সন্ধান করিয়া দিতে পারিল না। শেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, "ব্রহ্মার কাছে যাই, তিনি অবশ্যই আমার মনের মতন একটি ছেলের কথা বলিতে পারিবেন।

এই ভাবিয়া রাজা কন্যাটিকে লইয়া ব্রহ্মার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হাহা আর হূহূ নামে দুই জন গন্ধর্ব্ব সেইখানে বসিয়া ব্রহ্মাকে গান শুনাইতে ছিলেন। হাহা আর হূহূর মত ওস্তাদ আর এই ত্রিভুবনে কখনও দেখা যায় নাই, তাঁহাদের সেই বিচিত্র সঙ্গীত শুনিতে যে কি মিষ্ট লাগিতেছিল, তাহা কি বলিব! সে গান একবার শুনিতে আরম্ভ করিলে আর সকল বিষয়ের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়; যতক্ষণ সে গানের শেষ না হয়, ততক্ষণ আর উঠিয়া আসিবার যো থাকে না। সে আশ্চর্য্য গান একবার আরম্ভ হইলে আর শীঘ্র শেষও হইতে চাহে না। সেটা ছিল ত্রেতা যুগের আরম্ভ। গাহিতে গাহিতে সে যুগ শেষ হইয়া গেল, তারপর দ্বাপর আসিল, তাহাও প্রায় শেষ হইতে চলিল, তবে হাহা হূহূ গান শেষ করিয়া তাম্বুরা নামাইলেন। এত কাল যে চলিয়া গিয়াছে, রাজার কিন্তু সে খেয়ালই নাই। তিনি ভাবিতেছেন, 'আহা, এমন সুন্দর গান মুহূর্ত্তের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল!"

যাহা হউক, এখন নিজের কাজ সারিয়া লইতে হইবে আর বিলম্ব করা ভাল নহে। এই ভাবিয়া রাজা ব্রহ্মার সিংহাসনের সামনে গিয়া ভক্তিভরে প্রণামের পর যোড় হাতে বলিলেন, "ভগবন্! আমার এই কন্যাটির বিবাহ কাহার সঙ্গে দিব, দয়া করিয়া

আমাকে বলিয়া দিন্। আমি অনেক রাজপুত্রের সংবাদ লইয়াছি, কিন্তু ইহাদের কোন্‌টি যে সকলের চেয়ে ভাল তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।”

ব্রহ্মা বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি কাহার কাহার কথা ভাবিয়াছ, আমাকে বল দেখি।” সে কথায় রাজা অনেকের নাম করিয়া বলিলেন, “ইহাদের মধ্যে একটি হইলে আমি সুখী হইতাম।” তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন, “মহারাজ! তুমি যাহাদের নাম করিলে, এখন ত তাহাদের কেহই বাঁচিয়া নাই। তাহারা ছিল ত্রেতা যুগের লোক, আর এখন হইল দ্বাপরের শেষ। এত দিনে তাহাদের ছেলের ছেলে, নাতির নাতি অবধি মরিয়া গিয়াছে; তাহাদের রাজ্য, বংশ, নাম অবধি লোপ পাইয়াছে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ যে “পৃথিবীর আর সব লোক মরিয়া গেল, আর শুধু রাজা আর তাঁহার মেয়েটি বাঁচিয়া রহিয়াছেন, এ কেমন কথা হইল?” কিন্তু, সে যে ব্রহ্মার পুরী, সেখানে ত জরা মৃত্যুর অধিকার নাই। কাজেই তাঁহারা দু জন শুধু যে বাঁচিয়া আছেন, তাহা নহে, ঠিক যেমনটি গিয়াছিলেন তেমনিটি আছেন, একটুও বুড়া হন নাই।

যাহা হউক, ব্রহ্মার কথায় রাজা নিতান্তই আশ্চর্য্য হইলেন, আর ভয় পাইলেন, আর ব্যস্ত হইলেন তাহার চেয়েও বেশী। তিনি বিষম থত মত খাইয়া বলিলেন, “অ্যাঁ, অ্যাঁ! কি সর্ব্বনাশ! তাই ত! প্রভু! তবে এখন উপায়? এখন তবে আমার এই মেয়েটিকে কাহার হাতে দিই? আমার সমকক্ষ রাজা এখন কে কে আছেন?”

ব্রহ্মা বলিলেন, “মহারাজ! এতদিনে কি আর তোমার সে রাজ্য আছে? তোমার রাজ্যও নাই, প্রজারাও নাই; তোমার সেই সুন্দর কুশস্থলী নগরটি অবধি নাই। তাহার জায়গায় এখন দ্বারকা নামক পুরী হইয়াছে। সেই দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ, তাঁহার ভাই বলরাম। সেই বলরামের সঙ্গে গিয়া তোমার এই কন্যার বিবাহ দাও। এ মেয়েটি যেমন লক্ষ্মী, বলরামও তেমনি মহাশয় লোক, সকল রকমেই ইহার উপযুক্ত।”

কাজেই রাজা তখন আর কি করেন? তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, বাস্তবিকই তাঁহার রাজ্য, রাজধানী, লোক জন, আত্মীয় স্বজন সব লোপ পাইয়াছে। পৃথিবীই আর সে পৃথিবী নাই। তাঁহাদের সময়ে চৌদ্দ হাত লম্বা এক একটা মানুষ হইত, আর এখনকার লোকগুলি মোটেই সাত হাত লম্বা। আর তাহাদের চাল চলনও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আর দুঃখ করিয়া কি হইবে? রাজা বলরামকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিয়া বনবাসী হইলেন।

এদিকে রেবতীকে পাইয়া বলরামের আর আনন্দের সীমাই নাই, কেবল একটি কথায় তিনি একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। বলরাম হইতেছেন দ্বাপর যুগের লোক, তিনি সাত হাত লম্বা; রেবতী ত্রেতা যুগের মেয়ে, তিনি চৌদ্দ হাত লম্বা, বলরাম প্রাণপণে হাত বাড়াইয়াও তাঁহার মাথা নাগাল পান না। তখন বলরাম করিলেন কি, তাঁহার লাঙ্গলের আগা দিয়া রেবতীকে চাপিয়া অন্যান্য মেয়েদের মত বেঁটে করিয়া লইলেন। তারপর আর কোন অসুবিধা রহিল না।

ইন্দ্র হওয়ার সুখ।

দেবতাদিগের যিনি রাজা, তাঁহাকে বলে ইন্দ্র। তাঁহার কথা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। তাঁহার এক হাজার চক্ষু আর সবুজ রঙ্গের দাড়ি ছিল। তাঁহার আসল নাম শক্র, পিতার নাম কশ্যপ. রাণীর নাম শচী. পুত্রের নাম জয়ন্ত, হাতীর নাম ঐরাবত. ঘোড়ার নাম উচ্চৈঃশ্রবা, সারথীর নাম মাতলী, সভার নাম সুধর্ম্মা, বাগানের নাম নন্দন, অস্ত্রের নাম বজ্র। তাঁহার সভায় গন্ধর্ব্বেরা গান গাইত, অপ্সরারা নাচিত।

লোকে ভাবিত, ইন্দ্র বড়ই সুখে থাকেন, আর অনেক সময়ই যে তিনি খুব জাঁক জমকের ভিতরে দিন কাটাইতেন, একথা সত্যও বটে। কিন্তু সময় সময় তাঁহাকে বেগও কম পাইতে হইত না। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের ভয়ানক শত্রুতা ছিল, আর সেই সূত্রে অসুরেরা মাঝে মাঝে ইন্দ্রকে বড়ই নাকাল করিত দেবতারা আর অসুরের যুদ্ধে একবার বৃত্র নামে একটা অসুর ইন্দ্রকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল। দেবতারা তখন অনেক বুদ্ধি করিয়া সেই অসুরটাকে 'জৃম্ভিকা' অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারেন, তাই ইন্দ্র রক্ষা পান, নচেৎ সে যাত্রা আর তাঁহার বিপদের সীমাই ছিল না। জৃম্ভিকা অস্ত্রের গুণ অতি আশ্চর্য্য। সে অস্ত্র গায় লাগিবা মাত্রই অসুরটা ভয়ানক হাই তুলিল, আর ইন্দ্র সেই ফাঁকে তাহার পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

এই যুদ্ধ ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতেই আবার ইন্দ্রের এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে কোন কারণে তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বৃত্রের মৃত্যুর পরে সেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বেচারা ভয়ে অস্থির হইয়া যেখানেই পলাইতে যান, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে তাড়াইয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয়। শেষে আর উপায় না দেখিয়া, তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যে, পদ্মের মৃণালের

ভিতরে গিয়া সূতা হইয়া লুকাইয়া রহিলেন। তখন কাজেই ব্রহ্মহত্যা ঠকিয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে তাঁহাকে সহজে ছাড়ে নাই সে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বৎসর সেইখানে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল।

সাড়ে তিন লক্ষ বৎসর ত আর এক দিন দুদিনের কথা নহে দেবতাদিগের হিসাবেও তাহা এক হাজার বৎসর। কাজেই দেবতারা তাঁহাকে এত দিন দেখিতে না পাইয়া ব্যস্ত ভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মার কথায় যদিও তাঁহার সন্ধান পাইলেন তথাপি তাঁহাকে ঘরে আনিতে সাহস পান নাই, কারণ, ব্রহ্মহত্যা তখনও তাঁহার জন্য সেখানে বসিয়া আছে, সে তাঁহাকে সহজে ছাড়িবে কেন? তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোন পবিত্র নদীতে স্নান করাইয়া ইন্দ্রের শরীরের পাপ ধুইয়া ফেলিবেন, তাহা হইলেই ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে গৌতমী নদীতে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল! গৌতম যারপর নাই রাগিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "সে হইবে না! এই পাপীকে এখানে স্নান করাইলে আমি তোমাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব। তোমরা শীঘ্র এখান হইতে যাও!" একথায় দেবতারা নর্ম্মদার জলে ইন্দ্রকে স্নান করাইতে গেলেন। সেখানে মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম ছিল। মাণ্ডব্য মুনি বিষম ভ্রূকুটীর সহিত তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "এখানে যদি ইঁহাকে স্নান করাও, তবে এখনিই তোমাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব।" যাহা হউক, শেষে দেবতারা অনেক স্তুতি মিনতি করায় মাণ্ডব্য ইন্দ্রকে সেখানে স্নান করাইতে দিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌতমীতে নিয়াও স্নান করান হইল। ইহার উপর আবার ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলুর জল দিয়া ইন্দ্রকে ধুইলেন, তবে সে যাত্রার মত তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাস্তবিক, ইন্দ্র হওয়া আগাগোড়াই সুখের কথা ছিল না। কিন্তু লোকে ভাবিত, ইন্দ্র বড় সুখী। তাই অনেকে ইন্দ্র হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিত। সে জন্য কাহাকেও খুব তপস্যা করিতে দেখিলেই ইন্দ্র ভাবিতেন, "সর্ব্বনাশ! এইবার বুঝি বা আমার কাজটি যায়!" তখন তিনি সেই লোকটির তপস্যা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক একজন লোক ইন্দ্র হইয়া যাইত। নহুষ নামে এক রাজা একবার ইন্দ্র হইয়া দিনকতকের জন্য কি হুলস্থূলই বাধাইয়া ছিলেন! উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবতে তাঁহার মন উঠিল না, তিনি বলিলেন, "আমি বড় বড় মুনিদের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়াইব!" অমনি এক আশ্চর্য্য পাল্কী প্রস্তুত

হইল, মুনিরা হইলেন তাহার বেয়ারা; নহুষ তাহাতে উঠিয়া বসিয়া মুনিঠাকুরদের উপরে অসম্ভব তম্বী যুড়িয়া দিলেন। সে বেচারাদের গায় জোর কম, ফল মূল খাইয়া থাকেন, পাল্কী বহার অভ্যাস কাহারও নাই, তাঁহাদিগের কাজে নহুষের মন উঠিবে কেন? নহুষ তখন বেজায় চটিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের মাথায় ধাঁই শব্দে এক প্রচণ্ড লাথি লাগাইয়া দিলেন। তাহার ফলও পাইলেন হাতে হাতেই, কেন না, তাহার পর মুহূর্ত্তেই মুনির শাপে তাঁহার সেই সুখের ইন্দ্রগিরি ঘুচিয়া গেল, আর তিনি এক প্রকাণ্ড সাপ হইয়া হিমালয়ের নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

আর একবার অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে, কিন্তু কেহই জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না। সে সময়ে পৃথিবীতে রজি নামে একজন অতিশয় ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। দুই দলেই ভাবিলেন, 'এই রজিকে আনিয়া আমাদের সঙ্গে জুটাইতে পারিলে নিশ্চয় আমরা জিতিব'। এই ভাবিয়া দেবতাগণ রজিকে আসিয়া বলিলেন, "হে রাজন! তুমি আমাদের সঙ্গে মিলিয়া অসুর বধ কর, নহিলে আমরা কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না।" রজি বলিলেন, "আপনারা যদি আমাকে ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিতে পারি।" দেবতারা বলিলেন, "অবশ্য তোমাকে আমরা ইন্দ্র করিব, তুমি শীঘ্র আইস।" এই বলিয়া দেবতারা সবে চলিয়া গিয়াছেন, অমনি অসুরেরা আসিয়া রজিকে বলিল, "মহারাজ! আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন।" রজি দেবতাদিগকে যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনি অসুর-দিগকেও বলিলেন, "আপনারা যদি আমাকে আপনাদের ইন্দ্র করেন, তবে আমি আপনাদের কথায় রাজি আছি।" কিন্তু অসুরেরা সে কথায় অতিশয় ঘৃণার সহিত বলিল, "এমন সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ; আর কোন ইন্দ্র আমরা চাই না। আপনি না হয় আমাদের পক্ষে নাই আসিলেন।"

তখন রজি দেবতাদের সঙ্গে জুটিয়া ভয়ানক রাগের সহিত অসুর মারিতে আরম্ভ করিলেন, আর তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেবতাদের জয় লাভ হইল। ইন্দ্র দেখিলেন, এখন ত বড়ই বিপদ উপস্থিত, রজিকে এখন সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাই তিনি রজি নিজে কিছু বলিবার আগেই তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ! লোকে বলে, যে ভয় হইতে রক্ষা করে, সে পিতা। আপনি আমাকে ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই আপনি আমার পিতা হইলেন। আর তাহাতেই আপনি ইন্দ্রও হইলেন, কেন না ইন্দ্রের পিতা হইলে আর ইন্দ্র হওয়ার চেয়ে বেশী বই কম কি হইল?"

রজিও ইন্দ্রের সেই ফাঁকিতে ভুলিয়া আহ্লাদের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিলেন, স্বর্গে রাজা হওয়ার কথা আর মুখে আনিলেন না।

এই রজির পাঁচ শত মহাবীর পুত্র ছিল। রজির মৃত্যুর পরে এই পাঁচ শত বীর মিলিয়া যুক্তি করিল যে "দেবতারা ফাঁকি দিয়া আমাদের পিতাকে ইন্দ্রপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, আইস, আমরা তাহার শোধ লইব।" এই বলিয়া তাহারা দেবতা-দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, আর দেখিতে দেখিতে দলবল সহিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গ আর পৃথিবী দুইই দখল করিয়া বসিল। এই পাঁচ শত ভাই যেমন বীর, তেমনি যদি বুদ্ধিমান্ হইত, তবে আর ইন্দ্রের নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার কোন উপায়ই থাকিত না। কিন্তু ইহারা বুদ্ধিমানের মতন ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজ্যপালন করার বদলে, নানারূপ অসৎ কার্য্যে নিজের বিষয় আর বল নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার ফলে অল্পদিনের ভিতরেই ইন্দ্র তাহাদিগকে তাড়াইয়া আবার আসিয়া স্বর্গের রাজা হইলেন।

ইন্দ্র হওয়ার যে কি সুখ, তাহার সম্বন্ধে আর একটা মজার গল্প আছে। একবার অসুরেরা ঘোরতর যুদ্ধে দেবতাদিগকে যারপর নাই ব্যস্ত করিয়া তুলিলে, তাঁহারা সূর্য্যবংশের রাজা পরঞ্জয়কে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তুমি আমাদের হইয়া অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" পরঞ্জয় কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি, যদি আপনারা আমার একটি কথায় রাজী হন। আপনাদের যিনি ইন্দ্র, আমি তাঁহার কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করিব।" একথায় ইন্দ্র আর অন্য দেবতারা সকলেই বলিলেন, "হাঁ হাঁ, তাহাই হইবে, তুমি আইস।" তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ইন্দ্র বিশাল এক ষাঁড় সাজিয়া পরঞ্জয়কে কাঁধে করিয়া লইলেন, পরঞ্জয়ও তাহাতে ভারী খুসী হইয়া দুই দণ্ডের মধ্যে অসুর মারিয়া শেষ করিলেন। সেই ষাঁড়ের 'ককুদ্' অর্থাৎ কাঁধে চড়িয়া যুদ্ধ করায় তখন হইতে পরঞ্জয়ের নাম হইল 'ককুৎস্থ'। দশরথের পুত্র রাম এই ককুৎস্থের বংশের লোক ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকেও অনেক সময় বলা হয় 'কাকুৎস্থ'।

ইন্দ্রগিরির মজার আর একটা গল্প বলিয়া শেষ করিব। একজন অতি বিখ্যাত মুনি ছিলেন, তাঁহার নাম আত্রেয় (অত্রি মুনির পুত্র)। ঠাকুরটি বিস্তর যাগ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামত সংসারের সর্ব্বত্র চলা ফেরার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। একদিন তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে ইন্দ্রের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার শোভা দেখিয়া, সেখানকার গীত বাদ্য শুনিয়া, আর সেখানকার

ময়রাদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন খাইয়া ঠাকুরের মন এমনই ভুলিয়া গেল যে, তিনি দিন রাতই কেবল ভাবিতে লাগিলেন, "আহা! এই ত সুখ, এমনিই ত চাই!" তারপর আশ্রমে ফিরিয়া আর তাঁহার নিজের কুঁড়ে ঘরটি কিছুতেই তাঁহার পছন্দ হয় না। ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো! এ সব কি ছাই খাবার আমাকে খাইতে দাও? এ সব কি খাইতে ভাল লাগে? ইন্দ্রের বাড়ীতে যে চমৎকার মিঠাই খাইয়া আসিয়াছি, ফল মূলের তরকারী কিছুতেই তেমন করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে, "আমার এই আশ্রমকে ঠিক ইন্দ্রের পুরীর মত করিয়া দাও, নইলে তোমাকে শাপ দিয়া ভস্ম করিব। ঠিক তেমনি বাড়ী, তেমনি সভা, তেমনি বাগান, তেমনি হাতী, তেমনি ঘোড়া, তেমনি ঝাড় লণ্ঠন, তেমনি গান বাজনা, তেমনি মিঠাই মণ্ডা, লোক জন,—সব অবিকল চাই। খবরদার! যেন কোন কথার একটু তফাৎ হয় না!" শাপের ভয়ে বিশ্বকর্ম্মা তখনই তাড়াতাড়ি সেখানে এক ইন্দ্রপুরী তয়ের করিয়া দিলেন। মুনি ঠাকুর সেই পুরীতে থাকেন, আর বলেন, "আহা! এই ত সুখ, এমনিই ত চাই!"

এমনি ভাবে কিছুদিন যায়। ইহার মধ্যে অসুরেরা সেই পুরীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকায় আর বলে, "দেখ ভাই, ইন্দ্র বেটা স্বর্গ ছাড়িয়া চুপিচুপি পৃথিবীতে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। চল এই বেলা উহাকে ধরিয়া বৃত্রকে মারিবার সাজাটা ভাল মতে দিই।" অমনি দলে দলে অসুর 'ইন্দ্র বেটাকে মার।' 'ইন্দ্র বেটাকে মার।' বলিতে বলিতে আসিয়া সেই পুরী ঘিরিয়া বসিল। মুনি ঠাকুর মনের সুখে খাটের উপর বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে অসুরদিগের বিকট চীৎকারে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে লাখে লাখে শেল শূল, মূষল মুদ্‌গর, গাছ পাথর আসিয়া তাঁহার সাধের পুরী চূরমার করিয়া দিতে লাগিল। দু একটা তীরের খোঁচা যে না খাইলেন তাহাও নহে। তখন তিনি তাড়াতাড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে অসুরদের সামনে আসিয়া যোড় হাতে বলিলেন, "দোহাই বাবা! আমি ইন্দ্র নহি! আমি মুনি, ব্রাহ্মণ, অতি নিরীহ দীন হীন মানুষ! আমার উপরে তোমাদের এত ক্রোধ কেন?" অসুরেরা বলিল, "ইন্দ্র নহ, তবে ইন্দ্র সাজিয়াছ কেন? শীঘ্র তোমার এ সব সাজগোজ দূর করিয়া দাও! মুনি বলিলেন, "এই যে বাপু! এক্ষণি আমি এ সব দূর করিয়া দিতেছি। আমার নিতান্তই মাথা খারাপ হইয়াছিল, তাই এমন বেকুবী করিতে গিয়াছিলাম। আর কখনও এমন কাজ করিব না" তখন আবার বিশ্বকর্ম্মার ডাক পড়িল। বিশ্বকর্ম্মা

আসিলে মুনি বলিলেন, "ভাই! শীঘ্র এ সব দূর করিয়া আমার সেই আশ্রম আবার আনিয়া দাও, নহিলে ত অসুরের হাতে আমার প্রাণ যায় দেখিতেছি!" বিশ্বকর্ম্মা দেখিলেন মুনির বড়ই বিপদ, কাজেই তিনি তাঁর কথা মত কাজ করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। দেখিতে দেখিতে সেই সোনার পুরীর জায়গায় আবার কুঁড়ে ঘর আর বন হইল, অসুরদেরও রাগ থামিল, মুনিরও বিপদ কাটিল, বিশ্বকর্ম্মাও হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

ঝানু চোর চানু।

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ীর সকলে রান্না-ঘরে রয়েছেন—হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্না-ঘরের দরজা খুলে গেল। একটা অতি কুৎসিৎ বুড়ো ভিখারী পিঠে তার একটা মস্ত বড় থলে ঝুল্‌ছে সে এসে রান্না-ঘরের দরজায় উঁকি মেরে বল্ল, "জয় হোক্ বাবা! আপনাদের খেয়ে দেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারী কিছু খেতে পাব কি?

জমিদারমশায় বল্লেন—"অবশ্যি পাবে, রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু বসো।"

জানালার পাশে একজন লোক বসে ছিল খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, মস্ত বড় একটা খরগোস্ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে—এটাকে মারলে হয় না?"

জমিদার ধমক দিয়ে বল্লেন,—"খরগোস্ মারবার ঢের সময় মিল্‌বে, এখন চুপ করে বসে থাক্।"

খরগোস্‌টা বাগানে গিয়ে ঢুকল। এদিকে ভিখারীর পোষাক পরা চানু থলের ভিতর থেকে আর একটা খরগোস্ ছেড়ে দিল। একটু পরেই চাকর আবার চেঁচিয়ে উঠল, "বাবু বাবু, খরগোস্‌টা এখনও রয়েছে—এখনও চেষ্টা করলে মারা যায়।"

আবার জমিদার ধমক দিলেন, "চুপ্ করে থাক বল্‌ছি।"

খানিক বাদে চানু আরও একটা খরগোস্ থলে থেকে বের করে ছেড়ে দিল। চাকরও চেঁচিয়ে উঠল—আর যায় কোথা! একজন একজন করে সবকটি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোসের পেছনে তাড়া করল, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না।

খরগোস্ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে ভিখারীও নাই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নাই।

জমিদারমশাই বল্লেন, "আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চানু, সত্যি সত্যি আমাকে জব্দ করেছে।"

একটু পরেই চানুদের বাড়ী থেকে একজন চাকর এসে জমিদারমশায়কে বল্ল, "আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ী গিয়ে খাবেন।"

জমিদার বড় চমৎকার সাদাসিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও অহঙ্কার ছিল না। স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে চানুদের বাড়ী গেলেন এবং সকলের সঙ্গে বসে নানা রকমের ভাল ভাল খাবার জিনিষের সঙ্গে তাঁর সেই হাঁস ভাজাটীও খেলেন। চানুর চালাকির কথা বলে জমিদার মশায় হাস্তে হাস্তে পাঁজরে ব্যথা ধরিয়ে ফেল্লেন। মেয়েটীও আগে থেকেই চানুকে পছন্দ করত এখন তার পোষাক দেখে এবং তার আদব কায়দা দেখে মনে মনে আরও খুসী হল।

খাওয়া দাওয়ার পর জমিদার বললেন,—"চানু, সুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না। কাল রাত্রে আমার আস্তাবল থেকে আমার ছয়টা ঘোড়া যদি চুরি করতে পার তা হ'লে দেখা যাবে এখন। ছজন সইস্ কিন্তু ছয়টা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দিবে সেটা মনে রেখো।"

চানু বল্ল,—"আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব এখন।"

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছয়জন সইস্ ছয়টা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে আছে। বেজায় ঠাণ্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায়, তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটা করে মদের বোতল, খানিক পরে পরে একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না তাই সকলে মিলে মহা গল্প যুড়ে দিল—চানুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই রেখেছিল। রাত যত বেশী হতে লাগল ঠাণ্ডাটাও যেন বাড়তে লাগল মদেও আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল। এমন সময় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ি এসে দরজায় উঁকি মেরে বল্ল,—"বাবা সকল, শীতে জমে গেলাম এক মুঠো খড় দাও ত আস্তাবলের এক কোনে রাতটা পড়ে থাকি, তা না হলে বুড়ো মানুষ—শীতে মারাই যাব।" বুড়ির পিঠে ছয়টা থলে, মুখে প্রায় দু আঙ্গুল লম্বা দাড়ি—চেহারাটা কুৎসিতের এক শেষ।

বুড়ি আস্তাবলের দরজায় উঁকি মেরে বল্ল—"লক্ষ্মী বাপ্ আমার, বুড়ো মানুষ শীতে মরে গেলাম ঐ কোনটাতে একটু জায়গা দাও এক মুঠো খড় নিয়ে পড়ে থাক্‌ব এখন।"

সহিসেরা ভাব্‌ল—এলোই বা বুড়ি, বেচারি শীতে জমাট্ বেঁধে গেল—"ও ত আর কোন অনিষ্ট করবে না।" আস্তাবলের কোনে খড় পেতে বুড়ি বেশ আরামে বস্‌ল।

সহিসেরা দেখ্‌ল বুড়ি খানিক পরেই একটা কাল বোতল বের করে একটু মদ খেল—তার মুখে হাসি আর ধরে না যেন সে খুবই আরাম বোধ করেছে। সহিস্‌দের বুড়ি বল্ল—"বাবা, তোমাদের সব বোধ করি শেষ করে ফেলেছ তা আমার কাছে ঢের আছে। তবে কিনা তোমরা পাছে কিছু মনে কর তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না।"

একে বেজায় শীত তার উপরে সত্যি সত্যি তাদের সব মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়ির কথা শুনে সহিসেরা যেন হাতে চাঁদ পেল—"সে কি বুড়ি মা, তুমি যদি দাও তাহলে ত বেঁচে যাই—ঠাণ্ডায় মরে গেলাম।"

বুড়ির বোতলটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে শেষ হয়ে গেল তবুও সহিসদের শীত গেল না। সয়তান বুড়ি তখন আর একটা বোতল বের করে তাদের দিল; এ বোতলটার মদের সঙ্গে কি জানি মেশান ছিল খাবা মাত্র সব কটা সহিস্‌ ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

তখন বুড়ি উঠে সব কটা সহিস্‌কে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়া গুলির পায়ে মোজা পরিয়ে দিল তারপর সব গুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদার মশায় প্রথমেই কি দেখ্‌লেন? তাঁর বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়েই চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর তার ঘোড়ার পিছনে পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে।

জমিদার মশায় অবাক্‌ হয়ে রইলেন, মনে মনে বল্লেন—"গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিস্‌ সে বেটারাও গোল্লায় যাক্‌।" আস্তাবলে গিয়ে সহিস্‌ বেটাদের জাগাতে জমিদার মশায়কে বেগ পেতে হয়েছিল।

সকাল বেলা জমিদার মশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন। খেতে খেতে চানুকে বল্লেন—"কতগুলো বোকা পাঁঠার চোখে ধুলো দিয়েছ এতে তেমন বাহাদুরি নেই। আচ্ছা, আজ বেলা একটা থেকে তিনটা পর্য্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ীর সামনে ঘুরে বেড়াব, নিও দেখি বাপু আমার ঘোড়াটা চুরি করে? তা হলে বুঝব তুমি বাহাদুর এবং আমার জামাই হবার উপযুক্ত।"

চানু মাথা নীচু করে উত্তর করল—"যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখব এখন।"

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পাইচারি করে করে কাহিল হয়ে পড়লেন, তিনটা বেজে গেল, চানুর টিকিটাও দেখতে পেলেন না। মনে করলেন

এবারে বাড়ী ফিরে যাবেন এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের মত হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে হাজির—"কর্ত্তা শীগ্গির বাড়ী যান, মা ঠাক্‌রুণকে বুঝিবা আর দেখতে পেলেন না ; সিঁড়ির উপর থেকে তিনি পড়ে গেছেন বোধ করি হাত পা সব ভেঙ্গে গেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমি চল্লাম ডাক্তারের বাড়ী।"

জমিদারের চোখ বড় হয়ে গেল—"বলিস্ কিরে বেটা, কি সর্ব্বনাশ! ডাক্তারের বাড়ী যেরে ঢের দূরে—তুই আমার ঘোড়াটা নিয়ে ছুট্ শীগ্গির।" ঘোড়ায় চড়ে চাকর তখন ডাক্তারের বাড়ী ছুট্‌ল।

জমিদার মশাই হোঁচট্ খেতে খেতে বাড়ী এসে উপস্থিত। বাড়ী এসে দেখ্‌লেন সাড়া শব্দ কিছু নাই সব চুপ্ চাপ্। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাড়ীর ভেতর গেলেন, সেখানে বস্‌বার ঘরে গিন্নি আর তাঁর মেয়ে দিব্বি আরামে বসে আছেন। ততক্ষণে জমিদার মশায়ের চৈতন্য হলো তিনি বুঝতে পারলেন এ সব চানু বেটারই চালাকি—বেটা তাঁকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

খানিক পরেই দেখলেন চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। চাকর তার জন্য একটুও কেয়ার করে না, নাইবা করল তাঁর চাক্‌রি—চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিল তা দিয়ে তার অনেক দিন চল্‌বে।

পরের দিন চানু এসে জমিদার বাড়ী উপস্থিত, জমিদার বল্লেন—"তুমি বাপু এবারে নেহাৎ ফাঁকি দিয়েছ, ওতে তোমার বাহাদুরি কিচ্ছু নেই। মিছামিছি আমাকে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে, তোমার উপর আমার বড্ড রাগ হয়েছে। যা হোক্ আজ রাত্তিরে যদি আমাদের বিছানা থেকে চাদরখানা চুরি করতে পার তা হলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করব।"

চানু বল্ল—"আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখব, কিন্তু এবারেও যদি ফাঁকি দেন তা হলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করে নিয়ে যাব।"

রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন দিব্বি জ্যোৎস্না, কাচের জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে। জমিদার মশায় দেখলেন হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়ল।

জমিদার গিন্নিকে বল্লেন—"দেখ্‌লে ত ? এ বেটা নিশ্চয় চানু।" তারপর বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে বল্লেন—"দেখ, আমি বেটাকে এখনি চম্‌কিয়ে দিচ্ছি।"

বন্দুক দেখেই জমীদার গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"কর কি, চানুকে গুলি করবে না কি ?"

জমিদার বল্লেন—"আরে না, না, তুমি কি পাগল হলে নাকি ? বন্দুকে কি আর গুলি পূরেছি—শুধু বারুদ।"

খানিক পরেই আবার জানলায় মাথা উঁকি মারল, দড়াম্ করে জমীদার বন্দুক ছেড়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাওয়া গেল ধপ্ করে একটা কি নীচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে।

জমিদার গিন্নি চেঁচিয়ে উঠ্লেন—"হায়, ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে আর না হয় জন্মের মত খোঁড়া কানা হয়ে থাক্‌বে।"

জমিদার মশায়ও কেমন জানি থতমত খেয়ে গিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লেন—দরজা খোলাই পড়ে রইল। জমিদার মশায় বোধ করি তখনও বাইরে জানালার কাছে পৌঁছান নাই কিন্তু গিন্নিঠাকুরুণ শুন্‌লেন কর্ত্তা ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন—"শীগ্গির বিছানার চাদরখানা দাও, বেটা মরেনি বোধ হয় কিন্তু বেজায় রক্ত পড়ছে—একটু পরিষ্কার করে বেঁধে টেঁধে ওকে ঘরে নিয়ে আসব।"

গিন্নিঠাকুরুণ এক টানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে দরজায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চাদর নিয়ে জমীদার মশায় আবার ছুট্‌লেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই মূহুর্ত্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত—সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানলার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমীদার রেগে মেগে বল্‌তে লাগলেন—"বেটা পাজি চান্নু, তোকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।"

কর্ত্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক্ হয়ে বল্লেন—"বেচারির বেজায় লেগেছে আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছ?"

"ওর বাস্তবিক লাগাটাই উচিত ছিল। বেটার বদমাইসি দেখেছ? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড় চোপড় পরিয়ে বেটা এনে জানালায় ধরেছিল।"

"কি ছাই মাথা মুণ্ডু বল্‌ছ, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদরটা চেয়ে নিয়ে গেলে কেন?"

"বিছানার চাদর—বল্‌ছ কি! আমি ত বিছানার চাদর টাদর চাইতে আসিনি।"

"চাদর চাইতে আস আর না আস আমি সে সব কিছু জানি না। তুমি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে আর আমিও তোমাকে দিয়েছি।"

গিন্নির কথা শুনে জমীদার মহাশয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—"কি ভীষণ শয়তান্ রে বাবা চানু—ওর সঙ্গে আর পেরে উঠ্‌ব না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখ্‌ছি।

এর পর চানুর সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর থেকে চানু খুব ভাল হয়ে গেল—তার মত জামাই সচরাচর মিলে না। জমিদার মশায় এবং তাঁর গিন্নি শত মুখে চানুর সুখ্যাত করেন আর লোকের কাছে বলেন—"আমার ঝানু চোর চান্নু।"

বলে নারি, কলে মারি।

সেবারে ফাঁদের কথা বলছিলাম। মানুষেরা যেমন ফাঁদ পাতে, জন্তুরাও তেমনি ফাঁদ পাততে পারে। ছেলে বেলায় জন্তুদের ফাঁদ পাতার কথা ঢের শুনেছি। কূয়ার উপরে মাদুর বিছিয়ে শেয়াল কেমন তার বাঘ মামাকে এনে তাতে বসিয়েছিল, আর তাতে বাঘ মশায়ের কি দশা হয়েছিল; শেয়ালের কথায় কুমীরকে নৌকা ভেবে, বাঘ মশাই তাতে চড়তে গিয়ে কেমন মজা দেখেছিলেন; খরগোষ কেমন বুদ্ধি করে সিংহকে নিয়ে কূয়ায় ফেলে মেরেছিল; এ সব কথা আর আমাদের কারুরই শুনতে বাকি নাই।

নহুষ ইন্দ্র হইয়াছেন।

U. RAY & SONS.

কিন্তু এসব ত হল শুধুই গল্প। আসলে ত আর সে সব ঘটনা ঘটে নি। সত্যি সত্যিই জন্তুরা অনেক সময় ফাঁদ পেতে থাকে। বাঘকে যে আমরা ছেলে বেলা থেকে এমন বোকা ভেবে আসছি, সেই বাঘ অবধি ফাঁদ পাততে জানে। একটা বাঘ মানুষ খেতে বড় ভাল বাসত, গরু ছাগল খেয়ে তেমন তৃপ্তি হত না। সে অনেক ভেবে চিন্তে মানুষ ধরার এক চমৎকার ফন্দি বার করেছিল। সে চাষাদের গরুর দড়ি ধরে টেনে, তাকে বনের ধারে নিয়ে, কাঁটা গাছে তার দড়ির আগা জড়িয়ে রেখে, চুপ করে বসে থাকত। সে জানত যে, এই গরুটিকে খুঁজে খুঁজে চাষার সেখানে আসতে হবে, আর তা হলেই ভোজনও ভাল মতেই মিলবে। এমনি করে সে অনেক চাষাকে ধরে খেয়েছিল।

কতগুলো কাক একটা পোষা বানরের খাবার চুরী করে নিয়ে গিয়েছিল। বেচারা দড়িতে বাঁধা, কাকগুলোকে তাড়া করে সাজা দিবার ক্ষমতা নাই; সে ভাবল, ফন্দি করে তাদের জব্দ করবে।

সে সব বানর বুড়ো হলে, তাদের পিছনের দিকে খানিকটা চামড়া লাল আর উঁচু হয়ে উঠে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন কোন ফল। বানরটা করল কি, সেই ফলের মতন জিনিসটা কাকদের দেখিয়ে, চোখ বুঁজে পড়ে রইল, যেন কতই ঘুমাচ্ছে। কাকেরা ভাবল, এই বেলা এই ফলটাকে খেতে হবে! খানিক বাদে তাদের সর্দ্দার গোছের একটা এসে সেই ফলে ঠোকর দিয়েছে। ঠোকর দিয়ে মিষ্টি লাগল কি টক লাগল, তা ভেবে দেখবার অবসর আর তার হল না, তার আগেই বানরের সেই বিষম চটপটে হাত দুখানি এসে তাকে ধরে ফেল্ল। তারপর যখন সে তাকে ছেড়ে দিল, তখন আর সে পাখীকে কাক বলে চিনবার যো নাই; বানর একটি একটি করে তার সব ক'গাছি পালক তুলে ফেলেছে!

অনেক জন্তু আছে, তাদের ব্যবসাই ফাঁদ পাতা; যেমন মাকড়ষা। এ জন্তু ঘরে ঘরেই আছে, এর জালের কথা কে না জানে? সুতরাং সে কথা আর বেশী করে বলবার দরকার নাই। জালখানি সে কি যত্ন করেই না বোনে, কত বুদ্ধিই না তাতে খাটায়। একখানি ছিঁড়ে গেলে, দেখতে দেখতে আর একখানি তয়ের করে। এক সাহেব বার বার একটা মাকড়ষার জাল ছিঁড়ে দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, সে কতগুলো জাল তয়ের করতে পারে। মাকড়ষাটা পর পর অনেকগুলো জাল তয়ের করেছিল— ক'টা, আমার ঠিক মনে নাই। শেষে তার দড়ি ফুরিয়ে গেল, কাজেই আর জাল তৈরী

হতে পারল না। তখন সে জেলের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ডাকাতি আরম্ভ করল। চুপ করে হাত পা গুটিয়ে পড়ে থাকে, মাছি এলে অমনি লাফিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়ে।

মানুষ কেন তার জালে পড়ে না, এই কথাটা নাকি মাকড়ষার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকে। তাই থেকে নাকি সে ঠিক করে নেয় যে, মানুষেরা বড় লক্ষ্মী, তাই তারা তার জালে পড়তে আসে না। শেষে যখন যম রাজার দরবারে সকল জীবের পাপ পুণ্যের বিচার হয়, তখন নাকি মানুষের হয়ে সে যমকে বলে, "মানুষ বড় ভাল, আমি এত বড় জাল পেতে রাখি, তাদের একটিও তাতে পড়ে না!"

মাকড়ষায় ধরে জাল দিয়ে, আরেক জনে ধরে ছিপ দিয়ে। তার নাম হচ্ছে বঁড়ষীবাজ মাছ। চার হাত লম্বা জানোয়ার, সমুদ্রের জলে বাস করে। রূপের পরিচয় ছবিতেই পাওয়া যাচ্ছে। কপালের উপরে ঘাসের ডগার মতন ঐ যে বাঁকা

জিনিসটির আগায় নোলক ঝুলছে, ঐটি হল ওর বঁড়ষী। জানোয়ারটির চাল চলন একটু ঢিলা গোছের, তাড়িয়ে শিকার ধরা তার আসে না। সে সমুদ্রের তলায় ঝোপ জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে, তার ঐ সুন্দর মুখখানি মেলে পড়ে থাকে; বঁড়ষীটি ঠিক তার হাঁ'টির সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার এই ভাবে কেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাও বেড়ে ওঠে। তারপর, সে দিন কোন অভাগার আয়ু নিতান্তই ফুরিয়ে এলে সে সেই বঁড়ষীর তামাসা দেখবার জন্য এসে উপস্থিত হয়। আর একটিবার

নোলকটিকে ছুঁলেই অমনি খপ্‌ করে সেই বিকট হাঁ বন্ধ হয়ে চিরদিনের তরে তার তামাসা দেখার সাধ মিটিয়ে দেয়। কিন্তু এমন করে আহার যে খুব ঘন ঘন জুটতে পারে না, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কাজেই বঁড়শীবাজের ক্ষুধাটি একটু উৎকট রকমের হয়ে থাকে, আর তাই সে প্রায় কোন রকম জিনিসই খেতে আপত্তি করে না। মাছ, পাখী, শেয়াল সবই তার পেটের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে। একটার পেটে মস্ত একখানা কাঠ অবধি পাওয়া গিয়েছিল। বেচারা অনেক আশা করে কাঠখানাকে গিলেছিল, কিন্তু হজম করতে পারেনি।

তোমরা "পিঁপড়েধরা" দেখেছ? না দেখে থাক ত এখন থেকে তাকে দেখতে চেষ্টা কর। আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই এই পোকা পাওয়া যায়। আমি কলকাতায় দেখেছি, সাঁওতাল পরগণায় দেখেছি, চান্দায় দেখেছি। ইংরাজীতে একে বলে 'Ant-Lion' অর্থাৎ "পিঁপড়ের সিংহ"; আমি একে পিঁপ্‌ড়েধরা বলছি, এর আসল বাংলা নাম কি, আমি তা জানি না। ঝরঝরে পরিস্কার মিহি বালী হবে, তার উপর

'পিঁপড়ে ধরা'

'পিঁপড়ে ধরা' ফড়িং হয়ে গেছে

দিয়ে হামেসাই পিঁপড়েরা চলাফেরা করবে, এমনি জায়গাটি দেখে এই পোকা তার গর্ত্ত খোঁড়ে। গর্ত্তটি কি রকমের, ছবি দেখলেই তা বুঝতে পারবে। ঐ গোল গর্ত্তটির তলায় পিঁপড়েধরা বালীর ভিতরে গা ঢাকা দিয়ে, খালি মুখখানি জাগিয়ে হাঁ করে থাকে। গর্ত্তের ধারগুলো এমনি চমৎকার মোলায়েম, আর তাতে আলগা বালী

ছড়িয়ে তাকে এমনি হড়কানে করে রেখেছে যে, পিঁপড়ে একবার তার উপরে পা দিলে আর কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না,—তাকে তখনি গড়িয়ে গর্ত্তের তলায় এসে ঠিক পিঁপড়ে ধরার, মুখের ভিতরে পড়তে হয়। তখন কি হয়, বুঝতে পার। সিংহবটে, আর কাজেও অন্ততঃ পিঁপড়ের পক্ষে সে সিংহের চেয়ে কম নয়; কিন্তু আসলে এরা নিতান্ত খোকা। যখন বড় হবে, তখন আর তার এরকম চেহারাও থাকবে না, এ ব্যবসাও সে করবে না, সে ফড়িং হয়ে উড়ে যাবে।

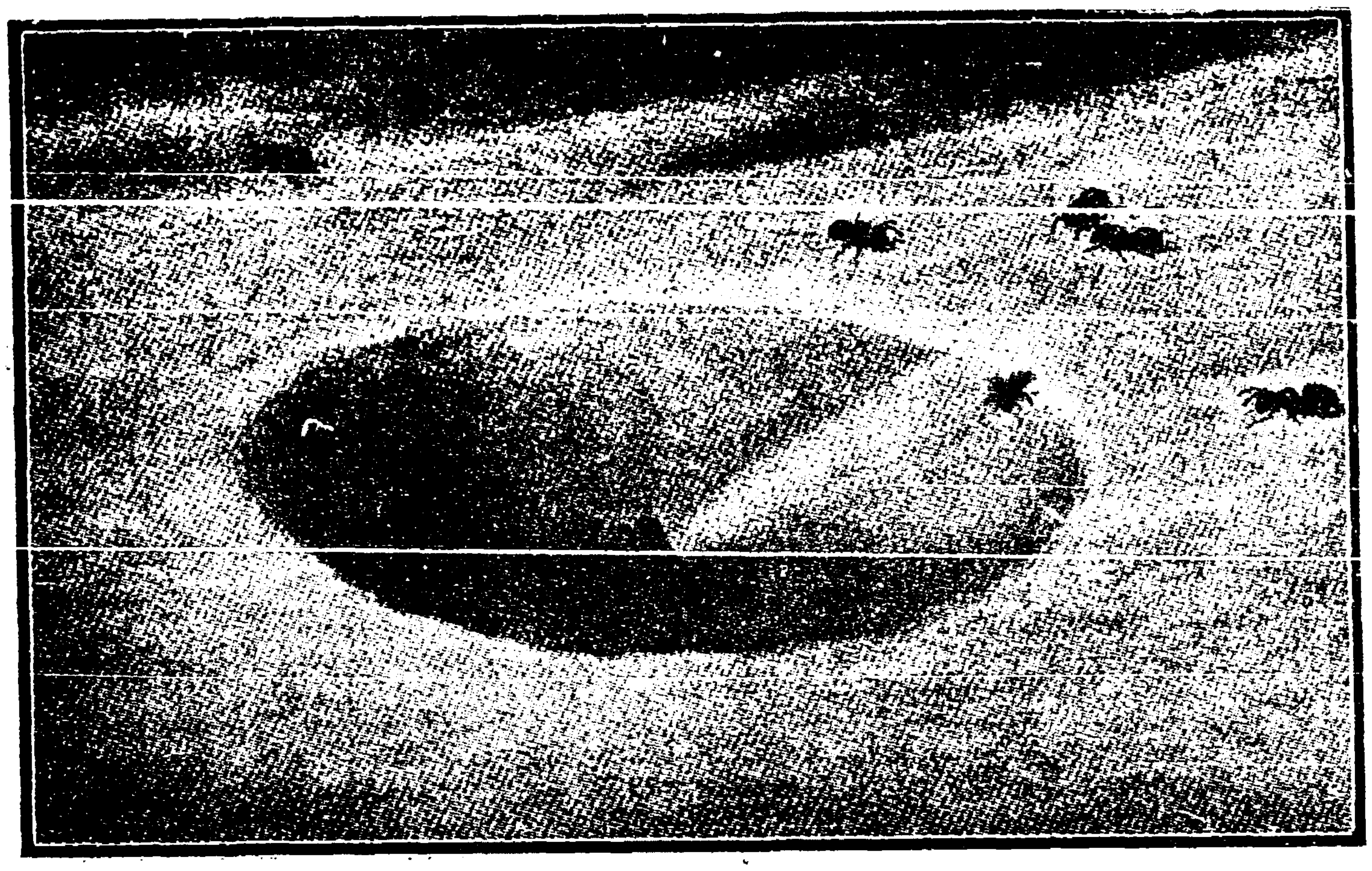

'পিঁপড়ে ধরার' গর্ত্ত

জিম্মী।

(গারফিল্ডের বাল্যকালের কথা।)

একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, তার নাম ছিল জেম্‌স্ এব্রাম্ গার্‌ফিল্ড্; তার বাড়ীর লোকেরা তাকে আদর করে ডাকত 'জিম্মী'। জিম্মী বড় বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। তার দেড় বছর বয়স হবার আগেই সে 'পাপা' 'মামা' ত বল্‌তে পারতই, একদিন 'প্লুটার্চ্' অবধি বলে ফেলেছিল।

জিম্মী যখন সাড়ে তিন বছরের, তখন সে তার দিদির কাঁধে চড়ে ইস্কুলে পড়তে গেল। তখন থেকেই সে খুব বুঝে শুনে পড়া শোনা করত। মাষ্টার মশাই তাকে একটা অক্ষর দেখিয়ে বল্লেন, "এটা 'আর্' (R)।" অমনি জিম্মী জিজ্ঞাসা করল, "কি করে জানলে?" মাষ্টার মশাই বল্লেন, "আমি যখন তোমার মত ছোট্ট ছিলাম, তখন আমার মাষ্টার মশাই আমাকে বলে দিয়েছিলেন।" এ কথায় জিম্মী খুব খুসী হল। ইস্কুল তার বেশ ভালই লাগতে লাগল! সেখানকার বড় বড় ছেলেদের সে এমন সব

কথা জিজ্ঞাসা করে বসত যে, তারা সকলে মিলে ভেবেও তার উত্তর দিতে পারত না। তখন সে তাদের বলে দিত। জিম্মীর সঙ্গে পড়া শুনায় কেউ পেরে উঠত না। দোষের মধ্যে সে একটু বেশী চঞ্চল ছিল। তার জন্যে ইস্কুলে মাষ্টার মশাই ব্যস্ত থাকতেন, আর ঘুমের ভিতরে তার দাদা টমাস্ বেচারা লাথি খেয়ে সারা হত।

জিম্মীরা বড় গরীব ছিল। একটা প্রকাণ্ড বনের ধারে একখানি ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে তারা থাকৃত। তার বাবা এব্রাম গার্ফিল্ড্ চাষ বাস করে অনেক কষ্টে সংসারের খরচ চালাতেন। তারপর জিম্মী দেড় বছরের হতেই তিনি মারা গেলেন। তখন জিম্মীর মা তাঁর চারটি ছেলে মেয়েঝে নিয়ে কি কষ্টেই যে পড়লেন, তা বলে শেষ করা যায় না। জিম্মীর দাদার নাম টমাস্, দিদির নাম মিহিতাবেল্। তারা দুজনে তখন থেকেই তাদের মার সঙ্গে জুটে সংসারের সকল কাজ করতে লাগল। শেষে জিম্মী একটু বড় হতেই সেও অতটুকু ছেলের পক্ষে কম কাজ করত না। আট বছর বয়সে তাকে কাঠ কাটা, গাই দোয়ান, সবজীর চাষ, প্রভৃতি সবই দেখতে হত।

কোন কাজ 'পারি না' বলার অভ্যাস জিম্মীর ছিল না, একবার একটি খুব ছোট্ট মুরগীর ডিম পেয়ে জিম্মী বল্ল, "আমি ওটা গিল্তে পারি!" আর একটি ছেলে সেখানে ছিল, সে বল্ল, "ঈস্!" জিম্মী বল্ল, "এই দেখ্!" বলেই লে ডিমটি মুখে পূরে দিল, কিন্তু সেটা কিছুতেই তল হতে চায় না! জিম্মী ছাড়বে না। বিষম ঠেলা ঠেলি আরম্ভ হল, তাতে ডিমটি গেল ভেঙ্গে আর জিম্মীর মুখখানি গেল তার রসে আর খোলায় ভরে! তখন ত বেচারার নাড়ী ভুঁড়ি অবধি উল্টে আস্তে চায়। বেগতিক দেখে জিম্মী নাক মুখ সিঁট্কিয়ে প্রাণ পণে ঘরের দিকে ছুটল। ঘরে ঢুকে, তাড়াতাড়ি এক টুকরা রুটি মুখে পূরে দিয়ে, সে অনেক কষ্টে বমি থামিয়েছে, নইলে সে যাত্রা আর মান বাঁচাবার উপায়ই ছিল না।

মাঝে মাঝে জিম্মী এমনি একটু আধটু মুস্কিলে পড়ত, কিন্তু প্রায় কখনো তার হার মানতে হয় নি, বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে সে বেরিয়ে আসত। একদিন জিম্মী ক্লাসে পড়ার সময় হেনরী বলে আর একটি ছেলের সঙ্গে কি নিয়ে চুপি চুপি একটু হাসি তামাসা করছিল। সে বেশী কিছু নয়, আর তাতে কোন গোলমালও হয় নি। কিন্তু মাষ্টার মশাই ভারী কড়া লোক ছিলেন, তিনি তাতেই হঠাৎ চটে গিয়ে বল্লেন, "জেম্স্ আর হেন্রী! তোমরা দুজন এখনি বাড়ী চলে যাও!"

হঠাৎ এমন কড়া হুকুম পেয়ে তারা দুজনেই ত ভারী থতমত খেয়ে গেল। তাতে মাষ্টার মশায় আবার চেঁচিয়ে বল্লেন, "দেরী ক'রো না; এখনি যাও!" তখন জিম্মী "আজ্ঞে, এই যাচ্ছি" বলে অমনি ছুটে বাড়ী চলে গেল, আবার তখনি ছুটে স্কুলে ফিরে এসে, হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লাসে বসল। মাষ্টার মশাই তাকে দেখেই ভারী খাপ্পা হয়ে বল্লেন, "জেম্‌স্! তোমাকে না বল্লাম বাড়ী চলে যেতে?" জিম্মী বল্ল, "আজ্ঞে হাঁ; আপনি যাও বল্‌তেই আমি ছুটে বাড়ী চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি ত আমাকে সেখানে থাকতে বলেন নি, তাই আবার ফিরে এসেছি!"

এমন ছেলের উপর কি রাগ করা যায়? মাষ্টার মশায় সে কথায় হেসে ফেলে বল্লেন, "আচ্ছা, তবে এখন এইখানে থাক! সেই থেকে তিনি জিম্মীকে খুব স্নেহ করতেন।

জিম্মীর বয়স যখন বারো বৎসর, তখন টমাসের বয়স একুশ। সেই সময়ে টমাস্ চাকুরীর জন্য বিদেশে চলে গেল, সংসারের সকল কাজের ভার পড়ল জিম্মীর উপরে। সে ছেলে মানুষ হলেও, কাজ করত ঠিক বুড়োদেরই মতন। বুড়োরা এসে তার মাকে বল্‌ত, "ওঃ! আপনার জেম্‌স্ খুব কাজ করছে; আমরা তার চেয়ে বেশী পারি না।"

সাত মাস পরে টমাস্ বিদেশ থেকে ফিরে এল। দূরে থেকে তাকে দেখেই জিম্মী লাফিয়ে আর চেঁচিয়ে অস্থির হয়েছিল। তারপর যখন টমাস্ এক মুঠো মোহর তার মার কোলে ঢেলে দিল, তখন জিম্মীর আর আশ্চর্য্যের সীমাই রইল না! সে চেঁচিয়ে বল্ল, "বাপ রে! কত টাকা!"

এত দিন পরে তাদের একখানি ভাল ইট আর কাঠের ঘর করবার উপায় হল; টমাস্ ৭৫ ডলার এনেছিল (প্রায় ২৩৪ টাকা)। ঘরের কাজ দেখতে দেখতেই আরম্ভ হল। ছুতরটির নাম 'ট্রীট্' সাহেব। তিনি এসেই জিম্মীর সঙ্গে ভাব করে নিলেন। যে কাজই করতে বলেন, জিম্মীর মুখে 'না' নাই। যা দেখে, তাই সে ঝাঁ করে শিখে নেয়। বাটালী ধরা, র‍্যাঁদা ঠেলা, বাইস্ মারা; পেরেক ঠোঁকা,—দু দিনের ভিতরে সে সব কাজ শিখে পাকা ছুতর হয়ে উঠল। আর, এ করতে তার খুব ভালও লাগত। তারপর যখন ঘরের কাজ সব শেষ হয়ে গেল, তখন একদিন সে তার মাকে বল্ল, "মা, আমি একটা টাকা রোজকারের পথ বার করেছি!" মা বল্লেন, "কি পথ বাবা?" জিম্মী বল্ল, "ছুতরগিরি।" বলেই সে গিয়ে সেই ট্রীট সাহেবের নিকট উপস্থিত হল। তাঁর অনেকগুলো তক্তা র‍্যাঁদা করবার দরকার ছিল; জিম্মী তাঁর সঙ্গে ঠিক করল যে সেই তক্তাগুলো সে পালিস করে দিবে, তিনি তক্তা পিছু তাকে এক সেণ্ট্ দিবেন।

পরদিন সকালে এসে জিম্মী কোট খুলে আস্তীন গুটিয়ে তার কাজে লেগে গেল, সারা দিনের ভিতরে আর সে থামল না, ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে তার হেতের চালাতে লাগল। সূর্য্য তল হবার একটু আগে সে র‍্যাঁদাখানি রেখে দিয়ে ট্রীট্ সাহেবকে বল্ল, "এই নি'ন, একশখানি হয়েছে, গুণে দেখুন!" সে কথা শুনে ট্রীট্ সাহেব আগে ত হাঁ করে রইলেন। এক দিনে একশটা তক্তা পালিস কর্‌তে বুড়োরা পারে না, সেই ছেলে যে তা করে বসে আছে তা তিনি কি করে জানবেন? কিন্তু গুণে দেখবার পর আর সন্দেহ করবার জো রইল না। তখন তিনি যারপর নাই খুসী হয়ে একশটি সেণ্ট তাকে গুণে দিলেন।

একশ সেণ্টে এক ডলার হয়। এতগুলি পয়সা একদিনে রোজকার করে জিম্মী কেমন খুসী হল, বুঝতেই পার। আর, তখন বোধ হয় সেই টমাস্ যে টাকা এনে মার কোলে ঢেলে দিয়েছিল, সে কথাটাও জিম্মীর মনে এসে থাকবে। যেমনই হোক, সে তখনই ছুটে মার কাছে এসে ঠিক টমাসের মতন করে সেই একশটি সেণ্ট তাঁর কোলে ঢেলে দিয়ে বল্ল; "মা, এই নাও!" মা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "এর সবগুলোই আজ রোজকার করলে?" জিম্মী বল্ল, "হাঁ! একশখানা তক্তা পালিস করেছি!" তারপর আর মার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না; তাঁর দুটি চোখ জলে ভরে এল।

[ক্রমশঃ

কঠিন কাজ।

যুদ্ধে এরোপ্লেনের কাজ বড়ই কঠিন। প্রাণটি হাতে নিয়ে এ কাজ করতে হয়। একটা ফরাসী এরোপ্লেনের কথা শোন।

এরোপ্লেন যে চালায়, তাকে বাংলায় কি বল্‌তে হয়, তা কিন্তু আমি জানি না; আমি বলব 'মাঝি'। একটা ভারী দরকারী খবর এরোপ্লেন দিয়ে অনেক দূরে একজন সেনাপতির কাছে পাঠাতে হবে। মাঝিকে বলা হল, "তুমি আমাদের একজন দূতকে অমুক জায়গায় পৌঁছিয়ে দিবে। খবরদার, গোলে টোলে প'ড় না যেন! যদি শত্রুর গুলিতে নেমেই আসতে হয়, তবে সঙ্গের কাগজ পত্র শুদ্ধ এরোপ্লেনটিকে পুড়িয়ে ফেলবে। আর যদি সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পার, তাহলে তখনি দূতকে সেনাপতি মশায়ের কাছে নিয়ে যাবে।"

মাঝি তার কল ঠিক করতে লাগল, দূত গিয়ে তার জায়গায় উঠে বসল; তার দু ধারে দুই বন্দুক, দু পায়ের মাঝখানে কাগজ পত্র। তারপর এরোপ্লেনটা খটমট করে খানিক দূর গড়িয়ে গিয়ে শেষে উড়তে লাগল। মাঝিটি তার কলের সঙ্গে বেশ করে বাঁধা। সে ছোট ছোট কাঠি নেড়ে কলটা চালাচ্ছে, তা ছাড়া আর একটুও নড়ছে না। পূবে হাওয়ার ধাক্কা ঠেলে এরোপ্লেন উত্তর মুখে চলেছে।

ঐ! অনেক দূরে, সেই ঢের ঢের নীচে বন্দুকের ধোঁয়া। মাঝি অমনি মোটর থামিয়ে দিয়ে, দূতকে ইসারায় বল্ল, "শোন!" কিন্তু দূত হাওয়ার শোঁ শোঁ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। আবার মোটর চলতে লাগল। ধোঁয়া ক্রমে বাড়ছে; আরো যে কাছে এসেছে। তারা ভাবল, উপরে উঠে যাই। অমনি বিষম এক ঝাপ্‌টা এসে দিল তাদের কাৎ করে। মাঝি ভারি মজবুত, তাই সেবারে সামলে গেল। কিন্তু এর পর এমনি ভয়ানক এক ঝাপ্‌টা এল যে, তা থেকে অনেক চেষ্টায়ও ভাল মতে সামলান গেল না। তার ঠেলায় তারা আগে সোজাসুজি উপরবাগে উঠে, তারপর হাওয়ার ধাক্কা খেতে খেতে নেমে আসতে লাগল। তবু তারা প্রাণপণে এরোপ্লেন হাঁকাতে ছাড়ছে না। দূত বেচারা জোঁকের মতন এরোপ্লেন আঁকড়ে রয়েছে,—কখন টিপ্ করে পড়তে হয়।

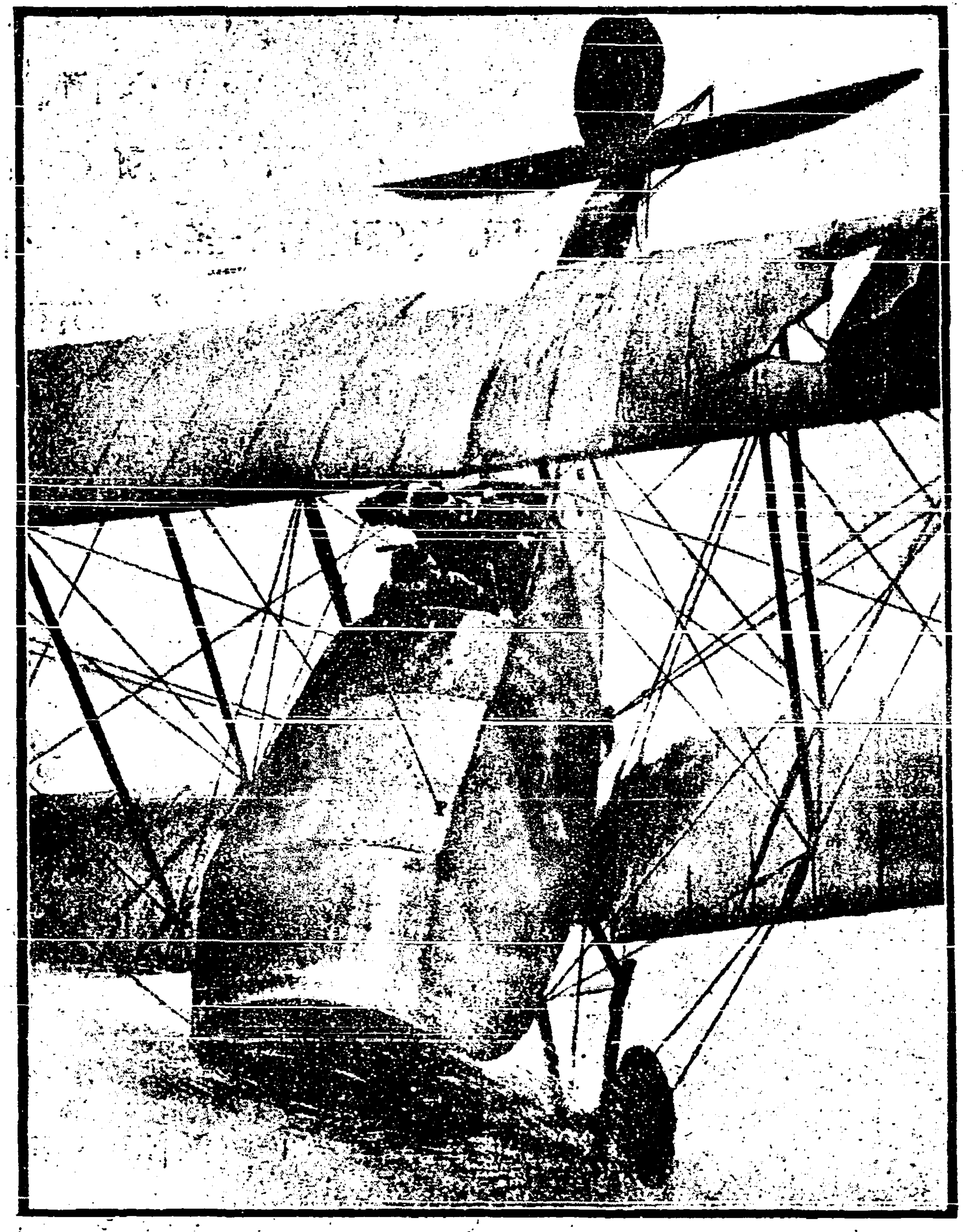

যা হোক, আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। এখন নীচে একটা মস্ত বন, আর মাঝে মাঝে নদী। তখন সবে ভয় একটু কমেছে, এমন সময় এরোপ্লেন হঠাৎ এমনি কাৎ হয়ে পড়ল যে আর কিছুতেই তাকে শোধরান গেল না। তখন দেখা গেল তার বাঁ ধারের পাখার অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়েছে! এখন আর ঊর্দ্ধশ্বাসে নেমে আসা ভিন্ন উপায় নাই।

নামতে নামতে বনের ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে এরোপ্লেনটা মাটিতে ঠেকল, কিন্তু তার বিশেষ কিছু হল না। আর কোন মাঝি হলে সেটা গুঁড়োই হয়ে যেত। মাঝি এর মধ্যেই লাফিয়ে পড়েছে; দূতকে বলেছে বন্দুক নিয়ে তয়ের থাকতে, আর শত্রু এলে 'দ্‌ড়াম্‌' করে লাগাতে। তারপর এরোপ্লেন জ্বালিয়ে দিয়ে তারা দুজনে ছুটে পালাবে।

দেখতে দেখতে ছেঁড়া পাখা সেলাই হয়ে গেল; এখন এরোপ্লেনটাকে টেনে সেই খোলা জায়গাটার আর এক মাথায় নিয়ে গেলে তবে আবার উড়বার সুবিধা হবে। কিন্তু সে কি সহজ কাজ? একজন ধরেছে কলটার লেজে, আর একজন ধরেছে তার মুখে; তারপর গাছপালার শিকড় আর পাথরের উপর দিয়ে তাকে নিয়ে টানাটানি করে বেচারাদের প্রাণান্ত, তবু সেটা এগুতেই চায় না। এমন সময় মাঝি হঠাৎ এক লাফে একটা বুনো মতন লোকের উপর গিয়ে পড়ে তার মুখের সামনে পিস্তল ধরে দিয়েছে। সে লোকটা যে এর মধ্যে কখন চুপি চুপি এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, তা তারা দেখতে পায়নি। দূতও ততক্ষণে বন্দুক উঠিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। সেই লোকটা কিন্তু তাতে একটুও ভড়্‌কাল না। সে দিব্যি পকেটে হাত দিয়ে বল্ল, "ওগো, আমরা তোমাদেরই লোক, শত্রুদের দেখে লুকিয়ে ছিলাম। চল তোমাদের বন পার করে দি।" বলে সে এক ডাক দিতেই তার দলের আরো কতকগুলো লোক এসে হাজির হল। তারপর আর এরোপ্লেন ছাড়বার কোন মুস্কিলই রইল না। দেখতে দেখতে আবার সেটা আকাশে উড়ে চল্ল। বনের ধারে এসে আবার শত্রুদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল, ওরা বন্দুকও ছুঁড়তে কসুর করেনি। কিন্তু একটু পাশ কেটে আবার বনের আড়ালে যেতেই সে সব বন্দুকের ভয় কেটে গেল। তারপর যখন আবার তারা বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, তখন এরোপ্লেন এত উপরে উঠে গেছে যে তাকে দেখা যায় কি না যায়। ততক্ষণে বন্দুকের আওয়াজও থেমে গেছে, আর এরোপ্লেনও এসে তার ঠিকানায় পৌঁছিয়েছে।

খুকুর লেখা।

লিখ্‌তে ছিলেন খোকা বাবু ;
খাতাখানি থুয়ে,
খাবার খেতে গেলেন যখন,
হাত দু'খানি ধুয়ে।
দাদার লেখা দেখ্‌তে ছিল
খুকী কাছে ব'সে ;
ভাব্‌ল সে এ লেখা সোজা,
ধ'র্‌ল কলম ক'সে।
কালী দিয়ে লিখ্‌ল কত
খাতার পাতা ঘিরে ;
আস্‌ছে কিনা দাদা, আবার
দেখ্‌ছে ফিরে ফিরে।

এমন সময় ফিরে এলেন
খুকুরাণীর দাদা ;
দেখ্‌লেন তাঁ'র খাতার পাতা
একখানি নাই শাদা।
কত রকম দাগ পেড়েছে,
সোজা আর বাঁকা ;
বল্‌ছে হেসে, "দেখ দাদা,
হয়নি ছবি আঁকা ?
এই দেখনা বাবার জুতো,
ছোট কাকার ঘড়ী ;
এই দেখনা ঠাকুর দাদার
চশ্‌মা আর ছড়ি।

এই দেখনা চেয়ার, টেবিল,
ঘড়া, ঘটী, থালা;
এই দেখনা পিশিমায়ের
হরি নামের মালা!
এই পাতেতে দেখ আবার
লুচি, খাজা, গজা;
জিলিপি আর মিহিদানা,
খেতে কেমন মজা!"
"সব ক'রেছিস মাটি!" বলেন
খোকা বাবু রাগে;
খুকী ব'লে, "হয়নি বুঝি!
ডাক্‌বো নাকি মাকে?
এই গুলো সব প'ড়ে দেখ,"
দাদা বলেন "যা!"
খুকী বলে, "ওহো, দাদা
পড়্‌তে পারেন না!"
হাত তালি দেয় খুকী তখন
একটি মুখ হেসে;
খোকা বাবুর রাগ পলাল,
কোলে নিলেন এসে।
চুমু খেয়ে বলেন, "তোমায়
দেবো নূতন খাতা;
আমার খাতায় এমন ক'রে
লিখোনা আর যা' তা'।"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চান্দা।

এক রাজার মুখময় ভয়ানক ফোড়া ছিল। রাজা কত বদ্যি ডাকলেন, কত ওষুধ মাখালেন, কিছুতেই তাঁর ফোড়া সারল না। এর মধ্যে একদিন তিনি বনের ভিতরে শিকার করতে গেলেন। সেখানে সারাদিন বাঘ হরিণ তাড়িতে তাড়িয়ে তাঁর বড্ড পিপাসা হল, কিন্তু নদী ঝরণা সব শুকিয়ে গেছে, জল কোথায় পাবেন? অনেক খুঁজে খুঁজে একটা গর্ত্তের ভিতরে খানিকটা ময়লা জল পাওয়া গেল, তারি একটু চোখে মুখে দিয়ে তিনি দু তিন ঢোক খেলেন। তারপর বাড়ী ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁর মুখের যে যেখানে সেই জল লেগেছিল, সেখানকার সব ফোড়া সেরে গিয়েছে!

তখন রাজা আর রাণী দুজনে মিলে আবার গিয়ে সেই জল খুঁজে বার করলেন। রাজা সে জলে স্নান করতেই তাঁর সবগুলো ফোড়া একেবারে সেরে গেল। গরুর পায়ের দাগ পড়ে সেখানে পাঁচটি ছোট ছোট গর্ত্ত হয়েছিল। সেই পাঁচটি গর্ত্তের ভিতরে খানিকটা মাত্র জল। সেই খানিকটা জল দিয়েই রাজার স্নান

হয়ে গেল, অথচ গর্ত্তের জল একটুও কম্‌ল না! জলের এমন আশ্চর্য্য গুণ হবার কারণ এই যে, সেই জায়গাটায় অচলেশ্বর নামে দেবতা আটকা ছিলেন। অচলেশ্বর, কি না, তিনি চলতে পারেন না,—অন্য দেবতাদের উপর ভারী দৌরাত্ম্য করতেন বলে তাঁকে দেবতারা সেখানে আটকে রেখেছেন। রাত্রে সেই দেবতাকে রাজা স্বপ্নে দেখলেন। তখন বুঝতে পারলেন যে তাঁরি কৃপায় তাঁর ফোড়া সেরেছে।

সেই আশ্চর্য্য জল যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেইখানে রাজা অচলেশ্বরের নামে এক মন্দির তয়ের করে দিলেন। মন্দির তয়ের হবার সময় রোজ ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে তিনি তার কাজ দেখতেন। একদিন কাজ দেখে ফিরে আসছেন, এমন সময় একটা খরগোষ বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে তাঁর সঙ্গের কুকুরটাকে তাড়া করল। কুকুর ত প্রাণের ভয়ে দে ছুট, খরগোষও ছুটল তার পিছু পিছু। রাজাও এই ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন। খানিক দূর গিয়ে একবার খরগোষটা কুকুরটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কুকুরটা তাকে ঝেড়ে ফেলে আবার ছুটতে লাগল। আর খানিক দূরে গিয়ে দেখা গেল যে, যেখান থেকে খরগোষটা কুকুটাকে তাড়া করেছিল, ঘূরতে ঘূরতে তারা আবার সেইখানে ফিরে এসেছে। তখন কুকুরটা খরগোষটাকে ধরে তার ঘাড় মটকিয়ে দিল।

এসব দেখে শুনে রাজা অবাক হয়ে গেলেন, আর ভাবতে লাগলেন যে, এর মানে কি? বাড়ী এসেও খালি সেই কথাই ভাবছেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। তখন রাণী তাকে বল্লেন, "এর মানে আর কিছুই নয়,—যে পথে খরগোষ কুকুরকে তাড়িয়ে গিয়েছিল, সেই পথ ধরে পাঁচীল গাঁথতে হবে, আর সেই পাঁচীলের ভিতরে একটি সহর বসাবে।"

রাণীর কথায় সেই যে পাঁচীল গেঁথে সহর বসান হয়েছিল, সে সহর আর পাঁচীল আজও আছে। সহরটির নাম ছিল চন্দ্রপুর, লোকে এখন তাকে বলে চান্দা। পাঁচীলটি ১০ ফুট চওড়া আর প্রায় ১৬। ১৭ ফুট উঁচু। দূরে থেকে দেখতে চমৎকার দেখায়।

চান্দা কলিকাতা থেকে প্রায় ৮০০ মাইল দূরে। হাওড়া থেকে নাগপুর হয়ে বোম্বাই যাবার ট্রেণে আগের দিন বিকালে রওয়ানা হয়ে, পর দিন বিকালে সেই ট্রেণ থেকে নেমে চান্দা যাবার ট্রেণে উঠতে হয়, তারপর চান্দা পৌঁছাতে প্রায় রাত দশটা বাজে।

সে দেশের শস্য ক্ষেতে বুনো হরিণ আর শূয়র চরতে আসে। রাখালেরা হয় ত সেখানে গরু চরাচ্ছে, তাদের গ্রাহ্যও করে না। চাষারা ক্ষেতে পাহারা না দিলে আর তাদের কোন ফসল ঘরে নিবার আশা থাকে না। ক্ষেতের মাঝখানে উঁচু মাচা বেঁধে

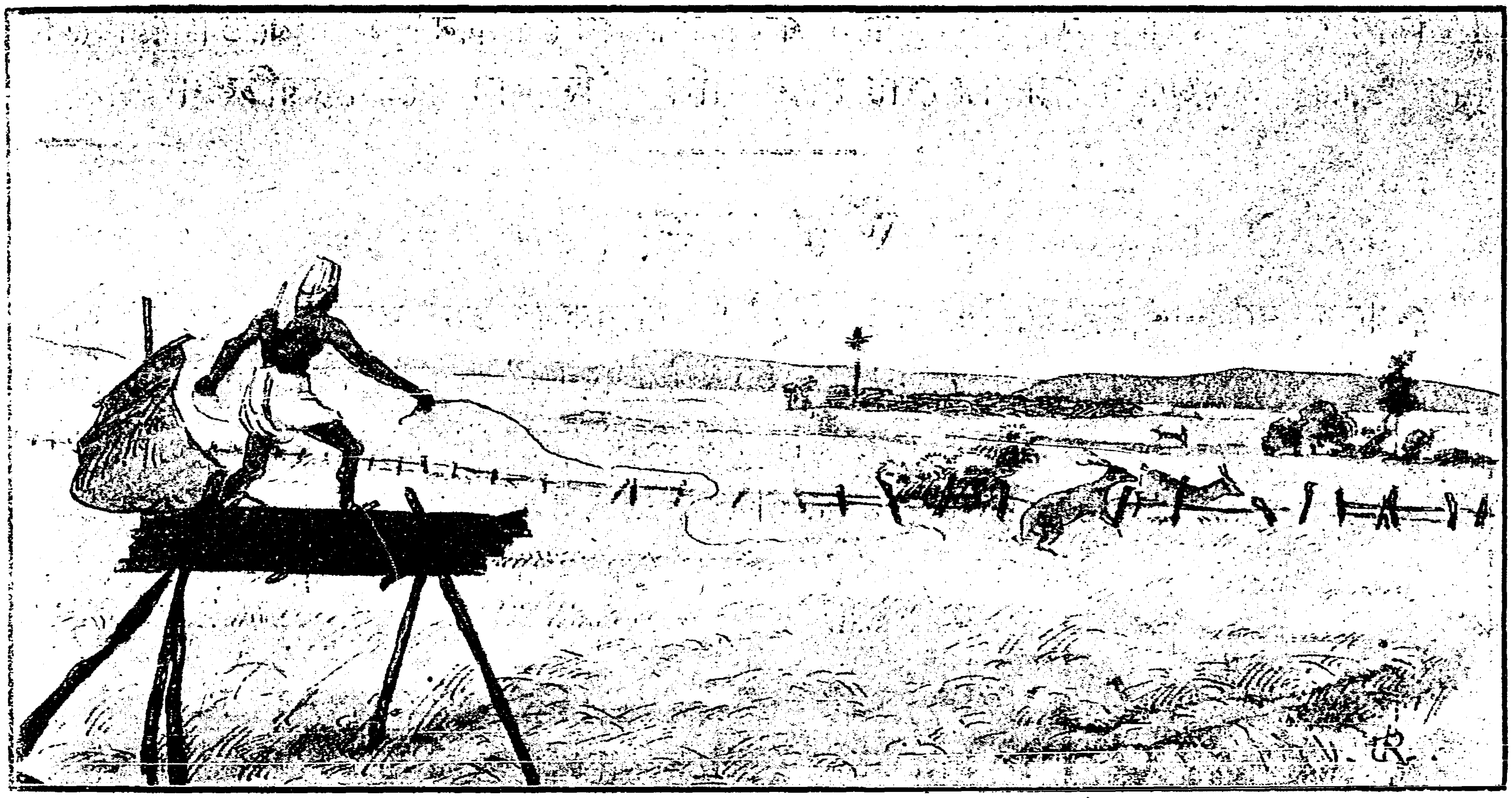

একজন সেখানে বসে থাকে। প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা দড়ির একমাথা তার হাতে, আর এক মাথা ক্ষেতে কোণের কাছে বাঁধা। হরিণ কি শূয়র এলে সে প্রাণ পণে সেই দড়িতে নাড়া দেয় আর যত পারে চ্যাঁচায়। আর দু তিন জন বড় বড় বাঁশ নিয়ে ক্ষেতের বেড়ায় ধাঁই ধাঁই করে মারতে আর দোহাই দস্তুর করতে থাকে। হরিণরা সেই গোলমাল শুনে ভূত ভেবে ছুটে পালায়।

আমাদের যেমন ধান, সে দেশের তেমনি জওয়ারী। তুলার চাষ সেখানে খুব হয়। তা ছাড়া ভুট্টা, অরহর, তিল, এ সবও আছে। আর আছে পিঁয়াজ। এত পিঁয়াজ, যে, তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে, আর ভাববে এসব কে খায়!

আম আর তেঁতুল গাছের অন্তই নাই। সেই তেঁতুল অরহরের জূষে গুলে, তাতে আচ্ছা করে মরীচ লঙ্কা মেখে এক চমৎকার জিনিস তয়ের হয়। তুমি আমি তা মুখে দিলে হয় ত দু দিন বসে চ্যাঁচাব, কিন্তু সে দেশের লোকের সেটি না হলেই চলে না।

কিন্তু সে দেশের বনই হচ্ছে সকলের চেয়ে দেখবার জিনিস। বড় বড় বনগুলো হেঁটে পার হতে ৬ দিন ৭ দিন লেগে যায়। একলা গেলে তার অনেক আগেই বাঘে ভালুকে খেয়ে ফেলে। বড় বড় শিকারীরা দেশ বিদেশ থেকে এসব বনে শীকার করতে আসে, আর বাঘ, ভালুক, শূয়র, হরিণ, মহিষ, নীল গাই এসব মেরে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে প্রাণ যে না হারায় এমনও নয়। দিন কয়েক আগে একদল সাহেব সেখানে শূয়র মারতে গিয়েছিলেন; শূয়র তাঁদের একজনের ঘোড়ার পেট চীরে নাড়ি ভুঁড়ি বার করে দিয়েছিল।

উঁচু বাড়ী।

লোকে বলে—"মনুমেণ্টের মত উঁচু"! সেরকম উঁচু বাড়ী দেখ্‌লে আমরা বলি "ইস্! বড্ড উঁচু বাড়ী।" কিন্তু একটিবার আমেরিকায় ঘুরে এস, তারপরে সেই বাড়ীই তোমার চোখে নিতান্তই ছোট ঠেক্‌বে। মনুমেণ্টের মাথায় অমন আরও দু চারটা মনুমেণ্ট চাপাও, তবে আমেরিকার লোকে বল্‌বে "হাঁ, কতকটা উঁচু বটে"! নিউ ইয়র্কের একটি বাড়ীর ছবি দেওয়া হল—এত উঁচু বাড়ী আর কোথাও নাই! বাড়ীটি পঞ্চান্ন তলা—সাড়ে সাতশ' ফুট উঁচু! একটা সাধারণ তিন তলা বাড়ী প্রায় ৪০ ফুট উঁচু—এই রকম উনিশটা বাড়ী একটার মাথায় আরেকটা চাপালে তবে ৭৫০ ফুট উঁচু হয়! আমেরিকার এক একটা সহরে বিশ তলা ত্রিশ তলা চল্লিশ তলা বাড়ীর ছড়াছড়ি!—ভাবতে গেলে আমাদের মাথা ঘুলিয়ে যায়।

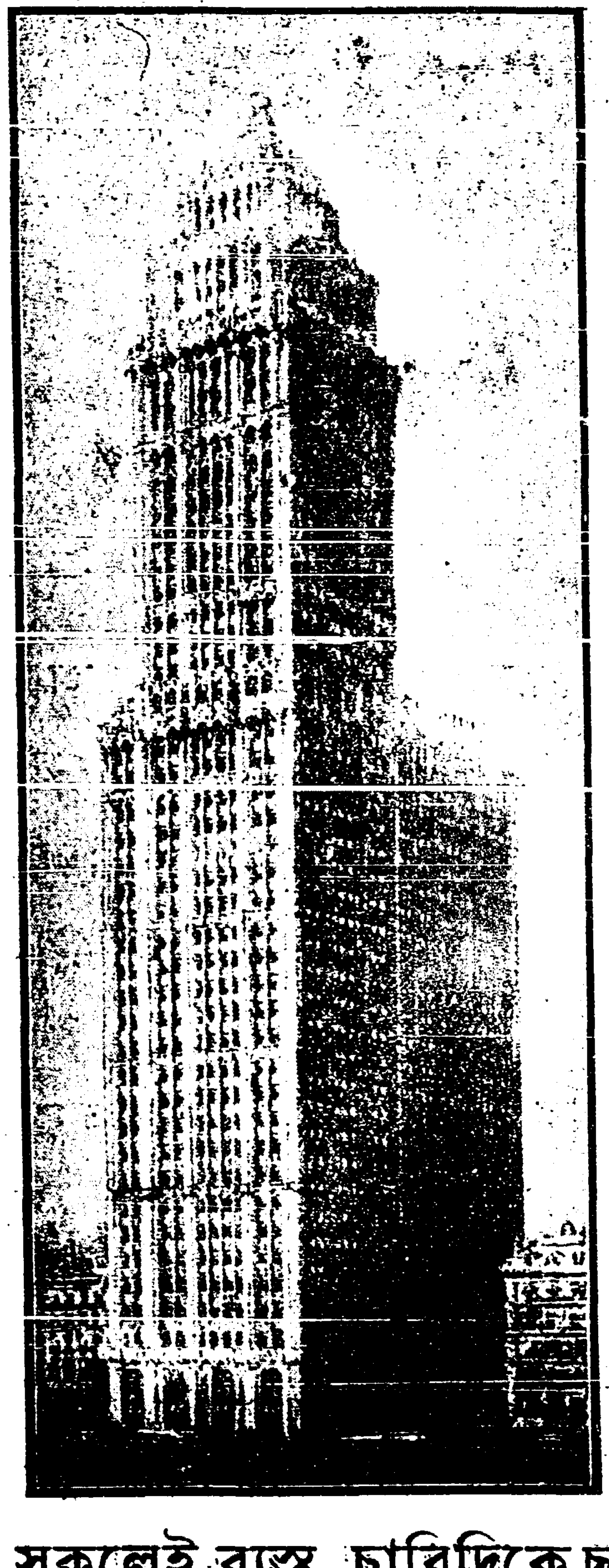

এক একটি বাড়ী যেন এক একটি সহর। তার মধ্যে কত আফিস কত দোকান কত হোটেল গির্জ্জা ইস্কুল থিয়েটার বায়স্কোপ ডাকঘর, সভাসমিতি! বাড়ীর এক এক জায়গায় সারি সারি খাঁচার মত ঘর—তা'তে চ'ড়ে লোকে উঠ্‌ছে নাম্‌ছে, বিশ পঁচিশ তলা সিঁড়ি ভেঙ্গে কষ্ট ক'রে উঠ্‌তে হয় না। বাড়ীর মধ্যে ত্রিশ হাজার লোক—সকলেই ব্যস্ত, চারিদিকে ছুটাছুটি অথচ কোন গোলমাল নেই। বন্দোবস্ত এমন সুন্দর যে

কিছু একটা দরকার হ'লে তার জন্য হাঁ ক'রে ব'সে থাকতে হয় না, বা বিশ মাইল দূরে ছুটতে হয় না। বাড়ীতেই সব রকম দোকান—ঘরে ব'সে টেলিফোন কর, যা চাও দু মিনিটের মধ্যে ঘরে এসে হাজির!

বাড়ীতে ঢুকলে দেখবে শুধু যে মাথার উপরে এতখানি দালান আছে, তা নয়—মাটির নীচেও দশ বিশ তলা! সেখানে সূর্য্যের আলো যাবার উপায় নাই—সারাদিন আলো জেলে কাজ চলে। ওই সব নীচের তলাগুলোতে নানা রকম কল কারখানা—ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির বড় বড় চাকাওয়ালা কল, বাড়ী গরম রাখবার জন্য বড় বড় 'বয়লার',—বড় বড় ছাপাখানা তাতে সকাল সন্ধ্যা খবরের কাগজ ছাপা হয়।

কোন কোন রাস্তার দুধারে এই রকম দশ বিশ তলা বাড়ীর সার চলেছে—তার ছায়ায় রাস্তা যেন অন্ধকার—সেখানে সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না—আকাশ দেখতে হ'লে ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে তাকাতে হয়। কিন্তু যারা একেবারে উপরে ত্রিশতলা বা চল্লিশতলায় থাকে তাদের আলো বাতাসের কোন অভাব হয় না। রাস্তার ধূলা সহরের কুয়াশা অত উঁচুতে পৌছায় না—কাজেই সেখানকার হাওয়া অতি পরিষ্কার।

বাড়ীগুলো দেখতে যেমন আশ্চর্য্য, এগুলি তয়েরি করার কায়দাও তেমনি অদ্ভুত। বাড়ী তুলবার আগে প্রায় ১০০।১৫০ হাত গর্ত্ত কেটে ভিৎ খুঁড়তে হয়। যেখানে বাড়ী হবে, তার চারদিকে খুব মজবুৎ আর খুব উঁচু "কপিকল" বসায়। সেই কলে বড় বড় লোহার

থাম চাপিয়ে থামগুলাকে হিসাবমত ঠিকঠিক জায়গায় বসান হয়। তারপর থামের গায় লোহার কড়ি বরগা বসিয়ে সেগুলাকে পেরেক স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়। এমনি ক'রে সমস্ত বাড়ীটার একটা কঙ্কাল আগে খাড়া করা হয়। তারপর ঢালাই-করা পাথুরে-মাটির দেওয়াল দিয়ে কঙ্কালটিকে ভরাট্ ক'রে তাতে দরজা জানালা বসালে পর তখন সেটা বাড়ীর মত দেখ্‌তে হয়। যারা এই সকল কাজ করে, তাদের যে অনেকখানি সাহস দরকার তা বুঝ্‌তেই পার। মাটি থেকে ৪০০ হাত উপরে লোহার বরগার উপর দিয়ে হাঁটাহাটি করা—তার উপরে বসে কাজ কর্ম্ম করা, কখন বা উপর নীচ ওঠা নামা—এ সব যেমন তেমন লোকের কাজ নয়। আগের পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, একটা লোক বাহাদুরী দেখাবার জন্য কোথায় ২৫।৩০ তলার উপরে, দড়ি ধরে ঝুল্‌ছে। তার ইচ্ছাটা অম্‌নি ক'রে উপর থেকে নীচে নাম্‌বে। একটিবার যদি হাত ছুটে যায় তবে সে যে একেবারে নীচে এসে নাম্‌বে তাতে আর সন্দেহ নাই। লোকটা মাটি থেকে প্রায় ৩২০ হাত উঁচুতে ঝুল্‌ছে। ঐ দেখ, তলায় নিউইয়র্ক সহর দেখা যাচ্ছে।

খিচুড়ি।

'হাঁস ছিল—সজারু' (ব্যাকরণ মানি না)
হ'য়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"মনে ভারি ফূর্ত্তি—
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্ত্তি"।
টিয়া মুখো গিরগিটি, মনে ভারি শঙ্কা
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাব কাঁচা লঙ্কা?
ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি—
চাপিল বিছার ঘাড়ে—ধড়ে মুড়ো সন্ধি!
জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে
ফড়িঙের ঢং ধরি সেও চাহে উড়িতে!
গরু বলে 'আমারেও ধরিল কি ও' রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে?

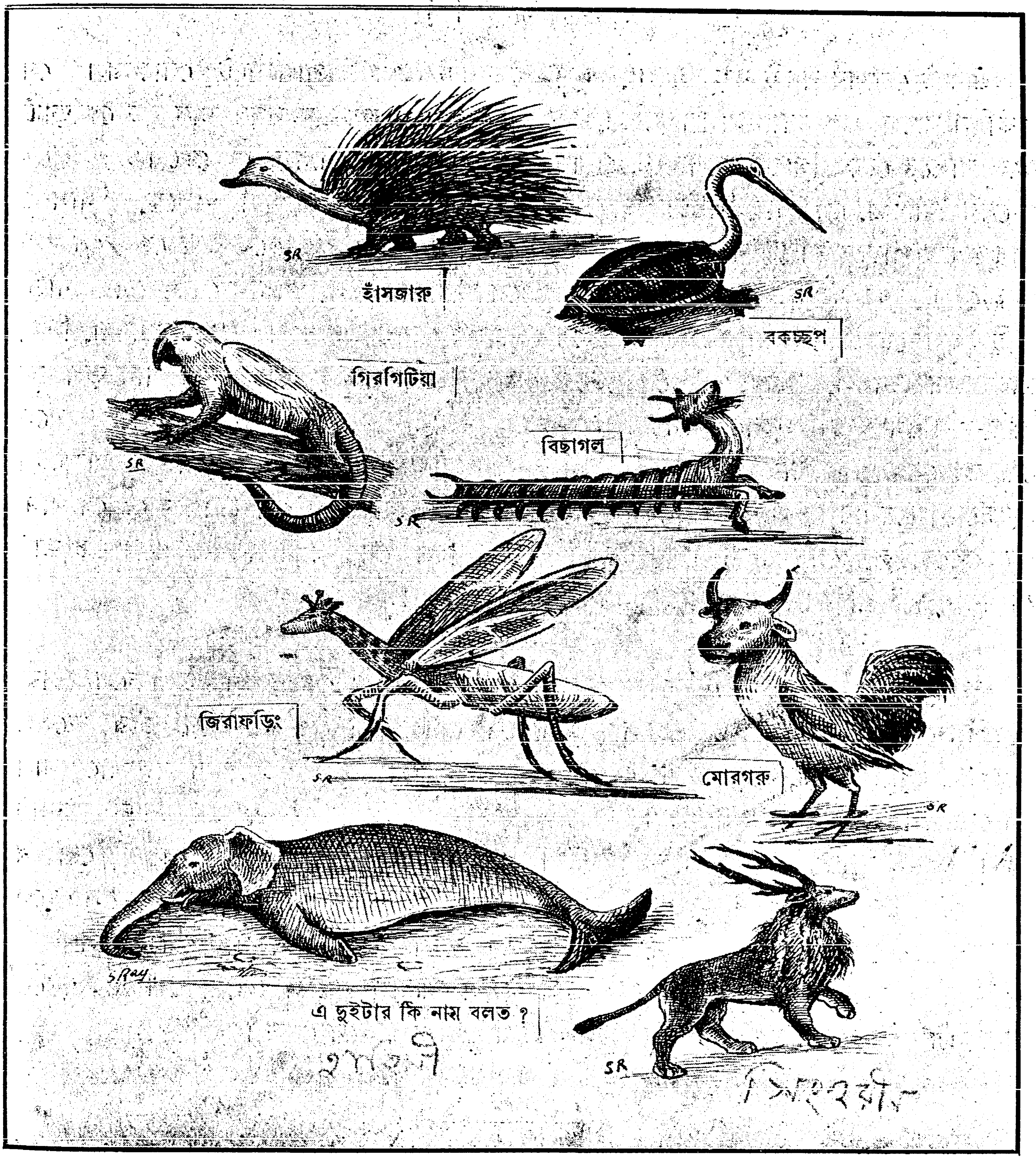
হাঁসজারু
বকচ্ছপ
গিরগিটিয়া
বিছাগল
জিরাফড়িং
মোরগরু
এ দুইটার কি নাম বলত ?

গল্প স্বল্প।

একটি ছেলের মনটি বড় ভালো, কিন্তু স্বভাবটি একটু পাগলাটে গোছের। সে একদিন রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিল, পূজা দেখতে। ঢুকবার সময় তার বুট জোড়াটি খুলে বাইরে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে, কে তা নিয়ে গেছে। ছেলেটি ত তাতে হেসেই অস্থির, সে বল্ল, "বেটা ভারী ঠকেছে! পুরাণো জুতা চুরী করেছে, দু মাস ও পায় দিতে পারবে না!" যা হোক, এখন বাড়ী ফিরে ত যেতে হবে; কাজেই সে শুধু পায় হেঁটে, ট্রাম ধরবার জন্য হেদোর ধারে এসে উপস্থিত হল, সেখান থেকে তার বাড়ী পঁচিশ মিনিটের পথ—পটলডাঙ্গায়। সে হেদোয় এসেই একখানা ট্রাম পেয়েছিল, কিন্তু তখন সে ভাবল, "এখান থেকে উঠে কেন নাহক ঠকি? সেই ছ পয়সাই ত দিতে হবে,—আমি শ্যামবাজারে গিয়ে ট্রাম ধরে পয়সা আদায় করে নিব। বলে সে ত সেই শুধু পায় হেঁটে হেঁটে গিয়ে শ্যামবাজারের আড্ডায় উপস্থিত হয়েছে। সেখানে গিয়ে সে শুনল যে সে দিন আর ট্রাম পাওয়া যাবে না; হেদোর ধারে যে খানা সে পেয়েছিল, সেই ছিল শেষ গাড়ী! সে দিন সে বাড়ী ফিরে এলে পর তার হাসির চোটে বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

সুশীল মেসে থাকে, ইস্কুলে পড়ে। মেসের আর কোন্ একটি ছেলে ভারী সৌখীন। সুশীল স্নান করতে চলে গেলে, সে রোজ তার ঘরে এসে তার ফুলেল তেলের বোতলটি থেকে তেল মেখে যায়, সুশীল কিছুতেই তাকে ধরতে পারে না। সে ছোকরা একবারেই সুশীলের তিনবারের মত তেল মেখে নেয়, তা ছাড়া আবার তেল ফেলে ছড়িয়ে লোকসানও করে। এতে যদি রাগ হয়, সে কি বড় দোষের কথা? কাজেই সুশীল একদিন করল কি—চুপি চুপি তার তেলটুকু অন্য বোতলে ঢেলে লুকিয়ে রেখে, পুরাণো বোতলটিতে কেরাসীন ঢেলে ঠিক সেই জায়গায় রেখে দিল।

সেদিন সেই সৌখীন ছেলেটি এসে তেল মেখে কি বলেছিল, সুশীল তা জানতে পারেনি। কিন্তু সেই থেকে তার তেল চুরী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

না মানে কামান না চাহে পিছু,
কে বাঁচে কে মরে না দেখে কিছু।

দ্বিতীয় বর্ষ ফাল্গুন, ১৩২১ একাদশ সংখ্যা

ভিখারীদের মেয়ে।

পথের ধারে, পুকুরপাড়ে, ভিখারীদের মেয়ে,
সারাদিনটি থাক্‌ত ব'সে, পথের দিকে চেয়ে।
তালি দেওয়া ময়লা কাপড়, গায়ে ধুলার রাশি,
রোগা শরীর, রুক্ষ মাথা, মুখেতে নাই হাসি।
কেউবা দিত পয়সাকড়ি, কেউবা দিত চা'ল,
কেউরা কেবল দেখেই যেত, কেউবা দিত গা'ল।
ধুলা দিয়ে পালিয়ে যেত— দুষ্ট ছেলের দল,
নীরবে তা'র গালটি বেয়ে পড়্‌ত চোখের জল।
রাজার ছেলে সেই পথেতে যেতেন ঘোড়ায় চ'ড়ে,
একদিন তাঁ'র ছুট্‌ল ঘোড়া, তিনি গেলেন প'ড়ে।
হাঁ'করে সব লোকগুলো তাই দেখ্‌ছে সবাই চেয়ে,
"আহা" বলে দৌড়ে এল ভিখারীদের মেয়ে।
কেঁদে বলে "হায় কি হবে! কপাল গেছে কেটে";
নিজের কাপড় ছিঁড়ে, মাথায় পট্টি দিল এঁটে।
আঁজলা ভ'রে পুকুর হ'তে জল দিল সে ঢেলে;
রাজার ছেলে সুস্থ হ'লেন, বসেন আঁখি মেলে।

জিজ্ঞাসিলেন অবাক হ'য়ে, চেয়ে মুখের পানে,
"কি নাম তোমার, কাদের মেয়ে থাক বা কোন্‌খানে?"
ভয়ে ভয়ে ভিখারিণী, ভুঁয়ের পানে চেয়ে ;
বলে, "আমি কেউ নই গো— ভিখারীদের মেয়ে।
বাবা আমার অন্ধ হ'লেন, মা প'ড়েছেন বাতে ;
ভিক্ষা ক'রে যেটুকু পাই বেঁচে আছেন তাতে"।
রাজার ছেলে দিলেন খুলে রত্ন হীরার হার ;
ভিখারিণী বলে, "ঠাকুর, চাই না অলঙ্কার।
"গরিব আমি, সোণা রূপায় কাজ কি বল মোর ;
মিথ্যালোভে মরব কেন, বল্‌বে লোকে চোর"।
রাজার ছেলে গেলেন চ'লে ; দেখ্‌ল সবাই চেয়ে,
সবাই বলে, "আচ্ছা বোকা ভিখারীদের মেয়ে"।

* * * *

এখন দেখ রাজবাড়ীতে রাণীর মত সুখে ;
এমন ক'রে বেড়ায় কেগো এমন হাসি মুখে।
কাহার গুণের প্রশংসাতে দেশ গিয়েছে ছেয়ে ;
আহা মরি, এই কি মোদের ভিখারীদের মেয়ে ?

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাপ রাজপুত্র।

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শূরসেন। রাজার পুত্র না থাকায় তাঁহার মনে বড়ই দুঃখ ছিল ; সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি অনেক দান ধ্যান অনেক জাগ যজ্ঞ করিলেন। তাহার ফলে শেষে তাঁহার একটি পুত্র হইল বটে, কিন্তু সে সাধারণ লোকের ছেলেপিলের মত নহে। সে একটি ভীষণ সর্প, যদিও মানুষের মত কথা কয়।

রাজা মনের দুঃখে বলিলেন, "হায় হায়! এই সর্প লইয়া আমি কি করিব? ইহার চেয়ে যে পুত্র না হওয়া আমার অনেক ভাল ছিল! কিন্তু সাপ সে কথা

ভাবিলই না; সে রাজাকে বলিল, "বাবা, আমার চূড়াকরণ, উপনয়ন করাইলে না? আমার হাতে খড়ি দিলে না? বেদ পড়াইলে না? তাহা হইলে যে আমি মূর্খ থাকিয়া যাইব!"

রাজা আর কি করেন? তিনি ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সব করাইলেন। সেই সাপ তখন দেখিতে দেখিতে সকল শাস্ত্র শেষ করিয়া মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিল। তারপর একদিন সে রাজাকে বলিল, "বাবা, আমার বিবাহ দিলে না? তাহা হইলে যে আমাকে লোকে ছেলেমানুষ ভাবিবে; আমার কথা গ্রাহ্য করিবে না। আর তোমারও বংশ লোপ হইয়া যাইবে, তাহার দরুণ শেষে তোমাকে নরকে যাইতে হইবে!"

রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "বাছা, তুমি যদি মানুষ হইতে তবে ত কোন মুস্কিল ছিল না, কিন্তু তুমি যে সাপ, তোমাকে দেখিলে পালোয়ানেরাও ছুটিয়া পলায়; তোমাকে কে তাহার মেয়ে দিতে চাহিবে বল?"

সাপ বলিল, "নাই বা চাহিল। রাজাদের ত জোর করিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিয়াও বিবাহ হইতে পারে,—তাই কেন কর না? আমার যদি বিবাহ না হয়, তবে আমি নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।"

এ কথায় রাজা মহাশয় ত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। এখন উপায় কি? শেষে অনেক ভাবিয়া তিনি তাঁহার অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আমার পুত্র এখন বড় হইয়াছে, আর খুব উপযুক্তও বটে। তোমরা তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখ।"

রাজার যে একটি ছেলে আছে, অমাত্যেরা সকলেই তাহা জানে, কিন্তু সেটি যে একটি সাপ, সে কথা তাহাদের কেহই জানে না, সে কথাটি রাজা মহাশয় গোপন রাখিয়াছেন। কাজেই রাজার কথা শুনিয়া তাহারা খুব উৎসাহের সহিত বলিল, "মহারাজ! আপনার যখন ছেলে, তখন আর চেষ্টার বিশেষ দরকার কি? দেশ বিদেশে আপনার নাম; আপনি যাহার নিকট চাহিবেন সেই মেয়ে দিবে।"

রাজার একটি খুব পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল, সে কিন্তু রাজার কথার ভাবে বুঝিয়া লইল যে ইহার মধ্যে কিছু চেষ্টার দরকার আছে। সে বলিল, "মহারাজ, আপনার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলে, আমি কন্যার চেষ্টায় যাইতে পারি। পূর্ব্বদেশে বিজয় নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার রাজ্য ধন লোক জন হাতী ঘোড়ার সীমাই নাই। তাঁহার আটটি মহাবল পুত্র আর ভোগবতী নামে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত একটি কন্যা আছেন। সেই কন্যাই আপনার বউ হইবার উপযুক্ত।"

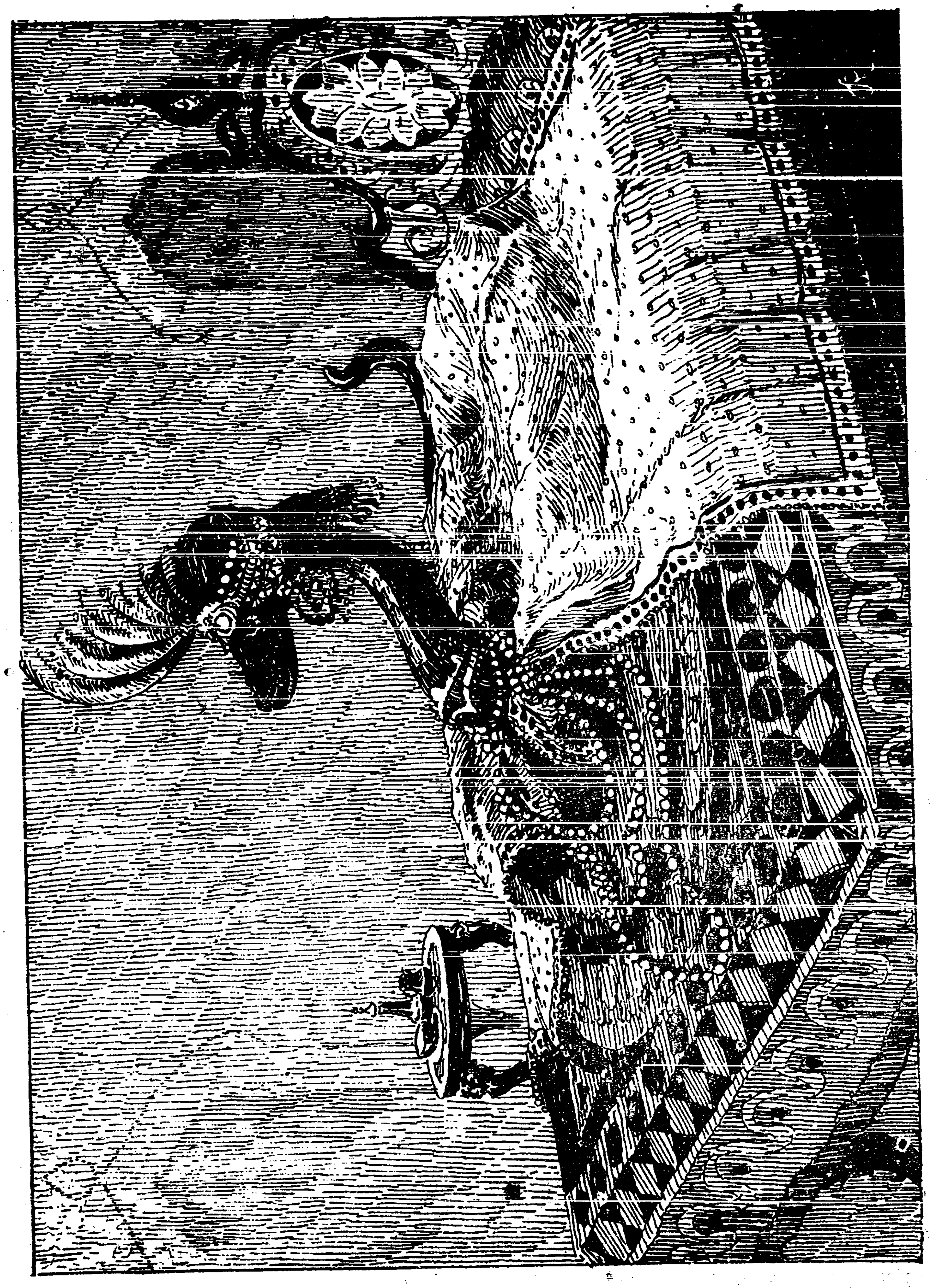

সাপ রাজপুত্র।

সে কথায় রাজা ভারি খুসী হইয়া তখনই বিস্তর টাকা কড়ি ও লোকজন সঙ্গে দিয়া কর্ম্মচারীটিকে পূর্ব্বদেশে রওয়ানা করিয়া দিলেন। কর্ম্মচারী রাজা বিজয়ের সভায় উপস্থিত হইয়া শূরসেনের পুত্রের জন্য তাঁহার মেয়ে ভোগবতীকে প্রার্থনা করিল। সেই সাপকে সে জন্মেও চক্ষে দেখে নাই, জানেও না যে সেটা সাপ। সে তাহাকে মানুষ ভাবিয়া আন্দাজি তাহার কত প্রশংসাই যে করিল, তাহা আর বলিবার নয়। তাহার এক কথাও সত্য নহে, কিন্তু রাজা বিজয় তাহার আগা গোড়াই বিশ্বাস করিলেন, কাজেই বিবাহের কথা স্থির হইতে আর বিলম্ব হইল না। তারপর আর দু একবার লোক যাওয়া আসা করিলেই বিজয় একথায়ও রাজী হইলেন যে, বর বিবাহ করিতে আসিবেন না, নিজের অস্ত্র পাঠাইয়া দিবেন, তাহার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে এরূপ ঘটনা ঢের হইয়া থাকে, কাজেই তেমনি করিয়া কিছুদিনের মধ্যেই ভোগবতীর বিবাহ হইয়া গেল; কেহই জানিল না যে সে বিবাহ একটা সাপের সঙ্গে হইয়াছে; ভোগবতীও তাহা জানিল না। সে শ্বশুর বাড়ী গেলে পর প্রথমে কেহই তাহাকে সেই সাপের কথা জানাইতে সাহস পায় নাই। কিন্তু শেষে যখন সে সকল কথা জানিল, আর সাপকে দেখিল, তখন সেই সাপকেই তাহার যারপরনাই ভাল লাগিল। সে দিন রাত পরম যত্নে তাহার সেবা করে, অতি মিষ্টভাবে তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহে, আর গান গাহিয়া, বাজনা বাজাইয়া, খেলা করিয়া বিধিমতে তাহাকে খুসী রাখে।

তখন একদিন সাপ তাহাকে বলিল, "ভোগবতী, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। পূর্ব্বের কথা এখন আমার মনে হইতেছে। আমি অনন্তের পুত্র মহাবল নাগ; মহাদেবের হাতে আমি থাকিতাম। তখনও তুমি আমার স্ত্রী ছিলে। একদিন শিব আমার উপর চটিয়া আমাকে এই শাপ দেন যে 'তোমাকে মানুষের ঘরে সাপ হইয়া জন্মাইতে হইবে।' তখন তুমি আর আমি দুজনে মিলিয়া শিবকে অনেক মিনতি করায় তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা দুজনে যখন গৌতমী নদীতে গিয়া আমার পূজা করিবে, তখন তোমাদের শাপ কাটিবে।' এখন তুমি আমাকে গৌতমী নদীতে লইয়া চল।"

ভোগবতী তখনই তাহাকে লইয়া গৌতমীতে যাত্রা করিল, আর সেখানে গিয়া শিবের পূজা করিতেই সেই সাপের আবার দেবতার মত সুন্দর চেহারা হইল। তখন সে শূরসেনের নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, এখন আমার পৃথিবীতে থাকার প্রয়োজন

শেষ হইয়াছে ; অনুমতি কর, আমি শিবের নিকট যাই।” শূরসেন বলিলেন, “বাবা, তুমি হইলে যুবরাজ ; কিছুদিন এখানে থাকিয়া রাজ্যভোগ কর, তোমাদের ছেলেপিলে হউক, আমরা দেখিয়া চক্ষু জুড়াই, তারপর, আমার মৃত্যু হইলে শেষে শিবের নিকট যাইবে।” সে কথায় সম্মত হইয়া মহাবল সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল।

জিম্মী।

এরপর জেম্‌স্ আবার কয়েক দিন ইস্কুলে পড়তে গেল। কিন্তু ট্রাট্ সাহেব তাকে খুব ভাল করেই চিনে নিয়েছিলেন, কাজেই আর একখানা বাড়ীর কাজ তাঁর হাতে আসতেই তিনি জেম্‌সের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তখন খানিক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল যে এবারে, জেম্‌স্ তাঁকে সাহায্য করবে, আর সেজন্য সে রোজ ৫০ সেণ্ট (১৷৶০) করে বেতন পাবে। সে কাজটিতে জেম্‌স্ ষাট টাকা পেল ; টাকা দিবার সময় ট্রাট্ সাহেব বল্লেন, “এই ষাট টাকার একটি পয়সাও আমার জলে যায়নি।”

শুধু টাকাই যে পেল, তা নয় ; টাকা পাওয়ার চেয়েও বেশী লাভ তার এই হল যে, এখন সে বাড়ীর নক্সা আঁকা, মাপ জোঁখ নেওয়া, সব করতে পারে। তার যদি এখন নিজের হাতে একটা বাড়ী তয়ের করতে হয়, তাহলে একটুও আটকাবে না, আর, এত দিনে সে লেখাপড়ায়ও অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। সেখানকার ইস্কুলে আর এর চেয়ে বেশী শিখবার উপায় নাই। এখন জেম্‌স্ একটা কিছু জিজ্ঞাসা করলে সেখানকার মাষ্টার মশায়রা মাথা চুলকাতে থাকেন। সে এখন রোজ রাত্রে আগুনের সামনে চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে, নিজে নিজেই পাটিগণিত শিখে। একটা আঁক একদিন ইস্কুলের মাষ্টার মশায় কিছুতেই কস্‌তে পারছিলেন না, জেম্‌স্ সেটা দু আঁচড়েই শেষ করে দিল। মাষ্টার মশায় না পেরে বলছিলেন, “বইয়েতেই ভুল আছে।” জেম্‌স্ বল্ল, “আজ্ঞে, আমি ত একদিন এই আঁকটা কসে ছিলাম, আমার উত্তর ব’য়ের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।” মাষ্টার মশায় বল্লেন, “আচ্ছা, আবার কস দেখি!” জেম্‌স্ তখনি সেটা কসে দিল। তখন মাষ্টার মশায়কে মানতে হল যে, জেম্‌সের কথাই ঠিক। এসব দেখে শুনে ইস্কুলের ছেলেদের যে জেম্‌সের উপর ভক্তি হল, সে কি বলব।

জেম্‌স্ যে শুধু খুব বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী ছেলে ছিল তা নয়, শ্রদ্ধা, দয়া আর মনের তেজও তার খুবই ছিল। একবার একটি ছেলে তাকে নিয়ে রবিবার দিনে এক

জায়গায় বেড়াতে যেতে চেয়েছিল। জেম্‌সেরা ধার্ম্মিক লোক, তারা রবিবারে ভগবানের নাম করে, কাজেই সে বল্ল, 'আমি পারব না। একাজ অন্যায়, আর এতে মারও মত হবে না।' সেই ছেলেটি বল্ল, 'আমি ত আমার মাকে বলতেই যাচ্ছি না, আর তিনি অমত করেন ত বয়েই গেল!' জেম্‌স্‌ বল্ল, 'আমি আমার মাকে না বলে কোথাও যেতে চাই না।' সেই ছেলেটি একদিন একটা বিড়ালকে ঢিল মেরে ছিল; জেম্‌স্‌ অমনি তাকে ধমকিয়ে বল্ল, "এ ভারী অন্যায়!" ছেলেটি বল্ল, "তোমার বিড়াল?" জেম্‌স্‌ বল্ল, "নাই বা হল, কোন জন্তুকে কেউ কষ্ট দিতে দেখলে আমার সহ্য হয় না।" ইস্কুলের একটি ছোট্ট ছেলেকে বড় বড় ছেলেরা খোঁচাত। জেম্‌স্‌ বয়সে সেই বড় ছেলেগুলোর সমান নয়, তবু সে সেই ছোট্ট ছেলেটির হয়ে তাদের এমনি শাসিয়ে দিল যে, তাতেই তারা দমে গেল।

আসল কথাটা এই যে, জেম্‌সের বয়স যদিও সবে তের বছর, তবু দেখতে তাকে দেখায় যেন মস্ত জোয়ান। আর সে তেমনি পরিশ্রমও করতে পারে; এর মধ্যে আর একবার ট্রীট্‌ সাহেবের সাহায্য করে ৪৫ টাকা রোজগার করেছে। কিন্তু তার মনে হয় যে সে এর চেয়েও বেশী কাজ করতে পারে, খালি পাড়াগাঁয় বেশী কাজ যোটে না বলে করবার সুবিধা পায় না। বড় বড় সহরে নাকি এর চেয়ে ঢের বেশী কাজ পাওয়া যায়, টাকাও বেশী মিলে; আর নানারকম দেখবার শুনবার, লেখাপড়া শিখবার আর বড়লোক হওয়ার খুব সুবিধা। কিন্তু এত কম বয়সে জেম্‌স্‌ এত দূরে যায়, তার মার সে মত নয়। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও তাকে চুপ করে থাকতে হচ্ছে।

এমনি করে আরো দু বছর গেল। এ দু বছর সে বই পড়ে, আর সুবিধা পেলেই ঘরে বাইরে ক্ষেতে বাগানে নিজের বা অপরের কাজ যা যোটে তাই করে কাটিয়েছে। ট্রীট্‌ সাহেবের কাছ থেকেও আরো অনেক টাকা রোজগার করতে ছাড়েনি। গায় জোরও তার এখন ভয়ানক হয়েছে; ট্রীট্‌ সাহেব বলেন, 'ষাঁড়ের মতন জোর!' এখন আর কোন কাজেই কেউ তাকে হারাতে পারে না। ছুটাছুটিতে, লাফালাফিতে সে একটু কম মজবুত; কিন্তু ঠেলাঠেলিতে বা বোঝা বইতে লাগিয়ে দেও, দেখবে কি জবর! তারপর স্বভাবটি এমন মিষ্টি, কথায়বার্ত্তায় এমনি রসিক আর ভদ্র আর কাজ কর্ম্মে এমনি খাঁটি অথচ চালাক যে, তেমন আর একটি ছেলে সে জেলায়ই দেখা যায় না। সে না থাকলে লোকের মজাটাই মাটি।

এর মধ্যে হঠাৎ জেম্‌সের বিদেশ দেখবার একটা পথ হল। এডুইন মেপ্‌স্ বলে একটি ছেলে তার বাপকে দেখতে ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড্ যাবে, সে এসে জেম্‌স্‌কে ধরল যে, 'চল আমার সঙ্গে।' জেম্‌স্ বল্ল, 'হাঁ, এক্ষণি!' পরদিনই দুজনে গাড়ীতে রওয়ানা হল, আর কথায়বার্ত্তায়, হাসি তামাসায় বেশ আরামেই গিয়ে ক্লীভ্‌ল্যাণ্ডে উপস্থিত হল। সেখান থেকে ফিরে আসবার সময়ও বেশ আমোদ হয়েছিল, কিন্তু সে একটু আরেক ধরণের।

তারা দুজন পথ দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একটা মাতাল পিছন থেকে এসে বলছে, "এই য়ো! সর্‌র্‌র্! আমার কাজ আছে!" বলেই সে তার ঘোড়াকে চাবকে পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার যোগাড় করেছে। তখন এডুইন্‌ও 'হঁস!' বলে তার ঘোড়া হাঁকাল। আর কি মাতাল তাদের সঙ্গে পারে! সে খালি সপাং সপাং তার ঘোড়াকে চাবকাচ্ছে আর যা তা বলে এডুইন্‌দের গাল দিচ্ছে। এডুইনের গাড়ী তখন ঢের আগে; সেইখান থেকে সে চেঁচিয়ে বলছে, "এসোনা! এস!" কিন্তু সে মাতাল আর তাদের সামিল হতে পারলই না, সে পিছন থেকে খালি ভেঙ্‌চাতে আর ঘুসি দেখাতে লাগল।

খানিক দূর গিয়েই একটা সরাই। জেম্‌স্ আর এডুইন্ সেখানে গাড়ী থামিয়ে একটু বিশ্রাম করতে বসেছে, এমন সময় সেই মাতাল 'রাগে মুখ দিয়ে ফেণা তুলতে তুলতে এসে বল্ল, "তোদের ঠেঙ্গিয়ে সোজা করব!" এডুইন্ বল্ল, "কেন ঠ্যাঙ্গাবে?" সে বল্ল, "পাজিরা! আমাকে পথ ছেড়ে দিলিনা যে?" তাতে জেম্‌স্ বল্ল, "পথ ত পড়েই ছিল, তুমি গেলে না কেন?" মাতাল বল্ল, "আমি পারলাম না যে! হতভাগারা!" জেম্‌স্ বল্ল, "সে ত তোমার ঘোড়ার দোষ, আমাদের কি?" বলে তারা দুজনেই হাসল, তাতে মাতালের রাগ গেল আরো ভয়ানক বেড়ে। এর পরেই হয় ত সে তাদের ধরে ঠ্যাঙ্গাত; কিন্তু জেম্‌স্ তখন খুব তেজের সহিত তার সামনে এসে তাকে এমনি এক ধমক লাগাল যে আর তার ঠ্যাঙ্গাতে হল না। সে দেখল যে জেম্‌সের মুখখানি যদিও ছেলে মানুষের, তার দেহটি আর ধমকটি যেন দানবের। তা দেখে সে খানিক ভারী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ছুটে পালাল!

ভটচাযি্য আর চোর।

এক ভটচাযি্য মশায়ের বাড়ীতে চোর এসেছে। ভটচাযি্য মশায় ভারী বুদ্ধিমান্ আর সাহসী লোক, যদিও গায় জোর একটু কম। চোরকে দেখতে পেয়েই তিনি জাপটে ধরেছেন, কিন্তু কিছুতে তাকে ধরে রাখতে পার্‌ছেন না। তিনি ভাবলেন, 'তাই ত, বেটা অমনি অমনি পালিয়ে যাবে, সে কি হতে পারে ? দাঁড়া বেটা, তোকে বলে না পারি কলে জব্দ করব।' এই বলে, ট্যাঁক থেকে নস্যির ডিবি খুলে খুব কতগুলো নস্যি চোরের নাকে গুঁজে দিয়ে দিলেন বেটাকে ছেড়ে। চোর ত তখনি 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি' মনে করে ছুট দিয়েছে ; এদিকে ভটচাযি্য মশায় চ্যাঁচাতে লেগেছেন, "কে আছ ভাই, শীগ্গির এস, চোর ধরা পড়েছে।" সে কথায় অবশ্যি দেখতে দেখতে পাড়া শুদ্ধ লোক এসে সেখানে উপস্থিত হল। হয়ে তারা বল্‌ছে, "কৈ, ভটচাযি্য মশায়, চোর কৈ ?" ভটচাযি্য মশায় বল্লেন, "একটু সবুর কর ভাই, এখনি দেখতে পাবে চোর কই।" এ কথায় সকলে হেসে বল্ল, "এই বুঝি আপনার চোর ধরা পড়েছে ?" ভটচাযি্য মশায় বল্লেন, "এই ত, এক্ষণি তোমরা তাকে ধর্‌বে। বেটা ধরবার পথে এসেছে।" তার যে কি মানে, তা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না ; এমন সময় বাড়ীর পিছনের বন থেকে 'হ্যাঁ—চ্ছ্যোঃ !' 'হ্যাঁ—চ্ছোঃ !' করে ভয়ানক শব্দ আসতে লাগল। অমনি ভটচাযি্য মশায় বল্লেন, "শুনেছ ? ঐ বেটা চোর ! ধর বেটাকে !" তখন সকলে 'ধর ধর' বলে ছুটে চল্ল। চোরও চায় প্রাণপণে ছোটে ; কিন্তু শুধু চাইলেই কি হয় ? ভটচাযি্য মশায় ত আর অল্প নস্যি নাকে গুঁজে দেন নি, তার হাঁচিটা আগে হেঁচে নিক, তবে ত ছুটবে ! ততক্ষণে সকলে এসে তার হাত পা বেঁধে, চুরী করার সাধ ভাল মতেই মিটিয়ে দিল।

আরেক ভটচাযি্য মশাই শিষ্যি বাড়ী গিয়েছিলেন, সেখান থেকে বাড়ী ফিরে চলেছেন। সঙ্গে চাকর আছে, তার মাথায় সন্দেশের হাঁড়ি। ভটচাযি্য মশায় ভাবছেন, "চাকর আমার আগে গেলে সে বড় নিন্দার কথা হবে, আর পিছনে যদি যায় তবে ত সন্দেশ খেয়ে ফেলবে। এখন করি কি ?" অনেক ভেবে শেষে তিনি বল্লেন, "গঙ্গারাম ! শুনছ ? আমার ঘাড়ে যে দুটো চোখ আছে, তা জান ত ? সে চোখ দিয়ে আমি খুব দেখতে পাই।"

সে কথায় গঙ্গারামের বড়ই ভাবনা হয়েছে। তার বড় ইচ্ছা, গোটা কতক সন্দেশ খায়। কিন্তু ঠাকুর মশায়ের ঘাড়ে যে চোখ, এ ত বড় মুস্কিলের কথাই হল। তারপর খানিক দূর গিয়ে তার মনে হল, "আচ্ছা, ঠাকুর মশায় যে বল্লেন, চোখ আছে, কৈ? আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না!" এই কথা ভাবতে ভাবতে সে আরো খানিক দূর গিয়েছে, আর এর মধ্যে দু তিন বার হাঁড়ির মুখে তার হাত উঠেছে, কিন্তু আর বেশী আর ভরসা হয় নি। তারপর কখন একবার হাতখানি আপনা হতেই হাঁড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। আহা, কি চমৎকার সন্দেশ! হাতে ঠেকছে, যেমন অমৃত। একটি সন্দেশ বার করে আনতে দোষ কি? না খেলেই ত হল। ভটচায্যি মশায় রাগ কল্লে না হয় বলা যাবে, "খাচ্ছি না, শুধু দেখছি।"

এই ভেবে গঙ্গারাম একটি সন্দেশ বার করে আনলে, ভটচায্যি মশায় কিছু বল্লেন না। গঙ্গারাম সেই সন্দেশটিকে ভটচায্যি মশায়ের ঘাড়ের কাছে নিয়ে বেশ করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল; তাতেও তিনি কিছু বল্লেন না। তারপর খানিক দোনা মনা করে শেষে সন্দেশটিকে নিজের মুখেই পূরে দিল; তবু তিনি কিছু বল্লেন না।

একটি যখন খাওয়া হল, ভটচায্যি মশায় তাতে কিছু বল্লেন না, তখন আরেকটি খেয়ে দেখতে বাধা কি? দেখতে দেখতে আরেকটি সন্দেশ গঙ্গারামের মুখের ভিতর চলে গেল। তারপর আর একটি, তারপর আর একটি, এমনি করে সব কটি! ভটচায্যি মশায় ত কিছু বলেন নি, কাজেই গঙ্গারামের কি দোষ? প্রত্যেকটি সে তাঁর ঘাড়ের কাছে নিয়ে দেখিয়ে খেয়েছে।

ততক্ষণে ভটচায্যি মশায় বাড়ীতে এসে পৌঁছিয়েছেন। তখন তিনি গঙ্গারামের কাছ থেকে হাঁড়ি নিয়ে দেখেন, সর্ব্বনাশ! সেটা একেবারেই খালী! "ও গঙ্গারাম, সন্দেশ কোথায় গেল?" "আজ্ঞে, সন্দেশ যে আমি খেলাম।" "সে কিরে বেটা? সন্দেশগুলো সব খেয়ে ফেল্লি, আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলি নে?" "কেন? আপনাকে দেখিয়েই ত খেয়েছি। আপনি ত কিছু বল্লেন না?" "বটেরে, বেটা মিথ্যাবাদী! আমাকে দেখালি কখন রে?" "কেন, আমি প্রত্যেকটি আপনার ঘাড়ের কাছে নিয়ে দেখিয়ে খেয়েছি। আপনি যে বলেছেন, আপনার ঘাড়ে দুটো চোখ আছে।" তখন আর ভটচায্যি মশায়ের কিছু বলবার রইল না।

আরেক ভটচায্যি মশায় রাত্রে হঠাৎ জেগে শুনলেন, তাঁর ঘরের চালের উপরে কেমন একটা খচ্‌মচ্‌ শব্দ হচ্ছে। ঠাকুর অমনি বুঝে নিয়েছেন, এ আর কিছু [illegible]—চোর! হতভাগা নিশ্চয় বিদেশী বেকুব, নইলে আর তাঁর মত গরীবের বাড়ীতে চুরী করতে আসে? তখন তিনি বল্লেন, “ব্রাহ্মণী, গহনার বাক্সটা মাচার উপর রেখে দিয়েছি; টাকাগুলোও তার ভিতরে আছে।” আসলে কিন্তু সব ফাঁকি। ঠাকুরটি সেই দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে গরীব। তাঁর টাকাও নাই, ব্রাহ্মণীও নাই, গহনাও নাই; সে কুঁড়ে ঘরখানিতে একটি মাচাও নাই।

চোর কিন্তু ব্রাহ্মণের কথা শুনে চুপ করে চালের উপর বসে রইল, ভাবল, ঠাকুর ঘুমোলেই চাল ফুটো করে মাচায় নেমে গহনার বাক্সটি নিয়ে চম্পট দিবে। মাচা যে নাই, তাত আর সে জানে না, কাজেই চাল ফুটো করে তাতে নামতে গিয়ে গেল বেটা হুড়মুড় করে পড়ে, আর অমনি ঠাকুর উঠলেন ‘চোর!’ ‘চোর!’ বলে চেঁচিয়ে। চোরকে ধরতে কিন্তু তাঁর সাহস হল না, সে তখনি উঠে দোর খুলে বনের দিকে পালিয়ে গেল। ঠাকুর ক্রমাগত তাকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, “আরে পূব দিকে পগার! ও দিকে যেয়ো না!” চোর কি আর তাঁর কথা বিশ্বাস করে? সে বল্ল, “তোর মাচাও মিছে, পগারও মিছে!” বলে সে আর সব দিক ছেড়ে সেই পূব দিকেই ছুটে চল্ল, আর খানিক দূর গিয়েই এক প্রকাণ্ড পগারের ভিতরে এমনি বিষম নাক মুখ থুবড়ে পড়ল যে সে আর বলে কাজ নেই। বেটার নাক গেল চেপ্টে, কোমর গেল ভেঙ্গে। পাড়ার লোক এসে তার সেই দশা দেখে বল্ল, “এর এতেই ঢের সাজা হয়েছে, একে আর মেরে কাজ নাই; এখন পুলিশে দাও।”

তার নাম কি, তাতে আমার কাজ নাই ; বেচারী বড়ই দুঃখিনী। বাড়ী নাই, ঘর নাই, কি খাবে তার ঠিক নাই। দয়া করে যদি খান কতক তরকারীর খোসা দাও, তাই খেয়ে সে যারপর নাই খুসী হবে।

এর আগে সে আরেক জনদের বাড়ী থাকত ; তাঁরা চলে গেলে নিতান্ত জড়সড় হয়ে এসে আমাদের দরজায় দাঁড়াল। মাথা হেট করে শুধু লেজ নাড়ছে, আর এক এক বার ভয়ে ভয়ে মুখের পানে তাকাচ্ছে ; জানে না, রাখবে কি তাড়িয়ে দিবে। শরীরটি রোগা, মুখখানি মলিন, কিন্তু চোখ দুটি দিয়ে যেন বুদ্ধি ফুটে বেরুচ্ছে। ঘরের ভিতরে বসে খাচ্ছি, আর সেই ওঠান থেকে সে ভুরু কুঁচকিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, কান খাড়া করে তার খবর নিচ্ছে। আমার হাত পাত থেকে মুখে যাওয়া আসা করছে, ওর মুখখানিও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠছে নামছে।

ওর নাকি মা আছে, সে তার খবর নেয় [illegible]। বোন আছে, সে কামড়িয়ে তাকে খোঁড়া করে দিয়েছে। তাই তাকে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকা ভাল মনে হল না ; খোঁড়া পা দেখিয়ে বেচারাকে লজ্জা দিয়ে কি ফল ?

আমাদের এখানে এসে দুঃখিনীর তিনটি ছানা হল, দুটি খোকা, একটি খুকী। আমরা ভাবলাম, যা হোক, তবু এদের নিয়ে ওর একটু সুখে দিন যাবে। সে কি আর ওর ভাগ্যে আছে? আমাদের হঠাৎ একটা কাজ পড়ল, আমরা চলে গেলাম। ভাবলাম, চাকর রইল, সে দুঃখিনী আর তার ছানাগুলোকে দেখবে, আমাদের ওবাড়ীতে ঢের ভাত ফেলা যায়, দুঃখিনীর খাবার কষ্ট হবে না। কিন্তু ওবাড়ীতে গিয়ে আর দুঃখিনীর খাওয়া হল না। ছানাগুলোকে খানিকের তরেও ফেলে যেতে মার প্রাণ চাইল না, কাজেই মাসখানেক প্রায় উপোস করেই তার দিন কাটাতে হল। আমরা এসে দেখি, বেচারার হাড়গুলো আর চামড়াখানি ছাড়া আর কিছু নাই, চলতে গেলে টলতে থাকে, প্রাণটি কেবল কোন মতে দেহে টিকে আছে। ছানাগুলো আবার তত দিনে এমনি ডানপিটে হয়ে উঠেছে,—দুধ খেতে গিয়ে মাকে কামড়ে কামড়ে ঘা করে দিয়েছে। সেই ঘায়ের যন্ত্রণায় এখন ওরা খেতে গেলেই সে খেঁকিয়ে ওঠে।

একদিন দেখি, দুঃখিনী শুয়ে আছে, ছানাগুলো তার কাছে দুধ খেতে গিয়েছে। ভাবলাম, এবারে দুঃখিনী তাদের ঠেঙ্গাবে। কিন্তু দুঃখিনী তা না করে উঠে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। ছানাগুলো ভাবল, 'বাঃ কি মজা!' তারাও তার সঙ্গে সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। দুঃখিনী নাচতে নাচতে একটু একটু করে খিড়কীর দরজার দিকে যাচ্ছে, ছানাগুলোও নাচতে নাচতে তার সঙ্গে চলেছে। দুঃখিনী তড়াক্ করে দরজার চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে গেল; ছানাগুলো দেখল, এবারে একটু মুস্কিল। কিন্তু তারা ছাড়বার পাত্র নয়। দু একবার আছাড় পাছাড় খেয়ে তারাও শেষে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে পাঁচীলের বাইরে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন দুঃখিনী দুই লাফে পাঁচীলের ভিতরে এসে আবার তার সেই জায়গাটিতে

শুয়ে রইল। ছানাগুলো তখন বুঝল যে মা বড্ড ফাঁকি দিয়েছে।

ভারী চঞ্চল, এই ছানাগুলো ; আর দিন রাত ঝগড়াটা যে করে! যখন দেখবে

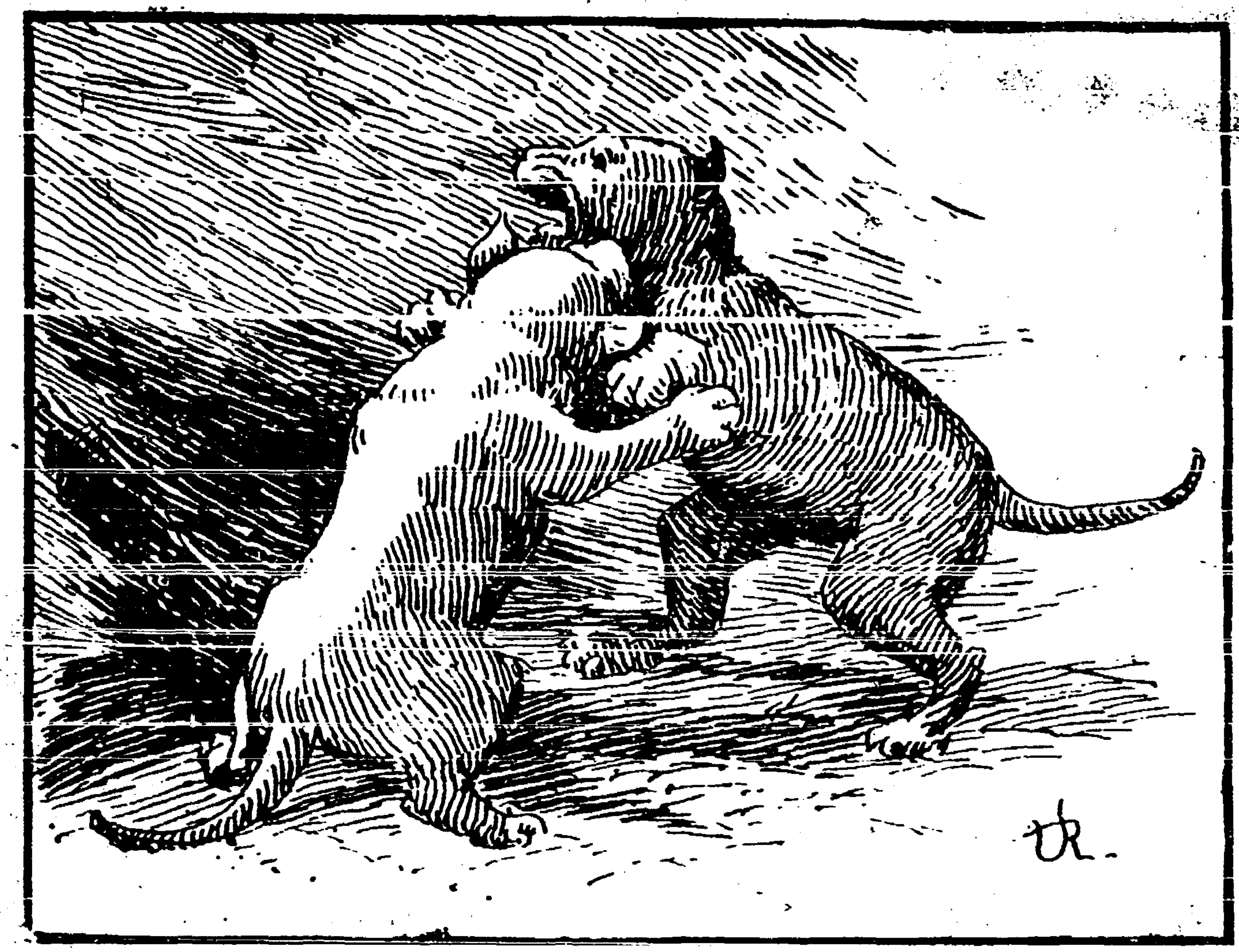

তারা ঝগড়া করছে না, তখন নিশ্চয় বুঝতে হবে যে, হয় তাদের ঘুম পেয়েছে, না হয় বড্ড শীত

লেগেছে। ঝগড়া যেন তাদের খেলারই সামিল ; অন্ততঃ গোড়াতে খেলা নিয়েই আরম্ভ হয়। খেলা নানান্ রকমের ; তার মধ্যে, একটা কিছু কামড়িয়ে ছিঁড়তে পেলে সেই হচ্ছে

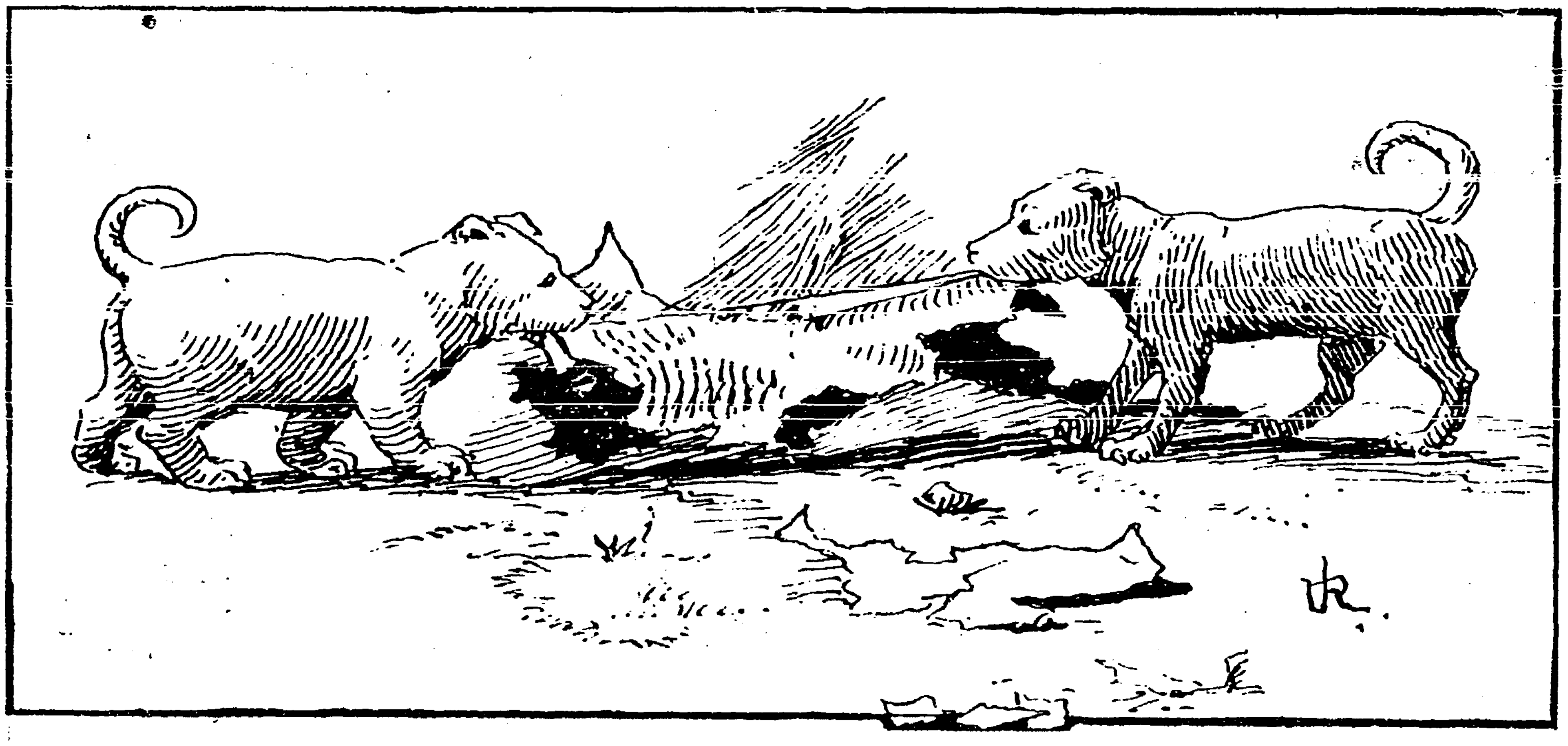

সকলের চেয়ে সরেশ খেলা। এ খেলাটি ছেলে কুকুর বুড়ো কুকুর সকলেই ভারী পছন্দ করে। আমাদের ওবাড়ীতে 'কেলো' হচ্ছে ছেলেদের ভারী আদরের কুকুর।

তার বিছানা আছে, চামড়ার কলার আছে, সুন্দর শিকলী আছে। সেই শিকলীতে যখন সে বাঁধা থাকে, তখন বিষম চ্যাঁচায়, আর যখন খোলা থাকে, তখন ছেলেদের সঙ্গে খুব খেলা করে। একদিন ছেলেরা সব কোথায় গিয়েছে, কেলোর খেলার সাথী নাই। সে ভাবল, তাইত, এখন কি করি? সে দেখল, খাটের উপরে কতগুলো কাপড় রয়েছে; কাজেই সে তাই নিয়ে খেলা করতে লাগল। ছেলেরা ফিরে এসে দেখল, কেলো তাদের সখের কাপড় সব ফালী ফালী করে রেখেছে। তখন কেলোকে ঠেঙ্গিয়ে তারা সেই কাপড়ের দাম আদায় করে নিল।

আরেক রকম খেলা হচ্ছে একটা কিছু বেয়ে ওঠা। তুমি তাদের সামনে দাঁড়ালেই তারা লেজ নেড়ে লাফাতে লাফাতে এসে তোমার পা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করবে, না পারলে অন্ততঃ তোমার চটি খানা কামড়িয়ে দেখবে। আর, তোমার পায় যদি মোজা থাকে, তবে ত সোনায় সোহাগা!

তোমাকে যদি গাছে উঠতে দেখে, তবে তারা ভাববে, 'আমরাও পারি'। সে বিদ্যা অবশ্যি তাদের জানা নাই, কিন্তু তারা চেষ্টা করে খুবই। আর চেষ্টা করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে। এখন তড়াক্ তড়াক করে উঠে যায়; কিন্তু যখন তা পারত না, তখন ঐ কাজটাতেই তারা প্রাণ পণ করত। উঠার চেয়ে তখন চিৎপাৎ হয়ে পড়াই হত বেশী। তখন গা ঝেড়ে উঠে কাউকে সামনে পেলে তার উপর ভারী চটত।

ঐটুকু ছোট জানোয়ারের পক্ষে তাদের তেজ আছে খুবই বলতে হবে। দরকার হলে তোমাকেও তারা খেউ খেউ করে শাসাতে রাজী আছে। আগে কাক দেখলেই তাড়াত। এখন কাক দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে; এখন আর কিছু বলে না। তবে কাকেরা এখনো তাদের খুব খাতির করে আর কাছে গেলে সরে দাঁড়ায়। আগে এক বেটা মোরগ আমাদের বাড়ী এসে ভারী বড়াই করত। এখন তাকে দেখতে পেলে ছানাগুলি এমনি তাড়া করে যে সে বেটা 'কক্ কক্' করে কোনখান দিয়ে পালাবে তার ঠিক পায় না।

হায়, দুঃখিনী! এখন আর তার সব কটি ছানা নাই। তার খুকিটি একদিন ফটকের বাইরে তামাসা দেখতে গেল, অমনি কোথাকার একটা কালো ভূতের মত মিন্সে এসে তাকে ধরে নিয়ে ছুট দিল। তার পর থেকে আর দুঃখিনী তার বাকি ছানা দুটিকে বেশী বকে না।

বলোদর।

(নরওয়ে দেশের গল্প)

হয়োদর আর বলোদর দুটি যমজ ভাই, স্বর্গের রাজার ছেলে। হয়োদর আঁধারের দেবতা। তিনি অন্ধ, তাঁর মুখে আর মনের ভিতরেও সেই অন্ধকার।

বলোদর আলোর দেবতা, আলোর মতই নির্ম্মল। তিনি হাসি খুসীর দেবতা; আলো দেখলে যেমন আঁধার পলায়, তেমনি তাঁকে দেখলে দুঃখ শোক পালিয়ে যায়, কান্নার ভিতরে হাসি দেখা দেয়। সকল ঔষধের কথা তিনি জানেন, মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন। কেবল, নিজের কপালে কি আছে, তা তিনি জানেন না।

বলোদর দিন রাত হাসি মুখে থাকেন. এক দিন সে হাসি হঠাৎ কি করে কোথায় মিলিয়ে গেল! দেবতারা তা দেখে বড়ই চিন্তিত হলেন। বলোদরের বাপ মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে বল্লেন, "কি হয়েছে বাবা? কেন তোমার মুখ মলিন? তোমার কিসের ভাবনা?"

বলোদর বল্লেন, "আর ত কিছু হয় নি; আমি যেন কিসের স্বপ্ন দেখি, চোখ মেলে আর তার কথা মনে থাকে না, খালি তার ভয় জেগে থাকে,—খালি মনে হয়, কি যেন হবে, কি যেন হবে!"

তাঁর বাপ মা বল্লেন, "ও কিছু নয় বাবা, তোমার মন্দ হতেই পারে না: সকলেই তোমাকে ভাল বাসে।"

বল্লেন বটে, কিন্তু তাঁদের নিজের মন সে কথা মানতে চাইল না। যদি বলোদরের কোন বিপদ হয়, যদি তিনি মরেই যান!—সুতরাং এই বেলা সে ভয় দূর করতে হবে।

রাণী তাঁর দাসীদের ছুটিয়ে পাঠালেন; তারা জলে, স্থলে, আকাশে পাতালে, সকল জায়গায় গিয়ে জীব জন্তু গাছ পালা ধাতু পাথর যেখানে যা আছে, সবাইকে বল্লে যে, "দোহাই ধর্ম্মের! তোমরা আমাদের রাজপুত্রের কোন অনিষ্ট করবে না বল।" বলোদরকে কে না ভালবাসে? কাজেই সবাই বল্ল, "আমরা কি তার কোন অনিষ্ট করতে পারি? কখনই না!" খালি রাজবাড়ীর ফটকের পাশে একটা গাছে একটি পরগাছা ছিল, সে চুপ করে রইল, কিছু বল্ল না।

পরগাছা অতি তুচ্ছ জিনিস, তার কথা বলা না বলায় কি আসে যায়? সকলের মুখে আবার হাসি দেখা দিল, রাণী মনের সুখে তাঁর চড়কা নিয়ে বসে গুণ গুণ করতে লাগলেন।

রাজা তখন সেখানে ছিলেন না, তিনি এর আগেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে খালি এই কথাই জাগছিল যে, বলোদরের কিসের ভয়, কে বলে দিবে? তপস্বিনী বুড়ী 'বালা' ছিল, সে কখন কি হবে সব বলতে পারত, সে ত আর নাই, সে মরে গিয়েছে। এখন সে বুড়ী সেই ভয়ঙ্কর দেশে চলে গিয়েছে, মৃত্যুর পরে সকলকেই যেখানে যেতে হয়। সে চির অন্ধকারের দেশ, 'হেলা' নামে রাণীর রাজ্য; সেখানে হেলার হুকুম ভিন্ন কোন কাজ হতে পারে না।

রাজা তার আট-পেয়ে কালো ঘোড়াটিতে চড়ে সেই হেলার দেশে যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর মন্ত্রের জোরে সেই বুড়িকে গোর থেকে তুলে, তাকে জিজ্ঞাসা করবেন বলোদরের কিসের ভয়।

রামধনুকের সাঁকোর উপর দিয়ে হেলার দেশে যেতে হয়; যাবার সময় সেই সাঁকো টল মল করতে থাকে। রাজা সেই পথে চলতে চলতে অনেক দিন পরে হেলার দেশে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সেখানে বিশাল ভোজের আয়োজন হয়েছে, যেন কোন মহাপুরুষের আসবার কথা।

কিন্তু ভোজের খবর নিবার অবসর তখন রাজার ছিল না। তিনি সেখানে গিয়েই বালার কবর খুঁজে বার করে, তার সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। খানিক বাদেই কবরের মাটি উঁচু হয়ে উঠল। তারপর দেখতে দেখতে সে মাটি দুভাগ করে কবরের ভিতর থেকে বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে বল্ল, "কে রে তুই? আমার ঘুম ভাঙ্গতে এসেছিস?" রাজা বল্লেন, "আমি জানতে এসেছি, হেলা কার জন্য এত ভোজের আয়োজন করছেন?" বুড়ী বল্ল, "তা জান না? এ সব আয়োজন দেবরাজের পুত্র বলোদরের জন্য। তার কপালে লেখা আছে যে তার ভাই হয়োদর তাকে মেরে ফেলবে!"

রাজার বুকে যেন শেল বিঁধল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আর হয়োদরের কি হবে?" বুড়ী বল্ল, "দেবরাজের আরেক পুত্র হবে, তার নাম 'বালী'; সেই বালী হয়োদরকে মেরে বলোদরের হত্যার শোধ নিবে।" রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কে, বলোদর মরলে যার চোখে জল আসবে না?" বুড়ী বল্ল, "তুমি এত কথা জান? বুঝেছি, তুমিই দেবরাজ! আর আমি তোমাকে একটি কথাও বল্‌ছি না। যত দিন না সংসারের নাশ হয়, ততদিন আর কার সাধ্য যে আমাকে ডেকে তোলে!" বলেই সে আবার কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে কবরের ভিতর ঢুকল।

মনের দুঃখে মাথা হেট করে রাজা ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু এসে যখন শুনলেন যে সংসারের সকল জিনিষই বলেছে তারা বলোদরের কোন অনিষ্ট করবে না, তখন তাঁর মনের ভাব একটু কমল।

আবার স্বর্গে আমোদ আহ্লাদ আরম্ভ হয়েছে। সে দিন আর পুরানো খেলায় তাঁদের সাধ মিটল না, তাঁরা বল্লেন, "নূতন খেলা কিছু হোক!" বলোদরকে নিয়ে সেই নূতন খেলা আরম্ভ হল। বলোদরের অনিষ্ট কোন জিনিসেই করে না। তাঁকে তীর ছুঁড়ে মারলে তীর উলটে আসে,—তলোয়ার তাঁর গায় ঠেকে ফুলের মত নরম হয়ে যায়। বড় বড় শিকারীরা সেদিন হার মেনে গেলেন। কোথায় গেল তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কোথায় গেল তাঁদের অব্যর্থ সন্ধান। পূবদিকে তীর মারতে গেলে পশ্চিমে চলে যায়; তখন লজ্জা পেয়ে তাঁরা নিজেই হো হো করে হাসেন, আর সকলে ত লাফিয়ে চেঁচিয়ে গড়াগড়ি দিয়েই অস্থির হয়।

বাস্তবিক সে খেলায় সকলেরই যার পর নাই আনন্দের রোল শুনতে পেলেন। এমন সময় সেই পথে এক বুড়ী যাচ্ছিল, রাণী তাকে বল্লেন, "হ্যাঁগা, ও কিসের কোলাহল? দেবতারা কি করছে?" বুড়ী কিন্তু আর কেউ নয়, সে হচ্ছে 'লোকি'—রাজার ভাই, আগুনের দেবতা আর দুষ্টুমির দেবতা—বুড়ী সেজে এসেছে। বলোদরকে সকলে ভাল বাসে, আর তাকে ভয় করে, তাই সে বলোদরকে দেখতে পারে না। লোকি বল্ল, "দেবতারা কোন অস্ত্রই বলোদরের গায় ঠেকাতে পারছেন না, তাই নিয়ে হানা হানি হচ্ছে।"

রাণী তাতে ভারী খুসী হয়ে হেসে বল্লেন, "তাত হবেই; বলোদরকে সংসারের সকল জিনিসেই প্রাণ দিয়ে ভাল বাসে, তার অনিষ্ট কে করবে?" তা শুনে লোকি যেন হিংসায় জ্বলেই গেল, কিন্তু রাণীকে সে কথা জানতে দিল না। সে খালি জিজ্ঞাসা করল, "সকল জিনিসেই কি তাঁকে এমনি ভাল বাসে?" রাণী বল্লেন, "একটা পরগাছা আছে, আমাদের ফটকের পাশে, সেই শুধু হয় ত ভাল না বাসতে পারে; তা তাকে বা কে হিসাব করে?"

এ কথার পর আর লোকি সেখানে দাঁড়াল না, সে তখনই গিয়ে সেই পরগাছার কাছে উপস্থিত হল। তারপর নানা রকম যাদু খেলিয়ে সেই ছোট্ট গাছটিকে দেখতে দেখতে সে এমনি বড় করে ফেল্ল যে তার কাঠ দিয়ে চমৎকার তীর তয়ের হতে পারে।

দেবতাদের খেলা তখনো চলছে। লোকি সেই পরগাছার কাঠের তীর বানিয়ে তাই হাতে করে খেলার মাঠে এসে উপস্থিত হল। সকলে খুব খুসী হয়ে খেলা করছে, খেলছেন না কেবল হয়োদর। তিনি অন্ধ কি করে খেলবেন? তাই তিনি মুখ ভার করে এক কোণে বসে আছেন। লোকি এসে তাঁকে বল্ল, "কি হে বড় যে মুখ ভার করে বসে আছ? খেলবে না?" হয়োদর বল্লেন, "আমি অন্ধ, কি করে খেলব?" লোকি বল্ল, "তার জন্যে ভাবনা কি? আমার সঙ্গে এস!" বলে সে তাঁকে তীর ছুঁড়বার জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর তাঁর হাতে ধনুক আর সেই পরগাছার কাঠের তীরটি দিয়ে বল্ল, "এখন ঠিক এমনি করে তীর ধনুক তুলে ধর,—এমনি,—ঠিক এই দিক পানে, হাঁ, বেশ! এখন ছোঁড় ত!" বলতেই সাঁই করে হয়োদর তীর ছুঁড়ে দিলেন, আর তাতেই সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। সে তীর বুকে বিঁধে বলোদরকে পড়তে দেখে সকলে হায় হায় করে ছুটে এলেন, এসে দেখলেন, দেহে প্রাণ নাই।

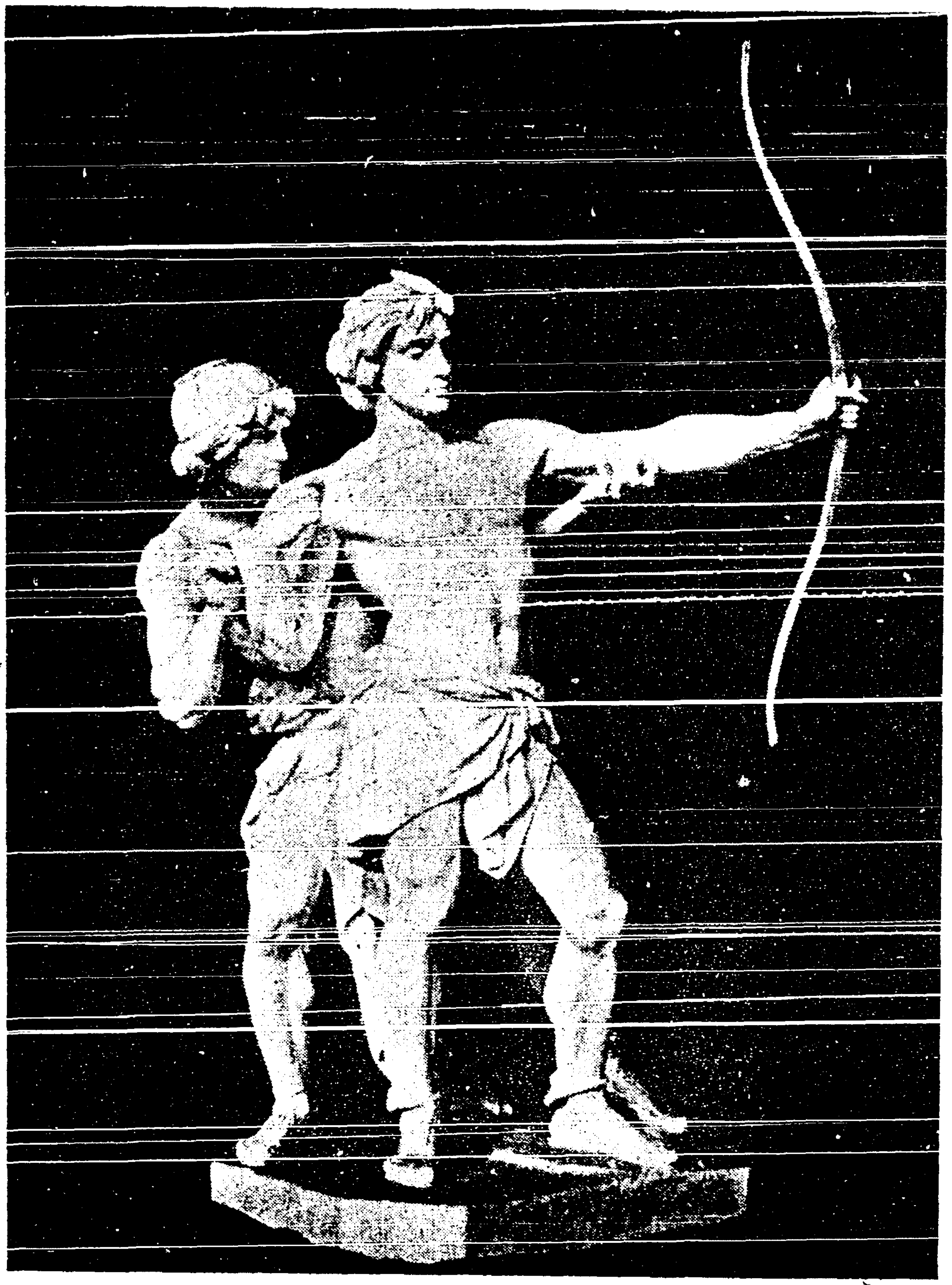

তখন সকলের কান্নায় আকাশ ফেটে যেতে লাগল। হয়োদরকে তখনই সকলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেন, কিন্তু স্বর্গে এমন পাপ করার নিয়ম ছিল না। কাজেই তখন আর হাহাকার ভিন্ন উপায় কি? ক্রমশঃ।

কুয়াসার কাজ।

আজ সকালে বড্ড কুয়াশা এসেছিল। যখন বেড়াতে বেরুলাম, তখন দেখি, গাছপালা সব ঝাপসা, আর তাদের পাতা বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়ছে। আমার ভাল লাগল না। খানিক দূর যেতেই আবার দু এক ফোঁটা করে জল আমার মাথায় পড়তে লাগল, আমার দাড়িগুলোও ভিজে উঠল। কাজেই আমি ভাবলাম, কুয়াশা জিনিসটা ভারী বিশ্রী।

কেবল একটা ব্যাপার আমার কাছে একটু নূতন ঠেকল। আগে ত বেশী মাকড়ষার জাল দেখিনি, আজ এত মাকড়ষার জাল কোত্থেকে এল ? এক একটা গাছে ১৫।২০টা করে মাকড়ষার জাল ; ক্ষেতের আলের পাশগুলো মাকড়ষার জালে ভরা, দেখলে মনে হয় ঠিক যেন মাকড়ষাদের সহর বসেছে। কাল কি এসব ছিল না, আর রাত্রের মধ্যে সব তয়ের হয়েছে ? তা নয়, কালও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। চোখ ঝাপসা বলে এতদিন সে সব দেখতে পাইনি, আজ কুয়াশার কৃপায় দেখতে পাচ্ছি।

কুয়াশার কৃপা কি রকম ? কুয়াশার কৃপা এই যে, আগে যা শুকনো ছিল, আজ তাতে শিশির জমিয়ে দিয়েছে। তাই গাছের পাতায়ও জল, আর আমার দাড়িও ভিজা।

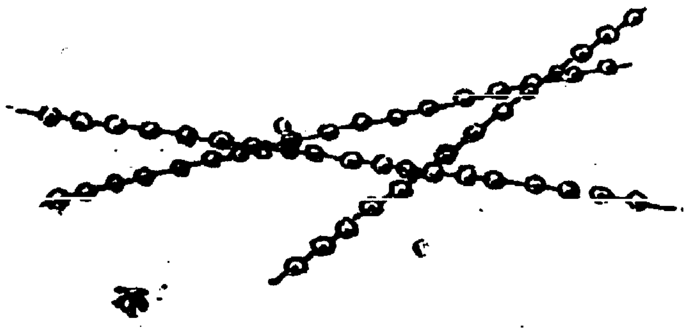

মাকড়ষার জালগুলোও তাই আজ এমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ; তাতেও শিশির জমেছে। আর সে শিশির কি চমৎকার হয়েই জমেছে ! জালের সূতাগুলি আজ দেখতে হয়েছে যেন মুক্তার মালা। বিন্দু বিন্দু শিশির তাদের গায় সার বেঁধে ঝুলছে, তাদের ঝিকি মিকিতে মুক্তাকেও হারিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু হায়, আসলে ত সব ফাঁকি ! হাত দিলাম আর সব মিলিয়ে গেল।

যা হোক, দেখতে খুব সুন্দর, তাতে ভুল নাই। নিজেরাও সুন্দর আর জালের কারিকুরীও ফুটেছে চমৎকার। এসব মাকড়ষার জাল এমন সুন্দর হয় তা আমি জানতাম না। আমি ভাবতাম, এই মাকড়ষাগুলো ভারি আনাড়ী, আজও জাল বুনতে শিখেনি। অন্য মাকড়ষারা কি সুন্দর জাল বোনে, ঠিক যেন একটি ডালা ; সূতাগুলি তাতে কেমন পরিষ্কার করে সাজান। আর এই বোকা মাকড়ষাগুলি খালি হিজি জি পাকিয়ে রাখে। সূতাগুলি সব এলোমেলো, কোন্‌টা কোন্‌দিক দিয়ে গিয়েছে তার ঠিক নাই।

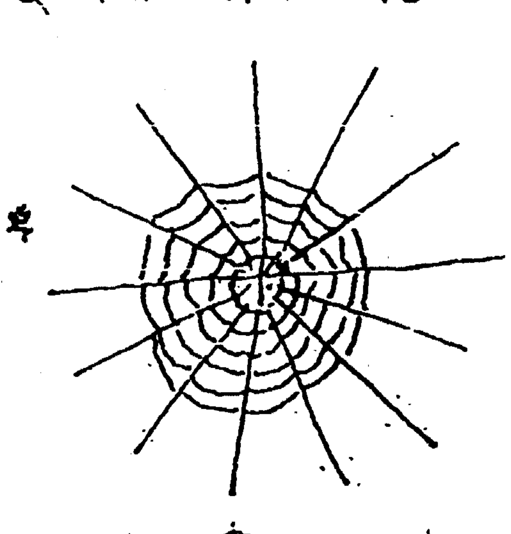

কুয়াশার কৃপায় আজ আমার মানতে হল যে, এসব জালের মাকড়ষারা আনাড়ী নয়, এরাই আসল ওস্তাদ। এদের আসল জালখানি এতদিন আমার চোখে পড়েনি।

এ জাল অন্য মাকড়ষাদের জালের মত খালি একখানা ডালা নয়, দস্তুর মতই জাল,— ঠিক যেন একখানি মিহি মশারির কাপড়ের মত করে বোনা। কি সুন্দর মিহি সূতা দিয়ে কেমন পরিস্কার করেই তা বুনেছে! কোন তাঁতির সাধ্য নাই যে এমন সুন্দর কাপড় বোনে। অন্য মাকড়ষারা তাদের জাল খাটায় পর্দ্দার মত করে, এরা খাটায় চাঁদোয়ার ধরণে। চাঁদোয়ার চারধার ত দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধেছেই, আবার তার তলায় নানান জায়গায় দড়ির টানা দিয়ে তাকে মজবুত করেছে। আবার সেই চাঁদোয়ার

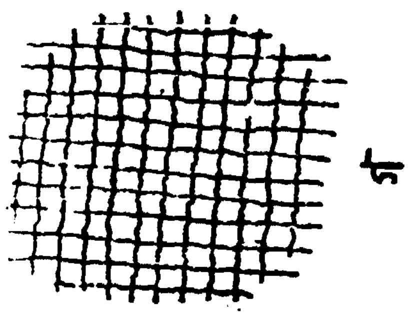

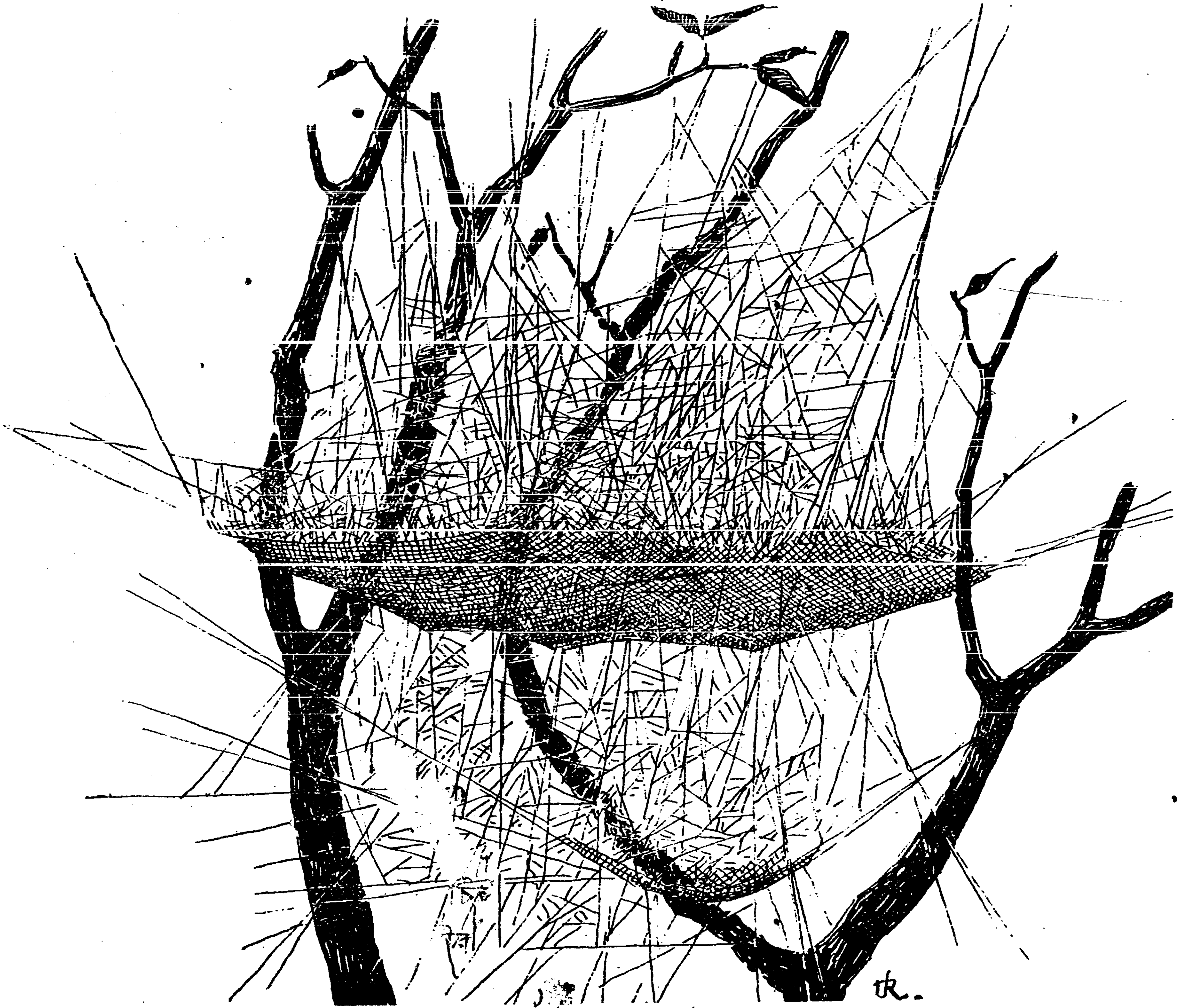

উপরে একটি গোলকধাঁধা, আর নীচেও একটি গোলোকধাঁধা বানিয়ে রেখেছে।

সেগুলোকে ভাল করে না দেখলে মনে হয় যেন নাহক হিজিবীজি; কিন্তু পোকা একবার তার ভিতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে, সেই হিজিবীজির ভিতরে কি মজা! সে যে আবার তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পালাবে, সে আশা নিতান্তই কম! এক একটা জাল দু তিন তলাও হয়,—উপরে গোলোকধাঁধা, তার নীচে জাল, তার নীচে গোলোকধাঁধা, তার নীচে জাল, এমনি।

একটা কথা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য ঠেকছে। আমি অনেক খুঁজেও এ সব জালের মালিকদের দেখতে পেলাম না। অনেকগুলো জাল খুঁজে দেখেছি। কোন কোনটাতে দু একটা ডিমের মত বোধ হল, কিন্তু মাকড়ষা একটাতেও নাই। বোধ হয় দূরে থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই তারা কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। তাতে কিন্তু তাদেরই লোকসান হয়েছে, কেন না, দেখা পেলে আমি বিনি পয়সায় সন্দেশে তাদের ছবি ছাপতাম। যা হোক, তারা যে কারিকর লোক, তাতে ভুল নাই; আমি দূরে থেকেই তাদের সেলাম করছি।

স্যমন্তক মণি।

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল প্রসেন। প্রসেনের ভ্রাতার নাম ছিল সত্রাজিৎ। সূর্য্যের সহিত সত্রাজিতের বিশেষ বন্ধুতা ছিল।

একদিন সত্রাজিৎ তোয়কূল নামক নদীতে নামিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্য স্নেহ বশতঃ নিজেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্রাজিৎ সূর্য্যের সেই আশ্চর্য্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়েয় সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্, আকাশে আপনাকে যেমন উজ্জ্বল দেখি, এখনও তেমনি উজ্জ্বল দেখিতেছি। আপনি যে স্নেহ করিয়া আমার নিকট আসিলেন, তাহার দরুণ ত আপনার রূপ কিছুমাত্র কোমল হয় নাই।" সূর্য্য তখন একটু হাসিয়া নিজের কণ্ঠ হইতে একটি মণি খুলিয়া রাখিয়া দিলেন। তখন দেখা গেল যে তাঁহার মূর্ত্তি অতি সুন্দর এবং স্নিগ্ধ।

সেই যে মণি, উহারই তেজে সূর্য্যকে এত উজ্জ্বল দেখা গিয়াছিল। সে মণির নাম স্যমন্তক। উহার এতই গুণ যে, যাহার গৃহে উহা থাকে, তাহার কোন অসুখ বা অকল্যাণ হয় না। যে দেশে উহা থাকে তথা হইতে দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সকল উৎপাত দূর হইয়া যায়।

সেই মণিটি সত্রাজিতের বড়ই ভাল লাগিল, সুতরাং সূর্য্য যাইবার সময় তিনি তাঁহাকে বিনীত ভাবে বলিলেন যে, “হে প্রভো! আপনি ত আমাকে কতই স্নেহ করেন, দয়া করিয়া এই মণিটি আমাকে দিয়া যান!” সে কথায় সূর্য্য তখনই তাঁহাকে মণিটি দিয়া গেলেন।

সেই মণি লইয়া যখন সত্রাজিৎ নিজের নগরে ফিরিলেন, তখন নগরের সমস্ত লোক নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে ‘ঐ সূর্য্য যাইতেছেন!’ ‘ঐ সূর্য্য যাইতেছেন!’ বলিয়া তাঁহার পিছু পিছু ছুটিল। সে আশ্চর্য্য মণি যে দেখে সেই অবাক্ হইয়া যায়। তাহার গুণের কথা যে শোনে, সেই ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসে। সে মণি পাইবার জন্য কৃষ্ণের খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, সত্রাজিৎ তাঁহাকে তাহা দেন নাই। কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে উহা সত্রাজিতের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মত মহৎ লোকে এমন কাজ কেন করিবেন?

সত্রাজিৎ সেই মণি তাঁহার ভাই প্রসেনকে দেন। প্রসেন প্রায়ই উহা পরিয়া চলা ফেরা করিতেন। একদিন সেই মণি গলায় পড়িয়া তিনি বনের ভিতর শিকার করিতে করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ভয়ঙ্কর এক সিংহ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সে ভীষণ সিংহের হাত হইতে আর তিনি রক্ষা পাইলেন না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সিংহ যে প্রসেনকে হত্যা করিল, সে তাঁহাকে খাইবার জন্য নহে, তাঁহার ঐ মণিটি পাইবার জন্য। সে তাঁহাকে মারিয়া মণিটি লইয়া চলিয়া গেল, তাঁহার দেহের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

যে বস্তুর প্রতি এক জন্তুর লোভ হয়, অন্য জন্তুরও তাহার প্রতি লোভ হইতে পারে। সিংহ সেই মণি লইয়া বেশী দূর যাইতে না যাইতেই পর্ব্বতের গুহার ভিতর হইতে এক বিশাল ভল্লুক আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া মণিটি কাড়িয়া নিল।

প্রসেন যখন আর ঘরে ফিরিলেন না, তখন তাঁহার আত্মীয়েরা মনে করিল যে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সেই মণির লোভে তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, নহিলে এমন কাজ আর কে করিবে? পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণের ঐ মণির প্রতি লোভ ছিল; তাঁহারই এই কাজ! বাস্তবিক এ বিষয়ে কৃষ্ণের কোন অপরাধই ছিল না, কাজেই এই মিথ্যা অপবাদের কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, আর প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়াই হউক, এই মণি আনিয়া দিতে হইবে।

প্রসেন যখন শিকারে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলে তখন সহজেই বুঝা যায় যে সেই শিকারের জায়গায় গিয়াই তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে। কৃষ্ণ বলরাম কয়েকটি সাহসী

চতুর আর বিশ্বাসী লোক লইয়া চুপি চুপি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া প্রসেনের দেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহাদের অধিক বিলম্ব হইল না। প্রসেনের ঘোড়াটিও সেইখানেই মরিয়া পড়িয়া ছিল। দুটি দেহের চারিধারে সিংহের পায়ের দাগ, সিংহের নখ দাঁতে দেহ দুটি ক্ষত বিক্ষত।

সেই সিংহের পদচিহ্ন ধরিয়া কিছু দূর গেলেই দেখা গেল যে উহার দেহও ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে যে ভালুকে মারিয়াছে, পায়ের চিহ্ন দেখিয়া আর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। এখন এই ভালুককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই হয়। তাঁহারা অতি সাবধানে সেই ভালুকের পায়ের দাগ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। সে দাগ ক্রমে একটা গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং বুঝা গেল, সেই গুহার ভিতরেই ভালুকের বাড়ী। এ কথার আরো প্রমাণ তখনই পাওয়া গেল। গুহার ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোকের শব্দ আসিতেছে, একটি ছেলেরও কান্না শুনা যাইতেছে। স্ত্রীলোকটি ছেলেটিকে শান্ত করিবার জন্য বলিতেছে, "কাঁদিয়ো না বাছা! সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছিল, তোমার পিতা সেই সিংহকে মারিয়া স্যমন্তক মণি আনিয়াছেন। এখন সেই মণি লইয়া তুমি খেলা করিবে; আর কাঁদিয়ো না!"

কাজেই আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন কৃষ্ণ, বলরাম আর সঙ্গের লোকদিগকে গুহার দরজায় রাখিয়া যেই একা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি পর্ব্বতপ্রমাণ এক বিশাল বিকট ভল্লুক ভীষণ গর্জ্জনে পাহাড় কাঁপাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন যে তাঁহাদের কি ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন, দুদিন, করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল, তথাপি সে যুদ্ধের বিরাম নাই। এদিকে কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া আর ভল্লুকের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনিয়া, বলরাম আর সঙ্গের লোকেরা দ্বারকায় আসিয়া সকলকে বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ আর নাই, তাঁহাকে ভালুকে খাইয়াছে!

একুশ দিনের পর সেই যুদ্ধ শেষ হইল। একুশ দিন যুদ্ধ করিয়া ভালুক বুঝিতে পারিল যে কৃষ্ণের নিকট হার মানা ভিন্ন আর উপায় নাই। তখন সে অশেষ অনুনয়ের সহিত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তারপর যেই জানিল যে তিনি সেই মণির জন্য আসিয়াছেন, অমনি মণি ত তাঁহাকে দিলই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের কন্যাটিও দান করিল। কৃষ্ণ সেই মণি আর কন্যা লইয়া মনের সুখে দ্বারকায় চলিয়া আসিলেন।

দ্বারকার লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কি বলিল, তাহা আমি জানি না ; তবে সত্রাজিৎ যে মণি পাইয়া খুবই খুসী হইয়াছিলেন, একথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

সেই ভালুকটি যেসে ভালুক ছিল না। সে সেই জাম্ববান্, রামায়ণে যাহার কথা তোমরা পড়িয়া নিশ্চয়ই খুব সন্তুষ্ট হইয়াছ। আর তাহার মেয়েটির নাম ছিল জাম্ববতী। সেও কি ভালুক ছিল ?

"রাবণের চিতা"।

লোকে বলে রাবণের চিতায় যে আগুন দেওয়া হ'য়েছিল সে আগুন নাকি এখনও নিভান হয়নি—এখনও তা জ্বল্‌ছে। কোথায় গেলে সে আগুন দেখা যায় তা আমি জানি না—কিন্তু এমন আগুন দেখা গেছে যা, বছরের পর বছর ক্রমাগতই জ্বল্‌ছে ; মানুষ তাতে জল ঢেলে মাটি চাপা দিয়ে নানা রকমে চেষ্টা ক'রেও তাকে নিভাতে পারে নি।

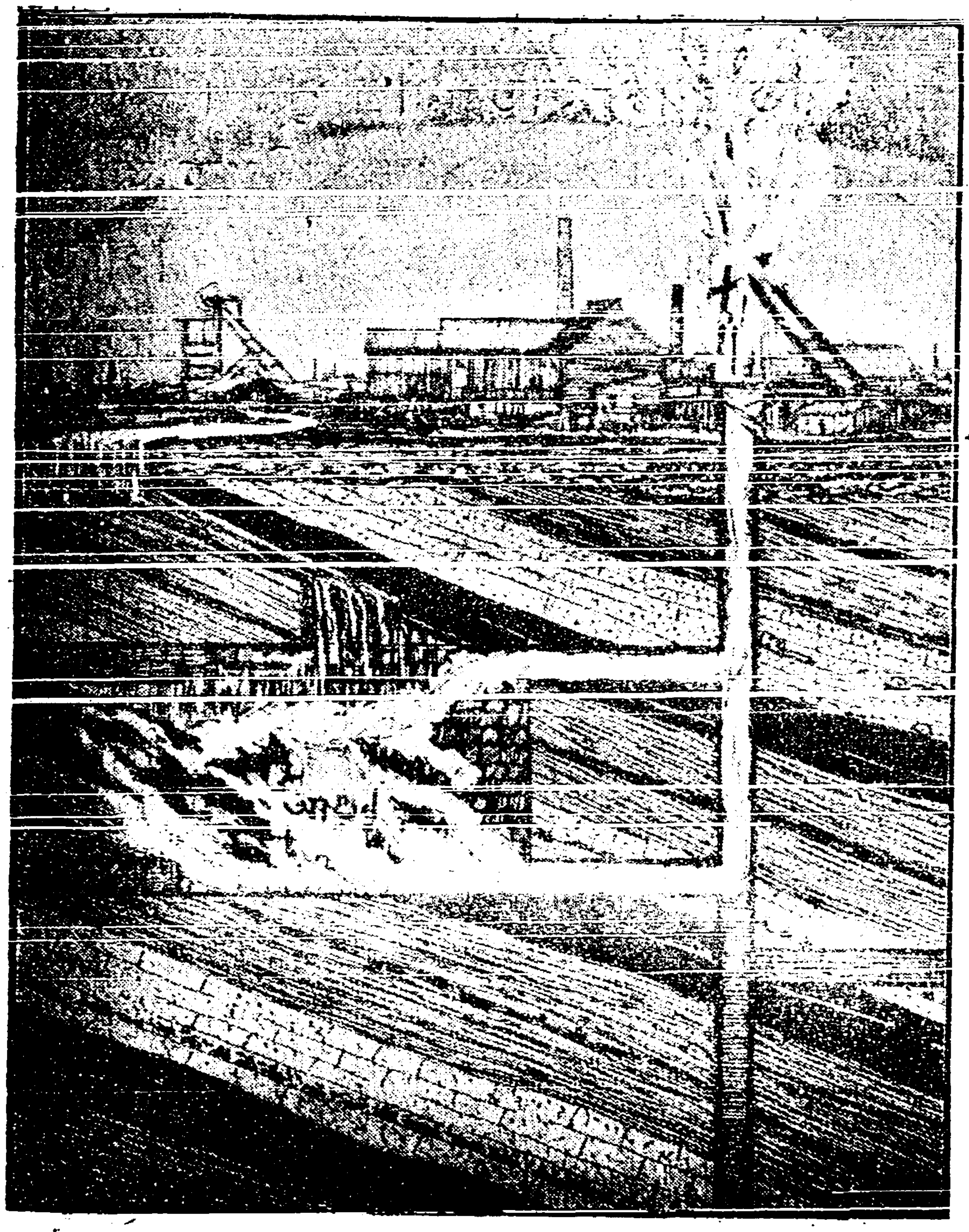

খনির আগুনে নদীর জল পড়্‌ছে।

খনি থেকে কয়লা এনে সেই কয়লা দিয়ে লোকে আগুন জ্বালায়। কিন্তু তা না ক'রে যদি একেবারে খনির মধ্যেই আগুন ধরিয়ে খনিকে খনি জ্বালিয়ে দেওয়া যায় তবে কি রকম হয় ? বাস্তবিকই এমন সব কয়লার খনি আছে যার আশে-পাশে বারো মাসই আগুন জ্বলে। সে সব খনির লোকেরা সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকে—কখন সে আগুন খনির মধ্যে এসে পড়ে। কোন দিকে যদি খনির দেয়াল একটু গরম হয়, কিম্বা খনির কাছে কোন জায়গা যদি ব'সে-যাবার মত হয়, তবেই হৈচৈ লেগে যায়—"আগুন আস্‌ছে,

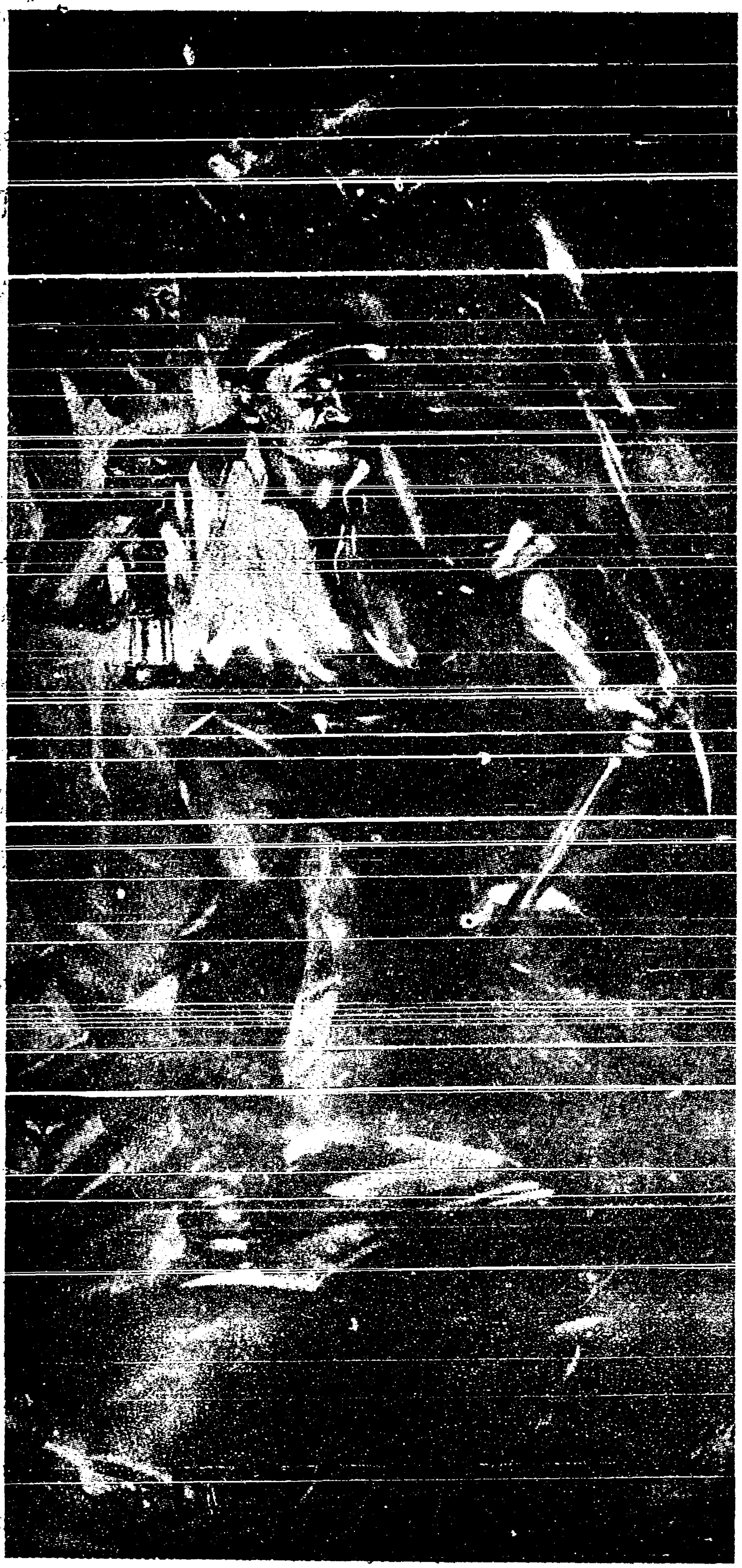

আগুনের সন্ধানে।

আগুন আস্‌ছে"। খনির একদল লোক আছে তাদের কাজ কেবল আগুন তাড়ান। যে দিক দিয়ে আগুন আস্‌ছে বোধ হয়, তারা সেই দিকে ইঁট পাথরের দেয়াল তুলে আগুনের পথ বন্ধ ক'রে দেয়। আগুন তখন বাধ্য হয়ে আর কোন দিক্ ঠেলে তার পথ ক'রে নেয়। কেমন ক'রে কোথা হ'তে আগুন আসে তা সব সময়ে বলা যায় না। মাটির নীচে হয়ত বিশ পঁচিশ মাইল জায়গা জুড়ে কয়লার স্তর রয়েছে—কোথাও ১০০ হাত কোথাও হয়ত পাঁচ হাত মাত্র পুরু। তারই কোনখানে যদি কোন গতিকে আগুন ধরে আর তার আশে-পাশে পাহাড়ের ফাটলে যদি বাতাস যথেষ্ট থাকে—তবেই সে আগুন একেবারে "রাবণের চিতা" হ'য়ে দাঁড়ায়!

খোলা বাতাসে কয়লা যেমন ধূ ধূ ক'রে জ্বলে যায়, মাটির নীচে তেমন হয় না—সেখানে আগুন যেন শামুকের মত আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌তে থাকে। যে দিকে তার পথ খোলা, যে দিকে একটু কয়লা আর বাতাস—আগুন একদিনে হোক এক বছরে হোক্, সে দিকটা দখল কর্‌বেই। অনেক দিন আগে একবার ইংলণ্ডের একটা গির্জ্জা হঠাৎ ব'সে যেতে আরম্ভ কর্‌ল—তার দেয়াল মেঝে সব দেখতে দেখতে

হাঁ করে উঠ্‌ল। এঞ্জিনিয়ার এসে মাটি খুঁড়ে দেখেন ১২ হাত নীচেই কয়লার স্তর আর তাতে আগুন লেগেছে—কয়লা যতই পুড়ে যাচ্ছে, উপরের মাটিও ততই ধ্বসে পড়্‌ছে। তখন পরামর্শ ক'রে সকলে গির্জ্জার মেঝেটা খুঁড়ে প্রকাণ্ড একটা ফুঁটো করলেন। সেই ফুঁটোর মধ্যে প্রায় এক পুকুর জল ঢেলে দেওয়া হ'ল—তারপর মাটি খুঁড়ে লোহার শিক বসিয়ে, তার নীচে দেয়ালের গায়ে দেয়াল তুলে, সবাই ভাব্‌ল "এবারে আগুন জব্দ হ'য়েছে"। কিন্তু সাতাশ বৎসর পরে আবার সেই আগুন কয়লা পুড়িয়ে পুড়িয়ে তিন দিক ঘুরে গির্জ্জার পিছনে এসে হাজির!

অনেক দিন আগে লিভারপুলের কাছে টড্ নদীর ধারে এক কয়লার খনি ছিল। হঠাৎ কেমন ক'রে সেই খনির এক কোণে আগুন লেগে যায়। খনি শুদ্ধ লোক প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও যখন সে আগুন নিভান গেল না, তখন খনির কর্ত্তারা খাল কাটিয়ে টড্ নদীকে খনির মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তাতে তখনকার মত আগুন চাপা পড়্‌ল বটে কিন্তু জলের স্রোত খনির এমন দুরবস্থা করল যে কর্ত্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর যখন কিছু দিন না যেতেই আগুন আবার আর এক দিকে এসে উঁকি মার্‌ল, তখন সকলেই বল্‌লেন আগুন নিভাবার চেষ্টা বৃথা—ওকে কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখ। যেদিকে আগুন আস্‌বার ভয় সেই দিকের কয়লা সরিয়ে ফেল, বড় বড় খাল কেটে দেয়াল তুলে, তার পথ বন্ধ কর। তা হলেই আগুন আর ছড়াতে পারবে না—কদিন বাদে আপনি নিভে যাবে। এই রকমে ছাব্বিশ বছর আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ চল্‌ল। এক দল লোক কেবল ওই কাজেই দিন রাত লেগে রইল; যারা ছোট ছিল তারা প্রায় বুড়ো হ'য়ে এল; খনির পাশে দেয়ালের পর দেয়াল উঠ্‌ল; আগুনের উপর নীচে চার দিকে ঘেরাও হ'য়ে গেল—কিন্তু আগুন কি থাম্‌তে চায়! দেয়াল ভেঙে, পাথর ফাটিয়ে আগুনের শিখা বার বার দেখা দিতে লাগ্‌ল। আগুন বেড়েই চল্‌ল।

এক দিকে যেমন আগুন, আর এক দিকে জল! পাহাড়ের ফাটল দিয়ে টড্ নদীর জল এসে খনির মধ্যে দিন রাত পড়্‌ত—সেই জল পাম্প্ কল দিয়ে ক্রমাগত বাইরে ফেলে দিতে হয়। এক দিন টড্ নদীতে জোয়ার লেগে উপরের মাটি ধ্বসে গিয়ে কবেকার পুরান এক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে খনির ভিতরে হুহু ক'রে জল ঢুক্‌ল। ভাগ্যিস্ তখন খনির মধ্যে লোক ছিল না, গোলমাল শুনে তারা সকলে খনির মুখের কাছে দৌড়ে এল। ব্যাপারটা কি বুঝতে কারও বাকী রইল না; সকলেই বল্‌তে লাগ্‌ল

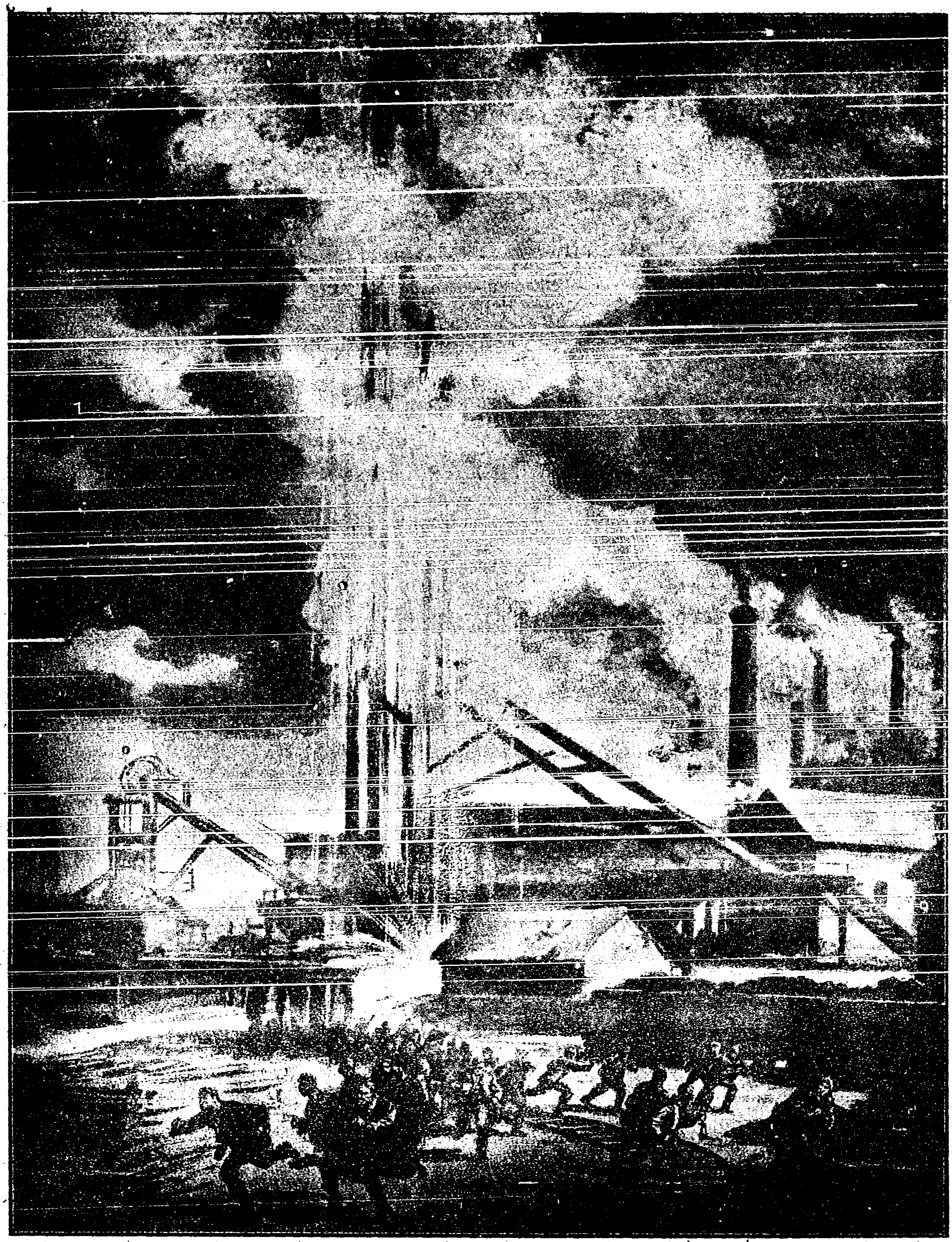

খনির আগুনে নদীর জল পড়ার ফল।

এই জল যদি আগুনে গিয়ে পড়ে, তবে কি হবে? আগুনে জলে যখন দেখা হ'ল তখন কয়েক মিনিট ধ'রে একটা ভয়ানক গর্জ্জন আর যুদ্ধ চল্‌ল—ফুটন্ত জল ফোয়ারার মত দুশো হাত উঁচু হ'য়ে এমন জোরে ছুটে বেরুল যে তার ধাক্কায় খনির মুখের কল কব্জা সব কোথায় উড়ে গেল। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব চুপচাপ! আগুন ঠাণ্ডা হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে খনির দফাও ঠাণ্ডা।

গিরিধির কাছে একটা কয়লার স্তরে আজ ক'বছর হ'ল আগুন ধরেছে। গরমে মাটি ফাটিয়ে পাহাড় তাতিয়ে সে আগুন এখনও জ্বল্‌ছে!

খুকীর বিদ্যা।

পৌষ মাসের সন্দেশে দেখলাম, কা'দের দাদা মশাইয়ের নাকি খুব একটা চাকরী জুটেছে। তাঁর মনিব একটি খুকী। আমিও ঠিক এমনিতর একটি তিন বছরের খুকীর কথা জানি। তার নাম বলব না, কি জানি সে বড় হয়ে চটে, কিন্তু তার 'বিদ্যের' কথা একটু শোন।

খুকী একদিন তার মামাকে বলছে, "মামা! আমি একটা হাতীর শুঁড়ের উপর একটা গরুকে বসিয়ে, এ—ম্নি করে ক'ড়ে আঙুল দিয়ে তুলে ধরেছিলাম!!" আসলে কিন্তু খুকী মিথ্যা কথা বলেনি। ওর খুব ছোট্ট ছোট্ট দুটি পিতলের গাই আর হাতী আছে, তাই সে অমনি করে তুলে ধরেছিল।

আর একদিন খুকী একজনদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে তাদের খুকীর একটি খেলানা ভেঙ্গে এসেছে। সেই কথা নিয়ে তার মা তাকে বল্লেন, "তুমি যে ওদের খেলানা ভেঙ্গে এলে, ওরা যদি তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসে তোমার খেলানা ভেঙ্গে যায়, তা হলে তোমার কেমন লাগবে?" তা শুনে খুকী বল্ল, "আমি আমার পিতলের হাতী আর গরু তাদের খেলা করতে দিব তাহ'লে ভাঙ্‌তে পার্‌বে না।"

খুকী যখন আরো ছোট ছিল, তখন একদিন তার মা তাকে একটা কি জিনিস খেতে মানা করেছিলেন। জিনিসটি খুকী হাতে নিয়ে বসেছে, তার বড় ইচ্ছা, সেটি খায়। কিন্তু মা যে মানা করেছেন, খেলে হয় ত তিনি বকবেন, এর উপায় কি হয়? তখন খুকী তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজে সেই জিনিসটি গিলে ফেল্ল, আর হয় ত ভাবল, মা দেখতে পান নি।

খুঁকী খাসা লুচি বেলতে পারে। দেখলে তুমি বলতে পারবে না যে সে লুচি কোন খুকী বেলেছে। এ কাজের মধ্যে যে তার বেশ একটু বাহাদুরী আছে, খুকী তা বেশ বুঝতে পারে। তবে অবশ্য তার সবখানা লুচিই যে ঠিক গোল হয়, তা নয়। মাঝে মাঝে এক একটার হাত পা নাক মুখও বেরোয়। খুকী তখন বলে, "এই দেখ, কেমন একটা মানুষ লুচি গড়লাম"—যেন সে ঠিক বুঝে শুনেই ইচ্ছা করে ও রকম করেছে।

খুকী যদি পুরুষ মানুষ হত, তবে আমি নিশ্চয় বলতে পারি, ও খুব মস্ত বীর হত। আমাদের বাড়ী থেকে একটা পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। খুকী তার মাকে বলে, "মা, চল পাহাড়ে যাই ; সেখানে বাঘ তাড়িয়ে বেড়াব।"

যুদ্ধের খবর শুনতে খুকী খুব ভাল বাসে। সে জরমানদের উপর বড় বেজায় রকমের চটা। খুকীর এক গাছি লাঠি আছে। একদিন তার মা শুনছেন, সেই লাঠি দিয়ে সে একটা বালিসকে বেদম পিটছে, আর খালি বলছে, "তবু কেন মরছে না ?" "তবু কেন মরছে না ?" মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে মারছ ?" খুকী বল্ল, "জরমান !" বলেই আবার ধাঁই ধাঁই করে মারতে লাগল। সেখানে কার একটা চাদর পড়ে ছিল, মারতে মারতে সেটা একবার খুকীর লাঠিতে জড়িয়ে গেল। তখন খুকী ভারী খুসী হয়ে বল্ল, "এই, চামড়া উঠে এসেছে !"

আর একদিন একটি খুব ছোট্ট খোকা আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। সেই খোকাটির হাতে খুকীর একখানি খেলানা তুলে দেওয়ায় খুকী কাঁদতে আরম্ভ করে, তাতে তার মা বল্লেন, "খোকার বড় দুঃখ হয়েছে, ওর দিদিমা মরে গিয়েছেন।" যেই এই কথা বলা, অমনি নিজের যত খেলনা, সব এনে খোকাটির কোলে চাপিয়ে দিয়ে খুকী 'ভাই, ভাই' বলে তার সঙ্গে খেলা করতে বসল ; সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাকে ছেড়ে গেল না।

আবোল তাবোল।

হাঁড়ি নিয়ে দাড়ি মুখো কে-যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে ব'সে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।
মাথা নেড়ে গান করে, গুণ গুণ সঙ্গীত,
(ভাব দেখে মনে হয় না-জানি কি পণ্ডিত)।
বিড়্ বিড়্ কি যে বকে নাহি বুঝি অর্থ—

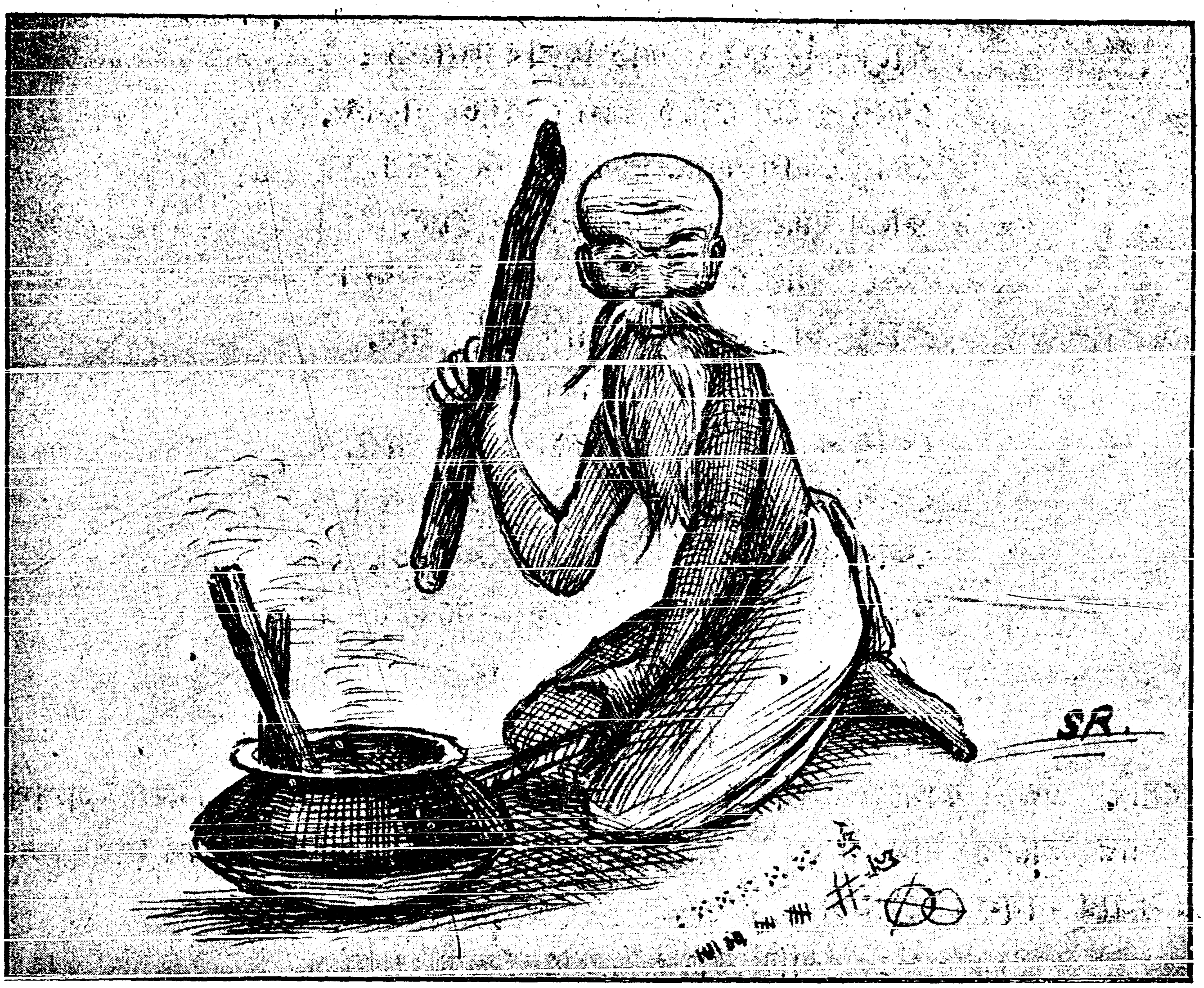

"আকাশেতে ঝুল্ নাই কাঠে কেন গর্ত্ত?"—
টেকো মাথা তেতে ওঠে গায়ে ছোটে ঘর্ম্ম,
রেগে বলে "কেবা বোঝে এসবের মর্ম্ম—
আরে মোলো, যে ব্যাটারা একেবারে অন্ধ,
বুদ্ধির ঢেঁকি যারা নাহি ছিরি ছন্দ।
কোন্ কাঠে কত রস সেদিকেতে মন নাই—
কাঠকে যে কাষ্ঠ কয়, এত বড় অন্যায়!
তারা কি মানুষ? তারা জানে কোন তত্ত্ব?—
পূর্ণিমার রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত্ত?"

আশে পাশে হিজিবিজি আঁকে কত অঙ্ক,
ফাটা কাঠ ফুঁটো কাঠ হিসাব অসংখ্য ;
কোন্ ফুঁটো খেতে ভাল কোন্‌টা বা মন্দ,
কোন্ কোন্ ফাটলের কি রকম গন্ধ।
কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক্ শব্দ,
বলে "জানি কোন্ কাঠ কিসে হয় জব্দ।
কাঠকুটো ঘেঁটেঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
একাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট?
কোন্ কাঠ পোষমানে, কোন্ কাঠ শান্ত,
কোন্ কাঠ টিম্‌টিমে কোন্‌টা বা জ্যান্ত।
কোন্ কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন্ কাঠে কেন থাকে গর্ত্ত।"

মজার নাম।

সেদিন একটা কাগজে লড়াইএর খবর পড়্‌ছিলাম। তাতে অনেক সেনাপতির ছবি আর তাদের নাম ছিল। এর মধ্যে সার্ভিয়াদেশের সেনাপতিদের নামগুলো সব চেয়ে মজার লাগ্‌ল। ২।৩টা নাম শুন্‌বে? শোন,—

রাডিভোজে বজোভোভিক্।
মিহালিলো জিভ্‌কোভিচ্।
মিহালিলো জৌরাচিচ্।

তোমরা হয় ত হাস্‌ছ, কিন্তু তারাও তোমাদের নাম পড়্‌লে নিশ্চয় হাস্‌বে। রুষদের নামগুলো বল্‌তেও অনেক সময় বড় মুস্কিল হয়। একজনের নাম—রোঝ্‌ডেষ্ট্‌ভেন্‌স্কি; আরেক জনের নাম—এ্যাণ্ড্রিই পার্‌ভোজ্‌ভ্যান্নিই। সে দেশের অনেক জায়গার নামও খট মট রকমের। একটা জায়গার নাম—পেট্রোপ্যাভ্‌লভ্‌স্ক্; আরেকটার নাম—নিশ্‌নি নভগোরড্। ওয়েল্‌স্ দেশে একটা গ্রাম আছে,—তার নামের সবটা আমার মনে নাই; তার আরম্ভে আছে—"ল্ল্যান্‌ফেয়ারপুল্‌গুইঙ্গিল," আর শেষে আছে—"হাউইস্কিগগোগচ্।" পুরো নামটা আরও অনেক বড়!

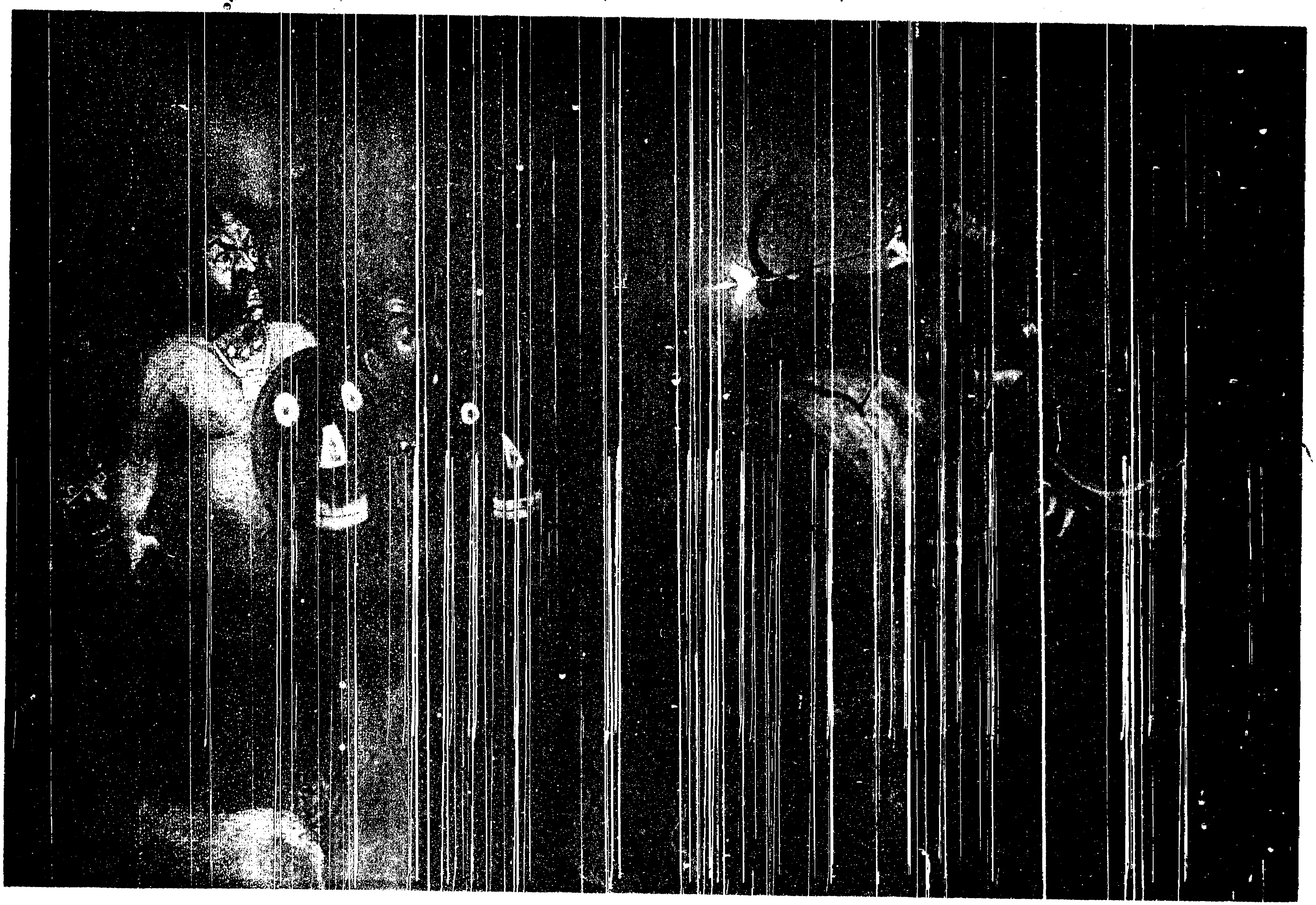

ঋতধ্বজ দানবের ভেঙ্চির ভিড়ের উপর ত্বাষ্ট্র অস্ত্র মারিতেছেন।

দ্বিতীয় বর্ষ চৈত্র, ১৩২১ দ্বাদশ সংখ্যা

দিনের হিসাব।

ভোর না হ'তে পাখীরা জোটে ; গানের চোটে ঘুমটি ছোটে—
চোখ্‌টি খোলো, গাত্র তোলো,—আরে মোলো সকাল হ'লো।
হায় কি দশা পড়্‌তে বসা, অঙ্ক কষা, কলম ঘষা,—
দশটা হ'লে হট্টগোলে দৌড়ে চলে বই বগলে।
স্কুলের পড়া বিষম তাড়া, কাণটি নাড়া বেঞ্চে দাঁড়া,
মরে কি বাঁচে! সমুখে পাছে বেত্র নাচে নাকের কাছে॥
খেল্‌তে যে চায় খেল্‌বে কি ছাই বৈকেলে হায় সময় কি পায়?
খেলাটি ক্রমে যেম্নি জমে দখিনে বামে সন্ধ্যা নামে ;
ভাঙ্‌ল মেলা সাধের খেলা—আবার ঠেলা সন্ধ্যাবেলা—
মুখ্‌টি হাঁড়ি তাড়াতাড়ি দিচ্ছে পাড়ি যে যার বাড়ী।
ঘুমের ঝোঁকে ঝাপ্‌সা চোখে ক্ষীণ আলোকে অঙ্ক টোকে ;—
ছুটি পাবার সুযোগ আবার আয় রবিবার হপ্তা কাবার!

কুবলয়াশ্ব।

পূর্ব্বকালে শত্রুজিৎ নামে অতি বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম ঋতধ্বজ। ঋতধ্বজের গুণের কথা আর কি বলিব। যেমন রূপ তেমনি বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি বিনয়, তেমনি বল, তেমনি বিক্রম। এমন পুত্র লাভ করিয়া রাজা শত্রুজিৎ খুবই সুখী হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ইহার মধ্যে একদিন গালব নামে এক মুনি একটি সুন্দর ঘোড়া লইয়া রাজা শত্রুজিতের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। একটা দুষ্ট দৈত আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে। সে কখনও সিংহ, কখনও বাঘ, কখনও হাতী, কখনও আর কোন জন্তুর বেশে আসিয়া দিবা রাত্র আমাকে অস্থির রাখে ; উহার জ্বালায় আমার তপস্যাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে শাপ দিয়া উহাকে বধ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তপস্যার হানি হয় ; কাজেই আর কি করিব, শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। এমন সময় একদিন এই ঘোড়াটি আকাশ হইতে আমার নিকট পড়িল, আর দৈববাণী হইল যে, 'গালব ! এই ঘোড়াটির নাম 'কুবলয়'। ইহার কিছুতেই ক্লান্তি নাই, সংসারে ইহার অগম্য স্থান নাই, ইহাঁকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ ইহাতে চড়িয়া তোমার শত্রু সেই দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত হইবে।"

"মহারাজ, তাই আমি এই ঘোড়াটি লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার পুত্র যদি ইহাতে চড়িয়া দানবটাকে তাড়াইয়া দেন, তবেই এ ব্রাহ্মণের তপস্যা হয়।"

রাজার আজ্ঞায় তখনই ঋতধ্বজ সেই আশ্চর্য্য ঘোড়ায় চড়িয়া মুনির সঙ্গে তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। তারপর মুনিরা সকলে তাঁহাদের সন্ধ্যাবন্দনা আরম্ভ করিতে না করিতেই সেই দুষ্ট দানব শূকর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মুনির শিষ্যেরা তাহাকে দেখিয়া প্রাণপণে চ্যাঁচাইতে লাগিল। রাজপুত্র তখনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। তাঁহার হাতের অর্দ্ধচন্দ্র বাণের বিষম খোঁচা খাইয়া আর কি দুষ্ট দানব সেখানে দাঁড়ায় ? সে প্রাণের মায়ায় কোন পথে পলায়ন করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পাহাড়ে, বনে, শূন্যে, সাগরে, যেখানে যায়, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া ধনুর্ব্বাণ হাতে সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হন। এই ভাবে চারি হাজার ক্রোশ

চলিয়া শেষে সে একটা গর্ত্তের ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। রাজপুত্রও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই গর্ত্তে গিয়া ঢুকিলেন বটে, কিন্তু সেখানকার সেই ঘোর অন্ধকারের ভিতরে আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

রাজপুত্র সেই গর্ত্তের পথে দানবকে খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আর অন্ধকার নাই, সেখানে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় অতি অপরূপ সোনার পুরী। রাজপুত্র তাহার ভিতরে কতই খুঁজিলেন, কিন্তু দানবকে পাইলেন না। মানুষও সেখানে কেহই ছিল না; ছিল কেবল দুটি মেয়ে। তাহার একটি যে কি সুন্দর, সে আর বুঝাইবার উপায়ই নাই।

এই কন্যার নাম মদালসা, ইঁহার বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু, তিনি গন্ধর্ব্বের রাজা। একদিন মদালসা তাঁহার পিতার বাগানে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। সে অন্ধকার আর কিছুই নহে, উহা পাতালকেতু নামক দুষ্ট দানবের মায়া। দুরাত্মা সেই অন্ধকারের ভিতরে সেই অসহায়া বালিকাকে লইয়া পলায়ন করিল, কেহ সে কথা জানিতে পারিল না, তাঁহার আর্ত্তনাদও কেহ শুনিতে পাইল না। তদবধি সেই দুষ্ট তাঁহাকে পাতালে আনিয়া নিজ বাড়ীতে আটকাইয়া রাখিয়াছে, বলিয়াছে যে, ভাল দিন পাইলেই তাঁহাকে বিবাহ করিবে। ইহার মধ্যে একদিন মদালসা মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিতে যান, তখন সুরভি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে, "বাছা, তোমার কোন ভয় নাই, এই দুষ্ট দানব তোমাকে বিবাহ করিতে পাইবে না। ইহার মৃত্যু যাঁহার হাতে হইবে, তিনিই অবিলম্বে তোমাকে বিবাহ করিবেন।"

রাজপুত্র মদালসার সঙ্গের মেয়েটির নিকট এসকল সংবাদ শুনিতে পাইলেন। মেয়েটির নাম কুণ্ডলা; তিনি একজন তপস্বিনী এবং মদালসার সখী। কুণ্ডলা আরো বলিলেন যে, সেদিন পাতালকেতু শূয়র সাজিয়া মুনিদের আশ্রম নষ্ট করিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে এইমাত্র এক রাজপুত্রের হাতের সাংঘাতিক বাণের খোঁচা খাইয়া আসিয়াছে।

তখন আর ঋতুধ্বজের বুঝিতে বাকি রহিল না যে তিনিই সেই রাজপুত্র, আর পাতালকেতুই তাঁহার সেই দানব। সেকথা শুনিয়া মেয়ে দুটির যে আনন্দ হইল! রাজপুত্রকে দেখিয়াই মদালসার যারপর নাই ভাল লাগিয়াছিল, আর সেজন্য তাঁহার মনে দুঃখও হইয়াছিল যতদূর হইতে হয়। কেন না, ইঁহাকে ত আর পাওয়ার কোন

আশাই নাই, যেহেতু, সুরভি বলিয়াছেন, 'যে দানব মারিবে, সেই মদালসাকে বিবাহ করিবে'—তাঁহার কথা বৃথা হইবার নহে।

যাহা হউক, এখন সে ভয় কাটিয়া গেল, সুতরাং দুঃখের জায়গায় আনন্দ হইল তাহার চতুর্গুণ! তবে আর বিলম্ব কেন? তখনই পুরোহিত তম্বুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পবিত্র আগুন জ্বলিল, ঘৃতের আহুতি পড়িল, মন্ত্রের ধ্বনি উঠিল, শুভকার্য্য শেষ হইল।

তারপর কুণ্ডলা আবার তপস্যা করিতে গেলেন, রাজপুত্র মদালসা সহ সেই আশ্চর্য্য ঘোড়ায় চড়িয়া দেশে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। অমনি পাতাল কাঁপাইয়া ভীষণ চীৎকার উঠিল, "নিয়া গেল রে, নিয়া গেল! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয় তোরা!" তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দানব কোথা হইতে খাঁড়া ঢাল গদা শূল হাতে আসিয়া 'মার, মার!' শব্দে ঋতধ্বজকে আক্রমণ করিল। ঋতধ্বজ তখন করিলেন কি, তাঁহার তূণ হইতে ত্বাষ্ট্র নামক অস্ত্রখানি লইয়া, মারিলেন তাহা সেই দানবের ভেঙ্চির ভিড়ের উপর ছুঁড়িয়া। অমনি দানবের দল চ্যাচাইতে চ্যাঁচাইতে পলকের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, রাজপুত্রও মনের সুখে মদালসাকে লইয়া দেশে চলিয়া আসিলেন। তখন সেখানে না জানি কেমন বাজি বাদ্য আর ভোজের ঘটা হইল! না জানি সকলে কত দিন ধরিয়া কত কি খাইল!

ইহার পর হইতে ঋতধ্বজের নাম হইল কুবলয়াশ্ব। এখন তিনি রাজার আজ্ঞায় প্রতিদিনই সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মুনিদের আশ্রম হইতে দানব তাড়াইয়া বেড়ান। ইহার মধ্যে হইয়াছে কি,—সেই পাতালকেতুর ভাই ছিল তালকেতু, সে বেটা দিব্য একটি শুদ্ধ শান্ত মুনি সাজিয়া, যমুনার ধারে আশ্রম করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে, যেন সে ভারী একটা তপস্বী। কুবলয়াশ্ব ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথে যাইতেছেন, এমন সময় সে চোখ মিট মিট করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "রাজপুত্র! আমার একটা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণা দিবার পয়সা নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার গলার ঐ হারখানি আমাকে দেন, তবে আমার সাধ পূর্ণ হয়!"

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ গলার হার খুলিয়া তাহাকে দিলেন। তখন সে আবার বলিল, "আপনার জয় হোক! এখন তবে আর একটি কাজ যদি করেন,—আমি জলের ভিতরে থাকিয়া বরুণের স্তব করিতে যাইব, ততক্ষণ আমার আশ্রমটির উপরে একটু চোখ রাখিবেন।" রাজপুত্র তাহাতেই সম্মত হইলেন, তালকেতুও চলিয়া গেল। কিন্তু সে

ত তপস্যা করিতে গেল না, সে সোজা সুজি কুবলয়াশ্বের বাড়ীতে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হায়, হায়! ওগো! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! রাজপুত্রকে দানবে মারিয়াছে! মৃত্যুর সময়ে তিনি এই হার আমার হাতে দিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিতে বলিয়াছেন।"

কুবলয়াশ্বের হার দেখিয়া আর কাহারও একথায় অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না। তখন দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল; সে দারুণ সংবাদ সহিতে না পারিয়া মদালসা প্রাণত্যাগ করিলেন।

ততক্ষণে সেই দুষ্ট তালকেতু আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কুবলয়াশ্বকে বলিল, "আহা! আপনি আমার বড়ই উপকার করিলেন। আপনি এখানে থাকায় আমি প্রাণ ভরিয়া যজ্ঞ করিয়াছি! এখন তবে আপনি ঘরে ফিরিয়া যাউন।"

একথায় রাজপুত্র তথা হইতে চলিয়া আসিলে, দুষ্ট ঘরে বসিয়া হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল। ক্রমশঃ।

বলোদর।

দেবতার কান্নার শব্দে দেবকন্যারা সকলে ছুটে এসে মাঠে উপস্থিত হলেন। রাণী পাগলের মত হয়ে সকলকে বলতে লাগলেন, "ওগো তোমাদের পায় পড়ি, তোমরা সেই 'হেলার' দেশে গিয়ে তার হাতে পায় ধরে আমাদের বলোদরকে ছাড়িয়ে আন। তাকে ছেড়ে সংসার কি করে চলবে?"

সেই ভয়ঙ্কর দেশে যাবার কথায় দেবতাদেরও প্রাণ কেঁপে উঠল। সকলেই বলেন, "কে যাবে?" কিন্তু কেউ এগোয় না। শেষে হারমোদ বলে বলোদরের এক ভাই বল্লেন, "আমি যাব।" তিনিও সেই আট পেয়ে ঘোড়া না হলে যেতে পারবেন না। সেটি হচ্ছে রাজার নিজের ঘোড়া, তিনি ভিন্ন আর কেউ তার উপর উঠতে গেলে সে তখনি ঝেড়ে ফেলে দেয়। আজ কিন্তু বলোদরের দুঃখে তার সে রাগ চলে গেছে, সে নিজে থেকে পিঠ পেতে দিয়ে হারমোদকে তুলে নিয়ে চল্ল।

তখন রাজা বল্লেন, "আর তোমরা কি দেখ্‌ছ? এখন বলোদরের চিতা সাজাও। বড় বড় গাছ কেটে আন গে, চিতাটি যেন আমার বলোদরের যোগ্য হয়।"

সেখানকার এই নিয়ম,—সে চিতা সাজান হবে বলোদরের নৌকার উপরে। কাঠ দিয়ে সেই নৌকার উপরে চিতা করে, গালিচা দিয়ে, নিশান দিয়ে, ফুল দিয়ে, মালা দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, মণি মুক্তা অলঙ্কার দিয়ে তাকে সাজান হল! তারপর বলোদরের

দেহ মহামূল্য আভরণে ঢেকে, সেই চিতার উপর রেখে, এক একজন করে সকলে তার নিকট বিদায় নিতে এলেন। বলোদরের স্ত্রী 'নান্না'ও এলেন। মাথা হেট করে ধীরে

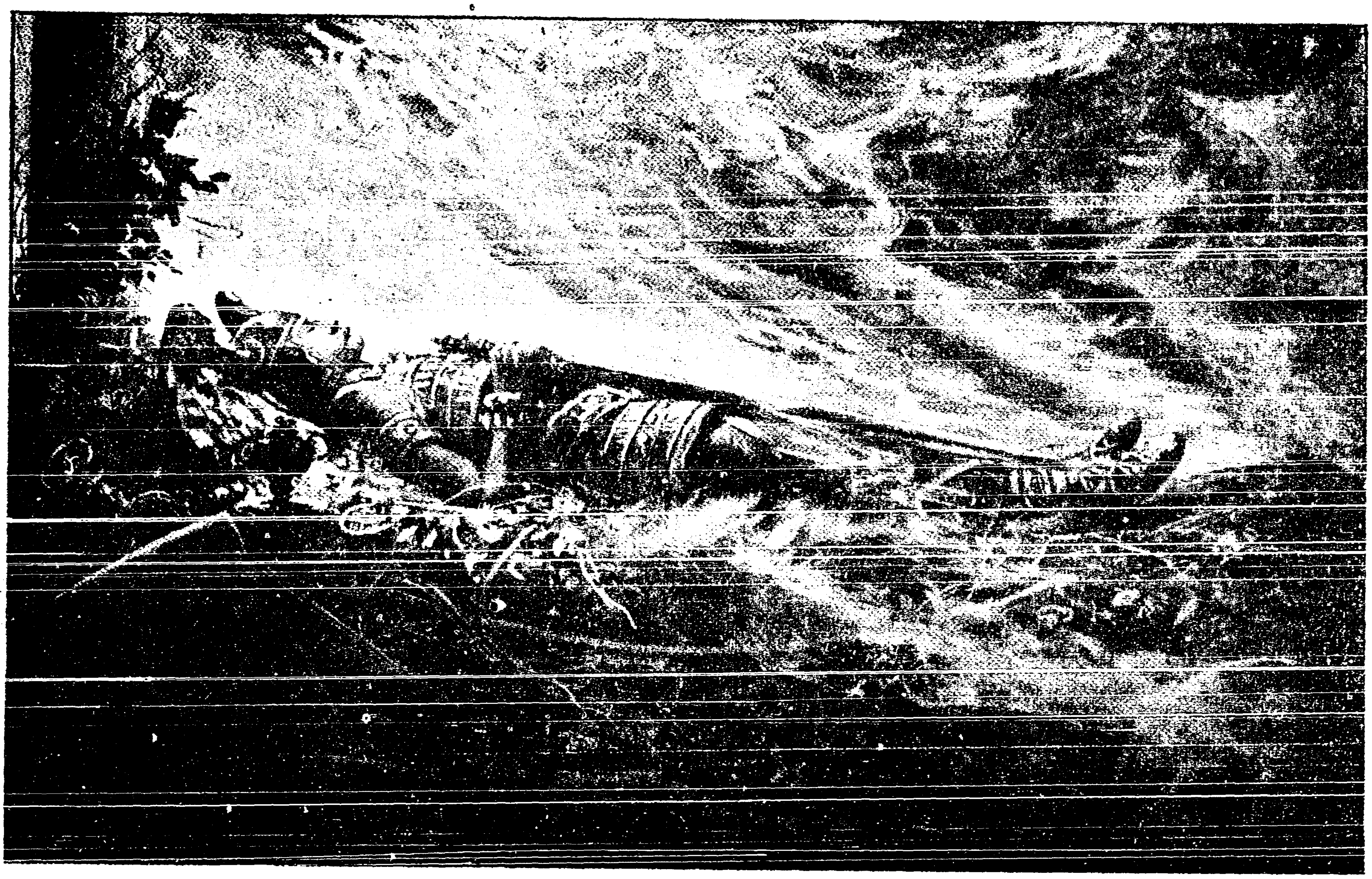

বলোদরের মৃত্যু।

ধীরে এসে তিনি চিতার পাশে দাঁড়িয়ে বলোদরের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন ; অমনি তাঁর প্রাণটি তাঁর দেহ ছেড়ে সেই বলোদরের নিকট চলে গেল, অসাড় দেহখানি শুধু সেখানে পড়ে রইল।

ক্রমে সকলেরই বিদায় নেওয়া শেষ হল। তখন চিতায় আগুন ধরিয়ে দেবতারা নৌকাখানিকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু সে নৌকা সেই বিশাল চিতার ভারে মাটিতে এমনি বসে গিয়েছিল, যে সকলে মিলে প্রাণ পণ করেও তাকে নাড়তে পারলেন না।

দূরে, পর্ব্বতের উপরে দানবেরা বসে এতক্ষণ তামাসা দেখছিল। তারা এখন কাছে এসে দেবতাদের বল্ল, "বড্ড ভারী হয়েছে, তোমরা পারবে না। 'রক্ষিণী' নামে দানবী

আছে, তাকে ডেকে নিয়ে এস, সে একলাই নৌকা নামিয়ে দিবে।” দেবতারা তখনই একটা দানবকে রক্ষিণীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন, তার খানিক বাদেই সে ভীষণ এক নেকড়ের পিঠে চড়ে এসে বল্ল, “তোরা কি চাস্?” দেবতারা বল্লেন, “এই নৌকাটা আমরা নামাতে পারছি না, তুমি যদি নামিয়ে দাও।” রক্ষিণী বল্ল, “আচ্ছা, তোরা আমার কুত্তাটাকে ধর্, আমি নৌকা নামিয়ে দিচ্ছি!”

কিন্তু দেবতাদের সকলের চেয়ে ষণ্ডা, সকলের চেয়ে রোখা চারটে পালোয়ান এসেও সেই নেকড়েকে ধরে রাখতে পারল না। শেষে রক্ষিণী এসে সেটাকে চেপে ধরে তার হাত পা বেঁধে দিল। তখন যে তারা তার দড়ি ধরে টেনে রেখেছিল, সেও অনেক কষ্টে।

তারপর রক্ষিণী গিয়ে সেই নৌকা ধরে খুব জোরে এক ঠেলা দিতেই সেটা ঘড় ঘড় শব্দে এমনি ভয়ঙ্কর বেগে গিয়ে জলে নামল যে তাবৎ পৃথিবী তাতে কেঁপে উঠল, দেবতারা ঘুরে পড়তে পড়তে অনেক কষ্টে থেমে গেলেন। তাতে আবার তাঁদের কেউ কেউ চটলেনও খুব।

সেই চিতা জ্বলতে জ্বলতে সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চল্ল। ত্রিভুবন তার আলোতে লাল হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ একবার সকল দিক আঁধার করে চিতা শুদ্ধ নৌকাখানি ডুবে গেল, আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। দেবতারা সেই অন্ধকারের ভিতরে ঘরে ফিরে আসতে আসতে ভাবলেন, না জানি এর পর আর কি বিপদ হবে।

এদিকে হারমোদ সেই আটপেয়ে ঘোড়ায় চড়ে শত শত বাধা বিপদ পার হয়ে অনেক কষ্টে গিয়ে সেই হেলার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন। পথে সেই রামধনুকের সেতু পার হবার সময় শুনে এসেছেন যে খানিক আগেই বলোদর আর নান্নাকেও সেই পথে যেতে দেখা গিয়েছে। এখন তাঁর মন বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে,—কখন গিয়ে তিনি বলোদর আর নান্নাকে দেখতে পাবেন। কিন্তু এর মধ্যে ভারি এক মুস্কিল উপস্থিত। হেলায় ফটক বন্ধ, কি করে ভিতরে যাবেন? হারমোদ তখন ঘোড়া থেকে নেমে খুব করে তার জিনের বাঁধন এঁটে নিলেন, তারপর আবার তার উপর উঠে এক চাবুক মারতেই সেই আট পেয়ে আশ্চর্য্য ঘোড়া তড়াক করে ফটক ডিঙ্গিয়ে গেল!

ভিতরে গিয়ে হারমোদ দেখলেন যে তখনো ভোজের ঘটা চলেছে। বলোদর আর নান্নাও সেখানে রয়েছেন, কিন্তু বলোদরের মুখ মলিন, খাবার উৎসাহ তাঁর নাই।

হারমোদ বল্লেন, "আমি তোমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।" বলোদর বল্লেন, "সে আশা অতি কম। আমাকে এইখানে চিরদিন থাকতে হবে। তুমি নান্নাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও; এ স্থান তার বাসের যোগ্য নয়।" কিন্তু নান্না কিছুতেই বলোদরকে ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না।

তারপর হারমোদ হেলার সিংহাসনের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বিনয় করে তাকে বল্লেন, "হে রাণী, দোহাই তোমার! স্বর্গের রাজার এই মিনতি, দয়া করে আমাদের বলোদরকে ছেড়ে দাও!"

হেলার রাজ্যে হারমোদ।

হেলা ভ্রূকুটি করে গম্ভীর হয়ে সে কথা শুনলেন, তারপর বল্লেন, "সংসারের চেতন অচেতন সকল বস্তুই যদি তোমাদের বলোদরের জন্য কাঁদে, তবে তাকে নিয়ে যেতে পার।"

হারমোদ হাসতে হাসতে সেই আশার সংবাদ নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। বলোদরের জন্য কে না কাঁদবে? দেবতারা তাঁর কথা শুনে তখনই চারি দিকে দূত পাঠিয়ে দিলেন; তারা গিয়ে সকলকে ডেকে বল্ল, "ওগো, তোমরা বলোদরের জন্য একটু চক্ষের জল ফেল।" সে কথা যে শুনল সেই কাঁদতে লাগল। মাটি অবধি ভিজে গেল,

পাথর অবধি নরম হয়ে গেল। কাঁদল না খলি এক হতভাগী বুড়ী। সে এক অন্ধকার গর্ত্তে থাকে, তাকে কাঁদতে বলতেই সে ছুটে গর্ত্তের ভিতরে গিয়ে হাসতে হাসতে বল্ল "আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে না বাপু!"

দেবতারা অনেক আশা করে ছিলেন, দূতেরা এসে বলবে যে সকলেই বলোদরের জন্য কেঁদেছে। কিন্তু হায়! যখন তারা ফিরে এসে সেই বুড়ীর কথা বল্ল, তখনই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে আর ইহজীবনে বলোদরের মুখ দেখতে পাবেন না।

সেই বুড়ী আর কেউ নয়, সে ছিল সেই দুষ্ট দেবতা লোকি।

হাতী।

আমাদের দুটো করে হাত আছে, বানরের আছে চারটে। কিন্তু আমাদের কেউ হাতী বলে না, হাতী বলে, যার একটাও হাত নাই, তাকে। আমার অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেছে, তবু যা আছে, হাতীর ততগুলো নাই। কিন্তু আমি দন্তী হতে পারলাম না, দন্তী হল হাতী।

হাতী যা দিয়ে হাতের কাজ করে, সে হচ্ছে তার নাক। সেটি যে কি আশ্চর্য্য জিনিস, তা তোমরা সকলেই জান। তাকে যদি হাত বলতে রাজী হও, তবে এ কথাও মানতে হবে যে, এমন আশ্চর্য্য হাত আর জগতে নাই। আর হাতীর দাঁতের কথা ভেবে দেখ, সে জিনিসটিও কম আশ্চর্য্য নয়। এই আশ্চর্য্যের খাতিরেই বোধ হয় ঐ দুটি নাম দেওয়া হয়ে থাকবে।

এখন আমরা হাতীর ঘাড়ে চড়ে বেড়াই, কিন্তু আমাদের উচিত তাকে মান্য করে চলা, কেন না, এক কালে সে এই পৃথিবীর রাজা ছিল। তখন মানুষের জন্ম হয় নি, আর কুমীরের বাদসাই চলে গেছে। সেই সময়ে ছোট বড় শত শত রকমের হাতী মনের আনন্দে এই পৃথিবীময় চরে বেড়াত। এখন আমরা মোটে দু রকমের হাতী দেখতে পাই,—আমাদের দেশের হাতী, আর আফ্রিকার হাতী। কিন্তু সে কালে নানা রকমের হাতী ছিল। কোনটার চার দাঁত,* কোনটার দুই দাঁত; কোনটার দাঁত উপরের চোয়ালে, কোনটার দাঁত নীচের চোয়ালে; কোনটার শুঁড় লম্বা,

* আমি বড় বড় মূলোর মত দাঁতগুলোর কথাই বলছি। এ ছাড়া অবশ্য হাতীর কসে আরো দাঁত আছে।

কোন্‌টার শুঁড় ছোট্ট ; কোনটার রোঁয়া নাই, কোনটা রোঁয়ায় ভরা ; কোনটার বাড়ী গরম দেশে, কোনটার বাড়ী বরফের দেশে।

আমাদের দেশে এক রকম পুরাণো হাতীর হাড় পাওয়া গিয়েছে, তার একেকটা দাঁত প্রায় চৌদ্দ ফুট লম্বা ছিল। কলিকাতার যাদুঘরে গেলে এই হাতীর হাড় দেখতে পাওয়া যায়। সে যে কত কালের পুরাণো হাড়, সেকথা আর এখন ঠিক করে বলবার উপায় নাই। সে হাড় এখন পাথর হয়ে গেছে। পণ্ডিতেরা এসব হাড় পরীক্ষা করে দেখেছেন, সেগুলো ঠিক আজকালকার হাতীর হাড়ের মত নয় ; সুতরাং এই হাতী-গুলো ছিল একটু ভিন্ন রকমের। তাই ওদের একটা নূতন নাম দেওয়া হয়েছে,—'ষ্টেগোডন্ গণেশ'!

আরেকটা হাতীর নাম হয়েছে 'ডাইনোথীরিয়ম্'। ইউরোপে এর অনেক হাড় পাওয়া গেছে ; আমাদের দেশেও নাকি কিছু কিছু পাওয়া গেছে, শুনেছি। এর দাঁত দুটি ছিল নীচের চোয়ালে ; একটু বেঁটে গোছের আর নীচের দিকে বাঁকান।

আর একটার ছিল চারটে দাঁত, দুটো উপরে, দুটো নীচে। পণ্ডিতেরা একে বলেন 'ম্যাষ্টোডন্'।

সাইবিরিয়ার বরফের ভিতরে আরেক রকম হাতী পাওয়া গিয়াছে, তার নাম হয়েছে 'ম্যামথ্'। এর কিনা বরফের উপরে চলাফেরা করতে হত, কাজেই তার গায় মুনিদের দাঁড়ির মত লম্বা লম্বা রোঁয়া ছিল। মাঝে মাঝে এসকল হাতীর আস্ত শরীর পাওয়া যায়, তাতে এখনো মাংস চামড়া আর লোম রয়েছে ; বরফের মধ্যে থাকায় কিছু পচতে পায় নি। পুরাণো হাতীর মধ্যে এগুলোই হচ্ছে সকলের চেয়ে নূতন। মানুষের জন্মের পরেও এরা বেঁচে ছিল (আমার বোধ হয় ম্যাষ্টোডনও ছিল)। সাবেক মানুষের হাতের আঁকা এদের ছবি পাওয়া গিয়াছে।

হাতী ভারী হুঁসিয়ার জন্তু। সে জানে যে তাঁর দেহখানি অনেক মণ ভারি, নরম জমিতে তার পা বসে যেতে পারে। তাই পথের অবস্থা ভাল মতে পরীক্ষা না করে সে কখনো চলে না। কোন জায়গায় হুছট খেলে, সেকথা চিরকাল মনে করে রাখে। লোকে বলে, 'হাতীরও পিছলে পা।' তার মানে এই যে নিতান্ত সতর্ক লোকেরও মাঝে মাঝে ভুল চুক হয়। হাতীর পা পিছলাতে তোমরা দেখেছ ? আমি দেখেছি!

ভাল মতেই দেখেছি, কেন না আমরা কয়েকজন তখন তার পিঠের উপরে ছিলাম।

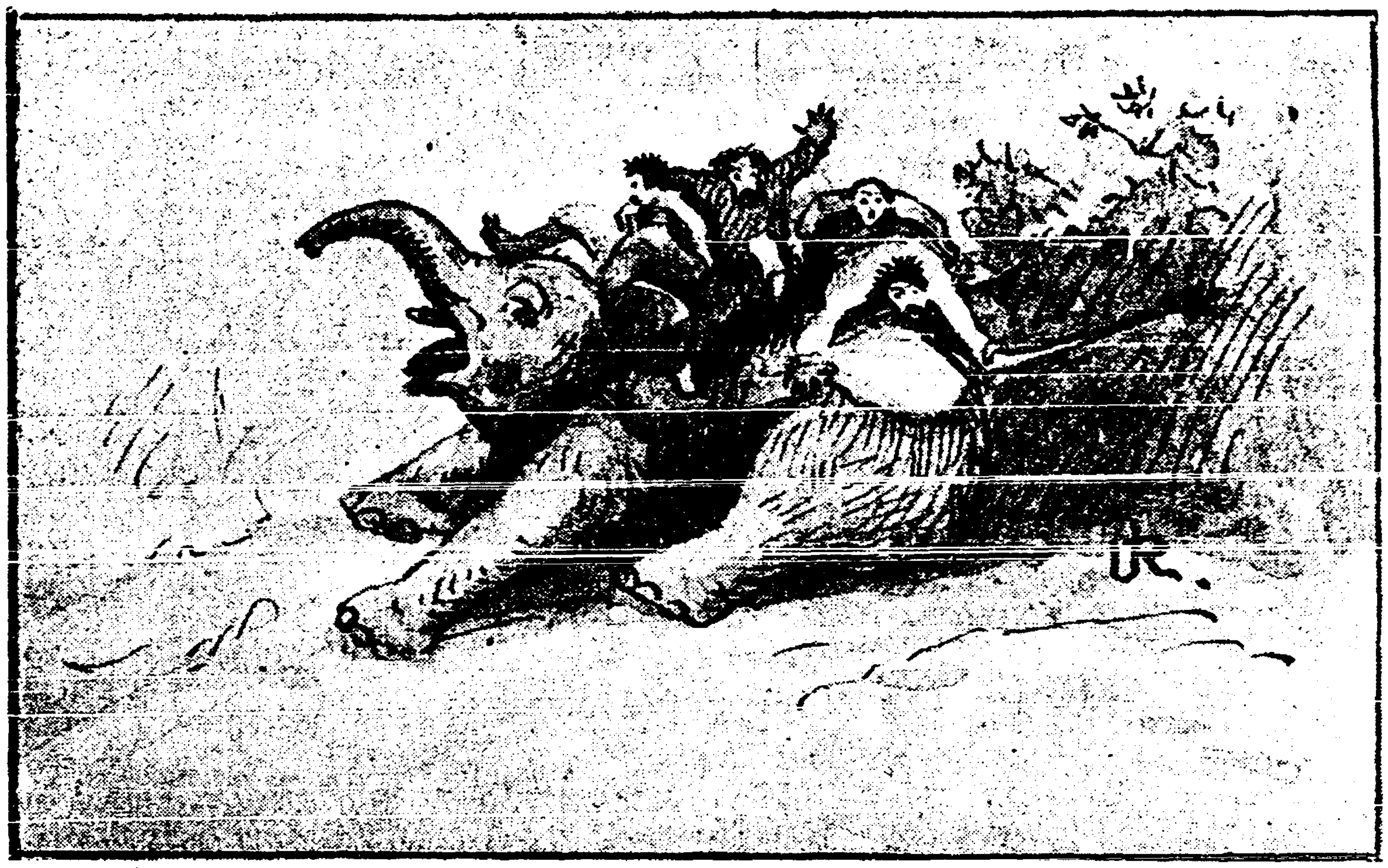

আর, পিঠের উপরে ছিলাম বলেই, আর কতকটা অন্ধকার রাত ছিল বলেও, আসল ব্যাপারখানা যে কি হয়েছিল তা বুঝতে পারি নি। তবে, এইটুকু বলতে পারি যে হাতীটা বসে পড়েছিল, গড়ায় নি, তাই এই গল্পটি আজ তোমাদের শোনাবার অবসর পাচ্ছি। এটা যে নিতান্তই একটা হাসির ব্যাপার হয়েছিল; সেকথা তোমাদের মানতেই হবে, যদিও ঠিক সেই সময়টাতে আমাদের আদপেই সেকথা খেয়াল হয়নি।

আর হাসির ব্যাপার হয়, যখন কপি কল দিয়ে হাতীকে জাহাজে তোলে। শূন্যে লট্‌কে থাকতে আমারও তেমন ভাল লাগে না, একথা আমি সরল ভাবে বলছি। হাতী নাকি তখন বড্ড বেজায় রকমের চ্যাঁচায়, তা ছাড়া আরো অনেক কাজ করে তার কথা লেখার দস্তুর নাই।

আর হাসির কাণ্ড হয়, হাতী যখন হাঁচে। এক একটা মানুষের হাঁচি শুনে চল্লিশ হাত দূরে থেকে চমকে উঠতে হয়, হাতীর হাঁচির ত কথাই নাই। হাঁচবার আগে সে কেমন একটু ব্যস্ত আর জড়সড় হয়, তারপর একবার চ্যাঁচায়, তারপর হাঁচে। তখন, যে তার অর্থ বোঝে সেও ভারী আশ্চর্য্য হয়, আর যে বোঝে না, তার ত প্রাণই উড়ে যায়।

হাতী ভারী বুদ্ধিমান; মাহুতের কত কথাই তার বুঝে চলতে হয়। 'বৈঠ্' বল্লে বসে, 'ধৎ' বল্লে থামে, 'মাইল্' বল্লে দাঁড়ায়, (আর খুব হুঁসিয়ার হয়), 'দেলে' বল্লে ধরে, 'ভরি' বল্লে ছাড়ে, 'পিচ্ছো' বল্লে হটে, 'জুগ্' বল্লে মাথা নোয়ায়, 'থেরে' বল্লে শোয়, 'হৈ' বল্লে সরে, 'বোল্' বল্লে চ্যাঁচায়, 'ডোগ্' বল্লে ডিঙ্গায়, 'মার্' বল্লে মারে।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অত বড় জানোয়ার এতটুকু মানুষের ধোকায় পড়ে কেন এত নাকাল হতে যায়? ওকে যে ফাঁকি দিয়ে ধরে, তার কথা শুনলে হাসিও পায়, দয়াও হয়। দুঃখের বিষয়, আজ আর সেকথার জায়গা নাই।

জিম্মী।

জেম্‌সের বয়স এখন পোনের বছর হয়েছে, কিন্তু সে কাজ করে ঠিক এর দ্বিগুণ বয়সের লোকের মত। চাষারা ত ক্ষেত বাছবার সময় তাকে পেলে যেন বেঁচে যায়। তারা বলে যে, জিম্ নিজে ত আর সকলের চেয়ে বেশী কাজ করেই, তার দেখা দেখি অন্য মজুরদের কাজও খুব এগোয়। জিমের মুখে গল্প শুনতে তাদের বড্ড ভাল লাগে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ করে জিমের সামিল থাকতে না পারলে সেটি হবার যো থাকে না। কাজেই সকলকেই একটু চট্‌পটে হতে হয়। চাষাদের পক্ষে এটা বিলক্ষণ লাভের কথা, তাই তারা কিছু বেশী মাইনে দিয়ে হলেও জিম্‌কে নিয়ে যায়।

আর সেই ট্রাট্ সাহেব ত আছেনই। কোন জায়গায় একটী নূতন ঘর করতে হলেই তাঁর জেম্‌স্‌কে চাই। একবার জেম্‌স্‌দের বাড়ী থেকে মাইল দশেক দূরে, ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড সহরের কাছে এক ক্ষারওয়ালার বাড়ীতে জেম্‌স্‌কে নিয়ে তিনি একটা ঘর করতে গেলেন। ক্ষারওয়ালার কাজ হচ্ছে, কয়লা জ্বাল দিয়ে তা থেকে সাজিমাটি তয়ের করা; কাজেই একটু নোংরা। চাষারা কাঠ পুড়িয়ে কয়লা করে সেই কয়লা ক্ষারওয়ালার নিকট বেচতে আনে; ক্ষারওয়ালা বড় বড় কড়ায় করে সেই কয়লার গুঁড়ো ফুটিয়ে সাজিমাটি বানায়।

জেম্‌স্ ত গিয়েছে ক্ষারওয়ালার ঘর তয়ের করতে; সেই লোকটির তাকে দেখে এতই ভাল লেগেছে যে সে আর কিছুতেই তাকে ছাড়তে চায় না। সে বলে, "আমার ঠিক তোমার মত এমনি ভাল একটি লোকের দরকার; আমি তোমাকে মাসে চৌদ্দ ডলার করে দিব।" কাজেই শেষটায় জেম্‌স্‌কে তার মার অনুমতি নিয়ে এসে এই চাকরীতে ভর্ত্তি হতে হল।

ক্ষারওয়ালার নাম বার্টন্। লেখা পড়ার ধার ধারে না, চাল চলন ও বেয়াড়া। কিন্তু জেম্‌স্‌এর উপরে সে ভারী সন্তুষ্ট, আর তাকে নিজের ছেলের মত ভাল বাসে। জেম্‌স্‌ও ঠিক বার্টনের নিজের ছেলের মত করেই তার কাজ দেখে। অনেক ধূর্ত্ত চাষা

কম কয়লা দিয়ে বেশী পয়সা নিয়ে বার্টন্‌কে ঠকাত, জেম্‌স্‌ আসাতে সে সব বন্ধ হয়ে গেল। এ কাজটা যে জেম্‌স্‌র খুব ভাল লাগত, তা নয়, কিন্তু তার কোন কাজেই অবহেলা করার অভ্যাস ছিল না।

দিনের বেলায় জেম্‌স্‌ এমনি করে বার্টনের ব্যবসা দেখত, সন্ধার পর বার্টনের মেয়ের কাছে থেকে বই নিয়ে পড়ত। এর সবই গল্পের বই; চোরের গল্প, বম্বেটিয়ার গল্প, নাবিকদের গল্প। এ ধরণের বই আর জেম্‌স্‌ কখনো পড়েনি। বিশেষতঃ নাবিকদের গল্পগুলি তার এতই ভাল লাগত যে সে তার আগাগোড়াই সত্যি মনে করে ভাবত বুঝি নাবিক হওয়ার মত সুখের কাজ আর জগতে নাই।

এর মধ্যে এক দিন হয়েছে কি,—রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর জেম্‌স্‌ বৈঠকখানার এক কোণে বসে গল্প পড়ছে, বার্টনের মেয়ে আরেক কোণে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। জেম্‌স্‌ তার গল্পে মগ্ন, সে বুঝতে পারেনি যে তার ঘরে থাকাটা ওরা পছন্দ করে না; এর মধ্যে বার্টনের মেয়ে বলে উঠল, "মাইনের চাকরের গিয়ে এখন ঘুমিয়ে থাকলেই ভাল হয়!"

এ কথার পর অবশ্য জেম্‌স্‌ আর সে ঘরে রইল না, কিন্তু সে রাত্রে সে ঘুমাতে পারল না। 'মাইনের চাকর!' একথা কি সহ্য হয়? জেম্‌স্‌ এমন একটা কিছু হতে চেষ্টা করবে, যাতে আর কেউ তাকে 'মাইনের চাকর' না বলতে পারে। পরদিন সকালে উঠেই সে তার ছোট্ট পুঁটুলিটি বগলে করে বার্টনের কাছে গিয়ে বল্ল, আমি আর কাজ করতে পারব না, আমার মাইনেটা চুকিয়ে দিন।" বার্টনের মাথায় ত আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, কিন্তু সে অনেক মিনতি করে, অনেক লোভ দেখিয়েও জেম্‌স্‌কে রাখতে পারল না।

সে দিনই মধ্যাহ্নে জেম্‌স্‌ তার মার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে ছাপ্পান্ন ডলার বুঝিয়ে দিল, আর বার্টনের মেয়ে যে তাকে 'মাইনের চাকর' বলেছে, সে কথাটিও তাঁকে জানাতে ভুল্‌ল না। তারপর কথায় কথায় সে তাঁকে বল্ল, "মা, আমি নাবিক হব!" সে কথা শুনে তার মা যেমন আশ্চর্য্য হলেন, চিন্তিত হলেন তার চেয়েও বেশী। তিনি বল্লেন, "বাবা, তুমি আর যা খুসী হও, কিন্তু নাবিক কখনো হয়ো না।" কাজেই জেম্‌স্‌ তখন চুপ করে গেল, কিন্তু তার নাবিক হওয়ার সাধ তেমনি রইল!

এরপর মাস দুয়ের জন্য জেম্‌স্‌ তার এক আত্মীয়ের নিকট কাজ করে। সেখানে এই সময়ের মধ্যে একশ বোঝা কাঠ কেটে সে পঞ্চাশ ডলার পায়।

যেখানে দাঁড়িয়ে সে কাঠ কাটত, সেই স্থানটি ছিল ইরাই হ্রদের ধারে। হ্রদের জলে শত শত নৌকা পাল খাটিয়ে ভেসে বেড়াত দেখে জেম্‌সের মনে নাবিক হওয়ার বাতিক আবার জেগে উঠল। কত সময় সে গাছ কাটতে কাটতে কুড়ুলখানি রেখে এক দৃষ্টে সেই নৌকাগুলির পানে তাকিয়ে রয়েছে, আর ভেবেছে যে একদিন সেও ঐ হ্রদে এমনি করে ভেসে বেড়াবে।

জেম্‌সের বিশ্বাস ছিল যে সে রোজ সকলের চেয়ে ঢের বেশী কাঠ কাটতে পারে। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল যে একজন জর্ম্মানও তার সমান কাঠ কাটে। জর্ম্মানটি সারা দিন ধরে ক্রমাগতই তার কাজ করে যেত, আর জেম্‌স্ কাজ ছেড়ে নৌকার তামাসা দেখে অনেক সময় নাশ করত। এই ঘটনা থেকে জেম্‌সের বিশেষ একটা উপকার এই হল যে, তদবধি আর সে কাজ রেখে তামাসা দেখতে যেত না।

এই কাজের পর আর একজন কৃষকের কাজ করে জেম্‌সের চার মাস চলে গেল। কোন কাজেই সে অবহেলা করত না, কিন্তু এখন থেকে সকল কাজের মধ্যেই তার মনে সেই নাবিক হওয়ার সাধটি জেগে থাকত। জেম্‌স্ এ সম্বন্ধে তার মাকে আর কোন কথা বলেনি, কিন্তু তাঁর মত বুদ্ধিমতী মেয়ের একথা জানতে বাকি রইল না। তারপর শেষে একদিন জেম্‌স্ নিজেই তাঁকে বল্ল যে, "মা, আমার নাবিক হতে কি ইচ্ছা যে হচ্ছে, তা তোমায় কি বলব! কোন একটা জাহাজে একবার কাজ নিয়ে দেখব কি?"

মা আর কি করেন? বেশী বাধা দিলে পাছে তার আরো জেদ চড়ে যায়, কাজেই তিনি এইটুকু রাজি হলেন যে ইরাই হ্রদে কোন একটি জাহাজে জেম্‌স্ কিছু দিন কাজ করে দেখবে। জেম্‌সের ত তখন আর আনন্দের সীমাই রইল না, সে দিন কতকের মধ্যেই তার পুঁটুলি নিয়ে ক্লীভল্যাণ্ডের জাহাজঘাটে গিয়ে উপস্থিত হল! গিয়েই প্রথমে যে জাহাজখানি সামনে পেল, তাতে উঠে তার একটি মাল্লাকে জিজ্ঞাসা করল, "আরো লোক চাই?" মাল্লাটি বল্ল, "এখনি কাপ্তান ভিতর থেকে আসবেন।"

এ কথায় জেম্‌স্ খুব খুসী হয়ে সেখানে একটু বসেছে, এমন সময় জাহাজের ভিতরে একটা ভয়ানক তোলপাড় শুনে মাল্লা বল্ল, "ঐ তিনি আসছেন!" আর তখনি একটা মাতাল টল্‌তে টল্‌তে আর বক্‌তে বক্‌তে এসে উপস্থিত হল; তার মুখে বিকট মদের গন্ধ, তার কথাগুলি ভয়ানক অসভ্য। জেম্‌স্ তাকে সবে বলেছিল, "আপনার কি আরো লোক চাই?" অমনি সে বিষম চটে দাঁত খিঁচিয়ে বল্ল, "চাই ত তোর কি রে

বেটা ? বেরো এখান থেকে, নইলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিব !” এরপর সে যা তা গাল দিতে দিতে এমনি ঘুঁসি তুলেছিল যে কি বলব। ভাগ্যিস্ জেম্‌স্ আর সেখানে দাঁড়ায় নি, নইলে নাবিক হওয়ার মজা ভাল মতেই দেখত। জাহাজ থেকে ছুটে পালাতে পালাতে অনেক দূর অবধি সে তার গাল শুনতে পেয়েছিল।

আর জেম্‌সের নাবিক হওয়া হল না। সে অনেক দূর এসে খালের ধারে কতগুলো কাঠের উপর বসে ভাবছে, এমন সময় কে তাকে ডাকল, “জিম্! জিম্!” জেম্‌স্ আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে দেখল, য়্যামস্ লেচার একটা নৌকা থেকে তাকে ডাকছে। সম্পাদক য়্যামস্ জেম্‌সের ভাই হয় ; ছেলে বেলা থেকে দুজনে খুব ভাব। য়্যামস্ ঐ নৌকার কাপ্তান ; সেইখানে মাল বয়ে বেড়ায়, সঙ্গে কয়েকজন মাঝি মাল্লা আর নৌকা টানবার জন্য খচ্চর আছে।

জেম্‌স্ তখনি বারো ডলার মাইনায় য়্যাম্‌সের খচ্চরওয়ালা নিযুক্ত হল। তারপর দু তিন মাস য়্যামসের কাজে বেশ আমোদেই কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে জেম্‌সের বেতন ১২ থেকে ১৮ ডলার অবধি উঠেছিল। নৌকাখানির নামটি ছিল চমৎকার— ‘সাঁজের তারা’! য়্যামস্‌ও লোকটি ছিল খুবই ভাল। সে এর আগে কিছু দিন ইস্কুলের মাষ্টারী করে, কাজেই তার বিশ্বাস ছিল যে সে একটা ভারী পণ্ডিত লোক। জেম্‌স্‌কে পরীক্ষা করার জন্য কত প্রশ্নই সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ; বানান, ভূগোল, পাটিগণিত, ব্যাকরণ কিছুই বাকি রাখেনি। জেম্‌স্ তার সব কথায় উত্তর দিয়ে তারপর যখন উল্টে তাকে পরীক্ষা করতে গেল, তখন বেচারা আর কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না ! তখন থেকে জেম্‌সের উপর ভারী শ্রদ্ধা হল।

য়্যামসের মাঝি মাল্লারা গোঁয়ার গোছের লোক ছিল ; মদ আর তামাক নইলে তাদের চলতই না। কথায় কথায় তারা মারামারি করত। একদিন জেম্‌সের হাত থেকে একটা দড়ি ফসকে গিয়ে মার্ফি বলে তাদের একজনের টুপী উড়িয়ে দেয়। মার্ফি তাতে বেজায় চটে ষাঁড়ের মত তেড়ে জেম্‌স্‌কে মারতে এল। মার্ফি ৩৫ বছরের গাট্ঠা জোয়ান, সে ভেবেছিল জেম্‌স্‌কে খুব নাকাল করবে, কিন্তু জেম্‌সের এক গুঁতো খেয়ে সে নিজেই গাড়াগাড়ি যেতে লাগল। তখন জেম্‌স্ তাকে এমনি চেপে ধরল যে, আর তার উঠবার যো রইল না। য়্যামস্ বল্ল, “বেটাকে মার !” কিন্তু জেম্‌স্ তাতে রাজী হল না। সে শুধু বল্ল, “হয়েছে, মার্ফি ?” মার্ফি বল্ল “হাঁ, হয়েছে !” সেই থেকে দুজনে ভাব হয়ে গেল। জেম্‌স্ ছেলে মানুষ হলেও সেই গোঁয়ার লোকগুলি তাকে

খুব মান্য করে চলত, আর যারপরনাই ভালও বাসত। অন্য নৌকার মাঝিদের কাছে তারা জেম্‌সের ভারী সুখ্যাত করত।

য়্যাম্‌সের কাছে থাকার দু তিন মাসের মধ্যে জেম্‌স্ প্রায় চৌদ্দবার জলে পড়ে। নিজের কাজের দিকে সে এতই মন দিত যে সকল সময় নিজকে বাঁচিয়ে চল্‌বার দিকে তার খেয়াল থাকত না। একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেই সে একটা দড়ি নিয়ে নৌকা বাঁধবার জন্য প্রস্তুত হতে গেল। চোখের ঘুম তখনো যায় নি, এর মধ্যে দড়িটা গিয়েছে কেমন করে নৌকার পালে আটকে। সেটাকে নিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে বেচারা জলে পড়ে গেল, কেউ তা টের পেল না। জেম্‌স্ সাঁতার জানত না কাজেই সে ভাবল, এবারে নিশ্চয় মৃত্যু। এমন সময় হঠাৎ কেমন করে সেই দড়ির আগাটি এসে তার হাতে ঠেকল, আর তাই ধরে অনেক কষ্টে সে এসে আবার নৌকায় উঠল। উঠেই তার এই চিন্তা হল যে, 'দড়িটা ত নৌকায় বাঁধা ছিল না, তবে কি করে কোথায় সেটা আটকাল, যার দরুন তাকে ধরে আমার নৌকায় এসে উঠা সম্ভব হল?' সে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই সেই দড়িকে আর নৌকায় আটকাতে পারল না। তখন তার একথা মনে হল যে ভগবান ভিন্ন আর কেহ এ কাজ করেনি। অমনি তার মার কথাও মনে হল; তিনি রোজ তার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন।

এরপর জেম্‌সের ভয়ানক জ্বর হওয়ায় তাকে কাজ ছেড়ে চলে অসতে হল। আসবার সময় য়্যাম্‌স্ তাকে বল্ল, "ভাই, তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের মাঝি মাল্লার কাজে জীবন নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না; তুমি ভাল করে লেখা পড়া শিখ।"

তারপর সেই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে রাত প্রায় এগারটার সময় জেম্‌স্ নিজেদের ঘরের সামনে এসে পৌঁছাল। এতদিনের মধ্যে মাকে একখানা চিঠি লেখেনি, লিখবার অবসরও বেশী পায়নি। আজ তাঁর কথা ভেবে জেম্‌সের মন বড় অস্থির হয়েছে। ঘরের কাছে এসে জানালা দিয়ে সে ভিতরে উঁকি মারল, মা হাঁটু গেড়ে যোড় হাতে ভগবানকে ডাকছেন; বলছেন, "হে ভগবান, চেয়ে দেখ, দয়া কর, বল দাও! তোমার এই দাসীর সন্তানকে রক্ষা কর!" সে কথা শুনে আর জেম্‌স্ থাকতে পারল না, সে অমনি ছুটে গিয়ে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে পড়ল। ক্রমশঃ

আরশির কথা।

তোমরা ধূম্রলোচনের কথা শুনেছ? রাম রাবণের যুদ্ধের সময় ধূম্রলোচনকে নিয়ে ভারী মজা হয়েছিল। ছেলেবেলায় এই রাক্ষস অনেক দিন ধরে ঘোরতর তপস্যা করে। তাতে তুষ্ট হয়ে যখন দেবতা বর দিতে এলেন, তখন সে এই বর চাহিল যে, "আমি যার মুখ দেখ্‌ব, সেই যেন ভস্ম হয়ে যায়!" দেবতা 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন, ধূম্রলোচনও খুব খুসী হয়ে দেশে রওয়ানা হল। তার আগেই সে ঠিক করে রেখেছে যে, "এখন ঘরে গিয়ে চোখ বেঁধে রাখতে হবে, কেন না, এখন আমি যার মুখ দেখব, সেই ত ভস্ম হয়ে যাবে!" সেই থেকে সে আর কারু মুখের পানে তাকায় না, দিন রাত চোখে ঠুলি বেঁধে বসে থাকে।

যুদ্ধের সময় সেই ধূম্রলোচনকে নিয়ে রাক্ষসেরা রামলক্ষ্মণকে ভস্ম করতে এসেছিল। দূরে থেকে সেই চক্ষে ঠুলিবাঁধা রাক্ষসটাকে দেখে রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি হে, বন্ধু?" বিভীষণ বল্লেন, "এটা ধূম্রলোচন। বড় সর্ব্বনেশে লোক! ও এসে একটিবার আমাদের মুখের পানে তাকালেই আমরা ভস্ম হয়ে যাব!" যা হোক, ধূম্রলোচনকে আর কাউকে ভস্ম করবার অবসর দেওয়া হল না। সে খুব ভরসা করেই রামলক্ষ্মণের সামনে এসে চোখের ঠুলি খুলেছিল। সে জান্‌ত না যে এর মধ্যে তাঁরা সকলে নিজ নিজ মুখ আরশি দিয়ে ঢেকে বসে আছেন! রাক্ষস তার চোখের ঠুলি খুল্‌তে মাত্রই সেই আরশির ভিতরে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখতে পেল, আর অমনি—বুঝতেই পার!

তবেই দেখ, যুদ্ধের সময় আরশিতে মাঝে মাঝে কেমন কাজ দেয়! গ্রীসের ইতিহাসে আর্কিমিডিস্ নামক পণ্ডিতের কথা আছে; তিনি একবার আরশি দিয়ে রোদ ফেলে শত্রুদের তাঁবু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্যি, একখানা সাধারণ আরশি দিয়ে এ কাজ করা যায় না। কিন্তু সরার মতন আরশির মাঝখানটা নীচু থাকলে, সেই আরশি দিয়ে এমনি করা ভারী সহজ। সাধারণ আরশিও অনেকগুলি হলে, তার প্রত্যেকটি দিয়ে যদি ঠিক একটি জায়গায় এনে রোদ ফেলা যায়, তবে তাতেও আগুনের কাজ হতে পারে। কড়ার তলায় এমনি ভাবে রোদ ফেলে লুচি ভেজে খেতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ইচ্ছা হলে তোমরাও চেষ্টা করে দেখতে পার। আয়োজনের মধ্যে শুধু আমাদের

এই 'সন্দেশের' আধখানার মত বড় ৩০।৩২ খানা আরশি লাগবে, আর অবশ্য, রোদটিও বেশ একটু চন্ চনে গোছের চাই।

কড়াখানি বসবে ৫।৬ হাত উঁচুতে, আরশি কখানি থাকবে মাটির উপরে। সেই যে হাতার মত বাঁটওয়ালা কড়া থাকে, সে হলে খুবই সুবিধা। কড়ার নীচটা ফাঁপা থাকা চাই, নইলে তার তলায় রোদ ফেলা যাবে না; তাই বাঁটওয়ালা কড়ার কথা বলছি। ফ্রাইপ্যান্ হলেও চলতে পারে, বিশেষতঃ যদি এলুমিনিয়মের হয়।

মনে কর যেন দোতলার বারান্দায় কড়াখানি বুদ্ধিপূর্ব্বক রাখা হয়েছে, আর ওঠানে একটা টেবিলের উপরে আরশিগুলো সাজান গিয়েছে, আর প্রত্যেকটি আরশির নীচে এক একটি কাদার ডেলা আছে। এখন এক একখানি করে আরশি তার কাদার আসনখানির উপরে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তা দিয়ে ঠিক কড়ার তলায় নিয়ে রোদটিকে ফেলে, আরশিখানাকে একটু চেপে বসিয়ে দিতে থাক। সব কখানি আরশি এমনি ভাবে বসিয়ে প্রত্যেকটির রোদ নিয়ে কড়ার তলায় ফেলতে পারলেই, উনুন ধরান হয়ে গেল। ততক্ষণে ঘী অবশ্য এসেছে, লুচিও বেলা হয়েছে; অতঃপর কি করতে হবে তাও ত জানই। এমনি ভাবে আরশি দিয়ে রোদ ফেলে নাকি আজ কাল বড় বড় কল চালান হচ্ছে।

আজকালকার যুদ্ধেও আরশির কাজ নিতান্ত কম হয় না। রোদে আরশি চম্‌কিয়ে এক পাহাড়ের উপর থেকে ২০।২৫ মাইল দূরে আরেক পাহাড়ের লোকের সঙ্গে অবধি কথা বলা যায়। যে দিকে সোজা সুজি নজর চলে না, আরশি দিয়ে সে দিকের জিনিসও দেখা সম্ভব হয়। যুদ্ধের সময় একটা কিছুর আড়ালে না বসলে গুলি খেয়ে মরতে হবেই, অথচ আড়ালে বসে শত্রুর গতিবিধি দেখবার সুবিধা কম। এমন স্থলেও আরশিতে কাজ দেয়। তা ছাড়া, আজকাল যে ডুবুরী জাহাজের (Submarine) কথা শোনা যায়, তারা ত জলের নীচে থাকে, অথচ তাদেরও পথ দেখা আর কোন্‌দিক দিয়ে কে যাচ্ছে তার খবর নেওয়া চাই। সে কাজটি তাদের আরশি দিয়েই করতে হয়।

আর বাবু লোকেরা যে চুল ফেরান্, তাও আরশি নইলে হবার যো নাই। যারা চলন সই বাবু, তাদের মুখের সামনে একখানা সাধারণ আরশি রাখলেই চলে। কিন্তু যাঁরা উঁচু দরের বাবু তাঁদের সাধারণ আরশিতে কুলায় না। তাঁদের এমন আরশি চাই, যাতে মাথার চারদিকই এক সঙ্গে দেখা যেতে পারে।

আরশির যে কত কাজ, সে আর কি বলব ? এই যে সন্দেশের ছবিগুলো; এগুলি তয়ের করতেও আরশি চাই, নইলে ছাপাতে গিয়ে সব ছবি উল্টো হয়ে যেত। আরশির ভিতরে যে বইয়ের ছবি দেখা যায়, তার লেখা পড়ে দেখেছ কি ? যদি না দেখে থাক, তবে এই বেলা দেখে নাও ; তা হলে বুঝতে পারবে যে আরশির ভিতরে সব জিনিসেরই উল্টো ছবি পড়ে। তোমার ডান হাতখানিকে আরশির মধ্যে বাঁ হাতের মত দেখবে। আর, লেখা দেখবে ঠিক ছাপাখানার সীসের অক্ষরগুলোর মত উল্টো, অর্থাৎ, এমনি—

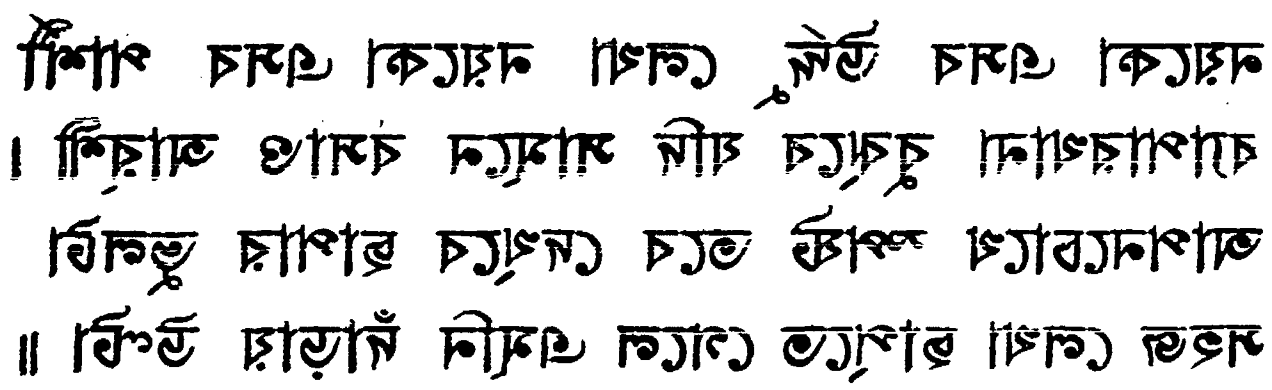

সীসের অক্ষরগুলো যদি উল্টো না হত, তা হলে প্রেসে বই ছাপতে গিয়ে তার লেখা হয়ে যেত এমনি তর উল্টো। তাই টাইপও উল্টো করে গড়তে হয়, ছবিও উল্টো করে খুদতে হয়। অর্থাৎ ছবির ফটোখানি আরশির ভিতর দিয়ে উল্টো করে তুলতে হয়। তোমরা হয় ত জান যে, এ সব ছবি হাতে খোদা নয়, এও এক রকম ফটোরই মত। তার কথা বাড়িয়ে বলবার এখন সময় নাই। এখন শুধু এইটুকুই আমি বলতে চাচ্ছি যে, এ সব ছবি খুদবার আগে আরশি দিয়ে তাকে উল্‌টিয়ে নিতে হয়।

এই আরশি বিজ্ঞান চর্চ্চায় লাগে, চিকিৎসায় লাগে, অণুবীক্ষণে লাগে, দূরবীক্ষণে লাগে, আর মুখ দেখতে ত লাগেই। আরশিখানি ঠিক সমান হলে মুখখানি তাতে দেখায় ভাল। সরার মত গর্ত্তপানা হলে তাতে মুখের চেহারা কাছে থেকে মস্ত আর দূরে থেকে ছোট, আর উল্টো দেখায়, আর সরার পিঠের মত উঁচু হলে তাতেও মুখখানি দেখায় ছোট্ট কিন্তু উল্টো নয় ; চোঙ্গার মত হলে দেখায় সরু আর লম্বা। আর যদি আরশিখানার কোথাও উঁচু কোথাও নীচু থাকে, তাতে মুখ দেখায় ভারী বিকট। সে মুখ একবার দেখলে আর হাসি থামিয়ে রাখা যায় না।

অনেক জানোয়ারকে আরশি দেখালে সে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যায়, আবার কেউ কেউ বড্ড চটেও। আমি বসে লিখছি, আমার পাশে দেয়ালে একখানা আরশি ঝুলছে। একটা চড়াই বার বার এসে এই আরশিতে তার ছবি দেখে সেটার

সঙ্গে যুদ্ধটা যে করে! সে ভাবে ওটা আরেকটা চড়াই। বেটা এমনি ইষ্টুপিড্,—কি যেন খেয়েছে, তা হজম কর্ত্তে পারেনি, তাইতে আমার আরশিখানির দফা একেবারে নিকাশ করে দিয়েছে। পেট রোগা বলেই বুঝি ওর অত রাগ! ও রকম লোকের মেজাজ খিটখিটেই হয়ে থাকে। একবার একটা বানরকে একখানি ছোট্ট আরশি দিয়েছিলাম। সে আরশিখানাকে মুখের সামনে ধরে কত রকম উৎকট ভেঙ্চিই কাটল! আর একটা বানর আরশির ভিতরে তার ছবি দেখে, সেটার

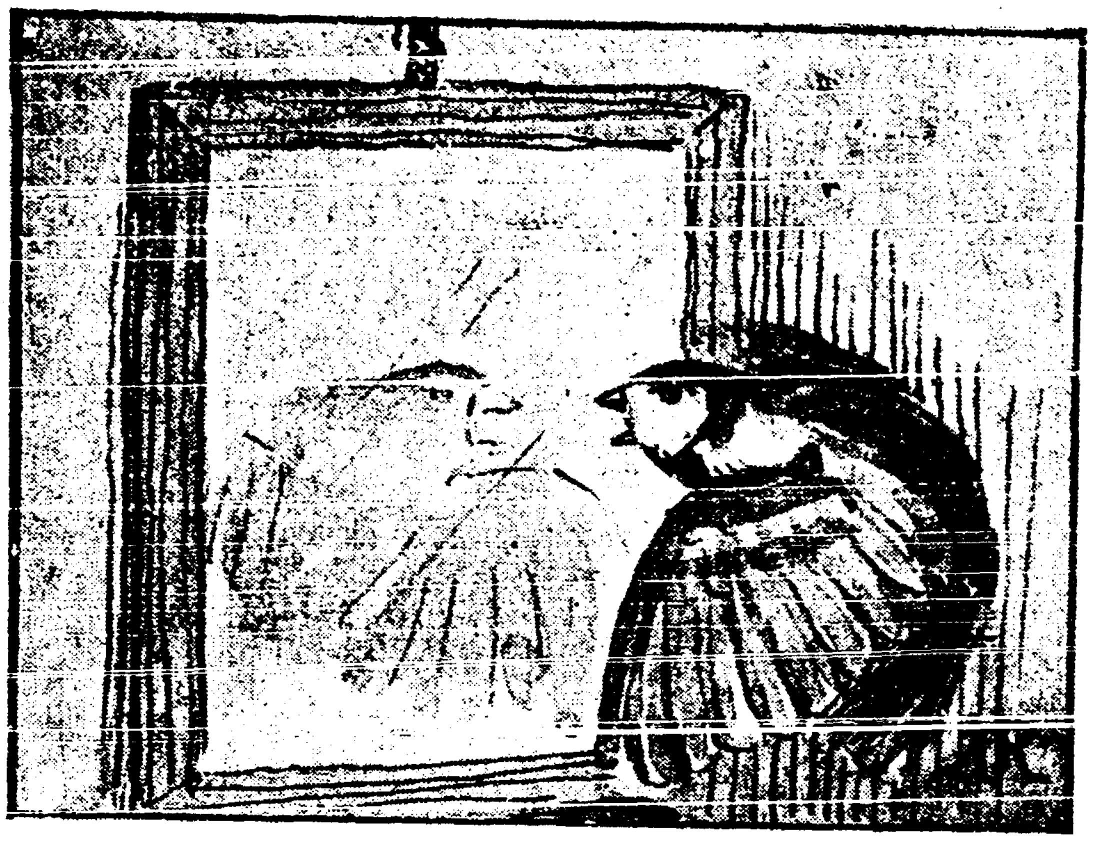

আরশি ও চড়াই।

সঙ্গে ভাব করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। প্রথমে সে কত রকম করে তাকে ধরতে চেষ্টা করল। আরশির সামনে এসে তাকে উঁকি মেরে দেখে, আবার অমনি ছুটে আরশির পিছনে যায় তাকে ধরতে। তাতে তাকে না পেয়ে, আরশির সামনে বসেই আরশির পিছনে হাত বাড়িয়ে তাকে খোঁজে।

আমাদের একটি বন্ধুর বাড়ীতে এক যোড়া ময়ূর ছিল, তার একটি হঠাৎ মরে যায়। তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত অন্য ময়ূরটি তাঁদের একটা আরশির সামনে দাঁড়িয়ে কত বিলাপই করত! সে ভাব্ত, ঐ আরশির ভিতরে তার সঙ্গিনী দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রাহ্মণ ও চামার।

কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ ও এক চামার উপযুক্ত মূলধন নিয়ে কোন এক বন্দরে ব্যবসায় কর্ত্তে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণটী চাউল কিনে গোলাজাৎ করে রাখ্‌বেন এবং চামার চামড়া কিনে ধ'রে রাখ্‌বে, বছরের মধ্যে যখন এই সকল জিনিসের বাজার মাগ্গি হবে তখন বিক্রী করা হবে।

সেই বন্দরে একজন ব্রাহ্মণ বাস কর্ত্তেন, তিনি খুব ভাল লোক, লোকেরা তাঁকে "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ" বল্‌তো। যে ব্রাহ্মণ ও চামারের কথা আগে বলেছি তারা দুজনই এই বন্দরে নূতন এসেছে, তাদের থাক্‌বার অসুবিধা দেখে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তাদের নিজের বাড়ীতে যত্ন করে জায়গা দিলেন। তিনি, ব্রাহ্মণকে ঘরের মধ্যে খেতে দিতেন আর চামারকে বাইরে উঠনে দিতেন কিন্তু দুজনকেই সমান যত্ন কর্ত্তেন এবং একই জিনিস খেতে দিতেন। সুধু ঘরে খেতে দেওয়া আর উঠনে দেওয়া ভিন্ন আর কোনও তফাৎ কর্ত্তেন না।

ব্রাহ্মণ সস্তাদরে অনেক টাকায় চাউল কিনে গোলা করে রাখ্‌লেন, চামারও খুব সস্তায় অনেক চামড়া কিনে একটা গুদামে ধ'রে রাখ্‌লো। দুজনই তাদের জিনিসের পাহারা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত লোক রেখে আপনাদের দেশে চ'লে গেল। কয়েক মাস পরে যখন চাউল ও চামড়ার বাজার চড়্‌বে তখন এসে বিক্রী কর্‌বে, তখন যথেষ্ট লাভ পাবে।

ছয় মাস পরে ব্রাহ্মণ ও চামার তাদের জিনিস বেচবার জন্য সেই বন্দরে ফিরে এসে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হ'লো, কেন না তারা সেখানে খুব আদর যত্ন ও সম্মান পেয়েছিল। তিনিও খুব সমাদরে অতিথি দুজনকে আপনার বাড়ীতে স্থান দিলেন।

এবারে কিন্তু একটা ভারি নূতন রকমের কাণ্ড হ'লো। আহারের সময় এবারে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ মহাশয় চামারকে ঘরের বারেন্দায় খেতে দিলেন এবং ব্রাহ্মণের জন্য বাইরে উঠনে পাতা ক'রে দিলেন। ব্রাহ্মণ ত এই ব্যবহার দেখে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌লো এবং সেই গৃহস্থকে যা খুসী তাই ব'লে তিরস্কার কর্ত্তে লাগ্‌লো। ব্রাহ্মণ বল্লে, "তুমি কখনও ব্রাহ্মণ নও, শুধু তা নয় তুমি বোধ হয় হিন্দু ও নও, গুপ্তবেশী ম্লেচ্ছ হবে, নতুবা ব্রাহ্মণের এতদূর অপমান্ কর্ত্তে হিন্দু কখনও সাহস করে না। তুমি ভণ্ড, তুমি পাষণ্ড, তুমি ভয়ঙ্কর দস্যু। এই ব্যবহারে তোমার রৌরব নরক হবে। আমি

ব্রাহ্মণ, পৈতে ছুঁয়ে তোমাকে শাপ দিচ্ছি, এই পাপে তুমি সবংশে নির্ব্বংশ হবে, তুমি' ধনে প্রাণে মারা যাবে।”

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হাতজোড় ক'রে বিমর্ষভাবে সেই ব্রাহ্মণ অতিথির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণের তিরস্কারে কিম্বা অভিশাপে তিনি বিমর্ষ হন নাই, কিন্তু অতিথি যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন এইটাই তাঁর সমস্ত দুঃখের কারণ হয়েছিল। কেন না শাস্ত্রে আছে যে, গৃহস্থের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বপ্রযত্নে অতিথির সেবা কর্‌বে, আর অতিথির কর্ত্তব্য এই যে কোনও প্রকারে গৃহস্থকে উদ্বিগ্ন কি ব্যতিব্যস্ত কর্‌বে না। আজ অতিথিকে অসন্তুষ্ট দেখে তাঁর মনে বড়ই ক্লেশ হ'লো কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যবহার করেছেন তার কারণ জান্‌তে না পাল্লে ব্রাহ্মণের অসন্তুষ্ট হওয়ারই কথা, তাই তিনি কর-জোড়ে অতি মিষ্ট কথায় বিনয় ক'রে বল্লেন, “মহাশয়, ক্ষমাই ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম। আমি আশা করি, কেন আমি এবারে আপনাকে উঠনে ও চামারকে ঘরের বারাণ্ডায় খেতে দিয়েছি তা জান্তে পাল্লে আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না। আমি ঠিক কাজই করেছি, আমার নিবেদন শুনুন—

“প্রথম বারে আপনারা যখন এসেছিলেন তখন আপনি এসেছিলেন চাউল কিন্‌তে আর এই চামার এসেছিল চামড়া কিন্‌তে। তখন আপনার মনের ইচ্ছা এই ছিল যে চাউল খুব সস্তা হোক্‌, আর এই চামারের মনের ইচ্ছা ছিল মোষ গরুর মধ্যে খুব মড়ক লাগুক তা হলেই চামড়া খুব সস্তা হবে। সুতরাং আপনার মনের অবস্থা ছিল তখন ব্রাহ্মণের মতন আর এই চামারের মনের অবস্থা ছিল চামারের মতন, তাই আপনাকে ঘরে খেতে দিয়ে আমি চামারকে বাইরে দিয়েছিলাম। এখন আপনাদের মাল বিক্রয়ের জন্য আপনাদের মনের অবস্থা ঠিক বিপরীত হয়েছে। চামার প্রার্থনা কচ্ছে যে, এখন যেন মড়ক না লাগে, তা লাগ্‌লে ওর চামড়ার দর হবে না; আর আপনি আশা কচ্ছেন যে চাউলএখন খুব দুর্ম্মূল্য হোক, এমন কি আকাল হলেই খুব ভাল হয়, তাতে আপনার চাউলের দর খুব বেড়ে যাবে। সুতরাং আপনার মনের ভাব এখন চামারের মতন হয়েছে। এই জন্যই আমি চামারকে ঘরের বারাণ্ডায় দিয়ে আপনাকে উঠনে দিয়েছি। আমি আপনার দেহ দেখে বিচার করিনি, মন দেখে বিচার করেছি।”

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কথা শুনে ব্রাহ্মণের চক্ষু স্থির হয়ে গেল, সে দেখলো যে সত্য সত্যই টাকার লোভে সে চামার হয়ে গিয়েছিল। লজ্জায় তার মুখ মলিন হয়ে গেল; সে মনে কল্লে, “যেরূপ ব্যবসায় মন এতটা মলিন হতে পারে, ব্রাহ্মণের,—

সুধু ব্রাহ্মণের কেন, যারা ভাল হতে চায় এমন কোনও লোকেরই—তেমন ব্যবসায় করা উচিত নয়। লোকেরা মনে করে কারবারে ভাল হলেই হলো, কিন্তু অনেক সময়ে কারবারে যে চামারের অপেক্ষাও মনটা ছোট হয়ে যায় তা অনেকেই ভাবে না।” এইরূপ চিন্তা ক'রে সেই ব্রাহ্মণ—তার সমস্ত চাউল গরীব দুঃখীদের বিতরণ করে ফেল্লে। তখন সত্য সত্যই আকাল উপস্থিত হয়েছিল, অনেক লোক খেতে পাচ্ছিল না, ব্রাহ্মণের চাউল পেয়ে অনেক গরীবের প্রাণ বাঁচলো। এই সকল দেখে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ এই ব্রাহ্মণকে বুকে জড়িয়ে ধল্ল, দুজনই কোলাকুলী ক'রে আনন্দে চক্ষের জলে ভেসে গেল।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ।

গুপী গাইন।

তোমরা গান পাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান

গাইতে পার তা। তার নাম ছিল গুপী কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন, তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপী কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির করে বলত গুপী 'গাইন'।

গুপী যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব করেই গাইত; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে বসে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গাইত, তখন মাঠের যত গরু, সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁস নিয়ে

তাড়া করতে সেই ছুটে মাঠে চলে গেল ; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতরে গিয়ে খুব করে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপীদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার সখ ছিল। বাজাতে বাজতে সে বিষম দুলতে থাকত, আর মাথা নাড়ত আর চোখ পাকাত; আর দাঁত খিঁচাত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ করে থাকত, আর বলত, “আহা! আ-া-া !! অ-অ-অ-হ্-হ্-হ্ !!!” শেষে যখন সে ‘হাঃ, হাঃ, হা-া-হ্ !’ বলে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত ‘বাঘা পাইন’। তার এই ‘বাঘা’ নামই রটে গিয়েছিল ; আসল নাম যে তার কি, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা করে ঢোলক ভাঙ্‌ত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না! কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বল্ল, “তুমি না পার, না হয় আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পয়সাটা দি’। আমাদের গ্রামে এমন একটা” ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে?” শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা করে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দিবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনী খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছিঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে তিন হাত চওড়া, আর ছাউনী মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যারপর নাই খুসী হয়ে বল্ল, "আমি দাঁড়িয়ে বাজাব!"

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিন রাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিন কতক এই ভাবে চল্‌লে কি হত বলা যায় না, এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বল্ল, "লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!"

বাঘা আর কি করে? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দু দিন না থাকতে থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় করে বলে 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না, আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, "আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চলে যাওয়াই ভাল। না হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে।" এই বলে বাঘা তার ঢোলটিকে ঘাড়ে করে বনে চলে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দুরে থাক, সে বনে বাঘ ভালুক কিছু নাই। আছে খালি একটা ভারী ভয়ানক জানোয়ার; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায়নি, শুধু দূরে থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থর থরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো! ওটা এলেই ত আমার ঢোলক শুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু আর কেউ নয়, সে গুপী গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে ভয়ে কাঁপে, সে গুপীরই গলা ভাঁজা। গুপীও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মত ভয়ে কাঁপে। শেষে সে একদিন ভাবল, "এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।" এই ব'লে গুপী চুপি চুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায়

করে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গুপী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে হে?"

বাঘা বল্ল, "আমি বাঘা বাইন, তুমি কে?"

গুপী বল্ল, "আমি গুপী গাইন। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

বাঘা বল্ল, "যেখানে একটু জায়গা যোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গান বাজনা বোঝে না, তাই ঢোলকটি নিয়ে বনে চলে এসেছিলাম। তা ভাই, এখানে যে ভয়ঙ্কর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না, তাই পালিয়ে যাচ্ছি।"

গুপী বল্ল, "তাই ত! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বল ত তুমি সেই জানোয়ারটাকে কোথায় বসে ডাকতে শুনেছিলে?"

বাঘা বল্ল, "বনের পূর্ব্বধারে, বটগাছের তলায়।"

গুপী বল্ল, "আরে, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হর্ত্তুকী তলায় বসে।"

বাঘা বল্ল, "সে ত আমার ঢোলকের আওয়াজ; আমি যে ঐখানে থাকতাম!"

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপী বল্ল, "ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দুজন জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি।"

একথায় বাঘারও খুবই মত হল। কজেই তারা খানিক কথাবার্ত্তার পর ঠিক করল যে তারা দুজনায় মিলে রাজা মশাইকে গান শোনাতে যাবে। রাজা মশাই যে তাতে খুব খুসী হবেন, তাতে ত আর ভুলই নাই, চাই কি অর্দ্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

[ক্রমশঃ]।

অদ্ভুত রেলগাড়ী।

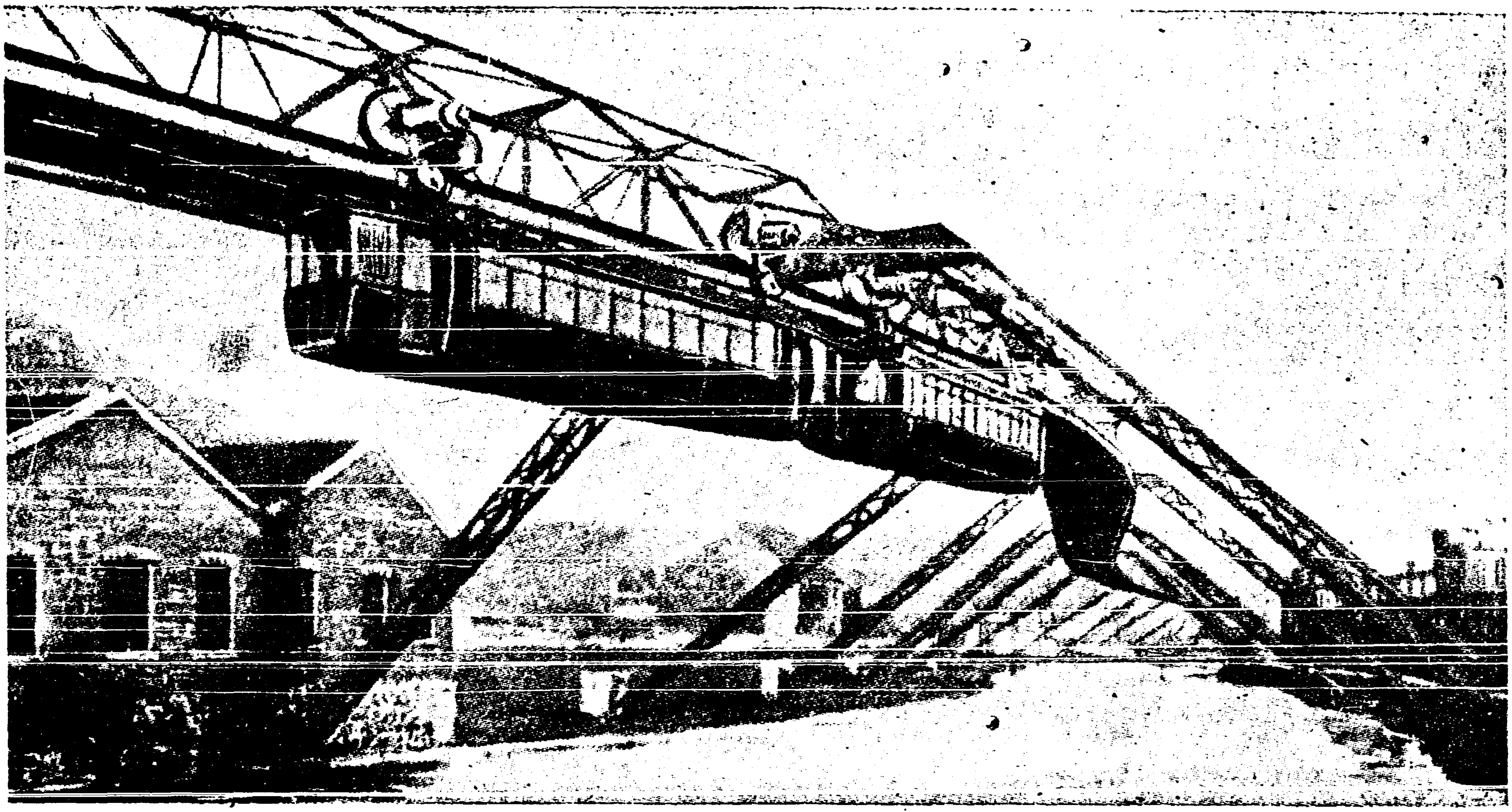

এ আবার কি রকম রেলগাড়ী ? গাড়ীর মাথার উপর রেলের লাইন, ছাদের উপর চাকা ! গাড়ীগুলো সব লাইন থেকে ঝোলান ! প্রুশিয়ার একটা নদীর উপর দিয়ে এই রেলগাড়ী চলাচল করে ! সেখানে জমির উপর লোহার রেল ফেলে লাইন বসাবার সুবিধা নেই অথচ রেলগাড়ী করা দরকার ; কাজেই বাধ্য হ'য়ে এই রকম করতে হ'য়েছে। এটা অবিশ্যি দেখ্‌তে খুবই অদ্ভুত ; কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য এই একলাইনের গাড়ী। একটি মাত্র লাইনের উপর ভর ক'রে গাড়ী চল্‌ছে ঘণ্টায় একশ' মাইল ! লাইন সোজাই হউক আর বাঁকাই হউক, গাড়ীর লোকেরা ঠাণ্ডাই থাকুক কি হুড়াহুড়িই

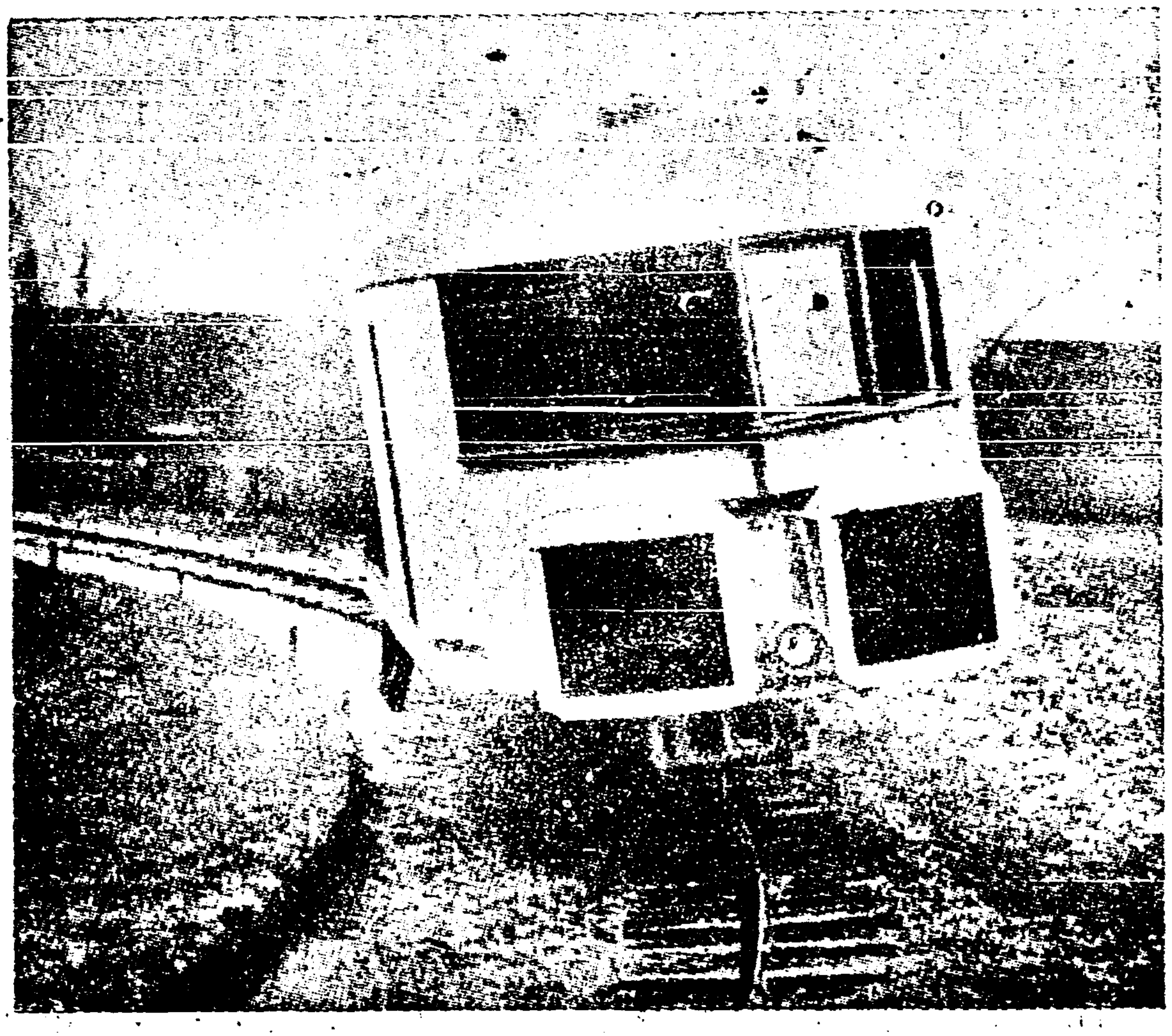

করুক গাড়ী তাতে টলে না। যারা বাইসিকেল্ চড়ে তারা যেমন ক'রে তাদের সাইকেলকে চালিয়ে নেয়—গাড়ী ঠিক্ তেম্নি ক'রে আর তার চাইতেও ভাল ক'রে আপনার তালে আপনাকে খাড়া রেখে হুহু ক'রে চলে যায়। শুধু তা নয়; বাইসিকেলকে থামাতে যাও অম্নি সে কাৎ হ'য়ে টলে পড়্বে। কিন্তু এ গাড়ী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক খাড়া ভাবে শুধু ঐ একটি লাইনের উপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্তে পারে। গাড়ীর মধ্যে যেখানে ড্রাইভার থাকে সেখানে যদি ঢুক্তে পার—দেখ্বে দুটো প্রকাণ্ড চাকাওয়ালা জিনিষ লাট্টুর মত ক্রমাগত ঘুর্‌ছে। ওই লাট্টুর জোরেই গাড়ী আপনার তাল ঠিক রাখে। সে কি যেমন তেমন ঠিক রাখা—কোন দুই লাইনের

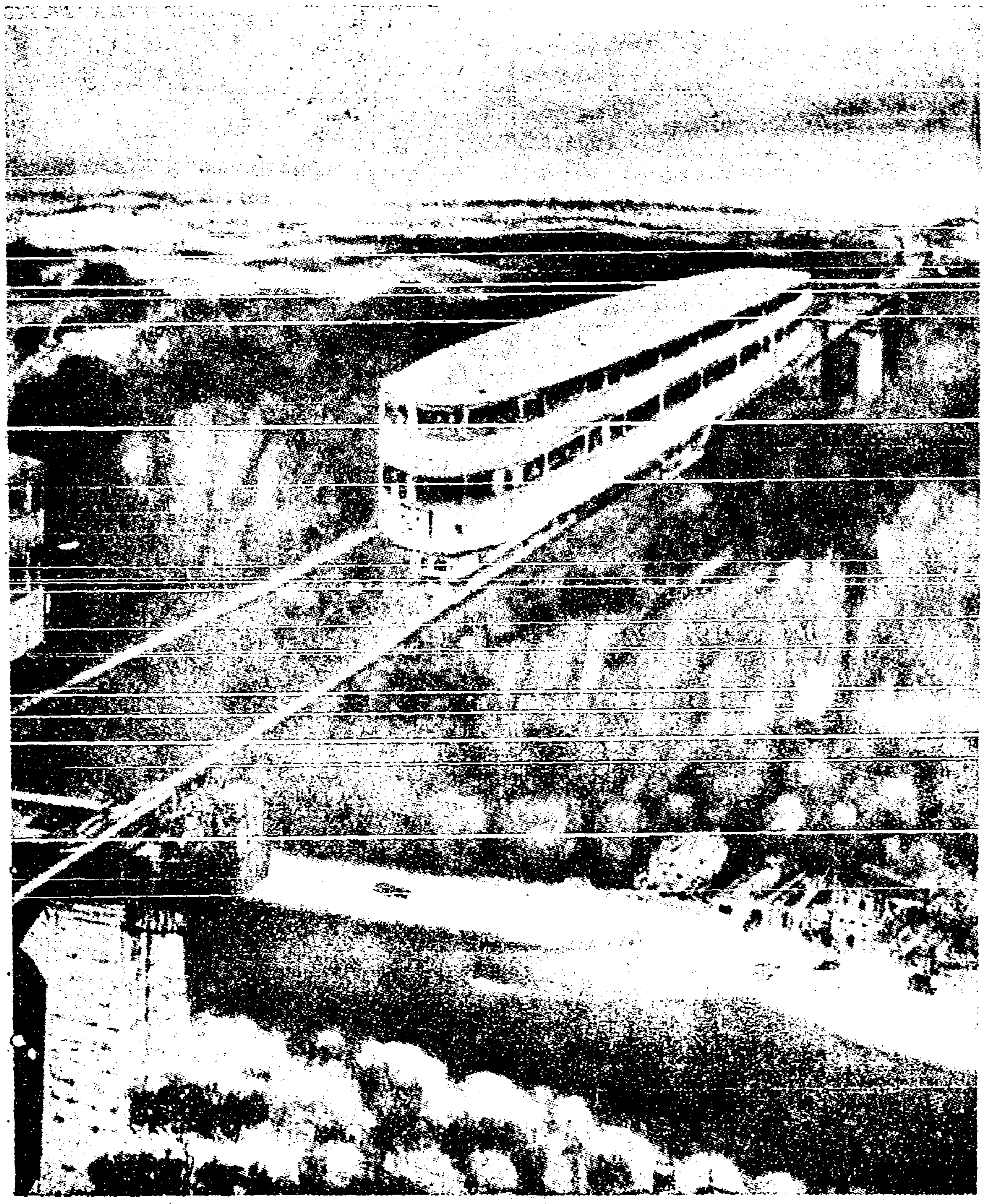

গাড়ী তেমন সুন্দর মোলায়েম ভাবে চল্‌তে পারে না—বাঁকা লাইনের উপর এ গাড়ী অতি সহজে যে রকম জোরে চলে যায়, একটা সাধারণ রেলগাড়ী সে রকম চেষ্টা কর্‌তে গেলে হয়ত লাইন থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়্বে! গাড়ীর নড় চড়া চাল চলনের হিসাবে এত সূক্ষ্ম যে তুমি যদি এক দিক থেকে আর একদিকে স'রে ব'স, গাড়ীও সেই বুঝে একটু ডাইনে বা বাঁয়ে ঝুঁকে আপনাকে সাম্‌লে নেয়! তোমরা যদি পাঁচজনে পরামর্শ ক'রে সবাই মিলে জিনিষ পত্র শুদ্ধ হুড়্‌হুড়্ ক'রে একদিকে লাফিয়ে পড়, 'লাট্টু'র চাকাও অমনি চট্ ক'রে গাড়ীকে আর একদিকে ঠেলে দিবে! কিন্তু তাই ব'লে এই যে ছবিটি দেখ্‌ছ এই রকম জায়গায় যদি ঐ রেগলাড়ীতে আমায় চড়্‌তে বলে, আমি কিন্তু সহজে চড়্‌ছি নে! এতে কোন

ভয় না থাক্‌তে পারে—কারণ, লাট্টুকে যেমন সুতোর উপরে চালিয়ে লোকে তামাসা দেখায়, এ রকমের গাড়ীও তেমনি একটা লোহার দড়ির উপর দিয়ে অনায়াসেই চলে যেতে পারে—তা অনেকবার পরীক্ষা ক'রে দেখান হ'য়েছে। কিন্তু তা বল্লে হবে কি? তার উপরে চড়্‌তে ইচ্ছা হয় কি?

আমেরিকায় এক আশ্চর্য্য রেলওয়ে আছে। এই রেলওয়ের লাইন আমেরিকা থেকে 'কিউবা দ্বীপের' দিকে প্রায় ১৫০ মাইল গিয়েছে—তার মধ্যে ১১০ মাইল একেবারে সমুদ্রের উপর। এতটা রাস্তা পার হয়ে ট্রেণটা ঢোকে গিয়ে একটা জাহাজের মধ্যে—সেই জাহাজ তাকে কিউবা পর্য্যন্ত পার করে দেয়।

পেটুক।

দুজন বুড়োর কথা জানি, এক জায়গায় তাদের খাওয়া দেখে খুসী হয়ে বাড়ীর লোকেরা বড় বড় দুটো রুইয়ের মুড়ো এনে দুজনার পাতে দিয়েছিল। তখন পেট ভরে গিয়েছে উঠবার সময়, তবু তারা মুড়োর লোভ সামলাতে না পেরে খেতে আরম্ভ করল; খেতে খেতে তাদের একজন ছুটে গিয়ে হড় হড় করে সব বমি করে ফেল্ল। আর দুজনের কথা জানি, তাদের এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণে যাবার একটু আগে তারা আরেক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে অনেক খাবার দেখে খুব খেয়েছে; পেটে যত ধরে। খেয়ে তাদের মনে হয়েছে যে, তাই ত, এক্ষণি যে নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে, এখন উপায়? উপায় আর কি? ফেল্ ডন্! দেখি পেট হালকা হয় কিনা! অমনি দুজনে মিলে প্রাণপণে ডন ফেল্‌তে লাগল!

আমি কিন্তু একটা প্রাণীবৃত্তান্তের পুস্তকে এর চেয়ে ভাল একটা উপায়ের কথা পড়েছি। সে উপায়টি জানা থাক্‌লে এই রকমের খাইয়ে মশায়দের সময় বিশেষে কাজ দিতে পারে। একটি জন্তু আছে, তার নাম গ্লটন্, সে পৃথিবীর সকল 'খাইয়ের' গুরু। খেতে খেতে পেট যখন তার জালার মত হয়ে যায়, আর একটি হজমীগুলিরও জায়গা থাকে না, তখন সে এমন দুটি গাছ খুঁজে নেয় যে তাদের মাঝখানে ফাঁক নিতান্তই অল্প। সে ফাঁকে মাথাটি মাত্র ঢোকে, কিন্তু পেট আটকে যায়। তারপর সে চোখ মুখ বুজে প্রাণপণে সেই সরু ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে গলে যেতে চেষ্টা করে। তখন কাজেই পেটের ভিতরে যত জিনিস আছে, সকলকেই বেরিয়ে আসতে হয়।

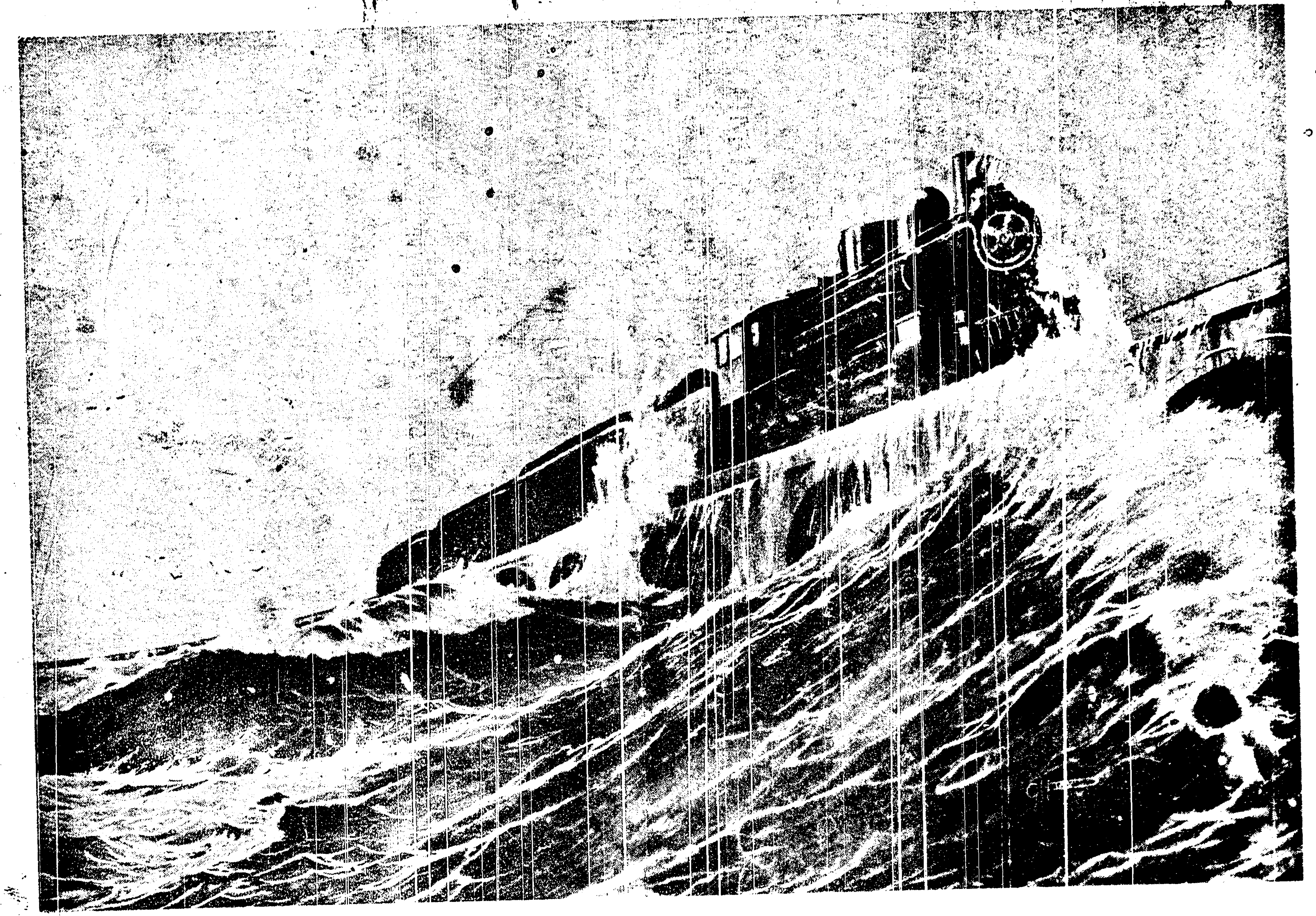

সমুদ্রের উপর রেল।

আবোল তাবোল।

হেড্ আফিসের বড় বাবু লোক্‌টি বড় শান্ত
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখন জান্‌ত ?
দিব্যি ছিলেন খোস্ মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
বসে বসে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হটাৎ গেলেন ক্ষেপে !
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখ্‌টি ক'রে গোল
হটাৎ বলেন "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল্" !

তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউবা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে "কামড়ে দেবে, সাবধানেতে তুলিস্"।
ব্যস্ত সবাই এদিক্ ওদিক্ কর্‌ছে ঘোরাঘুরি
বাবু বলেন "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি"!
গোঁফ হারান! সেকি কথা! তাও কি হয় সত্যি
গোঁফ জোড়াত তেম্নি আছে কমেনি এক রত্তি!
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে সাম্‌নে ধ'রে আয়না
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি কোন দিনও হয়না।
রেগে আগুন তেলে বেগুন তেড়ে বলেন তিনি—
"কা'রো কথার ধার ধারিনে সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা
"এমন গোঁফত রাখ্‌ত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস্ কর্‌ব তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে লিখে দিলেন খাতায়—
"কাউকে বেশী লাই দিতে নেই—সবাই চড়ে মাথায়,
"আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর—
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখেনা খবর;
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধ'রে খুব নাচি
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধ'রে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কা'রো বোঝা
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি এই ত বুঝি সোজা।"